শ্যাম দেশে প্রেম

পীযূষকান্তি সেন গুপ্ত

পরিবেশক :

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :—
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

প্রকাশক :
মিনতি সেন গুপ্তা
১৬৬/সি/৪২৬ লেক গার্ডেনস্
কলিকাতা-৭০০০৪৫

মুদ্রাকর :
গোবিন্দ লাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স
২নং ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম কুণ্ডু

উপদেষ্টা :
স্বাতী গাঙ্গুলী

পরিবেশক :
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৩

আমার
মা'কে

শ্যাম দেশে প্রেম

॥ ১ ॥

পার্ক স্ট্রীটের মোড়েই যা যানজট ছিল, তারপর ফাঁকা ভি. আই. পি. রোড পেয়ে আমার গাড়ির তরুণ চালক মহানন্দে গতি বাড়ালো। স্পিডোমিটারের কাঁটা যায় ছাড়িয়ে আশি ছুঁই ছুঁই।

ডান দিকে ঝিলের পাশের বাবলা জাতীয় গাছ আর ওপরে নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সোনালী মেঘের খেলা দেখতে দেখতে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল · কতদিনের এই চেনা পথটা অচেনা হয়ে যাবে—কয়েক বছরের জন্য বিদেশ যাত্রা। জানি না, আর ফিরতে পারবো কিনা। অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই আজ ডাক পড়েছিল ম্যানেজিং ডাইরেকটারের ঘরে। উনি ভাইস্ প্রেসিডেন্ট রিডের টেলেক্স পড়ে শোনালেন—ব্যাংককের নতুন কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেকটার করা হয়েছে আমাকে।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এত বড় পোজিশান পাওয়া যে চাট্টিখানি কথা নয়, সেটা আত্মীয় বন্ধু মহলে সবাই বলাবলি করছে। খালি মার বড় বড় শান্ত চোখ দুটো আরও বিষণ্ণ। এতদিনে যখন কলকাতায় সুন্দর ছিম্‌ছাম্ একটা বাড়িতে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে একটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভরা সংসারের মুখ দেখতে পেয়েছিলেন, তখন আমার এই চলে যাওয়া, মার কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। মার অবস্থা অনেকটা গঙ্গার জোয়ার ভাটার মত—সবার প্রশংসা শুনে গর্ব বোধ করছেন, ছেলের উন্নতিতে আনন্দবোধ করছেন, আবার চুপচাপ বসে থাকলেই বিচ্ছেদের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছেন। বাবা রাসভারি মানুষ, শুনে বললেন, শ্রীহরির অসীম কৃপা, এক হাত দিয়ে নেন আর এক হাত দিয়ে উজাড় করে দেন। বাবার কষ্ট বোঝার উপায় নেই। যতক্ষণ বাড়ি থাকি, বাবা-মা কাছাকাছিই থাকেন।

মা বেচারীর দুশ্চিন্তার শেষ নেই—সেখানে আমার রান্নাবান্না সংসারের উনোকুটি কাজ কে করবে ? ভালো মেইডের কথা তোলাতে মা মোটেও খুশি হননি—ও সব কি কাজের লোকের দ্বারা হয় ?

মোদ্দা কথা হলো, গৃহিণী-শূন্য গৃহে পুত্রের থাকাটা মার পক্ষে খুব পীড়াদায়ক, অথচ এমনটা হবার কথা ছিল না। মার চাপা দীর্ঘশ্বাস আমি টের পাই। পুরোনো ক্ষতে টান লেগে রক্তক্ষরণ শুরু হবার আগেই চেষ্টা করি হাসি ঠাট্টায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে।

আমার পাঁচ বছরের ভাগ্নী টুম্পা, মামা ব্যাংককে যাবে শুনে খুব উৎসাহিত। ওর স্কুলের বন্ধু বলেছে, সেখানে নাকি ইয়া বড় বড় পুতুল পাওয়া যায়, তারা হাঁটে, কথা বলে তো বটেই, বড়রা দুষ্টুমি করলে জোর ধমকও লাগায়। অফিস থেকে আসতেই একদিন কোলে চড়ে চুমু খেয়ে সেই পুতুলের আবেদনটা চুপিচুপি জানিয়ে ও আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, মামু ব্যাংককে কী খালি ব্যাঙ ভাজা খেতে পাওয়া যায় ?

মার আর এক চিন্তা—এক প্রতিবেশিনী নাকি বলেছেন, ওখানকার ফর্সা, নাক চ্যাপ্টা মুখপুড়িরা সব ভাল ছেলেদের মাথা বিগড়ে দেয়। ওরা নাকি সব কামরূপ কামাখ্যার মায়াবিনী। মা তাই বারবারই আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন—দেখিস, ওদের খপ্পরে যেন পড়িস না বাবা।

বাড়ির সবাই ছাড়া, অফিসের অনেকে এসেছে আমাকে বিদায় জানাতে। ওদের গুড্ উইসেস্ কুড়িয়ে হ্যান্ডসেক করে যখন মাকে প্রণাম করলাম, মা তখন অঝোরে কাঁদছে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে। মাকে জড়িয়ে ধরে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম, যাবার সময় কাঁদতে নেই। হাসিমুখে বিদায় দাও।

—বাবা, খুব সাবধানে থাকিস। ঠাকুরের ফুলটা কিন্তু পকেট থিকা ফালাইস্ না। মা আনন্দময়ীর ছবি দিয়া দিছি। ঐটা শোয়ার ঘরে টাঙাইয়া রাখিস। প্রত্যেক সপ্তাহে একটা কইরা পত্র লিখিস। মার গণেশ-গণেশ স্বগোতোক্তি আর থামছিল না।

বাবা মাথায় হাত রেখে চোখ বন্ধ করে জপ্ করে বললেন, শ্রীহরি তোমার মঙ্গল করুন। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীহরি।

বোন পারুকে আদর করে বললাম, মা বাবার খোঁজ নিস।

টুম্পাকে কোলে নিয়ে হামি দিয়ে কানে কানে বললাম, তোমার পুতুল ঠিক নিয়ে আসবো।

থাই কাউন্টারে মালপত্র জিম্বা দিয়ে বোর্ডিং, এমবারকেসান কার্ড নিয়ে আর একবার সবাইকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ভেতরে ঢুকে পাস্পোর্ট আর সিকিউরিটি চেকের বেড়া পার হয়ে অপেক্ষমান যাত্রীদের সঙ্গে গিয়ে বসলাম।

অতীত চিন্তা আবার মাথায় জমাট বাঁধলো। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল পাশের লোকের ডাকে—'বাবুজি, মেহেরবাণী করকে হামারা ইয়ে সামান্‌কা উপর থোড়া নজর রাখিয়েগা। হাম্ তুরন্ত আতা হ্যায়।'

—জরুর।

সামান্ কিন্তু দুটো চটের থলে। লোকটা মনে হয় উত্তরপ্রদেশবাসি। পরণে মালকোচা মারা ধুতি, পায়ে লাল মোজা আর কালো বুট জুতো, গায়ে পাঞ্জাবি।

কিছুক্ষণের মধ্যে সামানের মালিক ফিরে এল, কাঁধের লাল গামছাটায় মুখ মুছতে মুছতে। পৈতেটা তখনও কান থেকে ঝুলছে।

পৈতেটা নামিয়ে গামছাটা থলেতে ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করলো, কাঁহা জাইয়েগা?

—ব্যাংকক। আপ?

—হাম্ ভি তো হুঁয়াই।

ততক্ষণে থলে থেকে চুনের ডাব্বা আর তামাকের পুঁটুলি বের হয়েছে। হাতে খইনি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চুণ দিয়ে ডলতে ডলতে বললো, আপ কেয়া, ঘুমনে যা রহে?

—নেহি, কাম লেকে। আপ কিস্ লিয়ে?

উত্তরে জানালো, আমি তো ওখানে ব্যবসা করি দশ বছর ধরে।

ব্যবসাদার শুনে কৌতূহল হলো—কিসের ব্যবসা ?

—ছোট্ট একটা দোকান আছে, দেশী মসলাপাতির আর ভাজাভুজির।

—বউ ছেলে-মেয়ে ?

—ওরা সব দেশে থাকে। ও দেশে কি পরিবার নিয়ে থাকার জায়গা ?

জিগ্যেস করলাম, ব্যবসা চলে কি রকম ?

নীচের ঠোঁটটা বাঁ হাতে টেনে ডান হাতের চেটোর খৈনিটা ঠোঁটের মধ্যে চেপে বললো, মন্দ নয়। দেশে মাসে প্রায় পাঁচশো করে টাকা পাঠাই। দু-তিন বছর পর পর দেশে যাই, আর ওখানেও একটা ছোটো-মোটো সংসার আছে। রামজীর কৃপায়, দিন তো চলে যাচ্ছে।

বিমানে ওঠার ডাক এল। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও উঠলেন, দু হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে—জয় সীয়ারাম, জয় হনুমান বলতে বলতে।

থাই এয়ারওয়েজের ডি. সি. ১০ বিমানের দরজার মুখে জোড় হাত করে ঘাড় বাঁকিয়ে নমস্কার জানায় বিমান সেবিকা। ঝকঝকে দাঁতগুলো বের করে হেসে বললো, সোয়াদি খ্রাপ্ (সুস্বাগতম)। সেই মিষ্টি হাসিটা কালো চোখেও ছড়িয়ে পড়েছে। পাকা গমের রং গোলাপী হয়েছে গালে আর ঠোঁটে, হাল্কা বেগুনি হয়েছে চোখের পাতায়। সাজটাও নজর কাড়া—নিম্নাঙ্গে সিল্কের টাইট্ লুঙ্গি, গায়ে রঙিন ব্লাউজ, কাঁধ থেকে ফেলা কুঁচি দেওয়া এক ফালি ওড়না, ব্রোচ দিয়ে আটকানো। বুকের কাছে একটা বেগুনি অর্কিড্ ফুলের থোকে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো। অড্রে হেপবর্ণের মতো ফিগার।

বিমান তীর্যক গতিতে আকাশে উঠতেই বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো। কানে তখন আছড়ে পড়ছিল থাই সেবিকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে অক্সিজেন মুখোসের ব্যবহারের প্রক্রিয়া।

এর মধ্যে আমরা তিরিশ হাজার ফিট্ উঠে গেছি। নীচে বঙ্গোপসাগর। সেবিকা তখন বলছে, ভাসবার পোশাক আপনার সিটের নীচেই আছে। এর মধ্যে ড্রিংকস্-এর ট্রলি ঠেলে মিষ্টিহাসির মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি ড্রিংকস্ নেবেন ?

বিষন্ন মুখটায় হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি আছে ?

—যা চাইবেন—বিয়ার, জিন, হুইস্কি, ব্রান্ডি, ভোড্‌কা, স্যাম্পেন্ রেড্ ওয়াইন, হোয়াইট্ ওয়াইন, সফট্ ড্রিংক। একটু থেমে ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখিয়ে, আমাকে ছাড়া—যা চাইবেন ?

—ওয়েল সেইড্। স্যাম্পেন্ প্লিজ।

একটা চিনা বাদামের প্যাকেট, প্লাস্টিকের গ্লাস আর ছোট্ট স্যাম্পেনের বোতল রেখে বললো, এনজয় ইয়োরসেল্ফ। হ্যাভ্ এ প্লেজেন্ট্ স্টে ইন্ আওয়ার কান্ট্রি। মন খারাপ করবেন না, আমার চেয়ে সুন্দরী সঙ্গী পাবেন।

স্যাম্পেনের কর্কটা পপ্ শব্দ করে উড়ে গেল। গ্লাসে ঢালতেই বুদবুদে ভরে গেল অর্ধেক গ্লাস। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাবছিলাম, কি রকম হবে ব্যাংককের জীবনটা? মায়ের ভয়, ওখানকার মেয়েরা কামাখ্যার মত বোধহয় ভেড়া করে দেবে তার ছেলেকে।

পাশের সিটে বসেছিলেন এক প্রৌঢ়া থাই মহিলা। উনি উঠে বললেন, এক্সকিউজ্ মি।

তাড়াহুড়ো বোতল, গ্লাস সামলে উঠে দাঁড়িয়ে পথ করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর সহযাত্রিণী ফিরে এলেন। লাল স্কার্টের কোনা বাঁচিয়ে নিজের সিটে বসে বললেন, আমার নাম উমাপঙ্। আপনি তো ব্যাংকক যাচ্ছেন? বেড়াতে?

—হ্যাঁ। বেড়াতে নয়, কাজ নিয়ে। উল্টো জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলাম আপনাদের দেশে, কিছু থিসিসের মেটিরিয়েল সংগ্রহ করতে।

—তাই নাকি? কিসের ওপর থিসিস?

—বৈদিক ও বৌদ্ধ দর্শনের তুলনামূলক বিচার আমার বিষয়বস্তু।

শুনে কৌতূহল হলো—কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?

—বোধগয়া, সারনাথ, কাশী, হরিদ্বার।

—যা চাইছিলেন, সব পেয়েছেন তো?

উমাপঙ্ সিটটা একটু হেলিয়ে দিলেন। আরাম করে বসে বললেন, অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে, তাও যা আছে তা সারা জীবন ধরে পড়লেও শেষ হবে না।

—তিব্বতে শুনেছি, এ সব বিষয়ের অনেক পুঁথি আছে?

উমাপঙ্ একটু হাসলেন। হ্যাঁ, একবার যাবার ইচ্ছে আছে ওখানেও।

—বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কি হিন্দুধর্মের অনেক মিল আছে?

—আমার বিষয়বস্তু ধর্ম নয়, দর্শন—বৈদিক ও বৌদ্ধ। বেদ ও উপনিষদে ভগবান কী, সৃষ্টি কী, আত্মা কী, তার নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। বুদ্ধদেব তার ব্যাখ্যা করেছেন আর এক ভাবে। এই দুই বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য গিয়েছিলাম।

—কার কাছে পাঠ নিলেন?

—বেদ-উপনিষদ সম্বন্ধে পাঠ নিয়েছিলাম, হরিদ্বারের শঙ্করাচার্যের কাছে, মহাপণ্ডিত, তাঁর জ্ঞান অসীম, ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল। কাশীতে পেয়েছিলাম, আর এক পণ্ডিতের দেখা। বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ কাউকে বিশেষ পেলাম না সারনাথে! এ বিষয়ে পণ্ডিতের দেখা পেয়েছিলাম শ্রীলঙ্কায়, আমাদের দেশেও অবশ্য আছে। আর ধর্মের কথা যদি বলেন—তা হলে বলবো, বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মের প্রতিবাদ।

জিজ্ঞেস করলাম, কিসের প্রতিবাদ—পশুবলির বিরুদ্ধে?

—শুধু তাই নয়, জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অসৎ জীবন যাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বৌদ্ধধর্ম জনগণের ধর্ম, এ ধর্মে রাজা বা ব্রাহ্মণের কোনও প্রাধান্য নেই। মূর্তি পূজারও কোন স্থান নেই।

—সে কী, আপনারা তো বৌদ্ধমূর্তি'রই পুজো করেন।

উমাপঙ্গ্ প্রিয় বিষয় পেয়ে উৎসাহিত, সেটা পরে এসেছে। সেটা আসলে গুরু পুজো। আপনারা আপনাদের গুরুকে পুজো করেন না? আসলে কি জানেন, হিন্দুধর্ম' কোনও ধর্ম'ই নয়। এটা একটা ক্রমবিকাশ, নানা মুনির নানা মত, যত মত তত পথ। বুদ্ধদেব প্রথম একটা নির্দিষ্ট পথ দেখালেন। ধর্ম'কে সুসংগঠন করলেন।

আমি বললাম, আপনাদের দেশে একবার গিয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্যে। তখন দেখেছি, থাইদের হিন্দু দেব-দেবীর পুজো করতে।

—সেটা রাজানুকুল্যে এসেছে কম্বোজ মানে কম্বোডিয়া থেকে, রাজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে। বলছিলাম না, বৌদ্ধধর্মে' রাজার কোনও বিশেষ স্থান নেই।

প্লেনটা হঠাৎ ধুপ করে অনেকটা নেমে গেল। সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মাথায় উঠে গেল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটা সুরু হলো। তখন চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর পোলাও কেবল এক চামচ মুখে দিয়েছি।

সেবিকার নির্দেশ—দয়া করে সেফ্‌টি বেল্ট লাগিয়ে নিন। সিটটা সিধে করে বসুন।

প্লেনটা তখন কাঁপতে কাঁপতে, ঝাঁকুনি দিতে দিতে উপরে উঠছে।

আপনাদের ক্যাপ্টেন বলছি, আমরা রেঙ্গুনের উপর দিয়ে যাচ্ছি। ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম, তাই অনেক উপরে উঠে এসেছি। আর এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমরা ব্যাংকক পেঁছে যাবো।

উমাপঙ্গ্ আমার ফ্যাকাসে মুখ দেখে হেঁসে বললেন, খুব ভয় পেয়েছিলেন বুঝি?

লজ্জা পেয়ে বললাম, আরে না-না, কী যে বলেন!

—তারপর প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি পড়ান?

—হ্যাঁ, থামাসাট্ মহাবিদ্যালয়ে আমি দর্শ'ন শাস্ত্রের আচারিয়া অর্থাৎ অধ্যাপিকা। তারপর ব্যাগ হাতড়ে একটা ছোট্ট শিশি থেকে ছোট্ট একটা বড়ি জিভের তলায় দিয়ে চোখ বুজে শরীরটা এলিয়ে দিলেন।

গলা উঁচিয়ে দেখলাম, নীচে স্তূপিকৃত মেঘের দল যেন জমাট বেঁধে আছে।

খাবারের ট্রেগুলো নিতে নিতে সেবিকা জিজ্ঞেস করলো, খাবার ভাল ছিল তো?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, খুব ভালো, খুব সুন্দর, তোমার মতই। উঠে একটা বেনসন্ হেজের প্যাকেট আর ক্রিশ্চিয়ান ডয়োরের পয়জন্ পারফিউম্ কিনলাম।

বসতে বসতেই ঘোষণা—একটু পরেই আমরা ব্যাংককের ডন্ মুয়াঙ্গ বিমান-বন্দরে নামবো। আপনারা সেফ্‌টি বেল্ট লাগিয়ে চেয়ার সিধে করে বসুন।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে শ্যামদেশ, যার নাম এখন থাইল্যান্ড। একটা আঁকাবাঁকা রুপালী জলরেখা, তার পাশে পড়ে আছে একটা সার্পি'ল পথ, আর গাছের আড়াল করা ছোট্ট ছোট্ট বাড়িগুলো একটা সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ্ তৈরি করেছে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা আকাশচারী হয়ে দেড়ঘণ্টা সময় জুড়ে সাড়ে পাঁচটার সময়

আমাদের বিমান মাটি ছুঁলো। উমাপঙ্ আমায় একটা কার্ড দিয়ে বললেন, আসবেন, যখন সময় আর কাটতে চাইবে না। খুশি হবো এলে।

নমস্কার জানিয়ে বললাম, নিশ্চয় যাবো।

দরজার কাছে সেবিকার একই ঢং, একই কথা, 'স্বত্তয়াদি খ্রাপ'।

॥ ২ ॥

পাসপোর্ট, ভিসা পরীক্ষার জন্যে অনেকগুলো কাউন্টার—থাইদের জন্যে আলাদা, দূতাবাসের লোকদের জন্য আলাদা, আর বাকি গোটা সাতেক অন্যান্য বিদেশিদের। তড়িঘড়ি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পাসপোর্টে গোটা কয়েক ছাপ্পা মেরে ছেড়ে দিচ্ছে।

ওখান থেকে বের হলেই একটা মস্ত হল ঘর। সেখানে চারটে কনভেয়ার ঘুরছে। প্রত্যেক কনভেয়ারের সামনে লেখা আছে, কোন ফ্লাইটের মাল আসবে কোন কনভেয়ারে। আমার ফ্লাইট ছিল টি. জি. ৩৭০। একটা ট্রলি নিয়ে সেই ঘূর্ণত কনভেয়ারের সামনে দাঁড়ালাম। সবাই যার যার মাল নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমার মাল আর আসছে না। আমি অধৈর্য হয়ে পড়ছি। কনভেয়ার খালি। আমরা দশজন যাত্রী শুধু হা-পিত্যেশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এক প্যাসেঞ্জার-এসিস টেন্সকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম।

সে বেতারে খবর নিয়ে জানালো—আসছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়ান। সত্যিই এল।

সবুজ সংকেতের লাইন দিয়ে বের হতেই প্রথম হোঁচট, কাস্টমস্ অফিসারের ভারি প্রশ্ন—এনি থিঙ্ টু ডিক্লেয়ার ?

বললাম—নাথিং।

বিশ্বাস করলো না। স্যুটকেস খুলতে বললে দ্বিরুক্তি না করে স্যুটকেসটা খুলে সামনে ধরলাম।

হাতড়ে হাতড়ে বের করলো, একটা শক্ত প্যাকেট। টিপে টিপে বুঝতে না পেরে খুলে ফেললো। বের হলো কয়েকটা ছবি। দুটো একই রকম ছবি বের করলো, এটা কোথাকার ছবি ?

দেখলাম, ওটা বোধগয়ার ছবি। তাতে দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা আর তার সামনে বোধি গাছ। বুদ্ধদেবের মূর্তিটা অস্পষ্ট। ঐ ছবি দুটো নিয়ে এসেছিলাম প্রসাটে'র জন্য।

বোধগয়ার নাম শুনে বললো, আমায় একটা দেবেন ? আপনার তো দুটো আছে।

অগত্যা দিতে হলো।

ছবিটা মাথায় ঠেকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে দুঃখিত। আমরা খবর পেয়েছিলাম, এই ফ্লাইটে আপনার বয়সি এক স্মাগলার আসছে। আপনাকে সন্দেহ করার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

বাবাঃ, ঢুকতে না ঢুকতেই স্মাগলার। আমার চেহারাটা কি স্মাগলারের মত ?

ট্রাভেলারস্ চেক্ ভাঙিয়ে এয়ারপোর্ট ট্যাক্সির ভাউচার নিয়ে লাইনে দাঁড়ালুম, বারান্দায়।

এয়ারকন্ডিশানড্ ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের ভ্যাপসা গরমে গা ভিজে যাচ্ছিল।

একটা সাদা ভ্যান এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার নেমে এসে আমাদের ভাউচার দেখে চারজনকে বললো, গেট্ ইন্। সবাইর মাল তুলে নিল পেছনে। ভাউচারেই লেখা ছিল, কে কোন হোটেলে যাবে।

এয়ার কন্ডিশানড্ সুন্দর গাড়ি। ড্রাইভারের সুন্দর পরিষ্কার পোশাক। আমার তিন জন সঙ্গী, এক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার—ভদ্রলোক, স্ত্রী আর বছর দশেকের একটি ছেলে। ফর্সা রং।

ভদ্রলোক বেশ আলাপি। গাড়িতে উঠেই আলাপ জমিয়ে দিলেন।

—জানেন, আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অস্ট্রেলিয়ায় রেলে একটা চাকরি পেয়েছি। আমার স্ত্রীর খুব মন খারাপ—ইলিয়ট্ রোডের ভাঙা বাড়ি আর বুড়ি মায়ের জন্যে।

আমি বললাম, তা তো হতেই পারে। ওটাই যে নিজের দেশ। মাকেই বা ভুলবে কি করে ?

—হোয়াট্ দেশ ? দেশ আমাদের কী দিয়েছ ?—ছিলাম ইঞ্জিন ড্রাইভার, আর আমার স্ত্রী ছিল কোম্পানিতে সেক্রেটারি। আপনারা কি আমাদের দেশের লোক বলে কখনও ভেবেছেন ?

মনে মনে ভাবলাম, সে দোষ কি আমাদের। তোমরাও তো কোনও দিনই এটাকে নিজের দেশ বলে ভাবোনি ?

—স্বাধীনতার পর আমাদের অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের পেটে তো বিশেষ বিদ্যে নেই। আমার শ্বশুর ছিল খাঁটি স্কট্, আসামে টি গার্ডেনে ম্যানেজার ছিল। আমার বাবা ছিল আইরিস, কাজ করতো জেসপে। আমার বাবাকে একদিন ওয়ার্কাররা ধরে আর চারজনের সঙ্গে ফার্নেসে ফেলে দিয়েছিল।

—আপনার শ্বশুর, ওদের দেশে নিয়ে গেলেন না কেন ?

—ওর বাবা তো ওর মার সঙ্গে থাকতো না। ওরা থাকতো ইলিয়ট্ রোডে। ওর বাবা, মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা পাঠাতো। তা দিয়ে ওদের ভালোভাবেই চলে যেতো।

এ্যাংলো ইন্ডিয়ান দম্পতি মাঝ পথে একটা হোটেলে নেমে গেল।

আমি ওদের অল্ দা বেস্ট্ উইসেস্ বলে, হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বিদায় দিলাম।

বিমান বন্দর থেকে আসার পথটা ভারি সুন্দর। দুমুখি দুটো রাস্তা। গাড়িতে কোনও ঝাঁকুনি নেই, দুটো রাস্তার মাঝখানে ছেঁটে দেওয়া ছোট ছোট গাছ।

ভাবছিলাম, ঐ এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দম্পতির কথা। আজকাল আর এদের বিশেষ

দেখা যায় না। আমাদের অফিসের অনিমেষদা এদের সম্বন্ধে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল। এক সময় ও'র যাতায়াত ছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ায়—ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট। উনি এখনও কাজ করে চলেছেন একসটেনশনে।

উনি একদিন বলছিলেন, বুঝেছো অতু, ওরাই ছিল একদিন কলকাতার প্রাণ, আর ছিল বৌ-বাজারের বাইজীরা। এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েগুলো যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যদের কোমর জড়িয়ে হাঁটতো চৌরঙ্গির পথে। ভিড় করতো ফিরপো গ্র্যাণ্ড, স্পেনসাস আর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ব্যানকোয়েটগুলোতে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাই কলের আর রেলের চাকা ঘোরাতো, ওদের মেয়েরা ঘোরাতো টেলিফোনের ডায়েল। ওরাই ছিল বড়সাহেবদের সেক্রেটারি। সাহেবি ঠাঠ বজায় রাখতে রাতে উপরি রোজগারে বের হতো। ওরাই বাঙ্গালী সমাজটাকে বাঁচিয়েছিল। অথচ এরাই ছিল অপাংক্তেয়—কি বাঙ্গালী সমাজে, কি ইংরেজ সমাজে। তাই এরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ওরা চলে যাওয়াতে কলকাতার আর এট্রাকশনও নেই।

ড্রাইভার বললো, স্টে হাউ লঙ ?

—অনেকদিন।

—ওয়াণ্ট গার্ল ?

—থ্যাঙ্ক ইউ। আছি তো অনেকদিন, পরে দেখা যাবে।

—মিস্টার, বিউটিফুল। ইয়াঙ্গ। চিপ। হোল নাইট।

—না-না, আমার তার দরকার নেই।

—সারারাত তাহলে কি করবেন একা ?

—ঠিক আছে, তোমার ফোন আছে ? পরে ফোন করে যোগাযোগ করবো। আজ বড় ক্লান্ত।

—তা হলে চলুন, ম্যাসাজ পার্লারে নিয়ে যাই। একদম ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

বুঝলাম—কম্বলি নেহি ছোড়েগা, কী মুশকিল! বললাম, ঠিক আছে। পরে কথা বলা যাবে। কথা ঘোরাবার জন্যে বললাম, এ গাড়ি কি তোমার ?

—না, না, আমি গাড়ি চালাই—গাড়ি কোম্পানির।

—কত পাও ?

—মাসে মাইনে পাই পনেরো শো বাট (তখনকার হিসেবে প্রায় আটশো টাকা)।

—তাতে তোমার চলে যায় ?

—কি করে চলবে ? একটা ঘরের ভাড়াই তো প্রায় সাতশো বাট। একটা ছেলে আছে। তাই আমার স্ত্রীকেও কাজ করতে হয়। ও কাজ করে একটা দোকানে। টেক গার্ল। প্লিজ ইউ। খুব সস্তায় জোগাড় করে দেবো। অনলি ফোর হাণ্ড্রেড বাট।

আমরা অনেকক্ষণ শহরে ঢুকে পড়েছি। গাড়িটা একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালো। লাল বাতি জ্বলে উঠেছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এই রাস্তাটার নাম, রাম দি ফোর রোড। সামনেই চতুর্থ রামের একটা মূর্তি।

—ঐ সামনেই আপনার হোটেল ডুসিথ্ থানি।

গাড়িটা সোজা দোতলায় উঠে গেল। দারোয়ান নমস্কার করে দরজা খুলে দাঁড়ালো। তার মাথায় সোনালী পাগড়ি, গায়ে সাদা গলাবন্ধ কোট, মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, পায়ে সাদা মোজা আর জুতো।

কাঁচের দরজার কাছে দাঁড়াতেই ওটা সরে গেল দুদিকে। পুরু কার্পেটে ঢাকা সুন্দর হল। এক কোণায় রিসেপশান্।

তারই সামনে হাঁটু ভাঁজ করে নমনীয় ভঙ্গিতে বসে একটি সুন্দরী মেয়ে। তার সামনে বাঁশের সাজিতে বেল, চাঁপা আর নাম না জানা হলুদ রঙের থোকা থোকা ফুল।

মালিনী মালা গাঁথছে এক মনে। সাহেব মেমরা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ঢ্যাঙ্গা এক সাহেব একটা মালা কিনতেই মেয়েটি উঠে হেসে তার সঙ্গিনীর মাথায় পরিয়ে দিল। সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো।

রিসেপশনিষ্ট্‌কে নাম বলতেই কম্পিউটারের কী বোর্ডে সেই নামটা টিপতেই—ডিসপ্লে বোর্ডে দেখা গেল, আমার নাম, কবে আসবো, কবে যাবো ইত্যাদি।

বেলবয় পৌঁছে দিল দশ তলার একশ কুড়ি নম্বর ঘরে।

বিশাল ঘরের সবটাই নরম কার্পেটে মোড়া। কফি টেবিলের চারদিকে সোফা, টেলিফোন, টি ভি। একদিকের দেওয়াল জোড়া পর্দা। টেনে সরাতেই ঝলসে উঠলো রাতের ব্যাংকক। জানলা নয়, পুরো দেওয়ালটাই কাঁচের। মনে হয় ভারশূন্য হয়ে ভাসছি। লাল নীল আলোর মালা শহরের বুকে।

স্নান করে আসতেই ফোনটা বেজে উঠলো।

—গুড ইভিনিং, জেসমিন্ অতিলক্ষ্মণ। হ্যাঁ, খুব সুন্দর ঘর, ব্রাইডেল স্যুট। না-না, কোনও অসুবিধা হয়নি, ঠিক আছে। কাল আটটায় রেডি হয়ে রিসেপশনের কাছে থাকবো, আপনার অপেক্ষায়। আচ্ছা, গুড নাইট্।

ঘণ্টা খানেক পর আবার ফোন, এবার প্রসার্টের—ডিনারের আমন্ত্রণ।

প্রসার্ট এদের আর একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। ওকে বললাম, আজ থাক। আর একদিন খাওয়া যাবে একসঙ্গে; অনেক রাত হয়ে গেছে। আজ আর কষ্ট করে আপনাকে আসতে হবে না।

ঘরেই সামান্য খাবার এনে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। টিভিতে একটা ইংরেজি সিনেমা চলছিল, ভাল লাগছিল না। এতক্ষণ পর বড্ড একা মনে হচ্ছিল। বাড়ির কথা মনে পড়ছিল, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মা-বাবার মুখটা ভাসছিল চোখের সামনে। মার যেন গলা শুনতে পেলাম, যেমন রোজ শুনতাম। আমি অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়তাম। মা এসে বলতো, 'আর নয়, এবার ঘুমা, অনেক রাত হইছে।' আজও সেই কথা শুনতে পেলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

॥ ৩ ॥

রোববারের ছুটির আমেজ-লাগা ব্যাংকক ঘুরে দেখবো বলে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। রাম দি ফোর রোড পার হলেই সামনে একটা সুন্দর পার্ক, নাম—লুম্পিনী, লুম্বিনীর অপভ্রংশ। পার্কের মাঝে একটা খাল। তার পাশ দিয়ে বাঁধান রাস্তা। বাকি অংশ সবুজ ঘাস আর গাছে ঢাকা। মাঝে মাঝে ফুটে আছে নানান রঙ-এর মুসণ্ডা আর ক্যানা। খালের উপর অনেকগুলো খিলান দেওয়া পুল, যেমন দেখা যায় ভেনিসে। খালের জলে পেডাল্ বোট, চালাচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ে বাবা-মা, আবার কোনওটায় শুধু দুজন—কুহু আর কেকা।

হঠাৎ একটা মজার দৃশ্য দেখে চমকে গেলাম। কী ব্যাপার! না, চৈনিক যোগব্যায়াম হচ্ছে। জনা দশেক বৃদ্ধ লাইন করে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় হাত-পা ছুঁড়ছে, হাওয়ার সাথে লড়াই চলছে যেন। সবাই খুব স্বাস্থ্য সচেতন।

গাছের তলায় বসে আছে মাদুর পেতে এক-একটা পরিবার। জনা দশেক হবে এক এক পরিবারে। পরিবারের বুড়ো-বুড়ি, ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি সবাই এসেছে মনে হয়। তাদের বয়েস দু'মাস থেকে আশি বছরের মধ্যে। বুড়ো বুড়িরা কচিকাচাদের পাহারা দিচ্ছে আর তার চাইতে বড়রা কেউ ফুটবল খেলছে, না হলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। কেউ বা প্যাডেল্ বোট্ চালাচ্ছে।

প্রেমিক-প্রেমিকারাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড়ালে আবডালে রয়েছে। মাদুর এখানে ভাড়া পাওয়া যায়।

পার্কের ঠিক বাইরে গেটের কাছে গরম গরম ব্রেকফাস্ট্ বিক্রি হচ্ছে। চাকার ওপর রান্না ঘর—সব সরঞ্জামই আছে, এমন কি গ্যাসের উনুন অবধি। গরম গরম রান্না করে খাওয়াচ্ছে কাঁচের প্লেটে, গ্লাসে আর চামচে। এ রান্নাঘর টেনে নিয়ে যাবার জন্য কারও আছে মোটর সাইকেল, কারও বা সাইকেল। প্রত্যেক দোকানী তাদের নোংরা ফেলছে একটা বালতিতে। ভর্তি হয়ে গেলে তা ফেলে দিয়ে আসছে গার্বেজ্ বিনে। অনেককে নামিয়ে দিয়ে গেছে ভাড়াটে ভ্যান্। দোকান বন্ধ হয়ে গেলে সেই ভ্যান-ই এসে এদেরকে তুলে নিয়ে যাবে।

আর একদিকের ফুটপাতে দেখি চিনা বৃদ্ধদের ভিড়। কী ব্যাপার? খোঁজ করতে গিয়ে দেখি—আরে ব্যস্! বাঁশের খাঁচা ভর্তি জ্যান্ত গোখরো সাপ। এগুলো খায় নাকি? চোখের সামনেই সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে গেল।

এক বুড়ো একটা সাপ দেখিয়ে দোকানীর সঙ্গে দাম ঠিক করলো, দোকানী ঝাঁপি খুলে একটা কাঠ দিয়ে সাপটার মাথাটা চেপে ধরলো। তারপর বাঁ হাতে গলাটা টিপে ধরে বাইরে বের করে আনলো। সাপটা তখন ওর লেজ দিয়ে হাতটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। সেই লেজের চাপে দোকানীর হাতের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি একটা ছুরি দিয়ে সাপটার গলাটা কেটে ফেললো। দোকানীর স্ত্রী

একটা গ্লাস ধরলো। লাল রক্তে ছোট গ্লাসটা ভরে গেল। গ্লাসটা এগিয়ে দিতেই চিনা বৃদ্ধ মহাতৃপ্তিতে সেটা গলায় ঢেলে দিল। কিছুটা রক্ত ওর ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। ততক্ষণে সাপের ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো মাংস প্যাক করা হয়ে গেছে থলেতে। চিনা সেটা নিয়ে লম্বা পায়ে হাঁটা দিল মহানন্দে।

সত্যি বলতে কি—আমার গাটা গোলাচ্ছিল। পরে প্রসাটকে এই ঘটনার কথা জানাতে ও বলেছিল—এটা বুঝলে না, সাপের রক্ত যৌন ক্ষমতা বাড়ায়। চিনারা মনে করে, এতে বুড়ো হাড়ে ভেল্কি খেলানো যায়। এই সাপের রক্ত খেতে সিঙ্গাপুর থেকে সব বুড়োরা এখানে আসে।

সিঙ্গাপুরে নাকি সাপের রক্তের অনেক দাম। এখানে এসে যেমন রক্ত খাওয়া যায়, তার পরীক্ষাও করা চলে অনায়াসে। এই ব্যবসা চালাবার জন্যে তাই থাইরা সাপের চাষ করে।

হোটেলে এসে একতলার করিডর দিয়ে হাঁটছিলাম। বাঁ দিকে ওদের চাইনিজ খাবারের রেস্তোরা তারপর কফি-সপ্ আর ডানদিকে সব দোকান।

হঠাৎ ডাক শুনলাম—হ্যালো মিস্টার, ইউ মাস্ট্ বি এন্ ইন্ডিয়ান্। আইয়ে না অন্দর. একদিনে স্যুট পাবেন—খুব সস্তা, অর্দ্ধেক দাম—দেশের চাইতে।

ভেতরে ঢুকে বললাম, এখন নয়। আছি আমি অনেকদিন।

—তা হলে বসুন। একটু গল্প করা যাক।

কিছুই করার ছিল না—বসলাম। ভদ্রলোক বেশ আলাপি ও মার্জিত। সুন্দর আমেরিকান এ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন এখানে আছেন?

—তা অনেকদিন। দাঁড়ান, এই সাহেবের স্যুটের মাপটা লিখে নেই।

পেট মোটা এক সাহেব দাঁড়িয়েছিল। একটি থাই মেয়ে তার মাপ নিচ্ছিল আর ভদ্রলোক লিখছিলেন। সাহেব চারটে সার্ট আর দুটো স্যুটের অর্ডার দিল।

—এবার বলুন, আপনার নামটা জানতে পারি কী? কোথায় আছেন?

—নাম জানিয়ে বললাম, এখানেই। সামনের সপ্তাহে একটা বাড়ি খুঁজে চলে যাবো। আপনি কি দর্জির দোকান করার জন্যেই এখানে এসেছিলেন?

হেসে বললেন, না-না। এসেছিলাম ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে, আমি ব্রুকলিন ইউনিভার্সিটি থেকে এম.বি. এ করেছি। দেশে ইকনমিক্সে এম.এ. করেছিলাম।

শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ, পড়ানো ছাড়লেন কেন?

কারণ ওতে পয়সা নেই। এক সর্দারজি বন্ধুর কথায় এ দোকানটা নিয়েছিলাম, যখন এ হোটেলটা তৈরি হলো।

—আপনি সপরিবারে এখানে থাকেন?

উত্তরে সম্মতিসূচক ঘাড় হেলালেন, ট্যান্ডন্।

—কিছু যদি মনে না করেন—পরিবার কি এ দেশী ?

—খাঁটি স্বদেশী।

কৌতূহল চরিতার্থ করার ইচ্ছে হলো—আচ্ছা, এখানে আমাদের দেশের কত লোক আছে ?

একটু ভেবে বললেন, তা হবে হাজার তিরিশেক।

জিজ্ঞেস করলাম, এরা সব কি করে ?

—ট্যান্ডন্ জানালেন, প্রায় সবাই ব্যবসা করে।

—কিসের ব্যবসা ?

—পাওরাত ও প্রাতুনামে অনেকে ভারতীয়দের কাপড়-জামার দোকান আছে। পাওরাৎকে এখানে সবাই বলে, ইন্ডিয়ান বাজার। আমার মতো অনেক দর্জির দোকানও আছে। সুকুমভিতে আছে অনেকের জুতোর দোকান। কেউ কেউ হয়েছে ট্রাভেল এজেন্ট, রেস্তোরা করেছে কেউ কেউ। আবার অনেকের আছে বড় বড় কারখানা, থাই-ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার, যেমন বিড়লা, থাপারের সঙ্গে।

—এরা ইমিগ্রেসান্ পেলো কি করে ?

—১৯৩৫ সালের আগে কোনও ইমিগ্রেসানের কড়াকড়ি ছিল না। তখন পাঞ্জাব থেকে যারা এসেছিল, তারা সব কাপড়ের ব্যবসা করতো। উত্তরপ্রদেশের কিছু লোক করে দারোয়ানি, মশলাপাতির আর ভাজাভুজির দোকান। পাঞ্জাবিই বেশী।

—পাঞ্জাব মানে সর্দারজি না হিন্দু ?

—অনেক হিন্দুও এখন পাগড়িধারী শিখ হয়ে গেছে, কারণ শিখরাই এসেছিল বেশী। এবং ওরাই ছিল পথপ্রদর্শক।

একদল সাহেব মেম ঢুকলো দোকানে। রাজীব ট্যান্ডন্ ওদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি উঠে পড়লাম।

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যায় কিছু করার নেই, চিনিও না কাউকে। কফি-সপে কফি খেয়ে বের হলাম রাস্তায়, রাস্তার নাম সিলোম রোড।

পরিচ্ছন্ন চওড়া ফুটপাথ, পথচারীদেরই দখলে। ফুটপাতের ধারে বকুল গাছের মত গাছ, সবগুলো সমান, যেন ছেঁটে সমান করা হয়েছে। রাস্তা দুভাগ করা ছোট্ট বাঁধ দিয়ে।

গাড়ির ভিড়ে রাস্তা পার হওয়া মুশকিল !

অটো রিক্সাগুলো ভ্রমণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মাঝেই আছে মিনি ট্রাক বোঝাই লোক। ট্রাকগুলোর পেছনে দুটো বেঞ্চে গাদাগাদি করে বসেছে যাত্রীরা। হাল্কা ফ্রেমে গাড়িগুলোর মাথা ত্রিপাল দিয়ে ঢাকা, সাইডগুলো খোলা। আমি

দাঁড়িয়ে আছি আরও কয়েকজনের সঙ্গে—রাস্তা পারাপারের দাগ কাটা জায়গার সামনে। এক মহিলার হাতের ইসারায় একটা মোটর সাইকেল এসে দাঁড়ালো। মহিলা দরাদরি করে পেছনে উঠে বসলো। সাইকেলটা দুরন্তগতিতে চলন্ত গাড়িগুলোকে কাটিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল। আর এক ভদ্রলোক ডাকছিলেন, টুক্‌টুক্‌ টুক্‌টুক্‌—এসে দাঁড়ালো অটোরিক্সা। সুন্দর নামটা। পরে জেনেছি—শুধু থাই ভাষায় একে বলে সামরথ, সাম্‌ অর্থাৎ তিন, আর রথ হল রথের অপভ্রংশ।

রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠলো। লাল বাতির সঙ্কেতে গাড়িগুলো থেমে গেল। আমরা রাস্তা পার হলাম। একটু এগিয়ে যেতেই ডানদিকে দুটো রাস্তা, সেখানে লাল নীল নিয়ন লাইটের হাতছানি—কিঙ্গস্‌ বার, কুইনস্‌ বার, গার্লস বার, একস্‌ক্লুসিভ্‌ বিউটি : প্রত্যেক বারের সামনেই একটি মেয়ে বসে ডাকছে—ড্রিংকস্‌ কুড়ি বাট্‌, বিউটিফুল হোস্টেস্‌। কাম সার, কাম্‌।

ইংরেজি রক্‌ মিউজিকে রাস্তার বাতাস কাঁপছে। বারের দরজাগুলো আধখোলা, বারনারীরা উঁকি-ঝুঁকি মারছে। ঝকমকে খাটো জামা পরা নারী শরীরের হাতছানি কোণায় কোণায়। রাতের পতপঙ্‌ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সব ট্যুরিস্টদের পেছনে টাউটরা ছুটছে। আমার পেছনেও লেগেছে একটা দড়িপাকানো ছেলে—ওয়ান্ট ম্যাসাজ, বিউটিফুল গার্লস বলেই একটা এলবাম্‌ খুলে ধরলো। এলবামের পাতায় বিবসনা মেয়েদের রঙিন ছবি। একটু এগোতেই আর একজন—লাইফ সো। চিপ্‌—ভেরি চিপ্‌, কাম মাস্টার।

মাছির মত সব ভন্‌ভন্‌ করে ধরেছে। তাড়িয়ে কুল পাওয়া যাচ্ছে না। ওয়ান্ট এ বয় ট্‌য়েলভ্‌ ইয়ার্স। ইয়োর স্পেশ্‌ সার।

একটা ইংরেজি বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। বই দেখতে দেখতে ভাবছিলাম এইহল পতপঙ্‌, যার কথা সব ট্যুরিস্টরাই জানে। এয়ারপোর্টে যে প্যাম্পলেট দেয় সব-ট্যুরিস্টদের যাতে আছে সব দ্রষ্টব্য স্থানের ছবি আর ছোট্ট করে বর্ণনা, তাতেও আছে বারের বিকিনি পরা মেয়েদের ছবি আর নাইট লাইফের ছোট বিবরণ।

দোকান থেকে একটা বই কিনে বের হয়ে ডানদিকে ঘুরে যে রাস্তাটায় এসে পড়লাম, সেটার নাম পতপঙ্‌ টু। সামনে একটা ফাস্ট্‌ ফুডের দোকান সসেজ্‌, হ্যামবার্গার আর কফি বিক্রি হচ্ছে। বেশ ভিড়। একটা কফি খেলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

তার পাশেই ফুড্‌ল্যান্ড। নাইট্‌ লাইফের প্রলোভন থেকে বাঁচবার জন্যে ফুড্‌ল্যান্ডেই ঢুকে পড়লাম।

ফুড্‌ল্যান্ড, একটা সেল্ফ্‌ সার্ভিস সাজানো মুদিখানার দোকান, মধ্যে আছে কাঁচা বাজার—মাছ, মাংস, সসেজ্‌, পর্ক আর এক পাশে ওষুধ। সেল্ফে সব জিনিস সাজানো আছে, যার যা দরকার তুলে নিচ্ছে। শাক, সব্জি, মাছ, মাংস—কাঁচে ঢাকা কোল্ড স্টোরেজে রাখা। মাংস দরকার মত ইলেকট্রিক করাতে কেটে ওজন করে প্যাকেটে ঢুকিয়ে দাম লিখে গ্রাহকের বাস্কেটে দিয়ে দিচ্ছে একটি মেয়ে। বের হবার একটাই পথ। সে পথে বসে আছে একটি মেয়ে হিসেবের যন্ত্র নিয়ে। বাস্কেট থেকে

জিনিষগুলো তুলে হিসেব লিখে রাখছে পাশের টেবিলে। সেখানে আর একটি মেয়ে বড় এলকোথিনের ব্যাগে ভরে দিচ্ছে। ক্রেতা পয়সা মিটিয়ে থলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সমস্ত স্টোরগুলোই এয়ার কন্ডিশনড্।

ঢুকেছিলাম দোকান দেখতে কিন্তু খালি হাতে বের হই কি করে? এক প্যাকেট নেসলস্ চকলেট আর কয়েকটা রুমাল কিনে ফেললাম।

একটা ছোট্ট ঘরে অডিও ক্যাসেটের দোকান। পঁচিশ বাটে বিক্রি হচ্ছে নামকরা আমেরিকান গায়ক-গায়িকাদের বিখ্যাত গানের টেপ। এল্লা ফিটজারলাণ্ড, পল রবসন, ভেরি পার্কার, বব ডিলন, জোয়ান বায়েজ, কোল পোটার-সবই পাইরেসি করা। পাশেই একটা ঘড়ির দোকান, যেখানে রোলেক্স ঘড়ি বিক্রি হচ্ছে পনেরো শো বাটে, যার আসল দাম হয়তো পনেরো হাজার। এ সবই আসে সিঙ্গাপুর থেকে।

একদিকে চারতলা পার্কিং স্পেস্। বেরোবার পথে একটা কাঁচের ঘরে বসে পয়সা নিয়ে ইলেকট্রিক গেটটা খুলে দিচ্ছে একটি মেয়ে।

রাস্তার দুদিকে গো-গো বার। বারের একটি মেয়ে দরজা থেকে উঁকি মেরে হেসে বললো, কাম্ স্যার্, প্লেন্টি বাট্ বিয়ার। সি ডান্স্—নাইস গার্ল। দরজার ফাঁক দিয়ে ওর সুন্দর শরীর দেখা যাচ্ছে, থাই-এর মধ্যবর্তী ল্যাণ্ডটা একটা কালো ত্রিকোণ কাপড়ের ফালি দিয়ে ঢাকা। বয়সের ধর্ম যাবে কোথায়? ঢুকে পড়লাম।

সমস্তটাই আমেরিকান ধাঁচে তৈরি। ভেতরে আধো আলো, আধো অন্ধকার। স্টেজে ডিস্কো লাইটের চলন্ত লাল নীল আলোর রেখা বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রায়-বিবসনা পূর্ণযৌবনা নারীদেহে। ভালো সাউণ্ড সিস্টেমে মনমাতানো আধুনিক ইংরেজি গান।

একটি মেয়ে হাত ধরে নিয়ে বসালো নরম একটা কাউচে। সামনে একটা গোল টেবিল। স্টেজটা একটু উঁচুতে, স্টেজের উপর থেকে সিলিং পর্যন্ত উঠে গেছে কয়েকটা চকচকে পাইপ।

মেয়েটি পাশে বেশ ঘন হয়ে বসলো। নরম হাতে ধরাই ছিল আমার হাতটা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, প্রথেথ্ থি নাই?

আমি বললাম, ডোন্ট নো থাই।

ও বললো, ফম্ মাই সাপ, আংরেৎ—পাকিস্তান?

—নো, ইণ্ডিয়া।

—ইণ্ডিয়া - গুড। পাকিস্তান—নো গুড।

পাকিস্থানি কেউ হয়তো ওকে পয়সা দেয়নি, ওর শরীর নিংড়ে নিয়ে।

ড্রিঙ্ক—বিয়ার?

—ইয়েস, বিয়ার।

ও উঠে গেল বিয়ার আনতে। বারের পেছনে একটা মেয়ে ড্রিঙ্ক দিচ্ছে কাট গ্লাসের ট্যাঙ্কারে। স্টেজের সামনে উঁচু টুলে দুজন সাহেব বসে আছে। এক হাতে তাদের ড্রিঙ্কের গ্লাস আর এক হাতে ধরা আছে হোস্টেসের কোমর। মাঝে মাঝে সে হাত আরও উপরে উঠে আসছে নরম মাংস পিণ্ডে।

স্টেজে তিনটি মেয়ে নাচছে গানের তালে তালে পা ছুঁড়ে কোমর দুলিয়ে, রড্ ধরে। ওদের গায়ে দুটুকরো কালো বিকিনি, পায়ে পেন্সিল হিলের কালো

জনুতো, ছোট করে ছাঁটা চুল। কাঁচা সোনার মত রং মেক-আপ করে আরও সুন্দর হয়েছে। শরীরের গঠন চাবুকের মত। এদের নাচে না আছে উচ্ছৃংলতা, না আছে কমনীয়তা, না আছে নৃত্যকুশলতা। এ যেন নারী শরীরের চলন্ত বিজ্ঞাপন, দর্শকদের কামনা উদ্রেকের আপ্রাণ প্রয়াস।

মেয়েটি বিয়ারের ট্যাংকারটা টেবিলে রাখলো, পাশের খালি গ্লাসটায় বিলটা ঢুকিয়ে।

গা ঘেঁসে বসে বললো, খুন্ ছু আড়াই খ্রাপ্ ?

প্রসার্ট আগের বার একটা ইংরেজি-থাই ভাষার পকেট বুক দিয়েছিল। তার থেকে কিছু সাধারণ কথা শিখেছিলাম। বললাম, অতীশ। পাল্টা প্রশ্ন করলাম খুন্ ছু আড়াই খা ?

ফম্ ছু টিম্। কোমরটা জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখটা এনে বললো, টিম্ ক্রাই ড্রিংক। (টিম্‌কে একটা ড্রিংক কিনে দেবে ?)

—আমি বললাম, ঠিক আছে।

ও গালে গাল লাগিয়ে বললো, খাপ্ খুন খ্রাপ্ (থ্যাংক ইউ)।

ছুটে গিয়ে একটা ড্রিংক নিয়ে এল। বিলটা ঐ গ্লাসে ঢুকিয়ে রাখলো। গ্লাসে গ্লাসে ঠুকে চুমুক দিল, ওর কোকের গ্লাসে।

মেয়েটি বললো, খুন খয়—ফম্ ডেওনি ডান্স্। (তুমি অপেক্ষা কর—আমি এখন নাচবো)।

আগের মেয়ে তিনটে নেমে এল, অন্য তিনজন স্টেজে উঠলো। তার মধ্যে ও একজন। নাচের কোনও তারতম্য নেই। পার্থক্য নেই সাজে, শুধু আছে চেহারায়। ওদের সবার বুকের কাছে একটা করে লাল চাকতি, তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে নম্বর—ওটাই ওদের পরিচয়।

টিম্ নাচছে, কিন্তু চোখ আমার দিকেই। চোখের তারা বলছে, প্লিজ্ উঠে যাবেন না।

এর মধ্যে বার টুলে সাহেবটার পাশে বসা মেয়েটা, কখন উঠে গেছে। সাহেব সেই বারের মেয়েটিকে কি যেন বললো। ওয়ালেট থেকে কিছু নোট্ দিল ওকে। ওর হোস্টেস্ তখন জামা কাপড় পরে ভদ্রস্থ হয়ে এসেছে। সাহেবের হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

আমার বিয়ারের গ্লাস শেষ হয়েছে। ভাবছি এবার উঠবো। টিম্ স্টেজ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে হাত ধরে বসিয়ে বললো, আর একটা নাও। ফম্ নুয়াং (আমি ক্লান্ত), আমায় একটা দাও—প্লিজ্।

ইচ্ছে না থাকলেও রাজি হতে হলো। ওর কথা থেকে বুঝলাম—ওর ড্রিংকের যা বিল হয়, তার অর্ধেক ওর প্রাপ্য। উপরি যা হয়, তা বাইরে গেলেই। তার থেকেও বার পায় তিনশো বাট্। নাচবার জন্যে পায় হাজার বাট্ মাসে। সেটা পোশাক, যাতায়াত আর খেতেই চলে যায়।

ওর বিলগুলোতে চার্জ করেছে চল্লিশ বাট করে।

ওর হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে গুড্ নাইট্ বলে চলে এলাম।

বেচারা আমার দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। আমি আর পেছন ফিরে তাকাই নি।

॥ ৫ ॥

কানের কাছে মধুর কিড়িং কিড়িং-এ ঘুম ভাঙলো, রিসেপশনিস্ট জানাচ্ছে যে আমার অতিথি এসেছে জেসমিন্ অতিলক্ষ্মণ।

—সরি জেসমিন্। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়ছি।

জেসমিনের সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল, যখন একবছর আগে মার্কেট সার্ভে করতে এসেছিলাম। তাই ওকে চিনে নিতে কোনও কষ্ট হলো না। আমায় দেখে ও এগিয়ে এসে বললো, হাউ আর ইউ মিঃ রায়? হেসে বললো, কালকে নিশ্চয় লেট নাইট হয়েছে?

—না সেরকম কিছু নয়, এই এগারোটা।

—কোথায় গিয়েছিলেন, হেসে জেসমিন্ জিজ্ঞেস করলো।

—গিয়েছিলাম, আপনাদের নাইট লাইফ দেখতে।

—তা হলে তো ভালই কেটেছে সন্ধেটা। চলুন, এবার যাওয়া যাক। জেসমিন্ বেশ ফর্সা, মুখখানা ঢলঢলে। শরীর একটু মোটার দিকে। বয়েস হবে চল্লিশের মত। সুন্দর ইংরেজি বলে। স্টেনোগ্রাফি শিখেছে অস্ট্রেলিয়ায়। বিয়ে হয়েছে এক ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। ও প্রসাটের সেক্রেটারি ছিল, এখন এডমিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসার।

আমরা সদর দরজা ছাড়িয়ে করিডর দিয়ে হাঁটছিলাম।

—কী ব্যাপার। তোমাদের অফিসে যাবো তো?

—তাই তো যাচ্ছি।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, কোথায়, হোটেল থেকে বের হলাম না তো?

—হোটেলের নর্থ ব্লকেই তো আমাদের অফিস। করিডরের বাঁ দিকে সব সারি সারি সাজানো দোকান। দুদিকেই সম্পূর্ণ কাঁচ দেওয়া। বুটিকের দোকানে সব ম্যানিকুইন্, গায়ে তাদের রং বেরং-এর থাই সিল্কের ফ্রক্। গয়নার দোকানের সো-কেসে ঝলসে উঠছে হীরে আর মুক্তোর সেটিং। থাই হ্যান্ডিক্রাফটের দোকানে দেখা যাচ্ছে হাতির দাঁতের কাজ, কারুশিল্প, বেতের অপূর্ব কাজ করা জিনিস, ব্রোঞ্জের মূর্তি, ব্রাসের ওপর মিনা করা নানারকম তৈজসপত্র।

নীচে বার সুন্দর হল। সেই সাত সকালেই বসে গেছে ড্রিংকের গ্লাস নিয়ে সব সাহেবরা।

দশ তলার অফিসে প্রসাটের ঘরে ঢুকতেই হৈ হৈ করে আমাকে কনগ্র্যাচুলেট্ করলেন কারণ আমার সুপারিশেই কোম্পানিটা কেনা হচ্ছে।

প্রসাটের বয়স হবে পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। জীবনটাকে চুটিয়ে ভোগ করছেন—সব রকম 'ম' এরই নেশা আছে।

প্রসার্টকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কম্পানি কেমন চলছে ?

—ভালই। আমরা তো আর একটা কারখানা কিনেছি।

—আপনাদের প্রোডাক্ট কি সব থাইল্যাণ্ডেই বিক্রি করেন ?

—বেশীর ভাগই। মিড্‌ল ইস্টেও বিক্রি করি, কিছু সিঙ্গাপুরে।

আমাদের সেলস্‌ ম্যানেজার গোপালের সঙ্গে কি আগের বার আলাপ হয়েছিল ?

একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোপাল, আছে ?

—না, এখন নেই। ও ছেলেকে কলেজে ভর্ত্তি করার জন্য ইণ্ডিয়া গেছে। তারপর কাল রাতে কি করলে ? প্রসার্ট মিটি মিটি হাসছে।

—কাল ঘুমিয়েই কাটালাম। মিথ্যে কথাটা কেন যেন বেরিয়ে গেল।

—তুমি ভীষণ আনস্পোর্টিং। বিদেশিরা একা এলে এখানে প্রথম কয়েক রাত ঘুমোয় না।—স্ফুর্ত্তি করে নাও ভায়া, কবে জীবনটা ফুৎ করে নিবে যাবে। গতবার তোমায় দেখেছি, তুমি ভীষণ ওয়ার্কোহলিক। কী লাভ অত কাজ করে ?

—এই যে কাজটা নিয়েছি, এটা তো একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ।

না খাটলে চলবে কি করে ? আপনি আমায় একটু টিপস্‌ দিন না ?

প্রসার্ট চেয়ারটা পেছনে ঠেলে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি যে কোম্পানিতে যাচ্ছো সেখানকার সিনিয়ার স্টাফরা সবাই খুব উচ্চশিক্ষিত। ওদের স্টাফিং খুবই ভাল।

বললাম, সে কী ? তা হলে দশ বছরের মধ্যে লাভ করতে পারলো না কেন ?

—তার বোধ হয় একটা কারণ ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের অকর্ম্মন্যতা ও তার ডিজঅনেস্টি। শুনেছি ওদের অনেক কাগজ কিনতে হয় ফিনল্যাণ্ড থেকে। তার থেকে উনি কাট্‌ নিয়ে বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা করেন। ঐ ভদ্রলোককে···তো আমি প্রায় রোজই দেখি—দুপুরে গল্ফ খেলতে ওদের সেলস্‌ ম্যানেজার আহমেদের সঙ্গে।

—আহমেদ, শুনেছি ভারতীয় ?

—শুধু ভারতীয় নয়, উনি তোমাদের বাঙ্গালী।

—হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি গল্ফ খেল তো ?

—বললাম তা খেলি।

—ভেরী গুড, তোমাদের কর্পোরেট মেম্বারশিপ আছে রয়াল ব্যাংকক স্পোর্টস্‌ ক্লাবে। তুমি তাড়াতাড়ি সেটা তোমার নামে ট্র্যান্সফার করে নাও।

জেসমিন্‌ ঠিক সময় মত এসে বললো, সময় হয়ে গেছে, এবার চলুন মিঃ রায়।

প্রসার্ট বললো, ঠিক আছে, তুমি যাও। সামনের সপ্তাহে দেখা হবে। একদিন আমার সঙ্গে ডিনার খাবে কিন্তু।

এক তলার বারান্দায় এসে জেসমিন পাবলিক এ্যড্রেস সিস্টেমে ড্রাইভারকে

ডাকলো। বেসমেণ্ট থেকে গাড়িটা উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো। জাপানি টয়োটা ২000-এয়ার কণ্ডিশানড্ গাড়ি। ড্রাইভার ধোপদুরস্থ সাদা প্যাণ্ট, সাদা সার্ট পরা। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললো, আমিই আপনার ড্রাইভার 'সাকন্'। ল্বওয়ান্নিথনোপ্।

কাছেই অফিস। হোটেল থেকে বেরিয়ে সিলম রোড দিয়ে একটু গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরলেই পরে কনভেণ্ট রোড। এ রাস্তার উপর একটা কনভেণ্ট স্কুল আছে। চিনা থাই ছেলেমেয়েদের ভিড়। এই রাস্তা দিয়ে একটু গেলেই শিবাডাঙ্গ বিল্ডিং, তারই পাঁচতলায় কাইজার কম্পানির অফিস।

এ অফিসটা অত ছিমছাম নয়। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। দেশের অফিসের মত হট্টগোল নেই, গল্প গুজোব চলছে না। আমি জেসমিনের সঙ্গে ঢুকতেই সবাই কৌতূহল দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে।

মিলারের সেক্রেটারি বললো, আপনি তো মিঃ রায়? আমি মিঃ মিলারের সেক্রেটারি তাথঙ্গ। আসুন, মিঃ মিলার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘরের একদিকে বড় টেবিলের পেছনে এক্সিকিউটিভ চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে মিঃ মিলার বের হয়ে এসে আমার হাত ঝাকুনি দিয়ে বললো, ওয়েলকাম মিঃ রায়! আপমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

গোল কফি টেবিলের চারদিকে চারটে সবুজ লেদার কভার ঢাকা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান চেয়ার। তাতে দুজনে বসলাম। তাথঙ্গ দু'কাপ কফি দিয়ে গেল। তাথঙ্গ বেশ লম্বা, চিনাদের মত চেহারা, মধ্যবয়সি। পরে এসেছে হাল্কা হলুদ ফ্রক। মিলারের পরনে হাল্কা রং-এর পাতলা বুস সার্ট। ভদ্রলোক আমেরিকান।

—কী শুনতে চান বলুন?

—আপনাদের কম্পানির সম্বন্ধে একটু জানতে চাই।

—আমাদের নয় আপনাদের বলুন, হেসে বললেন।

মনে মনে ভাবলাম—এখনও তো রেজিস্ট্রেশান হয়নি। মুখে বললাম,

—আপনারা লাভ করতে পারলেন না কেন, জানতে পারলে আমার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা করতে সুবিধা হবে।

মিলার একটা সিগার ধরিয়েছেন। ধোঁয়ার মধ্যে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তার কারণ হলো আমারা জাপানি ইম্পোর্টের সাথে কম্পিট্ করতে পারছি না। ওদের কোয়ালিটি অনেক ভাল। দাম প্রায় একই। এ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মার খাচ্ছি।

—আপনাদের কোয়ালিটি কেন ভাল করতে পারেন না? দাম তো আপনাদের কম হওয়া উচিত। ওদের মালের ওপর তো আমদানি শুল্ক আছে।

—আমাদের মেশিন পত্র সবই জোড়াতালি দিয়ে তৈরি, দেখলেই বুঝতে পারবেন! ওদের তো সব অত্যাধুনিক। তাছাড়া জাপানিদের সঙ্গে কোয়ালিটিতে সবাই মার

খাচ্ছে। আমাদের দেশের গাড়ি তৈরির কারখানাগুলোর হাল তো জানেন। প্রতি বছরই লোক ছাটাই হচ্ছে।

—এখানকার কর্মীরা বুঝি কোয়ালিটি সম্বন্ধে সজাগ নয়?

—অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। মেশিনগুলোর জন্যেই আরও ঝামেলা।

—তা হলে কি আমাদের লোকসান দিতে হবে?

—আপনাদের হয়ে তো এবার থাই টোবেকো কম্পানিতে টেন্ডার দিয়েছিলাম সিগারেট ফয়েলের। সে অর্ডারটা পাওয়া যায়নি। ওরা আরও সস্তায় পেয়েছে মালয়েশিয়া থেকে।

(এই ফয়েল খুব পাতলা এ্যালুমিনিয়ামের চাদর ০০০৭ মিঃ মিঃ মোটা আর পেছনে লাগানো থাকে আঠা দিয়ে পাতলা কাগজ।)

—আমদানি শুল্ক দিয়েও মালয়েশিয়ার মাল কি করে সস্তায় দিচ্ছে?

—এদের সঙ্গে আমাদের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। আমাদের এজেন্টই দামটা ঠিক করে দিত কম্পানির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে। এবার একজন নতুন চেয়ারম্যান এসেছে। তার সঙ্গে ঠিক বন্দোবস্ত করা যায়নি। আপনাদের লাভ করতে হলে আরও বিনিয়োগ করে যন্ত্রপাতির উন্নতি করতে হবে। উৎপাদন বাড়িয়ে খরচ কমাতে হবে। বাজার বাড়াতে হবে। জোড়াতালি দিয়ে কারখানা দাঁড় করাতেই আমার সময় চলে গেছে। কর্মীদেরও শেখাতে হয়েছে।

—আর সিগারেট তৈরির প্রতিষ্ঠান নেই এখানে?

—না, আর নেই। সিগারেট তৈরি অর্থাৎ টোবাকো কম্পানি সরকারের এক-চেটিয়া ব্যবসা।

আমি হতাশ হয়ে বললাম তা হলে আমরা আর ফয়েল বিক্রি করবো কোথায়?

—সেটাই হবে আপনাদের প্রধান সমস্যা।

আমি নিরুৎসাহ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আজ তা হলে উঠি। সামনের সপ্তাহে আপনার সঙ্গে কারখানায় যাবো। সেদিন সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আশা করি তার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনও হয়ে যাবে।

—দুপুরে খাবেন কোথায়? চলুন আমার সঙ্গে খাবেন।

আমরা হেঁটেই বের হলাম। তখন কনভেন্ট স্কুলের ছুটি হয়েছে সকালের সিফটের। ছেলে মেয়েরা রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুলের বড় ছেলেরা ট্রাফিক পুলিশের কাজ করছে। সিলোম রোড পার হয়ে একটা কানা গলিতে ঢুকলাম। সে গলিতে নানান রকম জিনিস বিক্রি হচ্ছে. মেয়েদের ও ছেলেদের জামা কাপড়, ভ্যানিটি ব্যাগ, নানান রকম খাবার। রাস্তা দখল করে ওরা দাঁড়ালেও জিনিসগুলো সুন্দরভাবে সাজানো—জামা কাপড়ের নমুনা সব স্ট্যান্ড থেকে হ্যাঙ্গারে ঝুলছে, বাকিগুলো ভাঁজ করে রাখা আছে একটা টেবিলে। খাবারের মধ্যে আছে কলা ভাজা, আর নানান রকম ফল। এক ভারতায় বিক্রি করছে ছোলা আর বাদাম

ভাজা। দুদিকে অনেকগুলো রেস্তোঁরা।

আমরা যে রেস্তোঁরায় ঢুকলাম সেটা বৃটিশ স্টাইলে সাজানো। ওয়েটার ওয়েট্রেসরাও সেই স্টাইলেই সেজেছে। সাদা ফ্রক, সামনে কালো ফ্রিল দেওয়া এপ্রন্। খাওয়া দাওয়া ইংলিস। ফিস্ ফ্রাই ও চিপ সঙ্গে সেদ্ধ করা শব্জি সবশেষে পুডিং। জীন টনিকে গলা ভেজাচ্ছিলাম।

লোকসান করা কম্পানি কি করে লাভ করবে সে কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলাম হোটেলে।

॥ ৬ ॥

জেসমিনের সঙ্গে বাড়ি দেখতে বেরিয়েছিলাম, সঙ্গে ছিল একজন ব্রোকার। সকুমভিতে দুটো বাড়ি দেখলাম। একটা বাড়ি এক ইণ্ডিয়ান সর্দারজির।

জেসমিন বললো. এখানে বাড়ি নিলে আপনার সুবিধা হবে এখানে অনেক ইণ্ডিয়ান থাকে। এখানে যত বাড়ি দেখছেন তার শতকরা তিরিশ ভাগের মালিক হল ইণ্ডিয়ান।

সাত থেকে দশতলা সব বাড়ি। চারিদিকে বেশ কিছুটা করে খালি জায়গা। সব বাড়িতেই একটা করে ছোট সুইমিং পুল। নীচে গাড়ি রাখার জায়গা। দেশওয়ালি দ্বারোয়ান। দুটো বা তিনটে বেডরুমওয়ালা ফ্ল্যাট। আমার কেন যেন পছন্দ হলো না।

এরপর ব্রোকার নিয়ে গেল লুম্পিনী পার্কের কাছে সয়টন্সন্ রোডের ওপর একটা নতুন দশতলা বাড়িতে। দুটো ফ্ল্যাট খালি আছে। একটা দুই বেড রুমের আর একটা তিন বেডরুমের। দুই বেডরুমওয়ালা ফ্ল্যাটটাই পছন্দ করলাম। সামনের বড় ঘরটা এল সেপের। বসবার, খাবার আর রান্নার জায়গা ঐ একই ঘরে। রান্নার জায়গায় একটা উচু কাবার্ড দিয়ে আলাদা করা। ফ্রীজ, গ্যাস ওভেন রয়েছে। শোবার ঘরদুটোর মেঝে বার্ণিশ করা কাঠের টালি দিয়ে ঢাকা। শোয়ার ঘরে আছে একটা আলমারি. চেস্ট-অব-ড্রয়ার, গদিশুদ্ধ খাট. একটা সাইড টেবিল। বেডরুম দুটো এয়ার কণ্ডিশান্ড, ঘরের বাইরে রয়েছে মেশিন আর ঘরের মধ্যে আছে শুধু এয়ার ডিস্ট্রিবিউসানের গ্রীল।

বাথরুমে বাথ্টাব আছে। গরম জলের জন্য গ্যাসের গীজার মাস্টার বেডরুমের লাগোয়া চানের ঘরের সঙ্গে আছে ড্রেসিংরুম।

আমার পছন্দ হয়ে গেল। ভাড়া ষোলহাজার বাট। (প্রায় আট হাজার টাকা)

জেসমিনকে বললাম, বাড়িতো ঠিক করে দিলে. এবার যে একজন মেইড চাই, যে একটু ইংরেজি জানে।

—চলুন নীচে। দেখি অন্য মেইডদের সঙ্গে কথা বলে।

পেছন দিকে আলাদা একতলা ঘর রয়েছে, প্রতি ফ্ল্যাটের মেইডদের জন্যে একটা করে ঘর।

আমরা মেইডদের ঘরের কাছে গেলাম। পরিপাটি করে সব ঘরগুলো সাজানো। বিছানা পরিষ্কার বেডকভার দিয়ে ঢাকা। একদিকে রান্নার বন্দোবস্ত। কারো কারো ঘরে টিভি পর্যন্ত আছে। ছোট্ট টেবিল ফ্যান স্টুলের ওপর রাখা।

জেসমিনকে দেখে দুতিনজন মেইড বেরিয়ে এল। ওর কথা শুনে একজন অল্প-বয়সি মেয়ে দৌড়ে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এল এক মাঝবয়সি মহিলাকে নিয়ে। মহিলা কালো লুঙ্গি পরা, গায়ে চিকনের সাদা ব্লাউজ। ঘাড় অবধি ছোট করে চুল ছাটা, বাঁ হাতে সোনালী ঘড়ি, গলায় সরু একটা সোনার হার, কানে ছোট্ট দুল, বেটে, রং ফরসা।

জেসমিন ওর সঙ্গে কথা বলে বললো, ও রাজি আছে আপনার কাজ করতে। অল্প স্বল্প ইংরেজি জানে। আগে এক মুসলমানের বাড়ি কাজ করতো। ভাত, ডাল, মাংস, রুটি বানাতে জানে। এক জার্মানের বাড়িও কাজ করেছে।

আমি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

হাত জোড় করে নমস্কার করে বললো, আলি। সবাইকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, দে কল্ পিয়ালী।

জেসমিন বললো, পি মানে বড়।

আমি বললাম, আমি তোমায় পিয়ালীই ডাকবো;

ও খুব খুশি হয়ে হেসে বললো, খাপ্ খুন্ খ্রাপ।

মাস্টার কাম হোয়েন?

—সাতদিন পর। আমার তো সংসার করবার মত কিছুই নেই। এই সাতদিনে সব জিনিস কিনে আনবো। তুমি লিখতে পারো?

—ভাষা থাই লিখতে পারি।

বললাম, তুমি তা হলে একটা লিস্ট করে জেসমিনকে দাও। ও আমাকে সেটা ইংরেজিতে লিখে দেবে।

ব্রোকার বললো, তা হলে চলুন বাড়িওয়ালার সঙ্গে এগ্রিমেন্টটা সই করে ফেলা যাক।

একদম ওপরের তলায় বাড়িওয়ালা থাকে। নাম অনন্ত্। উনি আমার পরিচয় পেয়ে খুশি হয়ে হ্যান্ড সেক্ করে বসতে বললেন। চা খাওয়ালেন। এগ্রিমেন্ট সই হয়ে গেল। দুমাসের ভাড়া আগাম দিলাম।

কয়েকদিন পর হোটেল ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে চলে এলাম।

পিয়ালী দারুণ কাজের। ওকে কাজের কথা কিছুই বলতে হয় না। নোংরা কাপড় জামা নিজেই বের করে পরিষ্কার করে কাচে তারপর ইস্ত্রি করে দুপুরে। গেঞ্জি আন্ডারওয়্যারও ইস্ত্রি করে গুছিয়ে রাখে চেস্ট অব ড্রয়ারে। জামা, প্যান্ট হ্যাঙ্গারে

ঝুলিয়ে রাখে ড্রেসিংরুমে। বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় বদলে দেয় নিয়ম করে সপ্তাহে দুদিন। সকালবেলা ওর মিষ্টি গলার মাস্টার ডাকে ঘুম ভাঙে। তখন ওর হাতে থাকে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট। বেড্‌টি হাতে ধরিয়ে ও হাঁটু ভাজ করে বসে মেজেতে। জিজ্ঞেস করে. সেদিনকার রান্না হবে কি? সেই সময় ওর থেকে আমি কিছু থাই শব্দ শিখি আর ওরও শেখা হয় কিছু ইংরেজি শব্দ।

তারপর আমার জামা কাপড় বেছে দেয়—স্যুটের সঙ্গে সার্ট আর টাই মিলিয়ে। আমার পছন্দমত ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে যায় স্নান সারতে সারতে। ব্রেকফাস্ট আমার মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড—তাজা কমলার রস এক গ্লাস, সেদ্ধ করা ভুট্টা, কড়াইশুটি আর গাজর, দুটো টোস্ট, কফি, সপ্তাহে তিনদিন ডিম। এখানে কমলা আর প্যাকেটে আধাসেদ্ধ ঐ সব্জি সারা বছরই পাওয়া যায়। স্যুটের রং-এর সাথে মিলিয়ে ও জুতো মোজা বেছে পায়ের কাছে রেখে দেয়। তার পাশে সু হর্ণটাও রাখতে ভোলে না।

বেড টি খাওয়ার সময় ওর পারিবারিক খবরও নেই।

সাদা প্যাণ্ট সার্ট পরা লম্বা মত যে লোকটা ওর কাছে প্রায়ই আসে সে হলো ওর স্বামী। (স্বামী শব্দটা ঐ একই অর্থে থাই ভাষায় প্রচলিত।) এটি ওর দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষ ওকে ছেড়ে চলে গেছে অল্প বয়সি একটি মেয়ের সঙ্গে। আগের পক্ষের একটি ছেলে আছে, থাকে পিয়ালীর মার কাছে। স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। পড়ার খরচ পিয়ালীই দেয়। ওর এ পক্ষের একটি মেয়ে আছে সে ওর শাশুড়ির কাছে থাকে।

স্বামী কি করে জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, স্বামী 'ক্যাচ্‌ম্যান'।

ক্যাচ্‌ম্যান্ আবার কি কাজ জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, নাইট্ ব্যাড ম্যান কাম্ টেক্ থিঙ্গ। হি ক্যাচ।

আমি হেসে বললাম, বুঝেছি, ওয়াচম্যান্।

ও লজ্জা পেয়ে বললো, সরি, নো ইংলিস. লিটল।

মার দেওয়া আনন্দময়ী মার ছবিটা চেস্ট অব ড্রয়ারের ওপর দাঁড় করানো ছিল। একদিন অফিস থেকে এসে দেখলাম একটা সুন্দর সোনালী রঙের কারুকার্য করা ছোট্ট সেল্ফ দেওয়ালে লাগানো হয়েছে। মায়ের ছবিটা সেই সেল্ফের উপর সযত্নে টাঙ্গানো। সেল্ফের ওপর ধূপ কাঠি জ্বলছে আর ছোট্ট একটা ফুলদানিতে দুটো অর্কিড্ ফুল, ছোট্ট থালায় দু টুকরো ফল আর ছোট্ট গ্লাসে জল।

সেদিন দৌড়ে এসে পিয়ালী মায়ের ফটোর সামনে নমস্কার করে বললো মাস্টার ভালো হয়েছে না?

—খুব সুন্দর।

—এটা কার ছবি মাস্টার? তোমার মায়ের? খুব সুন্দর দেখতে তোমার মা।

—উনি সবার মা। সন্ন্যাসিনী।

শুনে, আর একবার নমস্কার করলো।

ও রান্নাও শিখে গেছে সব রকম। কোনই অসুবিধা নেই। আমাকে সংসারের কিছুই করতে হয় না, শুধু সপ্তাহে দুদিন বাজার। ও থাই ভাষায় লিখে রাখে কি কি ফুরিয়ে গেছে। সে অনুসারে আমি লিখেনি। শব্জি, ফল, মাছ কিনি আমি কারখানা থেকে ফেরবার পথে একটা ছোট্ট শহরের বাজার থেকে। ওখানে কুমড়োর ডগা, কলমিশাক, পান পাতা, এমনকি ঢেঁকি শাকও পাওয়া যায়। মাছ পাওয়া যায় সবরকম—রুই, কাতলা, মৃগেল, মাগুর, কই, পাবদা, খুব তেলওয়ালা এক রকম মাছ অনেকটা শিলং মাছের মত।

অফিস থেকে এসে কাপড় জামা ছেড়ে ব্যাংকক পোস্ট কাগজটা একটু পড়ছিলাম। আজ সকালে পড়া হয়নি।

পিয়ালী জলখাবার দিয়ে গেল। পরোটা আর বেগুন ভাজা, সঙ্গে চা।

কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হেডলাইন—ম্যানিলায় প্লেন থেকে নামার সময় একুইনোকে গুলি করে মেরেছে এক অজ্ঞাত আততায়ী।

মারকোস তখন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট। একুইনো ছিল তার বিরোধী জনপ্রিয় নেতা। মার্কোসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়। মারকোস ওকে দেশে ফেরবার অনুমতি দিয়েছিল। তারপর এভাবে সবার সামনে তাকে হত্যা করা হল। তার কিছুদিন পরই একুইনোর স্ত্রী প্রেসিডেন্ট হোলো আর মারকোস, যে কুড়ি বছর ধরে ডিকেটটরসিপ চালিয়েছে, তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো তার স্ত্রী ইমেলডাকে নিয়ে। কাগজটা বন্ধ করে ভাবছিলাম এ রকম ভাগ্যের পরিহাসের কথা। তখনই পিয়ালী এসে বললো, মাস্টার, যমু ভাষা যাই ব্রু-মা। (মাস্টার, তোমার থাই ভাষার টিচার এসেছে।)

তাড়াতাড়ি উঠে বই খাতা নিয়ে সামনের ঘরে গেলাম। স্ট্রাইফ দেওয়া সিল্কের ফ্রক পরা অল্প বয়সি সুন্দরী টিচার তখন কালো হিল তোলা জুতোটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খুলছিল।

আমি নমস্কার জানিয়ে বললাম, এসো।

বসেই খুব গম্ভীর গলায় বললো, আগের পড়াটা বের করুন। পড়া মুখস্থ হয়েছে তো?

মিষ্টি গলায় ভুল উচ্চারণে মহিলা ইংরেজি অনুবাদ করে। ওদের লিখিত পাঠ্যপুস্তক আছে তাই বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। না হলে মুশকিল হতো ওর ইংরেজি বাচনে। এক ঘণ্টা গড়িয়ে চলে গেল।

মহিলা সুন্দরী অল্পবয়সী হলেও কোনও রকম ইঙ্গিতেই সাড়া দেয় না। একবার বলেছিলাম, চল না, কোথাও বাইরে এক সঙ্গে ডিনার করা যাক।

—ধন্যবাদ, আমার সময় হবে না। আমাকে এরপর এক আমেরিকানকে পড়াতে যেতে হবে।

—তা হলে একদিন রোববার চল লাঞ্চ খেতে।

—আমার অন্য কাজ থাকে সেদিন।

মহিলা সপ্তাহে দুদিন আসে, তেরোশো বাট নেয়।

॥ ৭ ॥

হাত বদলের আগে কয়েকদিন কাজের ফাঁক ছিল। ভাবলাম ট্যুরিস্ট হয়ে কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে ফেললে কেমন হয়? তাই একদিন সারথি সাকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দেওয়াল ঘেরা একটা চত্বরের মধ্যে গাড়ি রেখে বললো, মাস্টার এটা হলো চক্রি-রাজপ্রাসাদ।

ইঁটে গাঁথা প্রাচীর, খুব একটা উঁচু নয়। পাহারা দেবার জন্য ওয়াচ টাওয়ারও নেই। কামান দাগার জন্যে নেই কোনও গুপ্তকক্ষ। দেওয়ালের বাইরে খাল নেই কোনও। হয়তো ছিল যখন ব্যাংককে রাস্তার বদলে চারিদিকে ছিল খাল। এখানে বর্মিদের আক্রমণের ভয় ছিল না নিশ্চয়। কারণ বর্মা মুলুক থেকে অনেকটা দূরে ব্যাংকক।

অনেক ট্যুরিস্ট, বেশীর ভাগই আমেরিকান। জাপানিও আছে অনেক। জাপানিদের সব গ্রুপ ট্যুয়ার। ওদের সঙ্গে আছে ওদের দেশের গাইড। সে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে একটা সূর্যমার্কা ছোট ফ্ল্যাগ দেখিয়ে। পেছনে ওরা চলেছে ভেড়ার পালের মত।

সুযোগ বুঝে আমি এক আমেরিকানদের দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়লাম। ওদের গাইড থাই। বিবরণ দিতে গিয়ে ইংরেজিতে গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে। সে উচ্চারণে আমেরিকানরা সামান্যই হয়তো বুঝতে পারছে।

—আমাদের দেশের আগে নাম ছিল শ্যামদেশ। রাজধানী ছিল প্রথমে সুখথাই, অনেক উত্তরে বর্মা মুলুকের কাছে।

কম্বোজের হিন্দুরাজারা সুখথাই দখল করে নিল। তারপর হলো রাজধানী আয়োথিয়ার (অযোধ্যা) আরও দক্ষিণে, এই চাউ পিয়াও নদীরই পাড়ে। বর্মিদের আক্রমণে আয়োথিয়া জ্বলে ছাই হয়ে যায়। সেই সময় সম্রাট পালিয়ে আসেন ব্যাংককের ওপারে থনবুড়িতে। সে রাজার নাম ছিল টাকশীল।

টাকশীল দুর্বল। সকলে মিলে প্রধান সেনাপতি চাওপ্রিয়াও চক্রিকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। চক্রিরাজা প্রথমে রাম নামে সম্রাট হলেন। এখনকার সম্রাট হলেন রাম দি নাইনথ।

সেই রাম দি ওয়ান ব্যাংকক নগর তৈরী করে এখানে রাজধানী করলেন। ব্যাংকক ছিল একটা জলা জায়গা। তাই খাল কাটা হলো অনেক। সেই মাটি দিয়ে ভরাট করে তৈরি করা হলো বাড়ি ঘর।

সেই খালের জলে যাতায়াতের পথ হলো সুগম, জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত, প্রতিরক্ষার সুবিধা। এইভাবেই তৈরী হয়েছিল এশিয়ার ভেনিস। সেই চক্রিবংশের রাজাদের আবাস হলো এই ডুসিথ মহাপ্রাসাদ! এই প্রাসাদের বয়স দুশো বছর। বর্ত্তমান সম্রাট অবশ্য এখানে থাকেন না! উনি অন্যত্র আধুনিক চিত্রলাদা প্রাসাদে থাকেন।

ইতিমধ্যে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছি। ফ্লোরিডার বাসিন্দা। ঘোরাই তার নেশা। পেশা জানা নেই। নাম কোরিনা, বয়স? ছিঃ মেয়েদের কি বয়স জিজ্ঞেস করতে আছে? মনটা এখনও সবুজ। কথা বলতে ভালবাসে।

মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধীরে বললেন, অতীশ, তোমাকে পেয়ে বাঁচলাম। বুড়ো বুড়িদের সঙ্গে থেকে নিজেই বুড়িয়ে যাচ্ছিলাম।

আমরা এবার অফিস প্রাঙ্গন থেকে রাজপ্রাসাদের চত্বরে ঢুকছি। দুজন দ্বাররক্ষী স্টেনগান নিয়ে পাহারা দিচ্ছে আর চারজন সঙ্গী গাছের ছায়ায় মাথার কাছে স্টেনগান নিয়ে শুয়ে আছে।

কোরিনা মুখভঙ্গী করে বললেন, দেখেছো এদের পাহারা দেবার ঢং? আমি অনেক রাজপ্রাসাদ দেখেছি এরকমটা দেখিনি কোথাও। সব জায়গাতেই দ্বাররক্ষীরাও একটা দ্রষ্টব্য। তোমাদের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের প্রহরীরা কি সুন্দর পোশাক পরে ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে থাকে। তুমি লণ্ডন গেছ?

—হ্যাঁ গেছি। কোরিনার তুলনামূলক রক্ষী আলোচনা শুনে মনে মনে হাসছি।

—তা হলে বাকিংহাম প্যালেসের চেঞ্জ অব গার্ড নিশ্চয় দেখেছ?

—দেখেছি বইকি। দেখলে মনে হয় আমরা কয়েক শো বছর পিছিয়ে গেছি। সেই সময়কার পোশাক, সেই সময়কার অস্ত্র নিয়ে যেন কয়েকটা চাবি দেওয়া পুতুল পা গুনে গুনে হাটছে।

—কোপেনহাগেনে গেছ?

কোরিনা এবার ইয়ুরোপ পাড়ী দিয়েছে। মাথা নাড়লাম, না, সেখানে যাবার সুযোগ হয়নি।

কোরিনা এবার খুব উৎসাহিত—যাইনি শুনে। ওখানকার প্রাসাদের প্রহরীর কালো পোশাক আর কালো ভালুকের টুপি, দাঁড়িয়ে থাকে যেন পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি।

আমরা প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে এসে দাঁড়িয়েছি। বাগান বলতে সুন্দর করে ছাঁটা ছোট ছোট কয়েকটা গাছ।

গাইড বললো, এগুলো হলো 'টাকো উড্'। নানান দেশ থেকে সংগ্রহ করা এ গাছগুলোর বয়স একশো বছরের উপর, অথচ দেখুন কত ছোট্টটি আছে।

কোরিনা বললো, আরে ছোঃ জাপানে কিয়োটোর এক মন্দিরে যে বনসাই আছে তার কাছে এগুলো শিশু। ওখানে একই গাছ কত রকম ঢং-এ দাঁড়িয়ে আছে, যেন

শিল্পির তুলিতে আঁকা ছবি।

সামনের বাড়িটা সিংহ দরবার। একতলাটা গ্রীকো-রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন থাকলেও ওপরটা থাই ঢং-এ চার চালা রঙ্গীন চিনামাটির টালিতে ছাওয়া। দুটো চুড়ো উঠে গেছে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের মত। নানান স্থাপত্যের মিলনে তৈরি হলেও খুব একটা খাপছাড়া লাগছে না, যেমন লাগে আকবরের সমাধি শায়েন্দ্রা।

ভেতরের হলটায় ঢুকে গাইড বললো, এখানে রাজকীয় উৎসব হয়। সম্রাট এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দর্শন দেন। এটার নাম অমরেন্দ্র গৃহ। (অমর + ইন্দ্রের + গৃহ)। ওপরে দেখুন ইন্দ্রের মূর্তি। সামনে দেখতে পাচ্ছেন সম্রাটের সিংহাসন।

সোনার সিংহের ওপর পাতা আসন। ওপরের চন্দ্রাতপ নটা থাকে বড় থেকে ছোট হয়ে উঠে গেছে। মোক্ষ লাভ করতে হলে মানুষকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তাই বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন চন্দ্রাতপের গঠনপ্রণালীতে।

কাছে গিয়ে দেখলাম, সিংহাসনে আছে মুক্তা, রুবি আর এমারেন্ড দিয়ে লতাপাতা করা। ওপরে রয়েছে এক সারি গড়ুর পাখি যারা সম্রাটকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আরও ওপরে আছে এক সারি পরীর দল, যারা বয়ে আনবে ভগবানের আশীর্বাদ।

সিংহাসনটা নাকি সুমেরু পর্ব্বতের প্রতীক। সুমেরু পর্ব্বত কোথায় আর তার প্রতীক কি করে হলো এই সিংহাসন তা বুঝতে পারলাম না।

—অতীশ তোমাদের মহিশুর আর জয়পুরের রাজদরবারও এর চাইতে সুন্দর।

আমরা সিংহদরবার দেখে বেরিয়ে এলাম। এখানে রয়েছে অনেক সিংহের মূর্তি হাঁ করা মুখে একটা বল। পাথরের তৈরি।

কেরিনা বললো, এই প্রথম পাথর দেখলাম। তাও আবার স্যান্ডস্টোন। কাছে গিয়ে পাথরের বলটায় হাত দিতে ঘুরে গেল। কিন্তু বের করা গেল না, সিংহের দাঁতে আটকে রইল।

—কেরিনা, এটা কিন্তু বেশ মজার ব্যাপার। বানালো কী করে?

গাইড আমাদের কৌতূহল দেখে বললো, এগুলো এনেছিল চিনা সওদাগরেরা আসবার সময় খালি জাঙ্কগুলোর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে। মাল বোঝাই করে ফেরার সময় এইগুলো ফেলে রেখে যেতো এখানে।

চলুন, এবার দেখবেন রাজকরণ সভা।

যা বুঝলাম তা হলো রাজার করণীয় সভাগৃহ অর্থাৎ 'কাউন্সিল অফ কিংস এফেয়ার্স'। এখন এখানে প্রিভি কাউন্সিলের সভা হয়। এর পেছনেই রানী মহল। যেখানে পরপুরুষের প্রবেশ নিষেধ।

গাইড এবার পেছনের বাগানে নিয়ে গেল, যেখানে বানানো আছে একটা ছোট্ট পাহাড়, যার গুহামুখ থেকে জল বেরিয়ে আসছে। গাইড বললো, এটা হল গঙ্গোত্রীর প্রতীক। সেই জল এসে নীচে জমা হচ্ছে, সেটা সাগরের প্রতীক। পাহাড়

থাকলেই জঙ্গল, আর জঙ্গল থাকলেই নানান পশু পাখি। তাই এই পাহাড়ের গায়ে আছে পুতুলের নানান জীবজন্তু। এই পাহাড়ের ওপরটাকে বলে শিবালয়। রাজার ছেলেমেয়েদের এগারো বছর পূর্ণ হলে তাদের মস্তক মুণ্ডন হতো এই পবিত্র গঙ্গাতীরে। ছোট্ট একটা টিকিও রাখা হতো। বামুন ঠাকুর মন্ত্র পড়তেন।

এর পাশেই রয়েছে বড় মহাবিমান অর্থাৎ সম্রাটের আবাস। এই হলের সিলিং-এ আছে একটা বিরাট পদ্মফুল আর আছে হিন্দু দেবদেবীর ফ্রেসকো। পুবদিকে রয়েছে ইন্দ্র, দক্ষিণে যম, পশ্চিমে বরুন আর উত্তরে অগ্নি। নীচে লেখা আছে থাই অক্ষরে সংস্কৃত শব্দ। রাজার পালনীয় দশটি গুণাবলি—দানম্, শীলম্, পরীক্ষগম্, অর্জ্যভম্, মাধবম্, তপম্, অক্রোধম্, অহিংসম্, কান্তিম্। সম্রাট হবেন দাতা, চরিত্রবান, ত্যাগী, সৎ, বিনয়ী, নম্র, মননশীল, ক্রোধহীন, অহিংস, ধৈর্যশীল ও ন্যায়বান।

কেরিনাকে বললাম, কি রকম দেখলেন?

—আহামরি কিছু নয়। তাছাড়া এর বয়েসই বা কত? মোটে দুশো বছর। গ্রীসের প্যান্থিয়ান, ইজিপ্টের মন্দির, রোমের কোলোসিয়াম, তোমাদের কৈলাস মন্দির, অজন্তা ইলোরার গুহা দশ পনেরা গুণ বৃদ্ধ, আর কত সুন্দর।

কেরিনা ব্যাগ থেকে একটা চকোলেট বের করে আমায় অর্ধেক দিয়ে নিজে মুখে পুরে দিল।

আমি সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, চলবে?

একটা সিগারেট তুলে নিলে, আমি লাইটারের আগুনটা এগিয়ে দিলাম।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

—আপনি কি একাই ঘোরেন?

কেরিনা ধোঁয়ার রিং ছাড়লেন—একা কেন হবে। দলে এত লোক থাকতে একা কেন হবো।

—না, মানে আপনার নিজের কেউ······

একটু অন্যমনস্ক হয়ে ববলেন, দুবার চেষ্টা করেছি ঘর বাঁধতে, ভেঙ্গে গেল। একটি ছেলে আছে থাকে ক্যানাডায়। মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়। দেখা হয় কয়েক বছর পর কয়েকদিনের জন্যে।

—আপনি কোথাও কাজ করেন?

—কাজ না করলে খাবো কী?

—কোথায় কাজ করেন?

—একটা স্কুলে।

—সুযোগ পেলেই বুঝি বেরিয়ে পড়েন?

—হ্যাঁ। বছরে একবার তো বটেই, কখনও দুবার।

—আমাদের দেশে কি একবারই গেছেন?

—হেসে বললেন, একবারে কি তোমাদের দেশ দেখা যায়? চারবার গেছি। এক

একবার এক অংশ ঘুরেছি।

—সবচাইতে ভালো লেগেছে কোথায় ?

—সে বলা মুশকিল। এক একটা এক এক রকম। খাজুরাহর সঙ্গে মাদুরার না কোনার্কের সঙ্গে কী কৈলাস মন্দিরের কোনও তুলনা হয়। তাজমহলের সঙ্গে কার তুলনা করবো ? পালিস করা লাল পাথরের লাল কেল্লা আর কোথাও দেখিনি।

কথা বলতে বলতে আমাদের গতি মন্থর হয়ে গেছিল। হঠাৎ মনে হলো, আশপাশের পরিচিত গলার সোরগোল শোনা যাচ্ছে না।

কেরিনা আমার সার্টের স্লিভস্ ধরে তাড়া লাগালো। কুইক মার্চ ইয়াং ম্যান, দল অনেক এগিয়ে গেছে।

কেরিনার হাত ধরে প্রায় ছুটে এগিয়ে দলের সঙ্গে আবার ভিড়ে গেলাম।

এমারেল্ড মন্দিরের চত্বরে গাইডকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়েছিল।

গাইড বলছে এটা চক্রি রাজারা তৈরি করেছিল প্রায় দুশো বছর আগে। এটাই এখানকার সবচাইতে বড় মন্দির। এখানে আছে এমারেল্ডের তৈরী বুদ্ধদেবের বরাভয় মূর্তি। এতবড় এমারেল্ডের মূর্তি পৃথিবীর কোথাও নেই। মন্দিরের বয়স দুশো বছর হলেও, মূর্তি কিন্তু আরও পুরোনো। আয়োথিয়ায় ছিল এ মূর্তি। বার্মীরা যখন আক্রমণ করেছিল তখন প্রধান পুরোহিত এ মূর্তি প্লাস্টারে ঢেকে একটা ছোট্ট মন্দিরে লুকিয়ে রেখেছিল। চারিদিকে এই যে বারান্দা রয়েছে তার দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলো রামাকীয়েন (রামায়ণ) থেকে নেওয়া হয়েছে।

আসুন আগে ওগুলো দেখে নেওয়া যাক।

সাদা দেওয়ালে সবুজ রং দিয়ে রাজস্থানী ছবির ঢং-এ আঁকা।

গাইড ছবির বর্ণনা দিচ্ছিল—এই হচ্ছে আয়োথিয়ার যুবরাজ রামের বনবাস, তোষাকান্তের সীতাহরণ, গরুড়ের বাধাদান, বালি সুগ্রিবের লড়াই, হনুমানের অশোকবনে সীতা দর্শন, লঙ্কাদহন, সেতুবন্ধন, তোষাকান্তের (রাবনের) সাথে রামের যুদ্ধ ও সীতাউদ্ধার, রামের সিংহাসন আরোহন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

আমি গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা তো বৌদ্ধ মন্দির, বৌদ্ধ জাতকের ছবি না এঁকে এখানে রামাকীয়েনের ছবি কেন আঁকা হয়েছে ?

গাইড কিছুক্ষণ ভেবে বললো তা ঠিক জানি না, তবে আমাদের কাছে রাম আর বুদ্ধদেবের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। রামই তো বুদ্ধদেব হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। জাতকের ছবি মন্দিরের গায়ে রয়েছে।

মূল মন্দিরের অঙ্গন আর একটু উঁচুতে, ছোট্ট একটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সে মন্দিরের দ্বাররক্ষী দুজন যক্ষ, হাতে তাদের তরোয়াল। সেই দ্বাররক্ষকদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলে রয়েছে একটা স্তম্ভ আর তার নীচে একটা কালো পাথরের দুগ্ধবতী গাভি। থাইরা সবাই সেই গাভির সামনে ধূপ, দীপ (মোমবাতি) ও পুষ্পার্ঘ দিচ্ছে।

কোরিনাকে বললাম, আপনি এগিয়ে যান, আমি আসছি।

থাই দর্শনার্থিদের মত আমিও একটা দোকান থেকে ধূপকাঠি, কয়েকটা মোমবাতি আর ফুল কিনে ফিরে এসে দেখি কোরিনা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

—কি ম্যাডাম, আপনি গেলেন না ওদের সঙ্গে ?

—তোমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে, যাই কি করে ?

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, অতীশ, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমার সঙ্গে ঘুরে সময়টা বেশ ভালই কাটলো। আমার গালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললো, অল দি বেস্ট। ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, যদি কখনও স্টেটসে যাও তাহলে অবশ্যই ফ্লোরিডায় আমার ওখানে এসো। চলি, না হলে দলছুট হয়ে যাবো।

সব থাইদের মত আমিও সেই গুরুর মূর্তির সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসলাম, ধূপকাঠি আর মোমবাতি জ্বালিয়ে সামনে রেখে পায়ের কাছে ফুল দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলাম।

উঠে যখন দাঁড়ালাম, তখন পাশের অল্পবয়সী মেয়েটি একটু বিকৃত উচ্চারণে ভুল ব্যাকরণে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথা থেকে আসছেন ? আপনি কি বৌদ্ধ ? তাহলে নিশ্চয় শ্রীলঙ্কার লোক।

মাথা নাড়লাম। না, আমি ভারতীয় হিন্দু। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী ?

—আমার নাম উধমু। আপনি কি টুরিস্ট ?

—এখন আমি টুরিস্ট।

আশ্চর্য হয়ে উধমু জিজ্ঞেস করলো, এখন ট্যুরিস্ট অর্থাৎ ?

—প্রথম দেখছি এসব টুরিস্টদের মত। থাকবো এখানে কয়েক বছর। একটা কাজ নিয়ে এসেছি।

সঙ্গিনীর মুখে উৎসাহের ছাপ পড়ল, আপনার গাইড আছে ?

বললাম উহুঁ। আমি এক আমেরিকান দলের সঙ্গে ঘুরছিলাম। ওদের সঙ্গে গাইড ছিল। ওরা আগে চলে গেছে।

—আমি কিন্তু গাইড। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।

তারপর একটু থেমে বললো—কী, আপত্তি আছে ? ভয় নেই, বেশী দিতে হবে না।

বললাম আপত্তি কিসের—চল। ভালই হলো। একা একা যেমন কিছু দেখতেও ভালো লাগে না তেমনি সবটা বোঝাও যায় না।

উধমু চায়নিজদের মত দেখতে। পোশাক পরেছে মেমসাহেবদের মত। টীন এজের শেষ সীমায় বয়স।

—চলুন ভেতরে।

— দাঁড়াও, আগে বাইরেটা দেখেনি।

মন্দিরটা প্রায় তিনতলা সমান উঁচু। ছাদ দোতালা সবুজ টালিতে ছাওয়া। বাইরের সারা দেওয়ালে খোদাই করা নাগ, গড়ুর, সিংহ আর ফুলপাতা বসানো আছে লাইন করে। সেগুলো লাল ও সোনালী রঙ করা। সেই ফুলপাতার মাঝে আয়নার টুকরো বসানো। তাতে রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। সমস্ত মন্দিরটাই খুব পরিচ্ছন্ন। মূল মন্দিরের দুপাশে দুটো ছোট্ট মন্দির. একটার নাম হর প্রা খণ্ডরাজ অর্থাৎ খণ্ডরাজ হরিমন্দির। ভেতরে কিন্তু বুদ্ধের মূর্তি। এখানে ইন্দ্র, হরি, রাম, শিব, গড়ুর, নাগ, গোমাতা আর বুদ্ধদেব সবই একাকার হয়ে গেছে।

চল উধম এবার ভেতরে যাওয়া যাক।

হেসে উধম বললো, আপনার মত এরকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিন্তু টুরিস্টরা কেউ দেখে না, বিশেষ করে আমেরিকানরা। ওরা ছুটে ছুটে দেখে।

আমরা মন্দিরের ভেতর ঢুকলাম।

পুরোটাই একটা বিরাট ঘর। সামনে কাঠের উঁচু বেদীর উপর সেই এমারেল্ড বুদ্ধ। ঘরের বাকি অংশে কার্পেট পাতা। দেওয়ালে বুদ্ধজাতকের ছবি। সিদ্ধার্থের জন্মপূর্ব রাজমহিষীর স্বপ্ন, শ্বেতহস্তিবাহনে দেবশিশুর ধরায় আগমন? দর্শনার্থীর সমাগম, শিশু সিদ্ধার্থের শরাহত পাখিটিকে বাঁচিয়ে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, রুগ্ন ও জরাগ্রস্থ মানুষের দুঃখে বিষাদ ও সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্যমূর্তি দর্শনে আনন্দ, তারপর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ, কৃচ্ছসাধনা, বারাঙ্গনা সুজাতার হাতে পায়াসান্ন গ্রহণ ও বোধিত্ব প্রাপ্তি। অন্য এক দেওয়ালে আবার রামায়ণের কিছু অংশ চিত্রিত। পেছনের দেওয়ালে পৃথিবীর জন্মের পৌরানিক কাহিনী।

উধম- আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি তো কিছুই আমাকে বলতে দিচ্ছেন না। জিজ্ঞেসও করছেন না কিছুই।

একটু হাসলাম, কী জিজ্ঞেস করবো তোমায়? এ সব কাহিনী তো আমাদের দেশ থেকে এসেছে। তোমার থেকে আমারই তো জানবার কথা বেশী।

উধম্‌ চোখ বড় বড় করলো—সত্যিই আপনাদের দেশ থেকে এসেছে? তা কিন্তু আমি জানতাম না। তাহলে আমাকে দিয়ে আপনার কোনও কাজই হলো না। হেসে বললো, আপনাকে গাইড ফী দিতে হবে না। চলুন এবার তা হলে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আসি।

সবাই হাঁটু ভাজ করে চোখ বুজে ধ্যানস্থ। শান্ত পরিবেশ, চার্চের মত, তফাৎ শুধু ডেস্ক আর বেঞ্চ নেই।

সবাইকে পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম বেদীর কাছে। দুজনেই ধূপ আর দীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করলাম।

উধম্‌ অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলো, ঐ পাথরের মূর্তি কি আমার কথা শুনতে পেল?

—প্রার্থনা করে তোমার মনে যদি শান্তি আসে আর মনের জোর বাড়ে তা হলেই তো হলো।

উধম্ জিগ্যেস করলো—মন্দির দেখা তো হলো, আর কিছু দেখবেন কী?

বললাম—আজ আর নয়। খুব খিদে পেয়ে গেছে। বেলা তো অনেক হোলো। আচ্ছা, ঐ ঘন্টার মত ছোট ছোট গাড়িগুলো কিসের মন্দির? নানান রঙের চীনা মাটির টুকরো দিয়ে বেশ লতা পাতা ফুল আঁকা।

এতোক্ষণে কিছু বোঝাতে পেরে উধম খুব খুশী। ওগুলো মন্দির নয়। ওগুলো স্তূপ। মৃত সম্রাটের স্মৃতি, বেদী।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, খিদে পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। গাইডের দিকে তাকালাম, তোমারও নিশ্চয় খাওয়া হয়নি? চল, এক সঙ্গে খাওয়া যাক।

উধমের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে স্বওয়াদিখাপ্। পাই থী-নাই। পাই রঙ্গ-রাম?

—আমি কি ছাই থাই ভাষা জানি? অবশ্য টুরিস্ট গাইডে দেখেছি, 'হোটেল', থাই ভাষায় রঙ্গরাম।

বললাম—বেশ, হোটেলেই চল।

—ডুসিথ্থানি।

—সে যে মস্ত হোটেল। কখনও যাইনি। খুব মজা হবে তা হলে। ওখানে তো টুকটুক ঢুকতে দেয় না। তা হলে আপনাকে ট্যাক্সি নিতে হবে।

চলই না! যেখানে সব গাড়িগুলো দাঁড়িয়েছিল সেখানে যেতেই, সাকন্ আমাকে দেখে হাত নেড়ে গাড়িটা বের করে সামনে দাঁড় করালো।

আমি দরজা খুলে বললাম. এসো উধম্। আয়নায় দেখলাম সাকনের মুখে একটু মুচকি হাসি।

—বাঃ সুন্দর গাড়ি। এ তো এজেন্টের কাছে ভাড়া করা গাড়ি নয়?

—না, এটা আমার কম্পানির গাড়ি।

—আপনি কি সেই কম্পানির ফুঃ চাট্কান্?

—আন্দাজে মানে বুঝে বললাম—হ্যাঁ।

সাকন্ এর মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, হোয়ার মাস্টার?

বললাম, ডুসিথ্থানি।

আগের কথার খেই ধরে উধম্ বললো, আপনি যখন ফু-চাটকান্, তা হলে তো আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন।

—তোমার পড়াশোনা কতদূর?

—স্কুল পাশ করে এখন কলেজে পড়ছি।

—কলেজে পড়লে গাইডের কাজ কি করে কর?

—কাজ পেলে সেদিন আর কলেজ যাওয়া হয় না, যদি দিনে কাজ থাকে।

—গাইডের কাজ তো দিনেই হয়।

হেসে বললো, সন্ধ্যের পরও হয়। রাতেও তো অনেক দেখার আছে ব্যাংককে।

—তোমায় কাজ যোগাড় করে দেয় কে?

—এজেন্ট।

হঠাৎ মনে হলো চক্রিরাজপ্রাসাদে সার্টিফায়েড কোনও মেয়ে গাইড দেখিনি। ও তা হলে এসকর্টের কাজ করে। সে কথা আর মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। আমরা হোটেলে পেঁছে গেছি।

—কী খাবে বল? চিনা, জাপানি, ইউরোপিয়ান না থাই?

—আপনার যা ভালো লাগে তাই খাবো। থাই খাবো না। আজ যখন মুখ বদলাবার সুযোগ এসছে, তখন সে সুযোগ ছাড়বো কেন?

—তা হলে চল চাইনিজ খাওয়া যাক।

ওকে নিয়ে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম।

লাল গলাবন্ধ লম্বা জামা পরা এক চাইনিজ মহিলা দুটো চেয়ার টেনে আমাদের বসালো লাল চাদরে ঢাকা একটা গোল টেবিলের ধারে। বসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এনি ড্রিংক স্যার?

আমি একটা বিয়ার চাইলাম আর ও একটা কোক।

উধম খেতে খেতে বললো, এত ভালো রেস্তোরাঁয় আমি কখনও খাইনি।

—কেন, তুমি যাদের গাইড হও তারা তোমায় খাওয়ায় না?

—টুরিস্টরা যখন দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে তখন রাস্তার ধারের কোনও রেস্তোরাঁয় বা ফুটপাথের দোকান থেকে খেয়ে নেয়। সব দেখা হয়ে গেলে দেখে আমাকে।

—তোমার এ কাজ করতে ভালো লাগে?

—কি করবো? আমার বাবা নেই। মা আছে, ভাই, বোন ছোট। কলেজের পড়ার খরচ আছে।

—তোমার বাবা কিছুই রেখে যাননি?

—বাবার একটা দোকান ছিল। বাবা মারা যাবার পর কাকা সেই দোকানটা নিয়ে নিয়েছে। আমাদের কিছুই দেয় না। আমার মা একজন চাইনিজের বাড়ি মেইডের কাজ করে। ভাইটা কাজ করে একটা দোকানে। বোনটা বাড়ির কাজ সেরে স্কুলে পড়ে। এই তো আমার জীবন। ন্যাপকিনে চোখ মুছে বললো আপনাকে এ-সব কথা শোনানো ঠিক হয়নি। আমি কখনও কাউকে এ-সব কথা বলি না। টুরিস্টদের সঙ্গে সব সময় হেসেই কথা বলি। তাতে কিছু উপরি পাওয়া যায়। দারুন খাওয়া হোলো কিন্তু। অনেক ধন্যবাদ। এই ফোন নম্বরটা রেখে দিন। যদি কখনও দরকার হয় খবর দেবেন।

—আমি পাঁচশো বাটের একটা নোট এগিয়ে ধরলাম।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মন রাখার জন্য নোটটা নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে আবার ধন্যবাদ জানালো, আমার হাতটা ধরে। ওর নরম হাতটা, অনেকক্ষণই ধরা ছিল আমার হাতে। ওর চোখ ছিল আমার চোখে নিবদ্ধ, একটু ইসারার অপেক্ষায়। ও চলে গেল।

॥ ৮ ॥

দুপুরে দিব্যি একটা ঘুম দিয়ে উঠে কি করি, কি করি ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো, এখানে মুখাজীর্দা আছেন। ডায়রি হাতড়ে বের করলাম ওর ফোন নম্বর।

নম্বরগুলো একবার টিপতেই ওধার থেকে আওয়াজ এল, হ্যালো, মুখাজী স্পিকিং। হু এ্যাম্ আই স্পিকিং উইথ্ ?

—মুখাজীর্দা, আমি অতীশ।

খুব হকচকিয়ে বললেন, কে ? অতীশ রায় ?

—ঠিক ধরেছেন। খুব অবাক লাগছে, না ?

—কোথা থেকে বলছো ? এাঁ, ব্যাংকক ! কবে এলে ? আরে, আমায় জানাওনি কেন ? আমি থাকতে, হোটেলে কেন ? ও। কাজ নিয়ে এসেছ ? খুব ভালো। একটু ধরো। তোমার বৌদিকে জানিয়ে নি। হ্যাঁ, তোমার বৌদি চলে আসতে বলছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ভুসিথ্ থানি আবার না চেনে কে ? তুমি তৈরি হয়ে থেকো। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসছি।

অনাদি মুখাজী একটা বিদেশি কোম্পানির হোমরা চোমরা ছিলেন। রিটায়ার করার কিছুদিন আগে সেই কোম্পানিরই এখানকার প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে বেশ অনেকদিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।

রিসেপশানে নেমে দেখি, মুখাজীর্দা হাজির। বয়সের ছাপ একেবারেই পড়েনি। প্রায় ছয় ফিট লম্বা। অত্যন্ত সুপুরুষ। ব্যাকব্রাশ করা চুল, হাতে চুরুট। হৈ হৈ করে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। চলো, চলো। বাগীশাও আসতো, বাড়িতে লোকজন এসেছে বলে, পারলো না।

বিকেলের সোনালী রোদ হাইরাইজের জানলার কাঁচে ঝলসে উঠছে। একটা সাততলা বাড়ির ড্রাইভ্ ইনে গাড়ি পার্ক করে বললেন, এসে গেছি।

ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়াতেই শুনতে পেলাম, সুরেলা মিষ্টি গলার গান—

এতো স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথায় এমন…পাহাড়

আমরা এসে পড়ায় বৌদির অভ্যর্থনার হৈ চৈ-তে গান থেমে গেলো।

—এসো, এসো, তোমাকে এখানে দেখবো, ভাবতেই পারিনি। তুমিও কাজ নিয়ে এলে আর আমরাও চললাম। আগে এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

—ইনি হচ্ছেন মকবুল সাহেব, আমাদের দেশের লোক অর্থাৎ মৈমনসিংহের। অনেক দিন হলো আছেন এখানে। ট্র্যাভেল্ এজেন্সির ব্যবসা করছেন।

মকবুল সাহেব উঠে জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনেও কী আমাগো দ্যাশের না কি? বৌদি, ওনার পরিচয় তো দিলেন না?

ও, হ্যাঁ! বলে, উনি আমার পরিচয় দিলেন।

—ইনি হচ্ছেন থাবীন্ কীর্তিসুন্দর। চুয়ালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। সংস্কৃত আর পালিভাষায়ও প্রচুর জ্ঞান। আমাদের আলাপ হয়েছিল সারনাথ দেখতে গিয়ে। তখন উনি কাশীতে সংস্কৃত আর সারনাথে পালি সাহিত্য পড়ছিলেন, অক্সফোর্ডে পড়েছেন ইংরেজি।

· উনি নমস্কার করে বললেন, সুস্বাগতম্।

—ইনি হচ্ছেন, দিবাকর দেশপাণ্ডে, ভারতীয় দূতাবাসে আছেন।

গায়িকা বসেছিল এতক্ষণ ডিভানের ওপর হাঁটু ভাঁজ করে নীল স্কার্ট পরে হারমোনিয়ামের সামনে। এবার লাফিয়ে উঠে চোখের ওপর এসে পড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো ঝটকায় সরিয়ে—অতীশ কাকু, হাউ আর ইউ? একদম বলবে না,

ও বাবা! কত বড হয়ে গেছিস। সামনের বছর কলেজে যাবো, বুঝেছো?

ওর হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—খুব বুঝেছি। যাক্‌গে, বেশ তো গাইছিলি। ওটা শেষ কর।

মুন্নির গান শেষ হতেই মকবুল সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাবি, আপনার মাইয়া এত সুন্দর গায়, তা তো জানতাম না।

—আমার তো দ্যাশের কথা মনে পড়তাছিল—শরৎকালের কুয়াশা-ঢাকা সকাল, সূর্যের আলোয় মুক্তা ছড়ানো শিশির-ভেজা ঘাস আর তার মাঝে ঝরা শিউলির মিঠামিঠা গন্ধ, ডোবার জলে শালুক আর কলমিফুলের বাহার। একপায়ে দাঁড়াইয়া থাকা বকগুলি, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেতে সোনালী রং-এর আঁচড়, পিয়ার খোঁজে ডাহুক পাখির ডাক, পণ্ডিত মশাইর গীতাপাঠ আর মসজিদের আজান গান—ভাবি, কই গ্যাল সেই সোনার দিনগুলি।

তারপর খেয়াল হতেই পাশের অবাঙ্গালীদের লক্ষ্য করে ইংরেজিতে বললেন কিছু মনে করবেন না। দেশের কথা মনে পড়ে গেল, তাই নিজের ভাষায় একটু কাব্য করে নিলাম। ধাব করা ভাষায় কি মনের কথা ঠিক বলা যায়?

থাবীন্ জানালেন, তা তো ঠিকই। মজার ব্যাপার হলো, ও গানটার অনেক কথাই আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের দেশও এমনি ধন ধান্যে ভরা, ক্ষেত ভর্তি সবুজ ধান, খালে বিলে পদ্ম, শালুক আর কলমিলতার ফুল। আপনাদের যে জাতীয় সঙ্গীত, সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম, তা সহজেই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারতো।

আমি বললাম, আপনাদের দেশটা তো এখনও দেখা হয় নি, তবে যা বললেন,

তাতে তো মনে হয় আপনাদের দেশে খাওয়া পরার অভাব নেই। এ কয়েকদিন যে ঘুরেছি, কোথাও কিন্তু কাউকে ভিক্ষে করতে দেখি নি।

থাবীন্ বললেন, তা অবশ্য ঠিক। মাছ ভাতের অভাব নেই আমাদের দেশে। জঙ্গলের কাঠ কমে গেলেও, অনেক আছে। খাবারের জন্যে কেউ ভিক্ষে করে না ঠিকই, কিন্তু দেখেননি, এখনও মেয়েরা কি ভাবে শরীর বেচে পয়সা রোজগার করে ?

মনে মনে ভাবলাম, তা অবশ্য দেখবার একদিন সুযোগ হয়েছিল। প্রসঙ্গ বদলে বললাম, এ কয়দিনেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আপনারা অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, বিশেষ করে নামকরণে, যেমন—আপনার উপাধি কীর্তিসুন্দর, প্রধান মন্ত্রীর নাম প্রেম তিনসুলানন্দ, রাজার নাম ভূমিবল অতুল্যতেজ। এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার নাম উমা আর একজনের উপাধি অতিলক্ষ্মণ।

থাবীন্ খুব উৎসাহিত হলেন। ঠিকই বলেছেন। এমনি আরও শব্দ আছে যেমন, অনন্ত, আচার্য্য, মহাবিদ্যালয় (ইউনিভার্সিটি), স্ত্রী, স্বামী। অনেক শব্দ অবশ্য সাধারণের ব্যবহারে বিকৃত উচ্চারণ হয়ে গেছে। আমাদের অক্ষরও ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি।

বৌদিকে উদ্দেশ্য করে অধ্যাপক মশায় বললেন, অনেক রাত হলো, এবার উঠতে হয়। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শুভায় ভবতুঃ। আবার আলাপ করা যাবে। চলে আসবেন একদিন আমার ওখানে, বলে একটা কার্ড দিলেন।

মকবুল সাহেব আমার হাত ধরে বললেন, ভালই হইল দ্যাশের আর একজন বাড়লো। আমরা প্রায় তিরিশ ঘর বাঙ্গলাদেশী আছি এইখানে। আমরা নববর্ষ মানাই, রবীন্দ্র জন্মোৎসব করি। খবর দিমু আপনারে। একটু থিতু হইয়া বইসা লন্, তারপর লইয়া যাইমু গরিবের ডেরায়। ইনসা আল্লা। আইজ তা হইলে আসি। আদাব্ দাদা, আদাব্ বৌদি।

ওরা উঠে গেলে বৌদি মুন্নির সঙ্গে খাবার ব্যবস্থা করতে উঠে গেলেন।

মুখার্জীদাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা, আর কত বছর আছেন ?

—কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে যাবো দেশে।

—কেন ? আপনার কন্ট্রাক্ট তো এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার কথা নয়।

—তা অবশ্য হয়নি। আর এখানে কাজ করতে ভালো লাগছে না। ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সঙ্গে বনছে না। থাই ভদ্রলোকের ইচ্ছা ছিল, আমার জায়গায় একজন থাইকে বসাবার। হেড্ অফিসের ইচ্ছেয় আমি এসেছি। ভদ্রলোক আমাকে ইচ্ছেমত কাজ করতে দিচ্ছেন না। বাজার মন্দা। আমি বলছি, লোক ছাটাই করতে। খরচ কমাতে। উনি কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। আমি একটা ডাইভারসিফিকেসানের প্ল্যান দিয়েছি, সেটাও ড্রয়ারেই ফেলে রেখেছেন।

মুন্নি পর্দা সরিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো, খাবার দেওয়া হয়েছে, তোমরা এসো।

মুখার্জীদা বললেন, চল অতীশ, হুইস্কির গ্লাসটা নিয়েই চল।

মুখার্জীদা পাইরেক্সের বোলের ঢাকনা তুলে তুলে দেখছিলেন, কি কি রান্না হয়েছে। ইলিশ মাছ ভাতে করেছো ? বা, ভেরি গুড্।

বৌদি মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা বসো তো। খাবার সময়ই বুঝতে পারবে, মেনু কী ?

খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, বৌদি এখানে লাগছে কেমন ?

—সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও অভাব নেই। সুন্দর এয়ার কণ্ডিশানড্ বাড়ি। খাবার দাবার সবই পাওয়া যায়, বিশেষ করে মাছ, দামেও যেমন সস্তা, স্বাদও তেমনি ভালো, রকমারিও দেশের মত। রুই, মৃগেলগুলোকে ওরা জীবন্ত রাখে গামলাতে রানিং ওয়াটারে। পুকুর থেকে নিয়ে আসে ওয়াটার টাইট্ ভ্যানে জল ভর্তি করে। মেইডও পেয়েছি খুব ভালো। দেশে তো তোলা কাজের জন্য লোক পেতে জেরবার হতে হয়। তবুও ভালো লাগে না।

ইলিশ মাছ ভাতেটা মুখে দিয়ে বললাম, দারুণ হয়েছে। এ যে একদম পদ্মার ইলিশ, মায়ের রান্না।

বৌদি বললেন, সত্যি খাওয়া দাওয়ার দারুণ সুখ, তবুও ভালো লাগে না।

—কেন ?

—একটা লোক নেই, যার সঙ্গে গল্প করতে পারি।

—কেন ? দেখলাম যে উল্টো দিকে এক ভারতীয়ের নাম। তার পরিবার নেই ?

—পরিবার আছে, কিন্তু সে স্ত্রী নয়। ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্যে তার স্ত্রী থাকেন কলকাতায়। এখানে আছে স্পেয়ার স্টেফান, মেড্ ইন থাইল্যান্ড। তাছাড়া, তোমার দাদা যতক্ষণ না ফেরেন, ততক্ষণ দারুণ চিন্তায় থাকি।

—কেন ?

আর বলো কেন। ওনাকে রোজ পঞ্চাশ মাইল নিজে ড্রাইভ করে যেতে হয়। একবার তো গাড়িতেই ব্ল্যাক আউট হয়ে গিয়েছিলেন।

তা হলে তো বিরাট এক্সিডেন্টে পড়েছিলেন। তার কোনও চিহ্ন তো দেখছি না, মুখার্জীদার শরীরে ?

—জোর বেঁচে গিয়েছিলাম ভায়া। নেহাৎ তোমার বৌদির সিঁথির সিঁদুরের জোর। ফ্র্যাকসান্ অব এ সেকেণ্ড আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, মাথাটা ঘুরে উঠেছিল হঠাৎ। আমি গাড়িটা সাইডে দাঁড় করাবার পর, কি হয়েছিল তা জানি না। যখন জ্ঞান হলো, দেখলাম আমি বাড়িতে। আমার পাশে ডাক্তার বসে আছে, আর আছে এক অপরিচিত ভদ্রলোক, সেই হলো আমার সামারিটান্।

মুন্নি গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতে বললো, জানো কাকু, বাবা কিছুতেই কারও কথা শোনে না। কিছুতেই ড্রাইভার রাখবে না।

—কেন রাখেন না দাদা ?

—কেন রাখবো, নিজের পয়সায়। আমার সার্ভিস্ টার্মে ছিল ড্রাইভার কোম্পানির। ব্যাটা, তা কিছুতেই দিচ্ছে না।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, উদগার তুলে চেয়ারে এলিয়ে বসলাম। মাঝে মাঝে মুখ বদলানো যাবে এমনি।

বৌদি দ্রুভঙ্গী করছেন, সে গুড়ে বালি। উনি রেজিগনেসান লেটার দিয়ে দিয়েছেন। মাস দুয়েকের মধ্যেই ফিরে যাবো দেশে। অপেক্ষা করছি মুন্নির স্কুল লিভিং পরীক্ষাটার জন্যে।

মুন্নি বললো, কাকু আমি উঠছি। আমার একটা হোমওয়ার্ক বাকি আছে।

আচ্ছা দাদা আপনি তো অনেক দেশে গেছেন। কোথাও ছেলেদের উত্তেজিত করার এ রকম মনমাতানো বন্দোবস্ত দেখেছেন? এখানে মেয়েরা যেন নিজেদের বেসাতি খোলাবাজারে বিক্রি করছে। সরকার এতে বাধা দেয় না?

—না। এটাও তো টুরিস্টদের এট্রাকসান। জানো না জাপানের ট্র্যাভেল্ এজেন্টরা এ্যাডভারটাইজই করে—গ্রুপ টুর ফর গল্ফ এণ্ড সেক্স।

—তা নিয়ে কোন প্রতিবাদ হয় না?

—একবার হয়েছিল, জাপানের প্রধানমন্ত্রী যখন এসেছিলেন এখানে। তখন নারী সমিতির মেয়েরা এদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদও জানিয়েছিল।

—এদের ফিলজফি কি জানো তো? ট্যুরিস্ট পছন্দ করবে না এমন কিছু নৈব নৈব চ্। প্রধানমন্ত্রীও তাই বললেন। তবে হ্যাঁ, ব্যবস্থা আছে, মেয়েরা যাতে সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকে। আবার কি চাই?

সেদিন অনেক রাত অবধি আড্ডা মেরে, বৌদির তৈরি পানের রেশ মুখে মিলিয়ে যাবার পর হোটেলে ফিরলাম।

॥ ৯ ॥

'বাড়ির' একখানা চিঠি পেলাম।

মা লিখেছেন - তুমি সুন্দর বাড়ি পাইয়াছ, সব জিনিস কিনিয়া গুছাইয়া লইয়াছ, ভালো মেইড্ পাইয়াছ জানিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছি। ওইখানে সব রকম মাছ পাওয়া যায় জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আরও ভালো লাগিতেছে জানিয়া তোমার মেইড ইতিমধ্যেই বাঙ্গালী রান্না মোটামুটি শিখিয়া লইয়াছে।

তোমাকে বিবাহ দিয়া পাঠাইতে পারিলে আরও নিশ্চিন্ত হইতাম।

তুমি চলিয়া যাইবার পর আর কলিকাতায় ভালো লাগিতেছিল না, তাই ঐ বাড়ি তালাবন্ধ করিয়া কৃষ্ণনগর চলিয়া আসিয়াছি।

কালি গাইটার একটা বাচ্চা হইয়াছে। আমি আসিবার পর ও আর রামুর হাতে খাইতে চায় না। অনেক দুধ হইতেছে কিন্তু খাইবার লোক নাই। তুমি নাই বলিয়া আর পিঠা পায়েস ও করিতে ইচ্ছা করে না।

এর মধ্যে একদিন তোমার বন্ধু অরিন্দম সস্ত্রীক আসিয়া দুইদিন রহিয়া গেল। উহাদের একটি ফুটফুটে ছেলে হইয়াছে। যে কয়দিন ছিল আমার আঁচল ধরিয়াই থাকিত। সারাদিন দিদা দিদা করিয়া ডাকিত।

ওরা থাকাকালীন একদিন পুকুরে জাল ফেলিয়াছিলাম। বড় একটা রুই মাছ ধরা পরিয়াছিল। সেদিন খুব তোমার কথা মনে পড়িতেছিল।

দাদুভাই চলিয়া যাওয়াতে খুবই খারাপ লাগিতেছে। সময়মত বৌ আসিলে তো আমারও একটি এমন দাদুভাই হইতো। কবে যে হইবে তাহা ঈশ্বরই জানেন। তুমি কিসের আশায় এখনও রহিয়াছ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

পাশের বাড়ির রমা একটি মেয়ে কোলে লইয়া আসিয়াছে। এখন তাহাকে লইয়া কিছুটা সময় কাটে। আমরা শারীরিক সুস্থ আছি। সাবধানে থাকিও।

মা আনন্দময়ী তোমার মঙ্গল করুন।

শ্রীহরি

বাবা লিখছেন—

তোমার কাজ ভাল চলিতেছে জানিয়া খুশি হইলাম। শ্রীহরির কৃপায় তুমি আজ কত অল্প বয়সে কত বড় কাজ করিতেছে ভাবিলে আশ্চর্যবোধ হয়।

আমরা যে সুখে লালিত-পালিত হইয়াছি তোমার কৈশরে দৈব দুর্বিপাকে তাহা দেওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া মনঃকষ্টই পাইয়াছি, কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই। শ্রীহরি তোমাকে হাত ধরিয়া দুর্গম পথ পার করিয়া দিয়াছেন। যেদিন দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসি সেদিন তিনিই একমাত্র সম্বল ছিলেন।

যখন দেশের চকমিলান বাড়ি, অন্দরমহল, বাহির মহল, ঠাকুর দালান ছাড়িয়া এই চার কোঠার বাড়িতে নিঃসম্বল অবস্থায় আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল তখন তোমার মুখের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যতের আশায় মনোবল ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। ঠাকুর আমার সেই আশা বিফল করেন নাই, তাই তাঁহাকে শতকোটি প্রণাম।

কেন জানি না আজ তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া কেবলই দেশের কথা মনে পড়িতেছে। সেই চাঁদ কপালি মণিপুরি ঘোড়াটা যার নাম তুমি রাখিয়াছিলে লালু, যাহাকে তুমি একবার হইলেও কচি ঘাস নিজের হাতে খাওয়াইতে, যে তোমাকে পিঠে লইয়া সমস্ত গ্রাম ঘুরাইয়া লইয়া আসিত, সে যখন অসুস্থ হইয়া হঠাৎ মারা গেল তখন তোমার কী কান্না। মনে পড়ে তোমার লালু তখন তোমাকে দেখিয়া নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিয়াছিল। তখনকার পশুপাখিগুলিরও যেন হৃদয় ছিল, মমত্ববোধ ছিল আর আজকাল মানুষরাও তাহা কোথায় যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে।

গোধূলি বেলায় তুমি মাজদের হাত ধরিয়া প্রতিদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে সুরমা নদীর ধারে। আমাদের গরুগুলি গ্রীষ্মকালে চরে ঘাস খাইয়া লেজ তুলিয়া, মুখ ভাসাইয়া যখন এপাড়ে উঠিয়া আসিত তখন তুমি মিলাইয়া লইতে যে তোমার ধলি,

কালি, সীতা, সবাই ফিরিয়াছে কিনা। তোমার মনে পড়ে কী, তুমি যে আমার সঙ্গে হাটে যাইতে। হাটে যাইতে সরু বাঁশের সাঁকোটা পার হইতে হইতো। মজিদ তোমাকে কোলে করিয়া সেই সাঁকো পার করাইয়া দিত। একদিন তুমি জোর করিয়া নিজে পার হইতে গিয়া জলে পড়িয়া গিয়েছিলে। মজিদ সেইখান হইতে জলে লাফাইয়া পড়িয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছিল।

তারপর একদিন আরম্ভ হইল মারামারি হানাহানি। ঠিক করিলাম দেশ ছাড়িতে হইবে। মুসলমান প্রজারা কতই না অনুরোধ করিয়াছিল থাকিবার জন্য। তোমারও ইচ্ছা ছিল না দেশ ছাড়িয়া আসিতে। তবুও আসিতে হইল।

তুমি কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হইলে। তোমার নাম ডাক হইল। সবাই বলিত আপনার ছেলের মত ছেলেই হয় না, যেমন পড়াশোনায় তেমনি খেলাধুলায়। তুমি পরীক্ষায় জলপানি পাইলে। প্রথম টাকা পাইয়া তুমি তোমার মাকে একটা শাড়ি কিনিয়া দিয়াছিলে। উনি তাহা আজও সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন।

মাসিমার বাড়িতে থাকিয়া যাদবপুরে পড়ার সময় তোমার খুবই কষ্ট হইতো, কিন্তু তোমার হাবভাবে তাহা কখনও প্রকাশ হইতে দেখি নাই।

আজকাল স্মৃতিচারণ করিয়াই দিন কাটে।

আজ আর আমাদের কোনও অভাব নাই। শুধু একটাই অভাব আর চিন্তা, বংশধর দেখিয়া যাইতে পারিব তো?

এখন ভাবি ঠাকুর যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যেই করেন। দেশে থাকিলে তুমি এত শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাইতে কিনা সন্দেহ। কর্মেরও এত সুযোগ পাইতে না। এত উন্নতি করাও সম্ভব হইত না। ঘর ছাড়ারাই ঘর খুঁজিয়া পায়। ঠাকুরের কৃপা তাহাদের উপরই বর্ষায়।

তুমি আমাদের যাইতে লিখিয়াছ। তুমি টিকিট পাঠাইয়া দিবে এবং প্রয়োজন-বোধে সঙ্গীতও জুটাইয়া দিবে ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। তুমি একটু থিতু হইয়া বসিলেই যাইবো।

শ্রীহরি তোমার মঙ্গল করুন।

আশীর্বাদক তোমার বাবা

পুঃ একদিন তোমার মজিদভাই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ডার পার হইয়া আসিয়াছিল। ঢাকায় ব্যবসা করিয়া অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে কিন্তু তোমাকে ভোলে নাই। তাহার অতু ভাইকে দেখিতে আসিয়াছিল। তোমার জন্য তিলের খাজা ঢাকার বাখর-খানি আর অমৃতি লইয়া আসিয়াছিল, তার মার জন্য একটা ঢাকাই জামদানি আর আমার জন্য একজোড়া জুতা। সাতদিন ছিল। দিনরাত কেবল গল্প করিয়াছি উহার সহিত। তোমার একখানা ছবি লইয়া গিয়াছে। তোমাকে তাহার বাড়িতে যাইতে বারবার বলিয়া গিয়াছে। ঠিকানা দিলাম। তুমি একখানা চিঠি লিখিও।

ইতি বাবা

চিঠি দুটো পড়ে আমার মনও চলে গেল সেই সুরমা নদীর পাড়ে, বাড়ির পেছনের ফলবাগানে, ঠাকুরদালানে দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে। ভিন গাঁ থেকে কুমোর আসতো ঠাকুর গড়তে। কাঠের ফ্রেমে খড় বেঁধে ঠাকুরের কাঠামো তৈরি দেখতাম। তারপর মাটির প্রলেপ দিয়ে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হতো ঠাকুরের শরীর, তারপর চুল লাগানো, রঙ দেওয়া, ঢাকের সাজ, শেষে চক্ষুদান। ঢাকের আওয়াজ, ঘট বসানো, পুজো, নতুন জামাকাপড় পরা, গ্রামশুদ্ধ সবার পংক্তি ভোজন। মার আর পিসিমার সে কয়দিন বিশ্রাম ছিল না। ভোর চারটেয় ওঁদের কাজ আরম্ভ হতো আর শেষ হতো রাত বারোটায়। গ্রামের সব দরিদ্রদের, হিন্দু মুসলমান নির্বিচারে, মা জামা কাপড় বিলি করতেন। পুজোর আগে বাবা শহর থেকে নৌকো বোঝাই করে জামা কাপড় কিনে আনতেন। "সে দিনগুলো আর ফিরে পাওয়া যাবে না শত চেষ্টায় ও। পৃথিবীটা যেন প্রাণহীন হয়ে গেছে। বাবা ঠিকই বলেছেন সে সময় পশুপাখিদেরও মমত্ববোধ ছিল।

গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে সাঁতার কাটা, নৌকো নিয়ে চর থেকে তরমুজ চুরি করে খাওয়া, বর্ষার জলে ভিজে ফুটবল খেলা, ঈদের দিনে মুসলমান বন্ধুদের ঈদ মুবারক করা সে সব দিন আর কখনও আসবে না।

॥ ১০ ॥

মিঃ মিলারের সঙ্গে যাচ্ছি কারখানায়। এই হবে আমার প্রথম দেখা। বিমান বন্দর থেকে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথ দিয়েই চলেছি। সুন্দর কংক্রিটের রাস্তা। এক এক দিকে চারটে গাড়ি অনায়াসে পাশাপাশি যেতে পারে। গাড়ি এখানে আমাদের দেশের মত বাঁ হাতি চলে। একদম বাঁ দিকের লেন হলো ভারি গাড়ি চলার জন্যে। তারও বাঁ দিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়িগুলো দাঁড়াবার জন্যে। নির্দিষ্ট লেনে সব গাড়ি লাইন করে চলেছে প্রায় একশো কিঃ মি ঘণ্টায়। রাস্তার ধারে খালে ফুটে আছে লাল সাদা শালুক কোথাও বা কলমিফুল। খালের ও পাশে আর একটা রাস্তা। তার ওপারে সব বাড়ি ঘর। সব বাড়িগুলোরই একটা আর্কিটেকচারাল ফিচার আছে। বস্তি বাড়ি একটাও নেই।

মিলার সাহেব চুপ করে বসে আছেন। ভাবছেন বোধহয় যে পথে উনি পাঁচ বছর যাতায়াত করেছেন, তা শেষ হয়ে যাবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সপ্তাহে কয়দিন যেতেন কারখানায়?

—যেতাম রোজই সকালে।

—রোজ যেতে হতো কেন?

—না হলে কাজ এগোতো না। আপনাকেও যেতে হবে।

— আমি ঠিক করেছি সপ্তাহে দুদিনের বেশী যাবো না। সাপ্তাহের কাজের ফিরিস্তি ঠিক করে নেবো সবার সঙ্গে আলোচনা করে। তারপর মিলিয়ে নেবো সে ভাবে কাজ হয়েছে কতটা, আর না হলে কেন হয়নি।

মিলার ঠোঁটের কোনে হাসলেন। দেখুন, সে ভাবে পারেন কিনা। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু হলো না।

এয়ারপোর্ট পার হয়ে গেলাম। তারপর দেখলাম মস্ত বড় সাইনবোর্ড এশিয়াটিক ইনস্টিটিউট্ অব টেকনলজি। জিজ্ঞেস করলাম, এই ইনস্টিটিউটটা কিসের ?

— এটা ইউ নে ডো. করেছে, এশিয়াটিকদের জন্য। বিভিন্ন টেকনলজিকাল সাবজেক্ট পড়ানো হয়।

কোন মিডিয়ামে পড়ানো হয় ?

মিলার বললেন, ইংরেজিতে।

কারা পড়ান ?

—নানান দেশের লোক আছে। ইণ্ডিয়ানও আছে।

- এটা কী রেসিডেন্সিয়াল ?

- হ্যাঁ।

- মেয়েরাও কি পড়ে ?

হ্যাঁ। কো এডুকেসান।

আর একটু এগিয়ে যেতেই কারখানা। পাশে হোগলা আর কচুরিপানায় ঢাকা জলা জায়গা।

মিলার সাহেব প্রথমেই কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখালেন। ছোট্ট কারখানা। সব পুরোনো যন্ত্রাংশ যোগাড় করে তাকে মেরামত করে জোড়া লাগিয়ে খাড়া করা হয়েছে মেশিনগুলো। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। লোকগুলো কাজ শিখেছে ভালই।

কারখানা দেখিয়ে অফিসে নিয়ে গেলেন। তারপর সব অফিসারদের ডাকলেন কনফারেন্স রুমে। আমার পরিচয় বেশ ঘটা করেই দিলেন।

ইনি হচ্ছেন অতীশ রায়। তোমাদের নতুন কোম্পানির নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বা চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার। বয়েস কম হলেও অভিজ্ঞতা অনেক, বিশেষ করে ফয়েল আর শীটে। অনেক দেশেরই ছোট বড় শীট্ ও ফয়েলের কারখানা দেখেছেন। উনি বিজ্ঞান ও ইলেকট্রিকাল মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্নাতক হবার পর ম্যানেজমেণ্টেও ডিগ্রি নিয়েছেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ওনার মত লোকের নেতৃত্বে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

এরপর সবাই তাদের পরিচিতি জানালো। সবাই বেশ উচ্চশিক্ষিত। তিনজন অফিসার এখানকার সবচাইতে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় চুয়ালঙ্করর্ণ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেটালার্জিতে স্নাতক হয়ে আমেরিকান কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার

করেছে। সবাই ভালই ইংরেজি বলে। সত্যি এদের স্টাফিং ভালই। মনে হলো না কাজ করতে কোনও অসুবিধা হবে।

আমি সবাইকে যে যার ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখতে বলে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেদিনকার মত চলে এলাম।

এরপর একদিন কোম্পানির হাত বদল হয়ে গেল। আমি মিলার সাহেবের চেয়ারে বসেছি।

একদিন কারখানায় বাস্তু পুজো হলো। মস্ত সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে। সামনে স্টেজ। কারখানার সবাই এসেছে। ন জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীদের পরনে খয়েরি রং-এর সিল্কের ধুতি, দার্জিলিং-এর লামারা যে রং-এর জোব্বা পরে। কারখানার এক কোণায় খোলা জায়গায় যেখানে প্রথম ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয়েছিল সেখানে ছিল ছোট্ট একটা মন্দির এক মিটার বাই এক মিটার। তার মধ্যে বসানো ছিল একটা মূর্তি, বুদ্ধের নয়। প্রধান সন্ন্যাসী সেখানে ধূপ, দীপ (প্রদীপ নয় মোমবাতি), পুষ্পার্ঘ দিয়ে পুজো করলেন। আমরা সবাই ভক্তিভরে প্রণাম করলাম।

ওঁরা তারপর স্টেজে এসে বসলেন। সবাই সমস্বরে পালি ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করলেন সুর করে। বিকৃত উচ্চারণের ফলে একটা কথাও বুঝতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে একগুচ্ছ কুশ দিয়ে পাত্র থেকে জল ছিটোচ্ছিলেন ওঁ শান্তি বলে। মন্ত্রের মাঝে মাঝেই বলছিলেন—বুদ্ধং স্মরনং গচ্ছামি।

তাকিয়ে দেখলাম সবাই হাতজোড় করে চোখ বুজে আছে। আমিও তাড়াতাড়ি চোখটা বুজে হাতটা জোড় করে বসলাম শান্ত ধ্যানমগ্নভাব নিয়ে।

পুজো শেষ হয়ে গেল। সন্ন্যাসীদের একজন থলে থেকে রুপোর নস্যির কৌটো বার করলেন, তার সাথে একটা রুপোর ইউ টিউব। সেই টিউবে নস্যি ভরে নলের সেই অংশটা নাকে ঢুকিয়ে অন্য অংশ মুখে ঢুকিয়ে জোরে ফুঁ দিলেন চোখ বুজে। নস্যির গুঁড়ো নিশ্চয় অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেল। আর একজন দামী সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে আরামে ধোঁয়া ছাড়লেন।

আমাদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট রিড্ সাহেব একটা বড় প্যাকেট প্রধান সন্ন্যাসীকে দিয়ে প্রণাম করলেন। প্যাকেটে ছিল একটা সিল্কের ধুতি আর তার সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষ। আমি ও অন্যান্য অফিসাররা পরপর সবাইকে ঐ রকম একটা করে প্যাকেট দিয়ে প্রণাম জানালাম। সবাইকে সন্ন্যাসীরা শান্তি জলের ছিটে দিলেন।

মিঃ মিলার প্রথমে তার বিদায়বার্তা জানালেন। আমাদের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ডোনাল্ড রিড্ নতুন কোম্পানিতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সহযোগিতা কামনা করলেন।

আমার পালা এলে আমি সম্বোধন করলাম থাই ভাষায় লিখে এনেছিলাম রোমান অক্ষরে। বিকৃত উচ্চারণে পাছে বুঝতে অসুবিধা হয় তাই পার্সোন্যাল

অফিসার জন্ তা পুনরাবৃত্তি করছিল। আমার পরিচিতি দিতে গিয়ে বললাম, আমার ভাষাটাই যা একটু আলাদা, না হলে আমাদের মধ্যে কোথাও তফাৎ নেই। আপনারা বৌদ্ধ, আমি হিন্দু, কিন্তু আপনারাও আমাদের দেব-দেবীকে পুজো করেন। আপনাদের ধর্ম, সাহিত্য, কৃষ্টির অনেকটাই আমাদের দেশ থেকে এসেছে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে কি করে কোম্পানিটাকে বাঁচাতে পারি এবং তার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারি। তা আমরা করবো উৎপাদকতা বাড়িয়ে, ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য ছাঁটাই করে নয়। এজন্য আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই।

খুব হাততালি। সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালো। এরপর সন্ন্যাসীদের খাবার দেওয়া হলো—ভাত, নুডুল শুয়োরের মাংসের চপ সহযোগে, গো মাংসের ঝোল। এরপর সবাই খেলো বুফে সিস্টেমে।

ওয়ার্কস ম্যানেজার সাতীত আর ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার মানাসিং আমার পাশে দাঁড়ালো খাবারের প্লেট হাতে।

সাতীত বললো, কর্মীদের খুব ভয় ছিল যে অনেকের কাজ চলে যাবে। আপনার কথায় এরা আশ্বস্ত হলো। আমরাও এখন নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারবো।

এইভাবেই শুরু হলো থাইল্যাণ্ডের কর্মজীবন।

॥ ১১ ॥

চুলটা বড় হয়েছে, কাটা দরকার। বারবার সপ্ চেনার কোনই অসুবিধা নেই। অনেক দূর থেকেই দেখা যায় একটা লাল আর সবুজ আলোর থিউব ঘুরছে। সুরিওঙ্গশ্রী রাস্তার ওপর একটা বারবার সপে ঢুকলাম, নাম পংপঙ্গ বার্বর সপ্। বসবার ঘরটা বেশ বড়। বাইরে খুব গরম, ভেতরে এ, সি,-র ঠাণ্ডা হাওয়া। একটা সোফায় গোটা চারেক অল্পবয়সী মেয়ে লাল ফ্রক পরে বসে আছে। রিসেপশানের কাউণ্টারে আর একটি মেয়ে। অল্পস্বল্প ইংরেজি জানে। বললাম চুল কাটবো। থাউ লাই (কত লাগবে)। রেট কার্ডটা সামনে এগিয়ে দিল। চুলকাটার দেড়শো বাট, শাম্পু একশো বাট, ম্যাসাজ ও চান দুশো বাট, চুলে রঙ লাগানো দুশো বাট।

একটি মেয়ে এগিয়ে এসে হেসে হাত ধরে নিয়ে গেল ছোট্ট একটা ঘরে। চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমাকে বসিয়ে ঘুরিয়ে দিল আয়নার সামনে। আলতো করে চশমাটা খুলে সেল্ফের ওপর রাখলো। জামার বোতামটা খুলে একটু নামিয়ে দিল। সদ্য ধোয়া ইস্তিকরা একটা সাদা কাপড় গায়ে জড়িয়ে দিয়ে একটা হেয়ার স্টাইলের বই সামনে ধরে বললো, কি রকম কাটবেন?

—কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে একটা ছবি দেখিয়ে বললাম, এই রকম।

চুলটা আঁচড়ে ইলেক্‌ট্রিক কাঁচি দিয়ে বড় বড় চুলগুলো কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি ট্যুরিস্ট ? কোথা থেকে আসছেন ?

থাই ভাষার প্রশ্ন থাই ভাষাতেই উত্তর দিলাম।

—আপনার চুল আমি এমন সুন্দর করে কাটবো যে আপনি প্রত্যেকবারই এখানে আসবেন চুল কাটতে।

—তাই আসবো। তোমার মত সুন্দরী মেয়ের কাছে চুল কাটতে আসবো নাই বা কেন।

সুন্দরী নাপিতনী জানালো, আপনার চুল কিন্তু বেশ নরম।

ও ততক্ষণে ইলেক্‌ট্রিক কাঁচি রেখে চিরুনি ধরে কাঁচি দিয়ে চুল কাটছিল। কাটবার সময় কড়াপড়া শক্ত হাতে জোর করে ঘাড়টা ঘোরাচ্ছিল না। দরকার মত চেয়ারটা এড্‌জাস্ট করে নিচ্ছিল। মাঝে মাঝে নরম আঙ্গুল দিয়ে গালটা একটু টিপে দিচ্ছিল মুচকি হেসে। ঘরে হাল্কা সুরের মিষ্টি গান বাজছিল স্টিরিওতে।

তারপর চুল ঝেড়ে সাদা কাপড়টা খুলে একটা তোয়ালে বুকের কাছে রেখে খুর দিয়ে জুলফি-টুলফি কেটে বললো, দাঁড়িতো আপনি নিজেই কেটেছেন। শ্যাম্পু করবেন ?

আমি ইতস্তত করছিলাম দেখে বললো, খুব সুন্দর করে দেবো। দেখবেন আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। আগে দেখে নিন কেমন হয়েছে। পছন্দ হয়েছে তো ?

বললাম, খুব ভালো হয়েছে। ঠিক যেমনটা চেয়েছিলাম।

বাধ্য হয়ে রাজি হতে হলো শ্যাম্পু করতে।

ও চেয়ারটাকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে কাত করে দিল। আমি তখন প্রায় শোয়া। আমার মাথাটা বেসিনের ওপর। ও একটা প্লাস্টিকের ট্রে গলায় লাগিয়ে দিল।

টেলিফোন শাওয়ারের গরম-ঠাণ্ডা জল দিয়ে মাথাটা ভিজিয়ে এগ্‌ শ্যাম্পুর ফেনা ঘসতে ঘসতে বললো, আপনি থাকেন কোথায় ?

—সয়টনসণ্‌।

—ফানাইয়া মী (স্ত্রী আছে)।

—মাই মী (না নেই)।

—তা হলে তো খুব ভালো। খুব স্ফূর্তিতে আছেন।

—কোথায় আর স্ফূর্তিতে আছি !

—সে কী ! আমার খুব সুন্দর সুন্দর বন্ধু আছে, চাই ?

বললাম, না, না ! দরকার হলে আসবো তোমার কাছে।

শ্যাম্পু হয়ে গেলে ড্রায়ার চালিয়ে চুলে বিলি কাটতে কাটতে আমাকে প্রায় ঘুম পাড়িয়ে ফেললো। তখন আর একটি মেয়ে আমার হাতটা ধরে বললো, ম্যাসাজ করবেন- ইলেক্‌ট্রিক ম্যাসাজ। খুব আরাম লাগবে। শরীর একেবারে ঝরঝরে

করে দেবো। চুল কাটার মেয়েটি বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাসাজ করিয়ে নিন। ও খুব সুন্দর ম্যাসাজ করে।

ও চেয়ারটাকে সিধে করে চুলে বাইলক্রিম লাগিয়ে চুল আঁচড়ে অডিকোলন মুখে মাখিয়ে, মুখের সামনে আয়না ধরে বললো, সেটল্যাও (শেষ হয়েছে)। ত্রিশ বাট টিপ দিতেই খুশি হয়ে বললো, খাপ্ খুন্ খ্রাপ। আবার আসবেন।

মেয়েটি এবার প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে গেল আর একটি ছোট্ট ঘরে। ঢোকবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘরে লাল কার্পেট পাতা। একপাশে একটা ছোট্ট চৌকি। তার ওপর পরিস্কার বালিশ আর ধবধবে চাদর পাতা। দুটো সাদা তোয়ালে ভাঁজ করে রাখা আছে। আর একপাশে একটা বাথ টব, তাতে টেলিফোন শাওয়ার, ঠাণ্ডা গরম জলের ট্যাপ। নতুন ছোট্ট এক টুকরো সাবান। আর এক দেওয়ালে একটা আয়না। থাকে রাখা আছে ব্রাস, চিরুণি ও পণ্ডস পাউডার। আমাকে চৌকিতে বসিয়ে জুতো মোজা খুলে দিল। তারপর জামাটা খুলে একটা তোয়ালে দিয়ে বললো, প্যাণ্টটা খুলুন। সব পরিপাটি করে রেখে বললো, এবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন।

ও এর মধ্যে ইলেকট্রিক ভাইব্রেটারটা হাতে লাগিয়ে প্লাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁপছিল। হাতটা আমার শরীরে ছোঁয়ালো, সেই কাঁপানো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে আমার সারা গায়ে শিহরণ তুলে ভারশূন্য করে দিল। গা এলিয়ে দিয়েছি। চোখ বুজে আসছে।

—কী ঘুমিয়ে পড়লেন যে? অনেকক্ষণ হয়ে গেল। এবার উঠুন। আর কিছু চাই?

—আবার কি চাইবো।

গম্ভীর হয়ে বললো, তা হলে উঠে চান করে নিন।

ও একটা প্লাস্টিকের এপ্রন লাগিয়ে আমার গায়ে পিঠে সাবান লাগিয়ে ঠাণ্ডা গরম জলে চান করিয়ে গা মুছিয়ে জুতো জামা এগিয়ে দিয়ে বললো, ফিল্ গুড্।

আমি ওর গালে একটা টোকা দিয়ে বললাম, 'ডি মাগ্।' ত্রিশ বাট বকশীস পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজাটা খুলে বললো, আবার আসবেন। সেদিন আরও অনেক আরাম পাবেন। মুচকি হেসে বললো, যদি চান।

॥ ১২ ॥

আমি বরাবরই খেলাধুলায় বেশ ভালো ছিলাম। ইউনিভার্সিটি ব্লু ছিলাম ফুটবলে, কলেজের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিলাম, টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান ছিলাম। ক্রিকেটের মাঠেই মনীষার সঙ্গে আলাপ, ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা তারপর বিচ্ছেদ, মনোমালিন্য, তাই থেকে বিতৃষ্ণা ও বিবাহে অনিচ্ছা ও মায়ের মনোকষ্ট।

রয়েল ব্যাংকক স্পোর্টস ক্লাব এখানে সব চাইতে বড় ক্লাব যেখানে সবরকম খেলার সুযোগ আছে। মিলারের শূন্যস্থানের জন্য আমি দরখাস্ত করেছি।

ভর্তি করার আগে ওরা ইণ্টারভিউ নিল! ইণ্টারভিউ বোর্ডে দশজন সভ্যের মধ্যে ছ'জনই ইংরেজ, সবাই বৃদ্ধ। এদেশে কাজ করতে করতে অবসর নিয়ে এখানেই নতুন করে সংসার পেতে বসেছে। এদেশে অনেক সুবিধা। দেশের তুলনায় খাওয়া থাকা সস্তা, অনায়াসেই অল্প বয়সি সুন্দরী বিশ্বস্ত সঙ্গিনী পাওয়া যায় যে সব কাজেই খাসা। ভালো ক্লাব আছে, পাব আছে, সমুদ্র সৈকত আছে, সুচিকিৎসা আছে। দেশের চাইতে অনেক আরামে থাকা যায়। এ ক্লাবের বয়স প্রায় একশো বছর হলো। কথায় বলে দশজন ইংরেজ একত্র হলেই ক্লাব করে, এ ক্লাবটাও ইংরেজরাই করেছিল। সম্রাট চুয়ালঙ্কর্ণ যখন ঢেলে সাজিয়েছিলেন শিক্ষা, ও শাসন-ব্যবস্থা, আর সেনাবিভাগ তখন অনেক ইংরেজ উপদেষ্টা করে এনেছিলেন। তাছাড়া তো ইংরেজ ব্যবসাদাররা ছিলই, তারাই এই হেনরি ডুরাণ্ট রোডের উপর এই ক্লাবের জমিটা সম্রাটের কাছ থেকে লীজ নিয়ে ক্লাবটা করেছিল। এই ক্লাবে ঘোড়দৌড়ও হয়। উল্টো দিকেই এখানকার চুয়ালঙ্কর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, যাকে ওরা বলে মহাবিদ্যালয়। ওখানে অন্যান্য বিষয় ছাড়া ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়ানো হয়।

যাক, আমাকে এরা সভ্য করে নিয়েছে।

আমার বাড়ি থেকে ক্লাব দশ মিনিটের পথ আর ক্লাব থেকে অফিস আর দশ মিনিট। আমি প্রায়ই সকাল ছ টায় অফিসের জামা-কাপড় নিয়ে ক্লাবে চলে আসি ঘণ্টাখানেক খেলে ওখানে ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্নান করে জামা-কাপড় বদলে অফিস চলে যাই।

সকালে খেলতে ভারি ভালো লাগে। শিশির ভেজা সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে মুসাণ্ডা আর ক্যানার বাহার, কোর্সের মাঝের খালটায় লাল, নীল, সাদা শালুক, গাছের পাতায় লুকিয়ে থাকা কোকিল, ঘুঘুর ডাক মনটাকে দোলা দেয়। শরীর-টাকে চাঙ্গা রাখতে অনেকে রেস কোর্সে জগিং করে। কোথায় এ সৌন্দর্য উপভোগ

করবে, শরীরের কথা ভাববে তা নয় অনেকে কানে একটা ওয়াকম্যানের ইয়ার প্লাগ লাগিয়ে দেয়।

সুন্দরম্‌কে প্রায়ই দৌড়তে দেখা যায়। আমাকে দেখলেই হাত ওঠায়। ভদ্রলোক এখানে অনেকদিন ধরে আছে, এই ক্লাবের চিফ্‌ এ্যাডমিনিস্ট্রেটার। প্রথম যখন এসেছিল তখন এক ভারতীয় ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটারের ম্যানেজার ছিল। সে সময় এখানে হিন্দি চলচিত্র খুব জনপ্রিয় ছিল। তারপর সেনাবিদ্রোহে যখন রাজা তার শাসনক্ষমতা হারালো তখন থেকে হিন্দি ফিল্ম আসা বন্ধ হয়ে গেল। তখন থেকেই ভদ্রলোক কাজ করছে এখানে। এখানে বাড়ি করেছে। ছেলে-মেয়েকে মাদ্রাজে পড়িয়েছে। তারা বিয়ে করে এখানেই আছে। দেশটার মাধুর্য এমন যে এলে আর কেউ যেতে চায় না।

এর মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠেছি আত্মীয় বান্ধবহীন নিঃসঙ্গ ব্যাংককে, যদিও আনন্দের বন্দোবস্তের অভাব নেই এখানে। সম্পর্কহীন সঙ্গ আমার ভালো লাগে না। দু-চারজন বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এরা বিদেশে থেকে আড্ডা দিতে ভুলে গেছে। নিজেদের নিয়েই সবাই ব্যস্ত অফিস, বাড়ি মাঝে-মধ্যে গল্ফ খেলা, ভি. সি আর এ হিন্দি, ইংরেজি সিনেমা দেখা, না হলে বই পড়া। আমারও একই রুটিন থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। মাঝে মাঝে মনীষার কথা ভেবে মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়।

এই হাঁফিয়ে ওঠা দিনগুলির মাঝে দেখা পেলাম নেত্রার, আর সেটা ঘটেছিল এই ক্লাবেই।

থাইরা জুয়া খেলতে ভালবাসে। জুয়া খেলার কত রকমই না পদ্ধতি। ছোট ছোট দোকানে রয়েছে ছোট্ট বিলিয়ার্ড বোর্ড—আসলে সেটা জুয়ার বোর্ড। বক্সিং এখানে দারুণ জনপ্রিয়, তাতেও চলে বাজি। গল্ফের মাঠে হাজার হাজার বাট হাত বদল হয়। প্রতিদিন দুপুরে চার ভদ্রলোক আসেন মার্সিডিজ করে ক্লাবে। ভর দুপুরের কড়া রোদে নামেন গল্ফের মাঠে। সঙ্গে থাকে বারোজন লোক—চারজনের কাঁধে থাকে ব্যাগ, চারজন ধরে ওদের মাথার উপর ছাতা, আর চারজনের হাতে থাকে বিয়ারের গ্লাস। যারা খেলে তারা যেমন অনেক হাজার বাট বাজি রাখে তেমনি অবাধ এই বারোজন ক্যাডি তাদের মধ্যে বাজি ধরে কোন হোলে কে জিতবে।

গ্রামে জুয়া খেলার জন্য আছে যেমন মুরগির লড়াই, তেমনি আছে বুলবুলির লড়াই, লড়াকু মাছের লড়াই, গুবরে পোকার লড়াই এমনকি ইঁদুরের লড়াই পর্যন্ত।

এই ক্লাবের মাঠে মাসে দুদিন ঘোড়দৌড় হয়। সেদিন হেনরিডুনান্ট রোড, মোটর সাইকেল আর টুকটুকে ভরে যায়। ফুটপাথে সব দোকান বসে জামা-কাপড় জুতোর যেমন, তেমনি খাবারের। লোকে লোকারণ্য। স্ট্যাডিয়াম উপচে পড়ে। বড়লোকের ভিড়ে ক্লাব ঘরের বারান্দায় দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যায় না। ঘোড়া

যখন দৌড়ায় তখন চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রমহিলারাও সমানভাবে চীৎকার করেন তারপর হতাশ হয়ে আবার বই দেখে ঘোড়ার ঠিকুজী কুষ্ঠী বিচার করে পরের রেসের জন্যে হাজার বাটের টিকিট কেনেন।

মাস মাইনে আর দিন আনা দিন খাওয়া লোকেরা হেরে গিয়ে ঘড়িটা, সাইকেলটা, গলার চেইনটা, সস্তায় বিক্রি করে আবার আশায় বুক বেঁধে বাজি ধরে। সর্বশান্ত হয়ে আর বাড়ি ফিরতে মন চায় না, ছেলে-মেয়েরা যে অপেক্ষা করে আছে কখন বাবা ফিরবে পয়সা নিয়ে তবে জুটবে তাদের খাওয়া। সে তখন কোনও ঠেকে গিয়ে মদ গিলে হয়তো রাস্তার উপরই পড়ে থাকে সারাটা রাত। তার স্ত্রী রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

আমিও একদিন গিয়েছিলাম ভুল করে রেসের মাঠে। সেদিন রেসের দিন আমার খেয়াল ছিল না। এসেছিলাম গল্ফ খেলতে। জীবনে কখনও রেস খেলিনি। নিয়মকানুনও জানা নেই। খুব বিজ্ঞের মত ঘোড়ার কুষ্ঠি বিচার করতে লাগলাম।

রেস আরম্ভ হবার আগে জকি আর ঘোড়াগুলোকে দর্শকদের সামনে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যে ঘোড়াটা সবচাইতে তাগড়া তার উপরই বাজি ধরলাম পাঁচশো বাট, যদি জেতে তাহলে পাবো পঁচিশশো। দৌড় আরম্ভ হলো। দারুণ উত্তেজনা। আমার ঘোড়া তৃতীয় স্থানে, এই দ্বিতীয়, পেছন থেকে আর একটা ঘোড়া এগিয়ে এল। জকি এবার ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাচ্ছে আবার দ্বিতীয়। উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। পাশের মহিলার কাছ থেকে বাইনোকুলারটা প্রায় কেড়েই নিলাম। উত্তেজনায় মহিলার পিঠ ছুঁয়ে বললাম দেখেছেন আমার ঘোড়া প্রথম। মহিলা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই বাইনোকুলারটা ফেরৎ দিয়ে বললাম, ধন্যবাদ।

—আপনার ঘোড়া জিতলো ?

বললাম, হ্যাঁ। আপনারটা ?

উনি হাত উল্টালেন, পেলাম না। অথচ দেখুন, ও আগের রেসে জিতেছিল। আপনার ঘোড়া কিন্তু কোন দিনই জেতেনি। অনেক টাকা পেলেন ?

—তা পেয়েছি।

মহিলার বয়স বেশী নয়। বেশ সুন্দরী। বাবার সঙ্গে এসেছেন। সুন্দর ইংরেজি বলেন।

—এবার আপনি যে ঘোড়াটা ধরবেন, সেটাই আমি ধরবো।

—পরের ঘোড়া আমার জেতা তো দূরে থাক উল্টে পড়লো জকিকে নিয়ে বেড়ার গায়ে ধাক্কা লেগে। সেই প্রথম আর সেই শেষ আমার রেস খেলা।

কয়েকদিন পর কারখানায় গিয়ে শুনলাম রাত্রের সিফটে এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আর তাতে একজন কর্মী মারা গেছে। তার মৃতদেহ তখন মেশিনের মধ্যে আটকে আছে। দুটো হাত চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে আছে দুটো রোলারের মাঝখানে। মাথাটা রোলারের গায়ে লেগে ফেটে গেছে নারকেলের মত। নীচে চাপ চাপ রক্ত।

মাল চালাবার আগে রোলার পরিস্কার করছিল আস্তে আস্তে রোলার ঘুরিয়ে, রোজ যেমন করে। শার্টের হাতা রোলারে আটকে ওর হাত টেনে নিয়েছে। রোলার দুটো উল্টো দিকে ঘুরিয়ে পরিস্কার করার কথা ও একেবারে ভুলে গিয়েছিল। ও নাকি কয়েকদিন ধরেই খুব অন্যমনস্ক ছিল। কারও সঙ্গে কথা বলতো না। মাইনের টাকা নাকি মুরগির লড়াইতে সব খুইয়ে এসেছিল। বাড়িতে খাবার কিনবার মত কোনও পয়সাই ছিল না।

কিছু পয়সা নিয়ে পুলিশ আর পোষ্ট মর্টেম করলো না। রিপোর্ট লিখলো—অসাবধানতাই দুর্ঘটনার কারণ।

ওর বাড়ি আয়োথীয়ায়, আমাদের কারখানা থেকে মাইল পনেরো দূরে। পরের দিন গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে। সুন্দর বাড়ি কাঠের মাচার উপর। সামনে পেছনে ফলের বাগান। বাড়ির চারদিকে বাঁশের বেড়া। ওর বুড়ো বাবা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। মাস্টার এখন আমাদের কী হবে?

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ক্ষতিপূরণ যা পাবে তাই দিয়েই চালাতে হবে।

—সে কি আর আমি পাবো? সে তো ওর বৌ পাবে।

ওর বৌ কফিনের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। দু জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মন্ত্রপাঠ করছিল যাতে ওর ভাল ঘরে জন্ম হয়। আমি কাছে গিয়ে নমস্কার করে শ্রদ্ধা জানালাম।

ওর স্ত্রী আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো।

—ওর তিন-চার বছরের ছেলে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে বলছিল, 'ম্যা, ফ থী নাই' (বাবা কোথায়) 'ফ মাই মা' (বাবা, আসবে না) পাই ল্যাও থী নাই (কোথায় গেছে)।

ওর মা ওকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল—বাবা, আসবে। বাইরে গেছে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে আমাকে নমস্কার করলো। বছর কুড়ি বয়স হবে মেয়েটির। দেখতে ভালই। কান্না-ভাঙ্গা গলায় মেয়েটি বললো, মাস্টার কী হয়ে গেল, মাস্টার? আমার এখন কী হবে?

আমি ওর মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছিল, বলতো?

ও অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, তিনদিন আগে আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছিল। ও মাতাল হয়ে ফিরেছিল বাড়িতে। মাইনের সব টাকা জুয়া খেলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাই নিয়েই ঝগড়া। মাস্টার, বলতো, আমার কি কোনও অন্যায় হয়েছিল? ও রেগে গিয়ে আমায় মেরেছিল। এই দেখ কপালের ফাটলটা এখনও আছে।

—তারপর কি হলো?

—আমি সেদিন রাত্রেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম মার কাছে।

—তুমি আর সেখান থেকে আসোনি এর মধ্যে?

—মাস্টার, সেটাই আমার ভুল হয়েছে। ও আনতে গিয়েছিল, কিন্তু আমি

আসিনি। সেদিন থেকে ও আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি। তার জন্যে কি এমনি ভাবে মরতে হয়, মাস্টার। না হয় আমার ভুলই হয়েছিল। আর একবার গেলেই তো আমি চলে আসতাম।

—ও কী প্রত্যেক মাসেই এমনি জুয়ো খেলতো ?

—তা খেলতো, অল্পসল্প। সে তো সব থাইরাই খেলে। এখন আমার কী হবে মাস্টার। এইটুকু ছেলে নিয়ে আমি কি করে চালাবো ?

—তুমি একদিন কারখানায় এসো। জনের সঙ্গে দেখা করো তা হলে জানতে পারবে কত টাকা পাবে।

ও এসেছিল কাগজপত্র নিয়ে। কয়েকমাস পর আবার এসেছিল টাকা নিতে।

তখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। খুব সেজে এসেছিল সেদিন। দেড়লাখ বাট পেয়েছে। সঙ্গে আর একটি ছেলে ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, এ কে ?

তার উত্তরে বলেছিল, ওর সঙ্গেই এখন আছি। আমার ছেলে থাকে আমার মার কাছে।

॥ ১৩ ॥

কারখানা ঘুরে একদিন দুপুরে সোজা গল্ফের মাঠে গিয়েছিলাম। খেলার সঙ্গী খুঁজতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম হঠাৎ চোখ আটকে গেল লাল টি সার্ট আর ফেডড্ জীনে। বিউটি কনটেস্ট করে যেন এই মাত্র এল। যেমন তার শরীরের গঠন, মুখের আদল আর তেমনি কাঁচা সোনার রঙ। সেও খেলার জুতো পরে বসে আছে। আমার মনে হলো একে যেন কোথায় দেখেছি।

কাছে গিয়ে নমস্কার করে অল্প শেখা থাই ভাষায় বললাল, 'খাও থোট। ফম্ লেন গল্প ?' (ক্ষমা করবেন, আমার সাথে গল্প খেলবেন ?)

হেসে সুন্দর ইংরেজিতে বললো, আপনাকে আর কষ্ট করে আমাদের ভাষায় কথা বলতে হবে না। আমি ইংরেজিটা ভালই জানি। আমিও খেলার লোক খুঁজছিলাম। আমার বন্ধু দেখছি আসেনি।

বলমাম, আপনাকে আমি আগে দেখেছি। কোথায় বলুন তো ?

হেসে বললো, রেসের দিন। আপনি সেদিন প্রথম রেসে অনেক জিতেছিলেন। পরের রেসে হেরে পালালেন। খুব সংযমি লোক কিন্তু আপনি

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সেদিন কত হারলেন ?

—তা প্রায় দু হাজার বাট। আপনার মত আমিও কখনও যাই না রেসের মাঠে। সেদিন বাবা জোর করে নিয়ে গিয়েছিল।

—আপনার বাবা কি ব্যবসা করেন ?

—না না সরকারি কাজ করেন, নারকটিক ডিভিসনের ডাইরেকটার জেনারেল। আগে সেনাবিভাগে জেনারেল ছিলেন। চলুন তা হলে খেলা যাক। ও আমাদের পরিচয় তো হলো না। আমার নাম নেত্রা। আপনার, বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল ?

—অতীশ রায়। ভারতীয়। এখানে একটা কম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেকটার। ওর নরম সুন্দর হাতটা বোধহয় অজান্তে একটু বেশীক্ষনই ধরে ছিলাম।

বলটা টিতে বসিয়ে ক্যাডির থেকে ক্লাবটা নিয়ে ও দুবার সুইং করে নিল। মারের সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরটাও দুলে উঠলো, ব্যালে ডান্সারের মত। ওর ফিগার মডেলকেও হার মানায়। ওর বল পদ্মফুলে ঢাকা ছোট্ট পুকুর পার হয়ে গ্রীনে পেঁছে গেছে। আমি হাত তালি দিয়ে উঠলাম।

এবার, আমার পালা। বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। যাই হোক জয় মা কালী বলে মারলাম।

নেত্রা হাততালি দিয়ে বললো, গুড্ বল। দ্যাটস্ গ্রেট।

মিষ্টি স্বরের উচ্ছাসে বুঝতে পারলাম আমার বলও পেঁছে গেছে গ্রীনে।

গ্রীনে পেঁছে নেত্রা বললো, সামান্য বাজি ধরবেন নাকি, এই ধরুন হোল প্রতি পঞ্চাশ বাট ?

—ঠিক আছে। মনে মনে ভাবলাম, এ রকম সুন্দরীর কাছে হারাতেও আনন্দ।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে দুজনেই দুজনের পরিচয় নিয়েছি।

ও লন্ডনের স্কুল থেকে 'এ' লেভেল পাশ করে অক্সফোর্ড থেকে গ্র্যাজুয়েসান করেছে। আমিও অক্সফোর্ড থেকে পাশ করেছি কিনা জিজ্ঞেস করায় হেসে বলেছিলাম, এক গন্ডগ্রামের স্কুলে পড়েছি। ওখানে অনেক ভুল উচ্চারনে ইংরেজি শিখলেও ব্যাকারনে কোনও গলতি ছিল না। তারপর কলকাতায় এসে সে উচ্চারন শুদ্ধ করেছি।

—আমার বাবা মিলিটারিতে জেনারেল ছিল। ইংলন্ডে স্যান্ডহার্ষ্ঠে যখন পড়তে গেল তখন বাবা কর্নেল। আমার বয়েস তখন দশ বছর। সেখানে পাশ করে বাবা মিলিটারি এট্যাচি হয়ে ছিল লন্ডন, প্যারিস আর ওয়াশিংটনে। হোস্টেলে থেকে পাবলিক স্কুলে পড়েছি।

—অক্সফোর্ডে কি হোস্টেলে ছিলেন ?

—না এক বুড়ির বাড়িতে পেয়িং গেস্ট ছিলাম।

সাবজেক্ট জানতে চাইলে বললো, ইতিহাস স্পেশাল পেপার ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস।

নেত্রা শেষ পর্যন্ত খেলায় জিতেছিল। আমি দুশো বাট হেরেছিলাম। কফি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেছিলাক, কোথায় থাকা হয় ?

বলেছিল সুকুমভিতে তিরিশ নং গলিতে একটা এপার্টমেন্টে ওর বন্ধুর সঙ্গে থাকে। কাজ করে এক জার্মান কম্পানিতে।

—বাবার কাছে থাকেন না কেন ?

—আমার মা মারা গেছে। বাবা আর একটা বিয়ে করেছে। তাই আর ওখানে থাকি না। তবে প্রতি শনিবার রবিবার বাবার সঙ্গে থাকি।

জিগ্যেস করলাম, মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে খেলতে আপনার আপত্তি নেই তো ?

নেত্রা হাসলো, আপত্তি থাকবে কেন ? আপনি তো ভালই খেলেন।

—তা হলে এই কার্ডটা রাখুন। শনিবার রবিবার আমার ছুটি। আমাকে একটু আগে জানিয়ে দিলেই চলে আসবো। ও ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন পর একদিন অফিস থেকে এসে চা খেয়ে স্নান করে চুপচাপ শুয়েছিলাম। ফোনটা বেজে উঠলো। অপরিচিত নারী কণ্ঠ।

ইয়েস্ অংশু স্পিকিং। হ্যা লো নেত্রা হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ্। কী করছি ? —কিছুই না। ওঃ আপনিও একা। আপত্তি না থাকলে চলে আসুন। একসঙ্গে বাইরে খাওয়া যাবে। না, না, কে আর থাকবে ! গাড়ি আছে, না নিয়ে আসবো ? ঠিক আছে, আসুন।

আধঘণ্টার মধ্যেই দরজার ঘণ্টিটা বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই সামনে হাস্যময়ী নেত্রা—চলেই এলাম।

— থ্যাঙ্কস্ সো মাচ্ ফর কামিং।

দরজার কাছে রাখা তাকে পেন্সিল হিল জুতো জোড়া খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, বেশ সুন্দর তো সাজিয়েছেন ঘরটা। সুন্দর রঙ মিলিয়েছেন দেওয়ালের, সিলিং-এর, পর্দার আর কার্পেটের, কাউচের আর মাল্টি পারপাজ ইউনিটের। ঘরের কোণায় কোণায় গাছ আর ডেস্কের ওপর বনসাইটাও খুব সুন্দর। কই বসতে বললেন না তো ?

—বসুন, বসুন, মাপ করবেন। আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনি কোনওদিন আমার বাড়িতে আসবেন। তাই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

ও একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে ফ্রকটা একটু নামিয়ে একটা সোফায় বোসলো। স্বাভাবিক ভাবেই আমার নজর গেল ওর পায়ের ওপর। নর্তকীদের মত সুন্দর আঙুলগুলো, পায়ের গড়ন বকেটের মত। পরনে নীল সিল্কের ফ্রক, চোখের পাতা হাল্কা নীলাভ, চোখের কোণে সুর্মা টানা, ঠোঁটে খুব হাল্কা গোলাপীর ছোঁয়া, গায়ের রঙ যেন স্বর্ণ চাঁপা। আমার চোখ ওর শরীরে আটকে গেল।

ও লজ্জা পেয়ে আমার মনকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করার জন্যে বললো, ভ্যান্ গগ্ আর মোনের ঐ দুটো প্রিন্টই আমর খুব প্রিয়। দারুণ ছবি দুটো।

হেসে বললাম, পছন্দের মিল যখন-তখন মনেরও মিল পাওয়া যাবে, কি বলেন ?

—নেত্রা একটু মুখ গম্ভীর করে বললো, আপনি বলছেন, আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন, তা হলে এতদিনে একবার আমাকে ফোন করেননি কেন ? নিশ্চয় মনের মিল নেই বলেই ।

—আপনার কথা ভাবতেই বেশ ভালো লাগছিল । ফোন করার যে ইচ্ছে হয়নি তা নয় । ভয় হচ্ছিল যে যদি ফোন পেয়ে রেগে যান তা হলে তো আর দেখাই হবে না ।

—আমি কিন্তু আপনার ফোনের আশায় বসেছিলাম । পর্বত আর এলো না মহাম্মদের কাছে তাই মহাম্মদই চলে এলো । আপনার মধ্যে দেখছি কোনও সিভালরি নেই ।

—হেসে বললাম, সিভালরির যুগ তো চলে গেছে । এখন নারী স্বাধীনতার যুগ । তাই আপনার ডাকেরই অপেক্ষা করছিলাম ।

—যাক্ গে, ও নিয়ে আর তর্ক করে লাভ নেই । দুজনে এখন একান্তে বসে আছি এটাই লাভ । একক্ষুনি কিন্তু খেতে যাচ্ছি না । আপনার আপত্তি নেই তো ?

—আপত্তি থাকবে কেন ? ভালই তো । শুধু মুখে কি গল্প জমে । গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক, কি বলেন ?

—বেশ তো ।

—স্যাম্পেন চলবে ?

—আপত্তি কী ?

স্যাম্পেনের বোতল বের করলাম । এর মধ্যে পিয়ালী এসে পড়েছিল । ওকে ডেকে বললাম,—'মাগ্ মাগ্ নাম্ খ্যাঙ্গ সঙ্গ গ্লাস পাই ল্যাও' । (তাড়াতাড়ি বরফ আর দুটো গ্লাস নিয়ে এসো ।)

স্যাম্পেনের বোতলটা বরফ ভর্তি বাকেটে ডুবিয়ে রাখতেই নেত্রা বললো, এ যে প্যারিসের রেস্তোরা বানিয়ে ফেললেন ।

হেসে বললাম, আপনার মত সুন্দরী সমজদার সঙ্গিনী তো প্যারিসেই পাওয়া যায় ।

এর মধ্যে পিয়ালী পাপড় ভাজা আর কাজুবাদাম এনে রেখেছে টেবিলে । নেত্রা একটা পাঁপড় মুখে দিয়ে বললো, দারুণ তো খেতে । আমাদের কিন্তু এরকম কোনও স্ন্যাক্স নেই । কোথায় পাওয়া যায় ? আমায় কিনে দেবেন তো । তারপর দেখে এলো কিভাবে ভাজতে হয় ।

এর মধ্যে স্যাম্পেনের বোতল ঠান্ডা হয়ে গেছে । ছিপিটা ঢিলে করতেই জোর শব্দ করে উড়ে গেল । নেত্রার গ্লাসে অল্প একটু ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম ।

নেত্রা একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে কনয়সিয়ারের মত মাথা নেড়ে গ্লাসটা এগিয়ে দিলে, আমি সেটা ভর্তি করে দিলাম। নিজেও নিলাম। দুজনের গ্লাস ঠোকাঠুকি করে চিয়ারস্ বলে ঠোঁট ডোবালাম স্যাম্পেনের গ্লাসে।

— আমি আপনাকে অতীশ বলেই ডাকবো। বেশ ভালো লাগছে।

অনেকদিন বাদে স্যাম্পেন খেলাম, দারুণ। আপনি প্যারিস গেছেন ?

বললাম — না, সে সুযোগ এখনও হয়নি। আপনি গেছেন ?

-- হ্যাঁ গেছি। এমনি আর একজন ছেলের সঙ্গে বসে স্যাম্পেন খেয়েছি।

স্যাম্পেনের বোতল শেষ। নেত্রার চোখ একটু লাল হয়েছে। ঘড়ি দেখলাম, কথায় কথায় বেশ রাত হয়েছে। চলুন এবার খেতে যাওয়া যাক।

নেত্রা উঠলো। ওর পা একটু টলছে। জুতোটা কোথায় রেখেছে খুঁজে পাচ্ছে না। আমি খুজে দিলাম। পরতে গিয়ে উল্টো পা ঢোকাচ্ছে। আমি জুতোটা পরিয়ে দিলাম। পরাতে গিয়ে ওর মসৃণ পায়ে বোধহয় হাতটা থেমে গিয়েছিল।

নেত্রা মিষ্টি হেসে, 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে, আমার হাতটা অলাতো করে চেপে ধরলো।

'সয় চেট' (সাত নং গলি) দিয়ে বের হলেই সয় লুয়াঙ্গ সঙ্গ রাস্তা। ঐ রাস্তার ওপর অনেক রেস্তোঁরা। আমরা হট্ সপেতে ঢুকলাম। এখানে আমি মাঝে মাঝে এসে খাই। আমার গাড়ি থামতেই উর্দি পরা একজন, গাড়ির দরজা খুলে নমস্কার করলো। ওর কাছে গাড়ির চাবিটা দিয়ে আমরা নেমে পড়লাম।

রেস্তোঁরাটা একটা বড় চারচালা হল। বাঁশের ফালি দিয়ে সিলিং ও দেওয়ালের ভেতর দিকটা তৈরি। চেয়ার-টেবিল সব বেতের। মাঝে মাঝে টবে রাখা আছে বাঁশ গাছ।

থাইল্যাণ্ডে খুব সুন্দর সুন্দর বাঁশের আর বেতের জিনিস পাওয়া যায়, যেমন আসাম আর ত্রিপুরায়। একদিকে এক ভদ্রলোক সিন্থেসাইজার বাজাচ্ছে, আর একটি থাই মেয়ে গান করছে মাইকে। আমাকে দেখে ঘাড় নাড়লো। আমি বললাম, একটা স্প্যানিস গান হোক।

কাউণ্টারের পাশে কাঁচের বাক্সে বরফ দিয়ে রাখা বড় বড় গলদা চিংড়ি। টেবিলে রয়েছে গ্যাস বার্নার, তার সামনে একজন থাই মেয়ে কিমোনো পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা পাশ দিয়ে তখন যাচ্ছিলাম, যখন মেয়েটি কোমর বাঁকিয়ে বললো, 'আরিয়াতো'। নেত্রাকে জিজ্ঞেস করলাম। চলবে নাকি জাপানি ?

ও ঘাড় নাড়লো।

চেনা ওয়েইটার দৌড়ে এসে আমাদের বসালো। মেনু কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে আমার দিকে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাঁসি দিল। ও সবসময় আমাকে একা আসতেই দেখে। মেয়েলি গলায় বললো, 'ফুয়িঙ্গ সু-যা-ই' (বান্ধবী খুব সুন্দরী) ড্রিঙ্ক কি দেবো ?

আমি বললাম, আর ড্রিঙ্ক নয়। তুমি খাবার নিয়ে এসো। কি খাবেন ? আপনিই অর্ডার দিন।

নেত্রা মেনু কার্ডটার উপর নজর বুলিয়ে বললো, থাই আর জাপানি বাদ দিলে তো থাকে চাইনিজ—তাহলে তাই হোক। আপত্তি নেই তো?

—আমি সর্বভুক। খাবার পেলেই হলো। আপনার যা অভিরুচি তাই অর্ডার দিন।

অর্ডার নিয়ে কোমর বাঁকিয়ে মেয়েলি ঢং-এ ওয়েইটার চলে গেল।

আমি নেত্রাকে জিজ্ঞেস করলাম ওকে দেখেছেন? ওর ঠোঁটে লিপস্টিক, কানে দুল, লম্বা চুল। ওরকম সেজেছে কেন বলুন তো?

নেত্রা একটু সলজ্জ হেসে বললো, কেন আপনি জানেন না? ও সমকামি। আমাদের এখানে এ রকম অনেক দেখতে পাবেন। এরা 'কাটাও' ট্রান্স ভেস্টাইট।

খাবার এসে গেল। সুপ, নুডল্, চিংড়ি মাছ আর একটা মাংস—কি মাংস বুঝতে পারছিলাম না।

—কি সিলেকসান ঠিক আছে তো?

—পার্ফেক্ট্। চিংড়ি মাছ হলে আমার আর কিছু লাগে না। আচ্ছা আপনি তো অনেকদিন বিদেশে ছিলেন কৈশোর থেকে যৌবনোদ্গম পর্যন্ত যে সময়টায় মানুষের মনোভাব জমাট বাঁধে। সেই জমাটবাঁধা ভাবধারা নিয়ে এখানে আপনার কি রকম লাগে?

—আপনার প্রশ্নটা কিন্তু অদ্ভুত। যাইহোক প্রথমত এটা আমার দেশ। এখানে আমি সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন নই। দ্বিতীয়ত এখানে সব ভাবধারা নিয়েই অনায়াসে থাকা যায়। পাশ্চাত্যের ডিস্কো, পাব্ ফাস্ট ফুড্—বিগ ম্যাক, কেনটাকি চিকেন, পিটজা হাট, ডো নাট্ খেলাধুলোর জন্য স্পোর্টস্ ক্লাব, রেস কোর্স, সোসাইলাইজ করার জন্য নানান ধরনের নানান স্তরের ক্লাব, সমুদ্র সৈকত, পাহাড়, পরিচ্ছন্ন ডিপার্টমেন্টাল, স্টোর, ফুডল্যান্ড। আবার প্রাচ্যের ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়ে মন্দির, পায়ে কাদা লাগা মাছ শব্জির বাজার, যেখানে দরাদরি করে কেনাকাটি করা চলে ব্যাঙরাথ, প্রাতুনাম, পাওরাট। ঐ রকমটা আর কোথায় পাবেন?

—এটা ঠিকই বলেছেন। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, শিক্ষিত মেয়েরা বিদেশিদের একটু এড়িয়ে চলে।

ও একটু মুচকী হাসলো। চেষ্টা করেছিলেন বুঝি?

—তা করেছিলাম বৈকী। সেই ধারণার বসেই আপনাকে ফোন করিনি।

—কেন? এখানকার মেয়েদের তো পৃথিবীজোড়া বদনাম, যে ওরা সহজলভ্য। দেখেন না রাস্তাঘাটে সব টুরিস্টদের হাত ধরে চলেছে এ দেশি মেয়েরা।

—তারা সব অন্য ধরনের মেয়ে। তাদেরও কিন্তু রাস্তায় কোনও অশালীন ব্যবহার করতে দেখিনি, যেমন দেখেছি ইংলন্ডে। তাদেরও দেখেছি সকালে পরিচ্ছন্ন হয়ে মন্দিরে উপাসনা করতে, সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা দিতে সশ্রদ্ধভাবে।

—তা ঠিক। আমরা সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়াকে পুন্য সঞ্চয় বলে মনে করি।

আমরা বিশ্বাস করি যে এমনি পুন্য সঞ্চয় করলে পরজন্মে সুখি পরিবারে জন্মগ্রহণ করবো। অখন আর শরীর বিকিয়ে গ্রাসাচ্ছদনের বন্দোবস্ত করতে হবে না।

আপনি সেদিন বললেন, যে এক বান্ধবীর সঙ্গে থাকেন। বান্ধবী কি করেন?

—কাজ করে।

কোনও বন্ধুর সঙ্গে ও তো থাকতে পারতেন?

—তা পারতাম। সে রকম বন্ধু পাইনি তাই।

—আপনার বন্ধুর অভাব হবে ভাবতেই পারছি না।

—আলাপ করার লোক পাওয়া যায়, কিন্তু তারা বন্ধু নয়। বন্ধু হতে হলে মনের মিল চাই।

—আমার সঙ্গে আলাপ করে কি মনে হচ্ছে যে আমি সে রকম বন্ধু হতে পারি?

—তা কি করে বলবো। আরও কিছুদিন যাক। আপনি কিন্তু এবার ফোন করবেন। আমিও করবো। হুট্ করে চলেও আসতে পারি। বিব্রত হবেন না তো?

—কি যে বলেন? খুব খুশি হবো এলে। আজ সন্ধ্যেটা খুব সুন্দর কাটলো।

—চলুন এবার ওঠা যাক। আমার বন্ধবীটি আবার চিন্তা করতে বসবে।

বাড়ির চত্বরে এসে বললাম, একটা নাইট ক্যাপ্ হবে নাকি?

—আর একদিনের জন্য ওটা তোলা থাক।

ওর গাড়িতে উঠে হাত ধরে বললো, থ্যাংকস ফর ওয়াণ্ডারফুল ইভিনিং।

হ্যাভ এ সুইট ড্রিম।

॥ ১৪ ॥

ব্যাংকক পোস্ট কাগজে প্রায় রোজই এক প্রৌঢ়ের ছোট্ট ছবি থাকে আর তার নীচে লেখা থাকে, পঞ্চাশ বছরের রান্নায় অভিজ্ঞ সোনালীচাচা আপনার জন্যে রাঁধেন ভারতীয়, পাকিস্থানি ও ইংলিশ খাবার। একবার এলেই বারবার আসতে হবে। সোনালীচাচা নিউ রোড। ফোন নং—

একদিন ফোনটা তুলে নম্বর টিপলাম।

ওদিক থেকে উত্তর এলো, ইয়েস, মী সোনালীচাচা। বক্ হু? কে?

কিছু শব্দ ইংরেজি, কিছু থাই, কিছু বাংলা, কিছু হিন্দি সত্যিকারের খিঁচুড়ি ভাষা বোধ হয় একেই বলে।

—চাচা, আই এম অতীশ রায়।

—আরে আরে, তাই কন্। আপনে বাঙালী। কন্, কী খবর?

— আপনার ওখানে আজ খেতে যাবো।

— নিশ্চয়, নিশ্চয়। আটটায় চইল্যা আসেন।

সুরিওয়াঙ্গশ্রী রোড দিয়ে নিউ রোডে বাঁ দিকে বাঁক নিলেই দেখা যাবে গলির মুখে একটা সাইনবোর্ড রাখা আছে, দিস্ ওয়ে সোনালীচাচা।

নির্দেশানুসারে পেঁছে গেলাম। দোকানের সামনে মস্তবড় দুটো কারুকার্য করা চিনামাটির গামলায় এরিকা পাম্। থাই কারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দরজাটা ঠেলে ঢুকতেই লোকের গুঞ্জন কানে এল। নানান ভাষায় - হিন্দি, উর্দু, ইংলিশ, বাঙ্গাল থাই। সাজসজ্জায় লালের আধিক্য, চিনে হোটেলের মত। ওয়েইট্রেসদের পরনে লাল সালোয়ার কামিজ।

দরজার পাশে কাউন্টারের সামনে বসে আছেন নাক চ্যাপ্টা এক মহিলা আর তার পাশেই বার। মোটাসোটা কালো এক ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে তদারকি করছেন। দরজার কাছে আমাকে ইতস্তত করতে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, আপনেই কি অতীশ রায়।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নমস্কার করে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত চাচা।

আমার হাত ধরে বারের কাছে এসে বললেন, একটু বইতে হইবো। ততক্ষনে একটু গলা ভিজাইয়া লন। কি দিমু কন্? টিম্ ইন্কো ড্রিঙ্ক প্লিজ্।

আমি বললাম, জিন টনিক বরফ দিয়ে।

চাচা চোখ প্রায় কপালে তুলে ফেললেন, কন্ কী? ওইটা তো মাইয়া লোকে খায়। স্কচ্ হুইস্কি আছে। টিম্ হুইস্কি সোডা। হামারা লিয়ে কিপ্ ওয়ান হুইস্কি। আমি আইতেছি।

চাচা আবার তদারকি আরম্ভ করেছেন তার নিজস্ব খিঁচুড়ি ভাষায় হাঁকডাক দিয়ে - তন্দুনি চিকেন হিয়ার, মতি ভাইরে একটা চিতল মাছ দাও, ফুড গুড, ইউ লাইক, কাম ফিন্, গুড নাইট।

আমি হুইস্কির গ্লাসটা হাতে নিয়ে টুলটা ঘুরিয়ে এই সবই দেখছিলাম আর শুনছিলাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার যে থাই মেয়েগুলো ঠিক ঠিক বুঝে ওর হুকুম তামিল করছিল। খাওয়া হয়ে গেলে প্লেট তুলে নিচ্ছিল। প্যাঁচামুখির কাছ থেকে বিল লিখিয়ে বাইন্ডারের মধ্যে ঢুকিয়ে মুখশুদ্ধির সঙ্গে ট্রে করে নিয়ে গ্রাহকদের সামনে রেখে আসছিল। খাপখুন খ্রাপ বলে পয়সা আর বকশিষ তুলে নিচ্ছিল। ওরা সমসময়ই ছুটোছুটি করছে। দম্ ফেলার সময় নেই।

চাচা এসে ওনার গ্লাসটায় একটা চুমুক দিয়ে বললেন, চলেন, একটা টেবুল খালি হইছে।

আমাকে বসিয়ে বললেন, কি খাইবেন? বাঙ্গালী রান্না তো?

— হ্যাঁ, বাঙ্গালী রান্না খেতেই তো এসেছি। শুনতে পেলাম চিতল মাছ আছে। ওটা অনেকদিন খাওয়া হয়নি। এখানে চিতল মাছ পাওয়া যায় তা তো জানতামই না।

চাচা এর মধ্যে একটি মেয়েকে বলে দিলেন কি কি খাবার এ টেবিলে দেবে। আমার উল্টো দিকের একটা চেয়ার টেনে বসে গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে আবার একটি মেয়েকে ডেকে বললেন, লাউ চিংড়িটাও এইখানে লইয়া আসো। বুঝলেন, এটা আমার নিজের লেইগ্যা বানাইছি। অত মাছ, মাংস খাইতে আমার ভালো লাগে না।

আমি হেসে বললাম, আচ্ছা চাচা, আপনার কথা ওরা বোঝে কি করে?

—ক্যান, আমার লগে ওরা প্রায় দশ বছর ধইরা কাম্ করতে আছে। আমার লগে সারাদিন কাম করে। আমার এইখানেই থাকে। শিখবো না ক্যান্?

জামাই আদরের খাওয়া– জেসমিন্ চালের ভাত আর তার চারদিকে গোটা ছয়েক প্লেট—চিংড়ি দিয়ে লাউঘণ্ট, একটা মস্ত কৈ তেলে ভাসছে, চেতল মাছের পেটি প্লেট ছাড়িয়ে গেছে, মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, চাটনি।

—আপনার রান্না করে কে?

· আগো সব শিখাইছি, তবুও দাঁড়াইয়া থাকতে হয় সামনে। আরে মশাই, হাত দিয়া খান। কাঁটা চামচ দিয়া কি কৈ মাছ খাওয়া যায়, না খাওনের স্বোয়াদ্ পাওয়া যায়।

চেটেপুটে খেয়ে বললাম, দারুণ রান্না হয়েছে। কোথায় শিখলেন?

—সে অনেক কথা। জানেন, আমি মাউণ্টব্যাটেনের কুক্ আছিলাম। নেহেরু আমরে ছাড়লো না। তার মাইয়া ইন্দিরার আবার জিভে আছিল বাঙ্গালী রান্নার স্বোয়াদ। ঐ মাইয়া তো শান্তিনিকেতনে আছিল এক বছর।

—চাচা, এই রান্না তো মুসলমানি রান্না নয়। বাঙ্গাল মুসলমানরা তো সবটাতেই পেঁয়াজ দেয়। আপনার কোনও রান্নায় তো পেঁয়াজ নেই।

পান-দোক্তার ছোপে কালো দাঁত বের করে হেঁসে বললেন, আরে আমারে বুঝি মুসলমান ভাবছেন? আমি খাঁটি হিন্দু। আমার আসল নাম, ননীগোপাল বসু।

—তাহলে চাচা নাম দিয়েছেন কেন?

—এটা হইল একটা ব্যাবসার চাল, আপনারা ইংরেজিতে য্যান কী কন্ মনে পড়ছে গিমিক্। বাঙ্গালাদেশীরা ভাবে আমি চাচা আর ভারতীয়রা ভাবে আমি হইলাম সোনালী। খাড়োন আর এক গ্লাস মদ লইয়া আসি।

কিছুক্ষণ পর খালি গ্লাসটা নিয়ে ফিরে এলেন গোমড়া মুখে। না, পারলাম না ফাঁকি দিতে। ধইর‍্যা ফালাইছে আমার গিন্নি। আর এক গ্লাস কিছুতেই দিল না।

—আপনার গিন্নি কোথায়?

—ঐ যে কাউণ্টারে বইয়া আছে। পয়সার হিসাব টিসাব আমার আসে না।

—আপনার বুঝি এক গ্লাসের বেশি খাওয়া বারন?

—আর কন্ ক্যান্? একবার মদ গিল্লা অজ্ঞান হইয়া গেছিলাম। হাসপাতালে থাকতে হইছিল এক মাস। একটা কিডনি বাদ দিয়া দিছে। একদম খাওয়া বারন।

আরও দুজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়াতে, চাচা উঠে গেলেন।

একটু পরেই এসে বললেন, কিছু যদি মনে না করেন, তা হইলে আপনার টেবিলে ওনাগো বসাই। আমার অনেকদিনের পুরানো খৈন্দার।

আমার সম্মতি নিয়ে ওদের বসিয়ে চলে গেলেন খাবার ব্যবস্থা করতে।

ভদ্রলোক দুজন বসেই ব্যবসার কথা আরম্ভ করলেন। দুজনেই বাঙ্গলাদেশী।

-- আরে ফনী ভাই, কাপড়ের দাম তো দেখি অনেক বাইয়া গ্যাছে এইখানে। এই দামে কিনলে তো পোসাইবো না। আমি তো হালায় খুব কম দামে অর্ডার নিছি।

আর এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কত কইর‍্যা নিছস?

—তিন হংকং ডলার, জামাপিছু।

ফনীভাই বললেন, দ্যাখ্ কান্ডটা, ঐ ব্যাটা তিন হংকং ডলারে আমাগো থিকা কিন্যা মেড ইন্ হংকং লেবেল লাগাইয়া আমেরিকায় বিক্রি কোরবো তিন আমেরিকান ডলারে, মানে ডবল দামে। ঐ চিনা ব্যাটার কামটা কি?

প্রথম ব্যক্তি– কাম্ হইলো অর্ডার ধরন, আমাগো থিকা মাল বুইঝ্যা লওন আর ছাপ মাইর‍্যা চালান দিয়া লাভ করোন। চল ফনী একবার আমেরিকায় গিয়া ডাইরেক্ট অর্ডার লইয়া আসি।

চাচা একজন ওয়েইট্রেসের হাতে খাবার নিয়ে হৈ হৈ করে এসে উপস্থিত হলেন। লও ফনী খাও। মতি তুমি ক্যান্ অনেকদিন পর আইলা?

—হ, চাচা। অনেকদিন পরই। আইলে তো দ্যাখতেই পাইতেন। আমাগো খাওয়া তো এইখানে বান্ধা।

চাচা হেসে বললেন, আর থাকন্ তো বান্ধা আছে পাওরাটে সর্দারজির গেস্ট্ হাউজে।

—ঠিকই কইছেন।

চাচা আবার হেসে বললেন, আর কি কি বাঁধা আছে এইখানে?

—হেইডা আপনারে কওন জাইবো না।

চাচা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসগোল্লার পায়েস খাইবেন তো? খুব ভালো পায়েস হইছে। চীৎকার করে বললেন ওর স্টুয়ার্ডকে, একটা রসগোল্লার পায়েস লইয়া আসো।

পায়েস এলো। দুটো বড় বড় রাজভোগ ক্ষীরের মধ্যে ডুবে আছে।

ফনী বললো, হায় কপাল আপনে বাঙ্গলী। নামটা কী?

নামটা জেনে দুজনেই বলে উঠলো, সেলাম, অতীশবাবু। আপনি পদ্মার এই পারের না ঐ পারের?

--ছিলাম আপনাদের পাড়ে এখন অন্য পাড়ে।

—যেই পাড়েরই হন্ না ক্যান্ বাঙ্গালী তো, তা হইলেই হইল।

মতি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, ফনী ন'টা বাইজ্যা গেল, তাড়াতাড়ি খা।

মনে নাই দশটায় ঐ ফ্রেইন্ডস্ এসকর্টের মাইয়্যা দুইটা আইবো। আমি তো ডেইজিরে আইথে কইছি।

· ত্র সব সময় তারেই পছন্দ।

—হ। ও আমারে জানে, আমি ওরে জানি। তাতে অনেক সুবিধা। ঝকমারি কম।

কোনও মতে খাওয়া শেষ করে ওরা উঠে পড়লো।

—আইচ্ছা দাদা চলি। ইনসা আল্লা।

চাচার পায়ে খুরু, সব সময়ই ঘুরছে, এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে। কাউকে আপ্যায়ণ করে বসাচ্ছে, কাউকে জিজ্ঞেস করছে আর কি লাগবে, কারও সঙ্গে দুটো খোস গল্প করছে। বুঝতে পারলাম শুধু ভালো খাবারের জন্য খরিদ্দাররা বারবার এখানে আসে না, আসে পার্সোনালাইজড্ সার্ভিসের জন্য।

চাচা আবার কাছে এলে বললাম, আপনার দেখছি ক্লান্তি নেই?

—ক্লান্ত হইলে চলবো ক্যামথে? আমার কাম শুরু হয় সকাল ছটার থিকা। প্রথমে বাঙ্গপ্রা বাজারে যাই, তারপর কি কি রান্না হইবো, কত রান্না হইবো কইয়া জলখাবার খাইয়া একটু বিশ্রাম, তারপর চান কইর‍্যা নামি নীচে রান্নার তদারকি করতে করতেই লাঞ্চের ভীড় শুরু। আবার চাইরটা থিকা ডিউটি আরম্ভ হয়। শুইতে শুইতে সেই বারোটা। ছুটি নাই একদিনও। তবে মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে যাই একটু বিশ্রাম লইতে। বয়েস তো হইল।

—গ্রামে বুঝি বাড়ি আছে? আপনার বয়স কত হলো?

—হঃ গ্রামে বাড়ি আছে, পুকুর আছে, ধানের জমিও আছে কিছু। বয়েস তা সত্তুর পার হইয়া গ্যাছে। চলেন একদিন আমার লগে গ্রামে।

—আমাকে আগের থেকে খবর দেবেন, নিশ্চয়ই যাবো। এই কার্ডটা রাখুন।

বিলটা দিয়ে গেছে একটি মেয়ে। চাচা সেটা তুলে বললেন, ড্রিঙ্কের দামটা বাদ দিয়া পয়সা দেন। ঐটা আমার আপ্যায়ণ।

—আচ্ছা চাচা, আজ চলি। খুব ভালো খেলাম।

—আবার আইবেন। আমার গ্রামের বাড়িতে লইয়া যামু কিন্তু।

॥ ১৫ ॥

সন্ধ্যার সময় শুয়ে শুয়ে হ্যারল্ড রবিনসের 'দি ড্রিম মার্চেন্ট্' বইটা পড়ছিলাম। বেশ জমে উঠেছে গল্পটা। তখন চলচ্চিত্রের শিশুকাল। হলিউড তখনও হয়নি। দৈবদুর্বিপাকে ওর জন্ম। ম্যাগ্নাম পিকচার্স তাড়া খেয়ে নিউইয়র্ক থেকে পালিয়েছিল হলিউডে। হলিউডের সুবিধে সারা মাসেই বাইরে সুটিং করা যায়; অঢেল ফাঁকা জায়গা সস্তায় পাওয়া যায়। আমেরিকায় প্রথম নয় রিলের ছবি ব্যান্ডিট্, তৈরি করেছিল ম্যাগ্নাম্ পিকচার্স। এই ম্যাগ্নাম্ পিকচার্সের উন্নতির মূলে ছিল পরাশ্রিত এক অনাথ বালকের অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম আর দূরদৃষ্টি। আমেরিকার অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান এই ভাবেই শুরু হয়েছিল।

ফোনটা বেজে উঠলো। খুব উৎসাহের সঙ্গে ফোনটা তুললাম। ভেবেছিলাম নেত্রার ফোন। গলা শুনে বুঝলাম অন্য কেউ।

—হ্যালো, ইয়েস অতীশ স্পিকিং।

অন্যদিক থেকে হাসির আওয়াজের সঙ্গে কথা ভেসে এলো, 'বক্ যম্ ছু আরাই' (বলো তো আমার নাম কি)?

—'মাই ডাই' (বলতে পারবো না)।

—'মাই সাপ্' (বুঝতে পারছেন না), বুদ্ধমন্দির দেখেছিলেন কার সাথে?

—ও তুমি উধম্।

—বাব্বা, এতক্ষণে চিনলেন।

—আমার বাড়ির ফোন নং কোথায় পেলে?

—তা বলবো কেন? যোগাড় করতে হয় মশাই। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। ব্যাংককের সব দেখা হয়ে গেছে?

—সেই যে দেখেছি, তারপর আর কিছুই নয়।

—মিথ্যা কথা বলবেন না। পতপঙ্গ দেখেননি?

—সেটা তো দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে না।

—সেটাই তো এখানকার প্রধান আকর্ষণ।

ফ্লোটিং মার্কেট আর ওয়াট্ অরুণ দেখেছেন?

—না।

—কাল যাবেন?

—যদি তুমি নিয়ে যাও।

—ঠিক আছে। আমি সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আপনার বাড়িতে পেঁছে যাবো। ঠীকানাটা দিন, আর একটু পথের নির্দেশ।

—ইউলাঙ্গ এপার্টমেন্ট। ফ্ল্যাট টু / সি। নন্গলয় সামপায়েট সয়টন্সন্, প্রয়েনচিট রোড। প্রয়েনচিট রোডের সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের উল্টো দিকেই সয়টন্সনের শেষ মাথায় এই বাড়িটা। আমি তৈরি থাকবো।

—ঠিক আছে, কাল দেখা হবে।

আজ পিয়ালী নেই। এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। উঠে নিজেই বেড্-টী খেয়ে তৈরি হয়ে, দুটো ডিম ভেজে রাখলাম। কফির দুধ আর জল ও স্টোভে বসিয়ে দিলাম। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ও এসে পড়লো। বেশ সুন্দর সেজেছে। মিষ্টি দেখাচ্ছিল।

—কি করছেন ?

—তুমি বসো। আমি ব্রেকফার্স্টটা করে আনছি।

—আপনি বরং বসুন, আমি করে আনছি। আমায় একটু দেখিয়ে দিন কোথায় কি আছে।

টোস্ট করে মাখন লাগিয়ে অমলেট, ফলের রস, কফি বানিয়ে সুন্দর সাজিয়ে নিয়ে এলো ট্রেতে। কোথাও জড়তা নেই।

খাওয়া হয়ে গেলে বললো, চলুন এবার।

—চলো, গাড়ির চাবিটা নিয়ে নেই।

—গাড়ি নিয়ে কি করবেন ? আমরা তো নদীর ঘাটে যাবো। ঘাটের কাছে পার্কিং-এর জায়গা পাওয়া মুস্কিল হবে। একটা টুকটুক্ নিলেই হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম নদীর ঘাটে কারণ ট্রাফিক জ্যাম এখনও শুরু হয়নি। ঘাটের পথে খাবারের দোকান সব সাজানো হচ্ছে। ভ্যানে করে দোকানদাররা মালপত্র নিয়ে এসেছে। রান্নার জিনিস ছাড়াও আছে বসবার হাল্কা চেয়ার, প্লাস্টিকের বালতিও আছে নোংরা ফেলার জন্যে। রাত্রে যাবার সময় এরা ফুটপাথ ধুয়ে পরিষ্কার করে নোংরা সব গারবেজ বিনে ফেলে সব জিনিসপত্র ভ্যানে তুলে নিয়ে যাবে। গ্রাহকদের মাথায় ছায়া ধরার জন্যে রয়েছে বড় বড় রঙ্গিন ছাতা। আমাদের দেশের মত দড়ি দিয়ে নীল প্লাস্টিকের চাদর টাঙানো নেই কোথাও। উনুনের ধোঁয়া নেই। খাবারের পাশে নোংরা নেই। অনেক মধ্যবিত্ত থাইরাও এই ফুটপাথ থেকে খাবার প্লাস্টিকের ঠোঙ্গায় করে কিনে নিয়ে যায় বাড়ি ফেরার পথে।

ঘাটের জেঠিতে পৌঁছতেই কয়েকজন নৌকোওয়ালা উধমকে ঘিরে ধরলো। ওদের সঙ্গে দরাদরি করে একটা নৌকো ঠিক করা হলো। যাওয়া-আসা পাঁচশো বাট।

দুজন মেমসাহেব টুরিস্টকেও নৌকোওয়ালা ঘিরে ধরেছে। ওরা সবাই মিলে কথা বলছে কিন্তু কেউ কারো কথা বুঝতে পারছে না। মেমসাহেবরা হাত মুখ নাড়ছে, নৌকোওয়ালারা সোরগোল করছে—ভাবছে একটা মুরগি পাওয়া গেছে।

আমি ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবেন ? ফ্লোটিং মার্কেট তো ?

একজন উত্তর করলো—হ্যাঁ, সেখানেই তো যাবো।

—তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন ইচ্ছে করলে।

—তাহলে তো খুব ভালো হয়। আমাদের কত দিতে হবে?

— তিনশো বাট দেবেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ। ওরা হাজার বাট বলছিল। দারুণ সস্তা পড়লো আমাদের।

উধম আমার গায়ে চিমটি কেটে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, আমার গাইড ফিটার কথা বলুন।

আমি তখন মেমসাহেবদের বললাম, দেখুন, আমার সঙ্গের এই মেয়েটি গাইড, ও বলছে যে ওর কিছু ফি আপনাদের দিতে হবে।

— নিশ্চয়, কত বলুন?

—উধমকে জিজ্ঞেস করে বললাম, চারশো বাট।

—দারুণ ভালো হলো, সাতশো বাটে নৌকোর ওপর উপরি পেলাম সঙ্গি আর গাইড, তা হাতে রইলো তিনশো বাট। আমার হাত ঝাকুনি দিয়ে থ্যাঙ্ক ইউ বলে বললো, আমি ডোরা আর ও হচ্ছে লিন্ডা। লিন্ডা হেসে হ্যান্ডসেক করলো।

মাঝি ততক্ষণে নৌকোর পেছনে লাগানো ছোট্ট পেট্রল ইঞ্জিনটা চালু করে প্রপেলার স্যাফটটা জলে নামিয়ে দিয়ে আমাদের উঠে আসতে বললো।

পানসি নৌকোর মত সরু নৌকো। আমরা মাঝখানে গিয়ে বসলাম।

ডোরাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমারা তো আমেরিকান। আমেরিকার কোথায় থাকো?

—আমরা থাকি এথেন্সে।

—এথেন্স কোথায়? সে তো গ্রিসের রাজধানী।

—জর্জিয়ায় ছোট্ট একটা ইউনিভার্সিটি টাউন।

—তোমরা দুজনেই বুঝি বেরিয়েছো?

— হ্যাঁ, আমরা দুজনেই এক সঙ্গে থাকি। ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের সস্তায় খাওয়াই আমাদের বাড়িতে। ছুটির সময় দুজনে বেরিয়ে পড়ি দেশ দেখতে।

নৌকোটা এর মধ্যে মাঝ দরিয়ায় এসে পড়েছে। নদীর জল ঘোলাটে; বেশ স্রোত আছে। নদীর পাড় ঢেকে গেছে বাড়ি ঘরে; জলের ওপর নেমে এসেছে খুটির ওপর ভর দিয়ে।

উধম্‌ তার গাইডের কাজ আরম্ভ করলো—এটাই হচ্ছে আমাদের দেশের প্রধান নদী, আমাদের কঙ্গা গঙ্গা। এর নাম চাউপিয়াও। প্রাণদায়িনী নদীকে আমরা বলি ম্যা-নাম্‌ (মায়ের জল)। এর এপাড়ে ব্যাংকক আর ওপাড়ে থনবুড়ি।

লঞ্চগুলি টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে বড় বড় গাদাবোট, তাতে আছে চাল, ট্যাপিওকা, চিনি, সিমেন্ট কাঠ, বালি, পাথর; সব আসছে উত্তরের গ্রামগঞ্জ থেকে। ঐ দেখুন থামাসাথ্‌ মহাবিদ্যালয়, তারপর ওরিয়েন্টাল হোটেল, এখানকার সব চাইতে নাম করা হোটেল। আমরা প্রথমে যাবো ওয়াট্‌ অরুণ দেখতে তারপর ফ্লোটিং মার্কেট।

নদীতে কোনও স্টিমার নেই, আছে এ রকম নৌকো আর গাদাবোটের দল। দাঁড়বাওয়া নৌকো নেই কোথাও।

নৌকোটা খুব জোরে মাথাটা উঁচু করে জল কেটে চলেছে। সামনে একটা ব্রীজ ব্যাংকক আর থনবুড়ির মাঝে। আমাদের নৌকোটা যখন ব্রীজের ঠিক তলায় ঢুকেছে, তখন আর একটা ওমনি নৌকো থামের আড়াল থেকে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে এলো আমাদের নৌকোর দিকে। আমাদের মাঝি ঐ নৌকোর মাঝিকে গালাগালি দিতে দিতে পুরোটা বাঁদিকে কাটালো। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলাম আমরা। লিন্ডা আর ডোরা আমায় জড়িয়ে ধরলো চীৎকার করে। জল ছিটকে আমাদের জামা-কাপড় ভিজে গেল অনেকটা।

আমি লিন্ডাকে বললাম, জোর বেঁচে গেছি। তোমরা দুজনেই সাঁতার জানো তো?

তা জানি। তবে নদীতে কখনও সাঁতার কাটিনি।

উধম কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, আমি কিন্তু জানি না। আপনারা সবাই বেঁচে যেতেন আর আমিই মরতাম।

আবীর মাখা পুবের আকাশ সাদা হয়ে এসেছে। ব্রহ্মমুহূর্ত যদিও অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে, তবুও ভালো লাগছে এই সময় নদীর বুকে ভাসতে, অজানা ভিন দেশের সঙ্গিনীদের নিয়ে।

উধম্ বললো, ঐ দেখুন সামনে ওয়াট্ অরুণ।

আমি বললাম, ওয়াট্ মঠের অপভ্রংশ আর অরুণ তো সূর্য অর্থাৎ এটা তা হলে সূর্যদেবের মন্দির।

নৌকো এসে ঘাটে ভিড়লো। বাঁধানো ঘাট। কয়েক জন বুড়ো-বুড়ি তাদের নাতি-নাতনিদের নিয়ে চান করছে। বাচ্চাগুলো ন্যাংটো হয়ে সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ছে জলে আর তাদের ঠাকুরদা আর ঠাকুমারা চীৎকার করছে। দু'জন সৌম্য সন্ন্যাসী গলা জলে দাঁড়িয়ে অরুণদেবকে নমস্কার জানাচ্ছেন, চোখবুজে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন বুদ্ধদেবের। কি অদ্ভুত ধর্মসমন্বয়।

লিন্ডা আর ডোরা ঘাটে দাঁড়িয়ে ন্যাংটো বাচ্চাদের ঝুপুর-ঝাপুর করে চান করা দেখছিল খুব মনোযোগ দিয়ে। কয়েকটা ছবিও তুলে নিল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ আবার কি দেখার আছে?

—আমাদের দেশে এ দৃশ্য দেখা যায় না। এ সব দেখতেই তো আসি এ সব দেশে।

—তোমাদের দেশেও তো সমুদ্রে সবাই চান করে প্রায় জন্মের পোশাক পরে।

– পরিবেশটা ঠিক এ রকম নয়। সেখানে বিকিনি, কালো চশমা, বড় ছাতা, শোয়ানো চেয়ার, আইসক্রিম পার্লার, মোটর বোটের আওয়াজ, কানে ওয়াকম্যান, সবটাতেই একটা কৃত্রিমতা। সময় আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় সব ব্যাপারে। এখানে সময় স্থির হয়ে থাকে। তাই এ সব জায়গায় এলে বেশ শান্তি পাওয়া যায়।

উধম্ তাড়া লাগালো, চলুন। দেরী করবেন না। বারোটার পর ফ্লোটিং মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে।

ওয়াট্ অরুণ মন্দিরের চত্বর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের স্থাপত্য ওয়াট্ বা ছেদী, যা এ পর্যন্ত দেখেছি, তার চাইতে একদমই অন্যরকম। চতুষ্কোণ মন্দির স্তরে

স্তরে উপরে ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। উঁচু বেদীর উপর মূল মন্দির 'প্রা-প্রাঙ্গ' আর তার চার কোণায় আরও চারটে ছোট 'প্রাঙ্গ' যেমন মসজিদে থাকে মিনার। স্তরে স্তরে সব পরী অথবা হনুমানের মূর্তি। নানান রঙের চিনামাটির টুকরো দিয়ে লতাপাতা আঁকা রয়েছে।

উধম্ বললো, এটা কিন্তু আসলে একটা স্তূপ। এ মন্দির শেষ হয়েছে মাত্র একশো বছর আগে। পাশে যে ওয়াট দেখছেন, ওখানে আগে এমারেল্ড বুদ্ধ ছিল।

ডোরা তার ক্যামেরা বের করে মন্দিরের ছবি তুলে আমাদের দুজনেরও তুললো। আমিও তুললাম।

লিণ্ডা বললো, মন্দিরটা বেশ সুন্দর, তাই না অতীশ? আচ্ছা অরুণ কি বুদ্ধদেবের কোনও শিষ্য?

—না, না। অরুণ হলো সূর্য, আমাদের জীবন, আমাদের শক্তি। তাই আমরা সূর্যোদয়ের সময় তাকে প্রণাম জানাই। প্রকৃতিও তাকে স্বাগত জানায় পাখিদের গান দিয়ে, গাছের পাতা শিরশিরে হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে। এখানকার সন্ন্যাসীরাও অরুণদেবকে প্রণাম জানিয়ে তাদের পূজোপাঠ আরম্ভ করে।

উধম্ বললো, আপনি তো দেখছি, আমার থেকে অনেক বেশী জানেন। আপনি যা বললেন, তা আমি সব নোট করে নিয়েছি। আমার কাজে লাগবে।

মন্দিরের ভেতরে বুদ্ধমূর্তি সোনার পাতে মোড়া।

লিণ্ডা বললো, আপনাদের সঙ্গে এসে খুব ভালো হলো। শুধু ভালো করে দেখতেই পারছি তা নয় আমাদের বুঝতেও সুবিধে হচ্ছে এই এশিয়ার কৃষ্টি। এই কৃষ্টি আমাদের থেকে এতই আলাদা যে আমাদের বুঝতে একটু কষ্ট হয় যদি না এ রকম করে কেউ ব্যাখ্যা করে দেয়। অনেক ধন্যবাদ, অতীশ।

উধম বুদ্ধদেবের মূর্তির কাছে ধূপ আর দীপ জ্বালিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললো, চলুন মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করে আসি। মন্দিরের চারদিকে দেওয়াল ঘেসে আছে সন্ন্যাসীদের থাকবার ঘর। সন্ন্যাসীরা সবাই তাদের ঘরের সামনের বারান্দায় বসে ত্রিপিটক পড়ছে। মন্দির প্রাঙ্গণে ঢোকবার চারটে প্রবেশ দ্বার মূল মন্দিরের ঢঙেই তৈরি, শুধু আকারে ছোট। আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়, মন্দিরটা উড়িষ্যার মন্দিরের মত নয়, দক্ষিণাত্যের মন্দিরের ঢং-এ তৈরি।

ডোরা বললো, আচ্ছা উধম মন্দিরটা কত উঁচু হবে?

—প্রায় ছাব্বিশতলা বাড়ির সমান হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, উধম্, মন্দিরের মাথায় ওটা কি বল তো?

—ওটা তিনশূল (ত্রিশূল)।

আমি আবার বললাম জানো উধম্, তোমাদের এ মন্দির আমাদের দেশের মন্দিরের ঢং-এ তৈরি।

—তা তো জানি না। এটুকুই জানি যে এ রকমের প্যাগোড়া আছে কম্বোডিয়ায়। নদীর পাড়ে এসে উধম বললো, এই যে বড় নৌকোটা দেখছেন এতে ষাটজন দাঁড়ী

দাঁড় বায়। এই নৌকোটার নাম 'শুভণ্যাঅহম্'। সম্রাটরা এই নৌকো ব্যবহার করতেন অতীতে। এখন বছরে একবার জলোৎসবের সময় বের করা হয়।

উধমের তারা খেয়ে আমরা আমাদের নৌকোয় এসে বসলাম। নৌকো এবার চলেছে ফ্লোটিং মার্কেটের পথে। মাঝি পাঁড় কি মরি করে নৌকো চালাচ্ছে। উধম আমায় জড়িয়ে ধরে বসেছে আর চীৎকার করে মাঝিকে আস্তে চালাতে বলছে। মাঝির তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নাই। দূরে বন্দরের জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছে।

নদী ছেড়ে এবার নৌকো এক শান্ত খালে ঢুকলো। খালের ধারে বাড়িগুলো ঝুলে পড়েছে খালের জলে। খুঁটিতে বাঁধা আছে ছোট্ট নৌকো। বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এসেছে কাঠের সিঁড়ি জল অবধি। বারান্দায় বড় বড় জালা তাতে রাখা আছে খাবার জল।

গাইড তার কাজে লেগে গেল, এই যে খাল দেখছেন এমনি খাল ছিল এক সময় সারা ব্যাংককে। তখন বাড়ি-ঘরগুলো এই রকমই ছিল। বাজার বসতো নৌকোয়, বিক্রেতাও নৌকোয় আর গ্রাহকরাও নৌকোয়।

লিন্ডা বললো, প্রাতুনাম বাজার আর রবিনসন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মাঝেই কেবল একটা নোংরা খাল দেখেছি, কই আর কোথাও তো কোনও খাল দেখিনি।

—সে সব খাল বুজিয়েই তো সব রাস্তা তৈরি হয়েছে—সয় লুয়াঙ্গ সুয়াং, থানন্ (রোড), সাথন্ আর নিউ রোড তো কিছুদিন আগেও খাল ছিল।

মেয়েরা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত—নদীর জলে বাসন মাজছে, কাপড় কাচছে, স্নান করছে। কর্তারা খালি গায়ে বারান্দায় বসে আছে। পাশে কুকুরটা কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। আর একটু এগোতেই দেখা গেল ছোট ছোট নৌকোর ওপর শাক্-শব্জি, চাল, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম বিক্রী হচ্ছে। মাঝি বলতে যে মহিলা বাঁশের টুপি মাথায় দিয়ে লুঙ্গি আর ব্লাউজ গায়ে নৌকো চালাচ্ছে, সেই আবার তার বেসাতি বিক্রী করছে। নৌকোতে খাবারের দোকানও আছে। গ্রাহকরা কেউ নৌকো করে কেউ বা পাড়ে দাঁড়িয়ে বা বাড়ি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাঁর বাঁধা নৌকোটার ওপর দাঁড়িয়ে জিনিস কিনছে।

একটি মেয়ে আমাদের নৌকোর পাশে এসে একগুচ্ছ অর্কিড ফুল এগিয়ে রাঙানো ঠোঁটে হেসে বললো, সাহেব ফুল নিন, ফুইঙদের জন্যে।

সুন্দর মুখেরই সর্বত্র জয়, ফুল কিনে তিনজনকেই একগুচ্ছ করে দিলাম।

লিন্ডা বললো, আমি ভেনিসের খাল দেখেছি, দেখেছি আমস্টার্ডামে কিন্তু কোথাও এই রকম ভাসমান বাজার দেখিনি।

তাহলে তুমি কশ্মীরে কখনও যাওনি। ওখানে গেলে দেখতে পেতে নৌকো সাজিয়ে জিনিস নিয়ে এর ওর হাউজবোটে ফেরি করছে। ফুলের মত টুকটুকে মেয়েরা এক ঝাঁক ফুল নিয়ে হাউজ বোটের গায়ে শিকারাটা লাগিয়ে বলে, সাহেব ফুল লিজিয়ে গা? লিজিয়ে না? ওরা এত সুন্দর দেখতে যে আমি ভাবছিলাম যে, ফুল সুন্দর না মেয়েটি সুন্দর।

ডোরা হেসে বললো, আপনি যখন গিয়েছিলেন, নিশ্চয় তখন ছিলেন. অবিবাহিত, তাই ভাবছিলেন ফুলের বদলে ওকে পেলেই বেশ ভালো হয়, তাই না ?

—আমি কিন্তু এখনও ব্যাচেলার। জানো আর একদিন এসেছিল শালওয়ালা, অনেক সুন্দর সুন্দর শাল নিয়ে নৌকো করে। আমি ছিলাম ডাল্ লেকে হাউজবোটে।

—শাল কী ?

—স্কার্ফ মেয়েদের আর ছেলেদের গায়ে জড়াবার গরম কাপড়ের টুকরো। তার চারিদিকে সুন্দর এম্ব্রয়ডারি করা, হাতের কাজ। লোকটা যেন শাজাহানের মত দেখতে। মেহেদিতে রঙ করা দাড়ি, খাঁটি আর্যের চেহারা, মাথায় টুপি, পরনে জোব্বা। অনেকগুলো শাল দেখবার পর তিনটে পছন্দ করলাম। প্রথমবার দামে পোসালো না কারণ ও যা দাম বলেছিল, আমি তার অর্ধেক বলেছিলাম। ও চলে গেল।

তা হলে আর কেনা হলো না ?

— পরে আবার এসেছিল। মাঝামাঝি একটা দামে কিনেছিলাম।

— এরপর তা হলে একবার আপনাদের দেশে যেতে হবে। খুভ লোভ লাগছে আপনার কথা শুনে

ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলাম ডোরাকে, তোমরা বিয়ে করনি কেন ?

—বিয়ে না করলেও আমরা দুজনেই লিভড্ টুগেদার ফর এ কাপল অব ইয়ার্স উইথ আওয়ার ফিয়াঁসে। দেখলাম, তাতে সেক্স আছে কিন্তু ভালোবাসা নেই। ভালোবাসার জন্যে কারও সময় নেই। নিজের প্রয়োজনটাই আজকাল সবাই বড় করে দেখে। টাকার পেছনে সবাই পাগলের মত ছুটছে এ একটা র‍্যাট্ রেস্। তাই ওদের ছেড়ে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি। আমরা একে অন্যের প্রয়োজনে বুঝে সে অনুসারে এডজাস্ট করেনি। দিব্যি আছি।

নৌকো এসে সেই ঘাটে লাগলো। আমি মাঝির পাওনা চুকিয়ে কিছু বাড়তি বকশিশ দিলাম। লিন্ডা আমার আর উধমের পাওনা মিটিয়ে বললো, দারুণ লাগলো। থ্যাঙ্কস্ এ লট্। একটা হোটেলের কার্ড দিয়ে বললো, আরও দুদিন আছি এখানে। চলে আসবেন একদিন। হ্যাভ এ গুড ডে।

উধম একটা টুকটুক ঠিক করে দিল ওদের। ওরা হাত নেড়ে চলে গেল।

উধম বললো, আমি তাহলে এখান থেকেই চলে যাব, যদি আপনি অনুমতি করেন।

আমি ওকে হাজার বাট দিয়ে বললাম, এটা তোমার পড়ার খরচাবাবদ কিছু দিলাম।

ও আমার হাত ধরে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নির্বাক হয়ে। চোখের কোণায় দুটো জলের বিন্দু। অনেকক্ষণ পর বললো, 'খাপ্ খুন্ খ্রাপ'। আজ অনেক উপায় হলো। দু'মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়েছিল। আজ তা সুধতে পারবো। জানেন আমার একটা কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে। 'থাই ভাষা শেখাতে হবে বিদেশিদের। যদি পাই তাহলে রাত্রে কলেজে পড়বো।

আমাকে একটা টুকটুকে উঠিয়ে ও চলে গেল।

॥ ১৬ ॥

অফিস থেকে এসে বড্ড একা একা লাগছিল। ফোনটা তুলে আর ভাবতে হোলো না কাকে ফোন করবো। হ্যালো!

মিষ্টি গলার আওয়াজ ভেসে এলো, আমি নেত্রা বলছি। আপনি কে তাও বুঝতে পারছি।

—বলুন তো কে?

—কে আবার, অতীশ। কেমন আছেন?

—ভালো না। বড্ড একা। চলে আসুন না? খুব ব্যস্ত?

—আমিও একা। ভাসনা এখনও ফেরেনি। আমি এই মাত্র অফিস থেকে ফিরলাম। ঠিক আছে, আসছি। কিন্তু কোথায় যাবেন?

—তা ঠিক করিনি। সে ভার আপনার।

—স্নান করে জামা কাপড় ছেড়েই রওনা হচ্ছি।

আমিও স্নান করে জামা-কাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিলাম বাইরের ঘরে। আধঘণ্টার মধ্যেই দরজার বেলটা বাজলো। দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেখলাম, আমার ড্রাইভার সাকনু জিজ্ঞেস করতে এসেছে, ও থাকবে, না যাবে।

আবার কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ। আবার ছুটে গেলাম। তার আগেই চাবি দিয়ে দরজা খুললো পিয়ালী।

পিয়ালী কার্পেটের ওপর বসে কাঁদতে কাঁদতে বললো, মাস্টার আমি কাল সককাল বেলা চলে যাবো দুদিনের জন্যে মার কাছে। মার খুব অসুখ। আমায় পাঁচশো টাকা ধার দেবে মাস্টার? কী হবে মাস্টার? আমার মা মরে গেলে যে আমার কেউ থাকবে না।

আমি পকেট থেকে টাকা বের করে বললাম, তুমি আগেই ভাবছ কেন যে তোমার মা মারা যাবে। তোমার যদি আরও একদিন থাকতে হয় তা হলে থেকে এসো।

—না মাস্টার তোমাকে কে দেখবে? আমি এখন তোমার জন্যে দুদিনের রান্না করে রাখবো।

এর পর যখন আবার দরজার বেলটা বাজলো, তখন আমি আর উঠলামই না। পিয়ালীই দরজা খুলে দিল।

নেত্রা হেসে ঘরে ঢুকে বললো, অনেক কি দেরী হয়ে গেছে?

—অনেক না, তবে প্রায় এক ঘণ্টা হবে। দুবার উঠে দরজা খুলে হতাশ হয়ে এবার আর উঠিই নি।

—খুব রাগ হচ্ছিল, তাই না? কি করবো? বাবা এসেছিল। কিছুতেই উঠতে চাইছিল না। বলে চা খাওয়া। বোস আমার পাশে। অনেক করে বাবাকে বিদায় দিয়ে তবে আসছি। তারপর জুতোটা খুলে দৌড়ে এসে আমার পাশে ঘন হয়ে বসে, বলুন, কোথায় যাবেন?

—ওগো সুন্দরী, আমি যাবো সেথা, নিয়ে যাবে যেথা।

—কে সেই সুন্দরী।

--কে আবার আপনি। এমনিতেই আপনি সুন্দরী আজকে আপনাকে দেখাচ্ছে অপূর্ব। এরকম করে সেজে এলে যে সন্ন্যাসীরও ধ্যান ভেঙ্গে যাবে।

—যাক না, ক্ষতি কি? শুনুন মশায়, আজ আমরা সি ফুড রেস্তোরায় খাবো। মুড বুঝে ঠিক করা যাবে, তারপর কোথায় যাওয়া যাবে। উঠুন, আর দেরী নয়।

পাওলিয়াথিন রোডে রেস্তোরাটা। নেত্রাই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল। একটা বাগানের মধ্যে টেবিল চেয়ার পাতা। খুব ভিড়, বিদেশি টুরিস্ট রয়েছে অনেক। উর্দি পরা মেয়েরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে এত লোককে খাবার যোগাতে। স্টুয়ার্ট এসে আমাদের বসালো।

নেত্রা বললো, বলুন কি খাবেন? এখানে কিন্তু শুধু পাবেন মাছ বা ঐ জাতীয় জিনিষ।

—কি পাওয়া যায় তাতো বলবেন?

—মেনু কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন।

কার্ডে আছে ছবি তার পাশে ইংরেজি আর থাই ভাষায় নাম ···গলদা চিংড়ি, ঝিনুক, স্কুইড, অক্টোপাস, হাঙ্গরের কানকো, কাঁকড়া। আমি লিস্ট দেখে বললাম, আমি তো চিংড়ি মাছ আর সার্কফিন সুপ ছাড়া কিছুই খাইনি কখনও। অবশ্য কাঁকড়া খেয়েছি?

আজ খেয়েই দেখুন না? ঝিনুক খেতে দারুন। ঘেন্না করে খাবেন না কিন্তু। আমিই তাহলে অর্ডার দিয়ে আসি।

—অর্ডার দিতে আবার কোথায় যেতে হবে?

--ঐ যে দেখছেন কাঁচের লম্বা বাক্স টেবিলের উপর, ওখানে লিস্টে লেখা জিনিসগুলো ববফের মধ্যে রাখা আছে। তাজা জিনিস থাকলেই না অর্ডার দেবো। আপনিও আসুন না?

চিংড়ি মাছগুলো জলের নীচে হাঁটছে, ঝিনুকগুলো ঢাকনা খুলছে আর বন্ধ করছে, অক্টোপাসগুলো তাদের সুর নাড়াচ্ছে, স্কুইডগুলো জলের উপর ভেসে উঠছে আবার নেবে যাচ্ছে।

--কি, খাবেন তো? অর্ডার দিল, তম্ ইয়াম্ কুঙ্গ সুপ, চিংড়ি মাছ, অয়েস্টার আর তার সঙ্গে খাই ভাত প্লা।

—দেখুন, আমি কিন্তু কাঁচা চিংড়ি আর জ্যান্ত ওয়েস্টার খেতে পারবো না, যেমন খাচ্ছে ঐ জাপানি ভদ্রলোক।

--তবে কি ভাবে খাবেন? তা হলে তাজা জিনিসের গন্ধ আর স্বাদ পাবেন কি করে?

—না বাবা, ওটা খেতে পারবো না।

—ঠিক আছে, আপনার জন্যে ভাজা, আর আমার জন্যে তাজা

আমরা গিয়ে জায়গায় বসলাম। স্যুপ এলো।

স্যুপ মুখে দিয়েই আমি হু, হা আরম্ভ করলাম।

—কী হোলো? খুব ঝাল লাগছে বুঝি? খেতে ভালো লাগছে না?

—খেতে সত্যিই ভালো। তবে ঝালটা বড্ড বেশী। গন্ধটা অবশ্য বেশ ভালো।

—কিসের গন্ধ বলুন তো?

আগে জলটা খেয়ে নিন। গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে তারপর বললো, ওতে আছে, লেবু পাতা, তুলসি পাতা, জিঞ্জার গ্রাস, আরও কি কি যেন পাতা। আপনাদের দেশটা তো মস্ত বড়। শুনেছি আপনাদের দেশের এক এক জায়গার ভাষা এক এক রকম, খাবারও সব ভিন্ন। আপনি কোথাকার লোক বলুন তো?

—আমি বাঙ্গালী।

—আরে! আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল অক্সফোর্ডে ওর দেশও ছিল বাঙ্গলাদেশ। ওতো খুব ঝাল খেতে পারতো। ও আমাকে প্রায়ই গান শোনাতো। আপনাদের একজন নোবল লরিয়েট ছিলেন ট্যাগোর, তাঁর লেখা সব গান গাইতো, ভারি ভাল লাগতো। আপনি গান জানেন?

—জানি, যে গান শুধু আমিই শুনতে পারি। আর সে গানের সঙ্গত করার জন্য চাই সাওয়ারের জল।

—বেশ তাই শুনবো একদিন। আপনাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দেবো। বাথরুমের দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখলেই আমি শুনতে পাবো, বলে একটু হাসলো।

আমাদের টেবিলের সেবিকা এর মধ্যে দু তিন রকম সস্ দিয়ে গেছে। তারপর নিয়ে এল, এক প্লেট কাঁচা চিংড়ি আর একটা প্লেটে ভাজা।

নেত্রা ভাজা চিংড়ির প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, এই নিন আপনার ভাজা। কাচা চিংড়ির একটা টুকরো চাকু দিয়ে কেটে কাটা চামচ দিয়ে তুলে দুরকম সসে ডুবিয়ে মুখে দিয়ে বললো, দারুণ। একটু খেয়ে দেখুন না? দাঁড়ান, আমি বানিয়ে দিচ্ছি। আব একটা কাঁটা চামচে একটা চিংড়ি তুলে সসে ডুবিয়ে নিল হাঁ করুন। মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি রকম লাগছে?

—খারাপ নয়। গন্ধ লাগছে না তো কাঁচা মাছের।

—তা, লাগবে কেন? সসের গন্ধে ওটা ঢেকে গেছে। তাহলে এবার নিজের ইচ্ছে মত খান।

ভাজা চিংড়িতে নুন কম হওয়ার নুনের বাটি খুজছিলাম, টেবিলে কিছু কোথাও পেলাম না।

—কি খুজছেন? নুন। নুন আমরা আলাদা করে খাই না। এই নিন এটাতেই নুন আছে।

—আরে, এটা তো দেখছি তেল।

—হ্যাঁ তেলই তো। এটা হচ্ছে 'নাম্‌প্লা' অর্থাৎ মাছের তেল। এর মধ্যেই নুন

দেওয়া আছে।

ফ্রায়েড রাইস, কাঁচা আর ভাজা চিংড়ি ভালই লাগছিল। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি এখন কোথায়?

উত্তর দিতে গিয়ে ওর হাসিভরা মুখটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভারি গলায় বললো অভিজিৎ আর নেই।

—কী হলো ওর?

—ও মারা গেছে।

—কী করে?

—ও খুব খেলাধুলো করতে ভালবাসতো। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির হয়ে ফুটবল খেলতো। ওদের নৌকো চালাবার দলে থাকতো কেমব্রিজের সঙ্গে প্রতিযোগীতায়। শীতের সময় স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে স্কিইং শিখতো। সুইজারল্যাণ্ডে গেলো স্কিইং কম্পিটিশানে। সেখানে থেকে আর ফিরলো না। ও চলে যাওয়ার পর আর ওখানে ভাল লাগছিল না। কোনও মতে পড়া শেষ করে এখানে চলে এলাম।

—আপনারা কি একই বিষয় নিয়ে পড়তেন?

—না, আমি পড়তাম ইতিহাস নিয়ে আর ও পড়তো ইংরেজি। ও ইংরেজি কবিতাও লিখতো। ওর কবিতা ম্যাগাজিনেও ছাপান হতো।

বলতে বলতে ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওর মন হয়তো চলে গিয়েছিল সেই ফেলে আসা সুন্দর দিনগুলোতে। খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে ছিল ফোয়ারাটার দিকে যার চারদিকে ছিল একটা রক্‌গার্ডেন্‌।

—কী ভাবছেন? খাবার যে পড়ে রইল।

—ভাবছি, কি সুন্দর দিনগুলো কেটেছিল ওর সঙ্গে। জানেন, ছুটি হলেই আমরা বেরিয়ে পড়তাম। প্রায়ই চলে যেতাম স্ট্রাটফোর্ড অন্‌ এভনে।

—সেক্সপিয়ারের নাটক দেখতে যেতেন বুঝি?

—তা তো দেখতামই। কখনও বা এভন নদীর ধারে উঁইপিং উইলো গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতাম ওর হাত ধরে। দেখতাম শান্ত জলে নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়ানো নানান রঙের হাঁস, ছোট ছোট মোটর বোটে ছুটির আলস্যে ভেসে যাওয়া সুখি দম্পতি, চড়ে বেরানো শেট্‌ল্যাণ্ড ভেড়ার দল। ও কখনও বা গান শোনাতো কখনও বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়তো। চারিদিকে ড্যাফডিল আর ডেইজি ফুল সবুজের মাঝে রঙ ছড়াতো। নদীর পাড়ে খড় আর স্লেটের দোচালা কাঠের ফ্রেমে বাঁধা সাদা বাড়িগুলো সেক্সপিয়ার আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগের পরিবেশ সৃষ্টি করতো।

সেবিকা খালি প্লেটগুলো তুলে নিয়ে অয়েস্টারের প্লেট রেখে গেল।

—আর ভেবে কি করবেন? সে দিনগুলো তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। নিন, এগুলোর সৎব্যবহার করা যাক। ঝিনুকের খোলটা ফাঁক করে একটু নাম প্রা

আর গোলমরিচ মিশিয়ে চামচ করে চেঁছে তুলে মুখে দিয়ে বললাম, খুব ভাল। অনেকদিন পর খেলাম।

—আপনি তো নিলেন না এখানকার স্কুইড্ (সামুকের মত) আর অক্টোপাস যদি খেতেন, তা হলে ভুলতে পারতেন না। আমরা সি-ফুড চালান দিয়ে অনেক পয়সা রোজগার করি। জাপানে আমাদের সবচেয়ে বড় বাজার। ওরা তো কাঁচা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। জানেন তো জাপানিরা মাংস খাওয়া শিখেছে পর্তুগীজদের কাছ থেকে মাত্র আড়াই শো বছর আগে। এবার বলুন ডেসার্ট কি খাবেন ?

—পেট ভরে গেছে, আর পারবো না।

—আজ, আমি খাওয়ালাম আপনাকে।

—আমি ডেকে আনলাম, আর খাওয়াবেন আপনি ? তা হয় না।

—সেদিন আপনি খাইয়েছেন। আজ আমার পালা। ও বিল মিটিয়ে দিয়ে বললো, এবার কি করবেন ?

—ঘড়ি দেখে বললাম, নটা কিন্তু বেজে গেছে।

—তা হোক, নাইট-ইজ-স্টিল ইয়াঙ্গ। চলুন একটু ডিস্কোতে নেচে আসা যাক।

—আমি বাপু, নাচতে জানি না।

—ঠিক আছে চলুন তো। ময়ূরি দেখলে শুনেছি ময়ূর আপনিই নাচে। বেরিয়ে আসতেই একটি রেস্তোরার ছেলে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনার ড্রাইভার আছে ?

ড্রাইভার নেই শুনে গাড়ির নম্বরটা জেনে ছুটে গেল ওর অফিসে। সেখান থেকে চাবি নিয়ে পার্কিং লট্ থেকে গাড়িটা এনে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে নেত্রার হাতে চাবিটা দিল। নেত্রা ওকে কুড়ি বাট বকশিস দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো, আমি ওর পাশে।

রবিনসন্ ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরের পাঁচ তলা পার্কিং স্পেসে গাড়িটা রেখে লিফটে তিন তলায় নেমে আমরা নাচের ঘরে পৌঁছলাম।

হলের ছাদের বাতিগুলো অমাবস্যার তারার মত টিপ্‌টিপ্ করে জ্বলছিল। ষ্টেজের ওপর লাল, সবুজ হলুদ আলোর সাজার রশ্মি নাচিয়েদের শরীরের বিভিন্ন অংশ আলোকিত করে ঠিকরে পড়ছিল। কান ফাটানো, বুক কাঁপানো বাজনা আর গলা ভাঙ্গা গানের তালে তালে আট-দশটা ছেলে মেয়ের শরীর ভেঙ্গে চুড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

আমরা বসতেই একটি মেয়ে এসে বললো, 'ড্রিংক থাম, মাই।'

—আমি নেত্রাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি খাবেন বলুন ?

—আপনি কি নেবেন ?

—আমি নেবো একটা ব্রাণ্ডি উইথ্ জিঞ্জার এল, আপনি ?

—আমি একটা ভার্জিন্ মেরি।

—আজকাল আর ভার্জিন পাওয়া যায় না। ব্লাডি মেরি নিন।

—ঠিক আছে। মাতাল হয়ে গেলে কিন্তু আর গাড়ি চালিয়ে বাড়ি যেতে পারবো না।

—ঠিক আছে। আমি পৌঁছে দেবো। হেসে বললাম, না হলে কালকের কয়েক ঘণ্টা আমার গেস্টরুমে কাটিয়ে যাবেন।

হেসে বললো—গেস্ট হতে যাবো কেন? ভার্জিন তো পাওয়াই যায় না, তাহলে আর ভয় কি? ঠিক আছে, ব্লাডি মেরি খেয়েছি বলে কিন্তু নো ব্লাডি বিজনেস্।

—নো, নো, ইউ ক্যান বি রেস্ট এসিয়োরড্, ইউ উইল বি ট্রিটেড্ লাইকে এ ভার্জিন, দো ভ্যার্জিনস্ আর রেয়ার।

—তাহলে মাতাল হতে আপত্তি নেই।

—তা হলে একটা গল্প শুনুন—আট্টিলা দি হুন্ ইউরোপের নানান রাজ্য জয় করতে করতে রাইন নদীর ধারে জার্ম্মানির কোলন্ শহর দখল করেছে। ওর সৈন্যরা কোলনের সব মেয়েদের ভার্জ্জিনিটি লুট করে নিয়েছে। প্যারিসের লোকেরা ভাবছে এরপর তাদের পালা। আশ্চর্য্যের ব্যাপার আট্টিলা প্যারিসের পাশ কাটিয়ে দক্ষিণে চলে গেল। সবাই বলে তার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে প্যারিসে কোনও ভার্জিন ছিল না

মুচকি হেসে নেত্রা বললো, দারুণ গল্প। এবার চলুন স্টেজে। লেট্স্ গিভ্ ইট্ এ ট্রাই।

—ভরসা পাচ্ছি না। এতগুলো লোকের সামনে বেল্লিক বনতে হবে।

আমার হাত ধরে টেনে তুলে বললো, চলুন তো। নিজেকে ছেড়ে দেবেন। অন্যদের দিকে তাকাবেন না। শুধু ভাববেন, আমি আছি আর আপনি আছেন, আর আছে গান বাজনার তাল। তাল রেখে আপনার যা করার ইচ্ছে তাই করবেন, আপনার পার্টনারকে কিন্তু ধরবেন না।

ওর কথায় আশ্বস্ত হয়ে খুব সাহস নিয়ে স্টেজে উঠে পড়লাম। ঠিক উঠে পড়লাম বললে ভুল হবে, ও টেনে তুললো স্টেজে।

বেশ ভাল লাগছিল। ছোটবেলায় বাড়ির দুর্গামণ্ডপে ঢাকের তালে তালে ধুনুচি নাচ করার সময় যে উম্মাদনা হতো সে রকম বাঁধন ছাড়া ব্যাপার একটা।

নেত্রা হেসে তালে তালে হাত-তালি দিয়ে বললো, দারুন হচ্ছে। কে বলে, আপনি নাচতে জানেন না। দেখুন, সবাই আপনার নাচটাই নকল করতে চেষ্টা করছে। কোথায় শিখলেন?

—ঢাক ঢোলের বাজনার সাথে সাথে ছোটবেলায় অনেক আরতি নাচ নেচেছি বাড়ির পুজোয়। আর এওতো ঢোলেরই আওয়াজ, তালটা একটু অন্য রকম। এ রকম আফ্রিকার উল্লাস নৃত্য অনেক দেখেছি টারজনের বইতে। আমি কিন্তু সেই ধুনুচি নাচটাই একটু হেরফের করেছি।

গান থামতেই আমাকে একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললো, ফ্যানটাসটিক।

হাঁফিয়ে উঠেছি। আরেক রাউণ্ড অর্ডার দিলাম। আবার নাচ সুরু হয়েছে। ঐ মেয়েটি আমার সামনে নাচতে নাচতে উত্তেজিত হয়ে ওর ফ্রক খুলে ফেলেছে। অন্তর্বাস শুধু গায়ে, তাদের সঙ্গিরাও জামা খুলে ফেলে উন্মত্ত হয়ে নাচছে। নাচের ভঙ্গিতে যৌন ইঙ্গিতের অভাব নেই। নাচ যে এতখানি উদ্দাম, আদিম যৌন আকাঙ্খার তীব্র প্রকাশ হতে পারে তা সেদিনই বুঝলাম।

ও আমাকে টেনে নামিয়ে এনে বললো, অসভ্য। মন আমাদেরও দুলছে, পাগুলো তাল ঠুকছে। ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে কাছাকাছি। ওর একটা হাত আমার হাতের মুঠোয় কাঁপছে। নরম গালের ছোঁয়া লাগছে। বাজনা থেমে গেল। বাতি নিভে গেল। নরম ঠোঁটের পরশে গা শিউরে উঠলো।

নেত্রা মুচকি হেসে বললো, থ্যাংক ইউ।

॥ ১৭ ॥

আমি তখন অফিসে। আমার সেক্রেটারি বললো, স্যার, আপনার ফোন।

মোটা গলায় আওয়াজ,—কি করেন? হঃ হঃ আমি চাচা। কাইল পরশু কোনও কাম্ আছে নাকি?

—না সে রকম—কিছু রাজ কার্য্য নেই। গল্ফ্ খেলতে যাবার ইচ্ছে আছে। একা একা আর কীই বা করা যায়?

—কাইল আমি গ্রামের বাড়িতে যামু। যাইবেন নাকি, আমার লগে?

—কতদূর আপনার সেই বাড়ি?

—বেশী দূর না, এই ঘণ্টা চাইব একের পথ। কাছেই শুনুছি একটা ভালো গল্ফ খেলনের মাঠ আছে। ইচ্ছা হইলে একদিন গল্ফ্ও খেলতে পারেন।

—কোথায়?

—হুয়া হীন্।

—ঠিক আছে যাবো।

—তা হইলে সকাল ছয়টার কাইল আপনের গাড়িটা লইয়া আমার এইখানে চইল্যা আইবেন।

—ঠিক আছে। ছাড়লাম।

ঠিক ছয়টায় পেঁছে গেলাম। চাচা প্রস্তুত হয়ে নীচে পায়চারি করছিলেম।

—ঠিক সময়ই আইছ। চল।

অত সকালে ব্যাংককের বিখ্যাত যানজট তখনও আরম্ভ হয় নি। ফুটপাথের খাবারের দোকানে তখনও গ্রাহক জড়ো হয় নি। শহর ছাড়িয়ে প্রশস্ত জাতীয় সড়কে পড়তেই গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। স্পিডোমিটারের কাটা একশোতে গিয়ে স্থির হয়ে রইলো। রাস্তায় খানাখন্দ নেই। গতিরুদ্ধ করার জন্যে গ্রামবাসিরা কেউ বাম্প তৈরি করেনি। গরুর গাড়িও নেই কোথাও। গাড়ি সব যার যার

পথে নিয়ম মেনে চলছে। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে দক্ষিণে। গ্রামের চেহারা সব মোটামুটি একই রকম। বাড়িগুলো এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে নেই, বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফল পাখারির বাগানের মাঝে আয়াসি ঢং-এ রয়েছে। প্রত্যেক গ্রামের মাঝে 'ওয়াট' একই রঙের একই ঢং-এর। চাচার একটু ঝিমুনি এসেছিল। আমি বললাম, কি চাচা ঘুমিয়ে পড়লেন যে?

লজ্জা পেয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, আরে কও ক্যান্, এই বয়সে কাম ছাড়া রইলেই ঝিমুনি আসে।

—চাচা, ব্যাংককে আপনার কতদিন হোলো?

—দাঁড়াও, ভাবতে হইবো। যুদ্ধ শেষ হইয়া গ্যাছে। জাপানি গো দ্যাশে-এটম্ বোমা পড়ছে। ফরাসিরা আবার ইন্দোচায়নাতে ফিরা আইছে। তা হইলে ধর চল্লিশ বছছর হইবো। ঠিক কইলাম কিনা?

—বৌদিকে জুটিয়েছেন, তা হলে তার পরে?

—প্রায় সেই সময়ই। তখন অরা লাওসে থাকতো।

—সেখানে আপনি ছিলেন নাকি?

—আমি তখন বর্ম্মা থিককা পলাইয়া গেছিলাম ঐখানে।

—আলাপ হয়েছিল কি করে? রোমান্সের গন্ধ পেলাম। চাচা সিটে গা এলিয়ে দিয়েছেন।

আর কও ক্যান সেই কথা। জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক মাস ধইরা হাটছি। বিছানা পওর কিছুই নাই লগে। দুইটা জামা আর দুইটা ধুতি লগে। শরীর কাহিল। হাটনের শক্তি নাই। কই জামু তাও জানি না। হারা উদ্দেশ্যে চলছি। কতদিন যে ভালো কইর‍্যা খাই না তা মনেই নাই। তারপর একদিন লাওসে আইস্যা পৌঁছাইলাম। ঠিক করলাম এইখানেই কোথাও থাইককা যাইমু। এদিকে হো চীন্-মিন্ তখন জ্যাপানিগো ফালাইয়া যাওয়া হাতিয়ার লইয়া ফরাসিগো বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করছে। ফরাসিরা খুব মার খাইতাছে। সন্ধ্যা হয় হয়। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নাই। মুইট্যার কাম কইরা কয়েকটা পয়সা পাইছিলাম। একটা কড়াতকলে জিগ্যাস করলাম, কাম আছেনি? আমার কথা তো কেউই বোঝে না। ইসারায় বুঝাইলাম। একটা বছর পনেরোর মাইয়া খুব মনোযোগ দিয়া আমার ইঙ্গিত বুইঝ্যা দৌড়াইয়া গিয়া একটু খাবার আইন্যা আমারে বসাইয়া খাওয়াইলো। তারপর অর দিদির লগে কি কথা কইয়া আমারে হাত ধইরা ঘরে নিয়া বসাইলো।

—সেই এক ঝলক দেখা, দেখা থেকে দয়া আর দয়া থেকে প্রেম?

—অত দৌড়াইলে কি গল্প হয়। সেইখানেই রইয়া গেলাম। কামও পাইলাম, কাঠকলের ম্যানেজারি। জঙ্গল থিকা গিয়া কাঠ কিন্যা আনা, লোকগুলিরে ঠিক মতো খাটানো। ঐ মাইয়া দুইটার বাবায় কয়েকদিন আগে জঙ্গলে সাপের কামড়ে মরছে। অগো ভাই আছিলো না।

—সেই থেকেই বুঝি আপনার কপাল খুললো। যে আশ্রয় দিলো তাকেই

আশ্রিতা করলেন বুঝি ?

চাচা হাসলেন, কী যে কও ? তোমার বৌদিরে দ্যাখলে কি মনে হয় সে আমার আশ্রিতা।

—তা চাচা আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন ?

—আমার দুই মাইয়া দুই পোলা।

—ওরা কি করে ?

—বড় মাইয়া তো এক অস্ট্রেলিয়ান আর্কিটেক্টরে বিয়া করছে। সেই জামাইই আমার রেস্তোঁরাটা কয়েকমাস আগে সাজাইয়া দিছে। বড় পোলারে ইণ্ডিয়ায় পাঠাইয়া দিছি পড়তে পাবলিক ইস্কুলে। ছোট মাইয়া আর ছোট পোলাটা এইখানে পড়ে। আরে আরে এইখানে একটু দাঁড় করাও। ব্রেকফাস্টটা খাইয়া লই।

আমরা একটা ছোট্ট শহরে পোঁছে গেছি। একটা রেস্তোঁরায় ঢুকে বেশ পেট-পুরে খাওয়া হলো। তারপর আরও এক ঘণ্টা চলার পর আমরা পোঁছিলাম হুয়া-হীনে। একদিকে সমুদ্র আর বেলাভূমি, আর একদিকে নাতি উচ্চ পাহাড়। এখানে আছে বায়ুসেনাদের ট্রেইনিং সেণ্টার। সমুদ্রের ধারে একটা পাঁচ তারার হোটেল আছে। পাহাড়ের পাশে আছে গল্ফকোর্স। বড় রাস্তার ধারে বেশ সুন্দর সুন্দর দোকানও আছে, বিশেষ করে কাপড় জামার। ব্যাংককের বিদেশিদের ও টুরিস্টদের জন্য সি-রিসর্ট হিসাবে এ জায়গাটাকে গড়ে তোলা হচ্ছে।

চাচা নির্দেশ দিলেন. অতীশ এইবার ডানদিকের রাস্তা লও। আর পনেরো মিনিট গেলেই আমার বাড়ি।

চাচার বাড়ি পোঁছে গেলাম।

চাচা, হাঁকডাক আরম্ভ করলেন। ড্যাম্, ড্যাম্, শিগ্গির আসো—

একটি গ্রাম্য মেয়ে ছুটে এলো। মাস্টার, আপনি এত দেরী করলেন ?

—তাতে কী হইছে ! মোটে তো এগারোটা বাজছে। এর স্যুটকেসটা পাশের ঘরে রাখো। আমাকে একটু চা খাওয়াও। তারপর রান্না বসাও।

সব বাড়ির মত চাচার বাড়িও কাঠের মাচার ওপর। ওপরে টিনের চাল আর দেওয়াল কাঠের। ড্যাম দুটো ইজিচেয়ার বের করে দিয়েছে বারান্দায়। আমরা সেখানে বসলাম। চা এসে গেল। তন্ময় হয়ে দেখছিলাম গ্রামের রূপ। সত্যই শ্রীমণ্ডিত। সুন্দর গ্রামের বাড়িগুলো। মাঝে ওয়াট। ধানের ক্ষেতে ঘাস গজিয়েছে। অন্য ফসলে অনেক ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে। সামনেই একজনের কমলালেবুর বাগান। রাস্তা দিয়ে যারা হেঁটে চলেছে তাদের পরিচ্ছন্ন পোশাক। ধানের ক্ষেতগুলোতে একটা মোষে টানা লাঙ্গল দেওয়া হচ্ছে। মোষের গলায় ফুলের মালা। চাষার মাথায় বাঁশের টুপি, পরনে ফুল প্যাণ্ট গায়ে সার্ট। কোনও কোনও ক্ষেত ছোট ছোট ট্রাকটর দিয়ে চষছে।

—কি অতো দ্যাখতাছো, তন্ময় হইয়া ?

—দেখছি আর তুলনা করছি আমাদের দেশের গ্রামের সঙ্গে।

—তুলনা কর কার লগে, রাজার লগে প্যাদার। এইখনে কোথাও হাহাকার নাই, হা অন্ন, হা অন্ন কইর‍্যা। দ্যাশের মত বন্যার জলে ভাইস্যা যায় না অগো বাড়িঘর। ক্ষেতে আছে ধান, জলে আছে মাছ, বনে আছে কাঠ।

ড্যামের আবার দেখা পাওয়া গেল। হন্ত দন্ত হয়ে এসে বললো, মাস্টার, শিগ্গির চলুন! আজ লাঙ্গল উৎসবের দিন মনে নেই। আর দেরী করবেন না। আমার স্বামী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

চাচা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন—ও বাবা, ভুইল্লাই গ্যাছিলাম যে আজ সাতই মে, লাঙ্গল উৎসব। চল চল অতীশ। বড্ড দেরী হইয়া গ্যাছে।

উঠোনে নেমে দেখল্যাম একটা গরু আর মোষ বাঁধা আছে। থালায় আছে কয়েকটা মালা, ধূপ, দীপ। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ড্যাম আর তার স্বামী।

চাচা হাত পা ধুয়ে এসে দাঁড়ালো ড্যামের সামনে। ড্যাম ওকে নিয়ে গেল মৃত আত্মার পূজাবেদীতে। চাচা মৃত আত্মাদের পাদপীঠে মালা দিয়ে ধূপ দীপ জ্বেলে দিলেন। প্রণাম করে অশরীরী আত্মাদের কাছে মঙ্গল কামনা করলেন। তারপর গরুটাকে আর মোষটাকে মালা পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর মোষটার কাঁধে লাঙ্গল লাগিয়ে ড্যামের স্বামী ওদের ধানের ক্ষেতে নিয়ে গেল। চাচা একটু লাঙ্গল চালিয়ে কিছুটা মাটি কেটে দিলেন।

চাচা বললেন—আজ থেইক্কা পারম্ভ হইবো ক্ষেত চষা। তারপর বষা আইলে ধান লাগানো।

—আমাদের ওখানে তো আজকাল সারা বছরই ধান হয়, ঠিক মত জল আর সার দিতে পারলেই। আপনাদের এখানে হয় না?

—তা হয়। কিন্তু এই মরশুমেই প্রধান ফসল নামে।

জিগ্যেস করলাম চাচা, এই লাঙ্গল দেওয়াটা আবার উৎসব হলো কি করে। চাচা উৎসবের ইতিহাস জানালেন, আইজ সম্রাট তার খ্যাতে লাঙ্গল দেন। ইন্দ্রের পূজা করেন। ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানান, যেন ভালো বৃষ্টি হয় আর সোনার ফসলে যেন্ খ্যাত ভইরা যায়। হগলে তাই আউজকা মাঠে প্রথম লাঙ্গল দেয়।

একটা পুকুরের পাড় দিয়ে আসছিলাম।

চাচা বললেন, কী, মাছ ধরণের সখ আছে নাকি? আমার এই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ আছে।

—না চাচা, আমার অত ধৈর্য নেই। এখানকার পরিবেশটা কিন্তু ভারি শান্ত।

—তাইতো এইখানে মাঝে মাঝে আসি। ব্যাটারিটা চার্জ কইর‍্যা যাই কারেন্ট ফুরাইয়া গেলেই। তাই তো এত এনার্জি। ড্যাম্ মাইয়াটাও খুব ভালো। আইলে খুব সেবা যত্ন করে। ও আর অর স্বামী এইখানকার সব দ্যাখা শোনা করে।

ঘরে আসতেই ড্যাম্ বললো, মাস্টার আজ মুরগির মাংস আর ভাত খেতে হবে। মাছ ধরার সময় পাবেন না। আর একবার চা হবে তো? পরোটা আর অমলেট করে রেখেছি। কোন সকালে রওনা হয়েছেন। খেয়ে চান করে নিন।

—পরোটা আর অমলেট শিখলো কি করে?

—ক্যান, আমি অরে সব রান্না শিখাইয়া দিছি।

খেয়ে নিজের ঘরে গেলাম। পরিপাটি ঘর। খাটে পরিস্কার বিছানা। দেওয়ালে একটা আয়না। এক পাশে একটা টেবিল আর চেয়ার। চান সেরে বিছানায় একটু গা এলিয়ে দিলাম।

চাচা হাঁক মারলেন, ও অতীশ ঘুমাইয়া পড়লা নাকি। খাইয়া একেবারে চোখ বোজো। খাইতে আসো। রান্না হইয়া গ্যাছে।

রান্না ঘরে আসন পেতে দিয়েছে ড্যাম্। আমরা দুজনে বসলাম। ড্যাম সব খাবার মাঝখানে সাজিয়ে রাখলো। আর একদিকে ড্যাম্ আর তার স্বামী বসলো। মুরগির মাংস ভাত আর কুইতিও তাতে আছে শুয়োরের মাংসের বল, আর কিছু শব্জি।

—চাচা, আপনি কি সবসময়ই এদের নিয়ে একসঙ্গে বসে খান?

খামু না ক্যান? আমি কোন বড়লোকের ছাতা আছিলাম। আমার জীবনের শুরুতে তো অগো থিক্যাও খারপ অবস্থা আছিল। অরা তো আমার পরিবারেরই একজন। কত দরদ্ দিয়া কাম করে।

ড্যামকে বললাম, 'আহান্ আলয়' (খাবার খুব সুস্বাদু হয়েছে)। খেয়ে উঠে চাচাকে বললাম, চারটের সময় গ্রামটা একটা চক্কোর মেরে আসবো।

চাচা রাজী—ঠিক আছে। তার আগে একটু গড়াইয়া লও। আমিও একটু বিছানায় গা ঠেকাইয়া লমু।

চারটের সময় উঠে চা খেয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম দেখতে।

—আগে চল আমরা ওয়াটে যাই। ওয়াটে গেলেই গ্রামের সম্বন্ধে তোমার একটা সাধারণ ধারণা হইয়া যাইবো।

পথে যেতে যেতে দেখলাম ঢাক ঢোল কর্ত্তাল বাজিয়ে একদল ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি শোভাযাত্রা করে আসছে। চারজন লোকের কাঁধে একটা সাজানো চেয়ারে বসে আছে এক কিশোর, তার মাথা মুড়ানো, পরনে সাদা কাপড়, গলায় ফুলের মালা। মেয়েরা সব সুন্দর সেজে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে, হাতে তাদের ফুলের সাজি।

জানতে চাইলাম কী ব্যাপার চাচা, বিয়ে নাকি?

—না, না বিয়া না। পোলাটা যৌবনে পা ফালাইছে। ও অখন মঠে গিয়া 'নাঙ্গ' হইবো অর্থাৎ তিনমাস মঠে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবো। সারাদিনে একবার খাইবো। সূর্য অস্ত গেলে আর খাওয়া নাই। রোজ ভিক্ষায় বাইর হইতে হইবো। সন্ন্যাসীগো কাছে ধর্ম্মশিক্ষা নিতে হইবো। এই দ্যাশে গরীব বড়লোক সবাইরই 'নাঙ্গ' হইতে হয়। অনেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর তিনমাস যে ছুটি থাকে তখন 'নাঙ্গ' হয়।

মঠের সামনে বাজার বসেছে। মেয়েরাই বিক্রি করছে বাগানের তরিতরকারি, চাল, ভুট্টা, ট্র্যাপিওকা। ঠেলাগাড়িতে নানান মনোহারি জিনিস বিক্রি হচ্ছে।

এটাই গ্রামের দৈনন্দিন বাজার।

মাঠের প্রধান সন্ন্যাসী একজন রুগির নাড়ী টিপে চোখ বুজে বারান্দায় বসেছিলেন। চাচা গিয়ে প্রণাম করলেন।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম — আচ্ছা, উনি কী চিকিৎসক নাকি?

—হঃ, সন্ন্যাসীরা কেউ কেউ আয়ুর্বেদশাস্ত্র পড়েন। প্রত্যেক গ্রামের মঠেই একজন কইরা আয়ুরবেদশাস্ত্রী থাকে। জানো তো, গ্রামে যদি কোনও কাইজ্যা হয়, আর গ্রামপ্রধানের বিচারে যদি বিবদমান গ্রামবাসিরা সন্তুষ্ট না হয় তা হইলে মঠাধ্যক্ষের বিচারই শেষ বিচার। আবার গ্রামবাসীরাই সন্ন্যাসীগো সমস্ত প্রয়োজন মিটায়।

—চলুন এবার গ্রামটা একটু ঘুরে আসি।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রাম্য বিদ্যালয়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। পরিচ্ছন্ন পাকা বাড়ি, টিনের চাল, সামনে খেলার মাঠ। বিদ্যালয়ের সামনে ফ্ল্যাগ পোস্ট, তাতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। পাশে একটা গোশালা, তাতে গরু নেই, আছে বাঁধা কয়েকটা মোষ। সেখানে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন গ্রামের লোক, আর জনা তিনেক শহুরে লোক। তাদের গাড়িটা একপাশে রাখা।

—চাচা, কি ব্যপার বলুন তো?

—এইটা হইলো একটা ব্যাংক।

শুনে আমি অবাক—কি রকম ব্যাঙ্ক চাচা? ব্যাংক তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

চাচা জানালেন, মইষ ধার দেয়, টাকা না।

—মোষ ধার দেয় কি রকম?

চাচা ব্যাখ্যা করলেন, যে চাষায়া মইষ কিনতে পারে না পয়সার অভাবে, তাগো মইষ ধার দেয় এইখান থিকা। বছরে ছয়শো বাট ভাড়া। যদি ধার নিতে না চাও তা হইলে একটা মইষ নিতে পারো বিনা পয়সায়। প্রথম বাচ্চাটা ব্যাংকরে দিতে হইবো দুধ ছাড়লে। দ্বিতীয় বাচ্চাটা চাষার। ঐটা বড় হইলে মইষটাবে ব্যাংকারে ফেরৎ দিতে হইবো, সেইটা আবার আর একজন চাষারে দিয়া দেয়। ইচ্ছা করলে মইষটা কিন্নাও নিতে পারো। তিন বছরে টাকা শোধ দিতে হইবো। কোনও সুদ দিতে হইবো না।

—এই ব্যাঙ্ক চালায় কে?

—পশু বিভাগ।

—এটা দারুন ব্যবস্থা তো। কার আইডিয়া বলুন তো?

—রাজার আইডিয়া। আরম্ভ করছিলেন আড়াই শো মইষ লইয়া। এখন এই ব্যাঙ্কের আছে পঁয়ত্রিশ হাজার মইষ।

—আমি তো এখানে ট্র্যাকটার আর জাপানি টিলার দেখেছি ক্ষেত চষতে। রাজা ঐ সব মেশিন ধার না দিয়ে মোষ ধার দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন কেন?

—যাগো অনেক জমি আছে তারা ট্র্যাকটার আর টিলার কিনতে পারে ফার্মার ব্যাংক থিকা টাকা ধার কইরা। যারা অল্পজমির মালিক তাগো মইষই ভালো। তেল লাগে না, সারাই করতে হয় না। খড় খাওয়াও, ঘাস খাওয়াও, গোবর দিয়া সার কর, কত সুবিধা।

—ওদের অসুখ হলে কি হয় ?

—ব্যাংকের পশু চিকিৎসক আছে।

—মোষ যদি চুরি হয়ে যায় তা হলে—

—চুরি তো হইতেই পারে। মইষের সিং-এ নম্বর দেওয়া আছে। একবার এই গ্রামে একজনের মইষ চুরি যায়। তখন এ গ্রামে এবং পাশের গ্রামগুলিতে জানাইয়া দেওয়া হইলো রাজার মইষ চুরি গেছে। যে নিছে তার পরকালে নরকযন্ত্রণা পাইতে হইবো। পরের দিন মইষটারে ঠিক পাওয়া গেল। অনেক হইছে। এইবার চল বাড়ি ফিরা যাই। সূর্য ডুবতাছে তা খেয়াল করছো নি ?

হাঁটতে হাঁটতে বললাম, ভারি ভালো লাগছে চাচা। গ্রামের পথে হাটতে গিয়ে দেশের কথা মনে পরছে। এ রকম একটা গ্রামেই তো আমি বড় হয়েছি। অবশ্য সে গ্রাম এই রকম ছিল না, চারিদিকে খাল, বিল, নদী। সেখানেও আমার একচাচা ছিল, রহিম চাচা, তার কোলে পিঠেই মানুষ হয়েছিলাম। চারিদিকে কেবল দুঃখ আর দৈন্য তবু তাতে একটা প্রাণ ছিল একটা মমত্ববোধ ছিল। তার ছেলে মজিদ ভাই ছিল আমার সর্বক্ষণের সাথী।

—কোনখানে তোমাগো দ্যাশ আছিল ?

—আপনার যেখানে ছিল।

—তাই কও তুমিও তা হইলে বাঙ্গালের পো।

—হ্যাঁ, আর একটু ঘুরে তারপর বাড়ি চলুন। আজ বোধহয় পূর্ণিমা। কতদিন পর নারকেল সুপুরি গাছের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে আসতে দেখছি। কতদিন এ মোহময় সন্ধ্যা দেখিনি। প্রকৃতি কি সুন্দরী। তার সৌন্দর্য্য আমরা কেড়ে নিয়েছি।

একটা বাড়ির দিকে অঙুল দেখিয়ে চাচা বললেন—এই বাড়িটা দেখতাছ, এইটা হইল গ্রামপ্রধানের বাড়ি ওরা কয়, 'পু-ইয়াই-বানু' (পু-পুরুষ, ইয় বড়, বানু-বাড়ি) তা হইলে মানে হইল খুব বড় পুরুষের বাড়ি। গ্রামের সবাই এক বাড়িরই মানুষ। পনেরো কুড়িটা গ্রাম লইয়া হয় একটা 'চমুখনু' আর তার যে প্রধান তারে কয় 'কামুনানু'। এরা সবাই একটা সরকারি বৃত্তি পায়। অগো একটা কমিটি আছে তাতে আছে ইস্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামের ডাক্তার, পশুচিকিৎসক আর কৃষিবিভাগের একজন কর্মচারি।

—তা হলে তো গ্রামের সর্বাঙ্গিন উন্নতির জন্য যাদের যাদের দরকার তারা সবাই এই কমিটিতে আছে।

—তা আছে। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তো আমার ছ্যাবলা

উইঠ্যা আইল। এত শত জ্যাইন্যা করবা কী ?

—একটা দেশে এলে তার সম্বন্ধে তো সব কিছু জানাই উচিত।

—তা কইছ ঠিক।

—এই গাছগুলি তো ট্যাপিওকা। এখানে আর কি কি ফসল হয় ?

—ধান আর ট্যাপিওকা হয় প্রচুর, পাটও অল্প-স্বল্প, তামাক হয়, ভুট্টা হয় আর হয় অ্যউথ্।

—এখানে কোথাও সেরকম গরু তো দেখলাম না।

—এরা গরু রাখে না। গরুর দুধও খায় না। অগো মিষ্টি খাও নাই ? মিষ্টি অগো, নাইরকলের আর সয়াবিনের দুধের। রাজা অবইশ্য অখন গোপালন জনপ্রিয় করনের চেষ্টা করতাছে। তার নিজের খামারে হলস্টাইন্ গরু আনছে অনেকগুলি জার্ম্মানি থিক্যা। তার বীজ দিয়া শঙ্কর গাই জম্মাইতে আছে। দুধের উপকারিতার কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার চলতাছে ? আমার বাড়িতে যে গাইটা দ্যাখলা ঐটা আসল জাতের। আইজ ঐ গাই এর দুধের ক্ষীর খাইতে পারবা।

আমরা যখন বাড়ি এসে পেঁছিলাম তখন চাঁদের রুপালি আলোয় চারিদিক ভরে গেছে। মনে হোলো চাচা ঠিকই বলেছে, এখানে এলেই ব্যাটারিটা চার্জ নিয়ে নেয়।

বাড়ি পেঁছে চাচা বললেন, বুঝলা অতীশ, অ্যাইজ একটু আরাম কইরা মদ খাওয়ন যাইবো ! ক্যান বোঝলানি, আমার গার্জিয়ান নাই।

চাচার ছেলেমানুষী দেখে হাসি পেল। তা, আমি তো আছি। ডাক্তারের যখন বারণ তখন আপনাকে অ্যামি বেশী খেতেই দেবো না।

—চল বাসি তো গিয়া।

চাচা একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে এলেন ঘর থেকে। তারপর হাঁক পাড়লেন, ড্যাম, কাম, 'র‍্যাও র‍্যাও।' (র‍্যাও র‍্যাও—তাড়াতাড়ি)

ড্যাম এলো দৌড়ে। কী মাস্টার ?

— পাইল্যাও গ্লাস, নাম খ্যাঙ্গ (বরফ), আর কাজুবাদাম।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম, চাচা কি ভালো যে লাগাছে তা কথায় প্রকাশ করতে পারছি না।

চাচা হাসছেন—, নাই বা প্রকাশ করলা। আমি ঠিকই বুঝছি।

—এই রকম চাঁদনি রাতে শান্ত পরিবেশে কি মনে হয় বলুন তো ?

—ফালাইয়া আসা দিনগুলির কথাই মনে হয়।

—তা হলে সেই কথাগুলো একটু জোরে বললে আমারও শোনা হয়ে যাবে। বলুন না আপনার সেই দিনগুলোর কথা।

—আরে আমি একটা মানুষ, আর আমার আবার কথা, তোমাগো মত তো লেখাপড়া জানা মানুষ না।

বললাম, আমাদের জীবন তো সরল রেখায় এগিয়ে গেছে। আর আপনার

জীবন এঁকে বেঁকে উথাল-পাথাল করা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এখানে উঠে এসেছে। আমাদের জীবন নিয়ে গল্প হয় না। আপনার জীবন নিয়ে যতটুকু শুনেছি, মনে হয় সুন্দর জমাট গল্প হয়। সেই গল্পই শুনবো আজ।

চাচা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসলেন। তারপর বললেন, তা হইলে শোন—আমার বাবা আছিল্ঞ ঢাকায় সরকারি উকিল। আমি আছিলাম তার ডানপিটা পোলা। সককলে কইতো, এইডার কিছু হইবো না। আমিও ধইরা নিছিলাম কিছু হইবো না। বর্ষার ভরা বুড়িগঙ্গা সাঁতার দিয়া পার হইতাম। কোনও মতে ক্লাস টেনে উঠছিলাম। তখন এক বন্ধুর পাল্লায় পইরা যুগান্তর পার্টির আখড়ায় যোগ দিলাম। মুগুর ভাইজ্যা, কুস্তি কইর‍্যা, লাঠি আর ছোড়া খেইল্যা শরীরটা খুব মজবুত হইলো, মাথাটায় কিন্তু বুদ্ধি গজাইলো না। লুকাইয়া রিভলবার চালাইতেও শিখখাম।

একদিন পুলিস তাড়া করলো। বাবার কানে গ্যালো যে আমি টেরোরিস্ট্ পার্টিতে যোগ দিছি। রায় বাহাদুর বাবা সইহ্য করতে পারলেন না। আমারে খুব পিটাইলেন। তার পরদিন মায়ের ট্রাঙ্ক থিকা কিছু টাকা আর কয়েকটা জামা কাপড় লইয়া পলাইলাম। নামলাম আইস্যা শিয়ালদহ ইস্টিশনে।

আমাদের গ্লাস খালি হয়ে গেছে। চাচার গ্লাসে অল্প একটু ঢেলে বললাম, আর কিন্তু পাবেন না।

—তা হইলে কিন্তু তোমার গল্প শেষ হইবো না। তোমার খুদা পায় নাই তো? তবু একবার দেইখ্যা লই খাওনের কতদুর। ড্যাম্, ড্যাম্ শুইন্যা যাও। ড্যামকে জিজ্ঞেস করে জানলেন আরও ঘণ্টা খানেক দেরী, কারন ওর স্বামী সন্ধ্যার পর মাছ এনেছে।

বললাম, তা হলে চাচা চালিয়ে যান।

—ইস্টিশন থিকা বাইর হইয়া একটা হোটেলের রকে বইস্যা মুড়ি খাইতে আছিলাম। হ্যারিসন রোডে আছিল হোটেলটা।

এক বুড়া আইস্যা আমারে কয়, এই ছোঁড়া, সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখনও কেন এখানে বোসে? দেখে তো মনে হচ্ছে তুই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস। চল ভেতরে চল। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের কাছে জিম্মা কইরা কইলো আমারে খাইতে দিতে আর অর কাছেই শোয়াইতে।

ঐখানেই রইয়া গ্যালাম। ফুটফরমাইস খাটি, খাই থাকি আর পাঁচটাকা কইরা মাইনা। বোর্ডার গো একটু সেবা টেবা কইরা বকশিস ও পাইতাম গোটা দুই এক টাকা। ঠাকুরের লগে আগাল পিছাইল ও করতাম। ঠাকুরের লগেই ছেড়া মাদুর পাইতা রাত্রে শুইতাম। বাড়ির কথা মনে হইতো আর রাত্রে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমাইয়া পড়তাম। এইভাবেই আমার জীবনের আরম্ভ। আউজকার মত এই থাউক। ড্যাম ভাত লইয়া বইস্যা আছে। অগো আবার সন্ধ্যা হইলেই খাওনের অভ্যাস।

খাওয়ার পর আর গল্প শোনা হোলো না। শুয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে ছিলাম। ড্যাম্ এক কাপ চা দিয়ে গেছে। চাচার তখনও নাক ডাকছে। অনেক দিন পর সকালের সোনা ঢালা আলোতে একটা সুন্দর গ্রামের ছবি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম। কুয়াশার পাতলা ঘোমটা ঢাকা পুকুরের দিকে হাঁসগুলো লাইন করে চলেছে। হাঁসের প্যাক্ প্যাক্ আওয়াজ, মুরগির ডাক, গরুটার হাম্বা রব যেন ঘুম ভাঙ্গানো সানাই বাজাচ্ছে। কতদিন এ রকম একটা সকাল দেখিনি, শুনিনি। এর মাঝে ড্যামের গলাও শোনা যাচ্ছে খয় খয় ম্যাল্যাও (অপেক্ষা কর। আমি আসছি)। ওর কাঁধে একটা খড়ের ঝুড়ি হাতে একটা বালতি।

সেই তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল চাচার ডাকে, কী কখন উঠছ? রাত্রে ঘুম হইছে তো? আমি যা আরামে ঘুমাইছি না, কী কমু। বাজারের তাড়া নাই, কামের ধান্দা নাই, নিশ্চিন্তির ঘুম।

—হ্যাঁ, চাচা, আমিও খুব ভালো ঘুমিয়েছি।

—অঃ ড্যাম্, আমি উঠছি এক কাপ চা দিয়া যাও।

চা দিতে এলে ড্যামকে জিজ্ঞেস করলো, সকালে খাওয়াইবা কী?

—কী খাবেন, বলুন।

—ময়দা আছে? বেগুন আনছনি কাইল?

—ময়দাও আছে, বেগুনও আছে।

—তা হইলে লুচি আর বেগুন ভাজা। কি কও অতীশ?

—দারুন হবে।

—অ্যাইজ সকালে কি করবা? মাছ ধরা তো তোমার আসেনা।

—আপনার কি খুব মাছ ধরার ইচ্ছে?

—তুমি হইলা আমার গেস্ট, তোমারে একা ফালাইয়া আমি মাছ ধরতে পারি? হেইডা ভালো হইবো না। ভদ্রতাটা একেবারে ভুইল্যা যাই নাই। শত হইলেও তো ভদ্রলোকের পোলা অ্যাছিলাম। জানো, অতীশ আমি নিরুদ্দেশ হওনের কিছুদিন পর আমার বাবায় একদিন কোর্টে সন্যাস হইয়া মারা গেল। বাবায় আমারে ভালাবাসতো। আমি তার মূল্য দেই নাই। তাই অখনও মনে হয় বাবার কথা। মনে হইলেই বড় দুঃখ পাই।

—আপনি জানলেন কি করে?

—কাগজে উঠছিল। আমার বাবার তো নামডাক আছিল।

—তখন যাননি দেশে?

—তখন তো আমি দ্যাশের বাইরে।

—চাচা, আজ আর কিছু করার দরকার নেই। এখানে বসেই কাটানো যাক। রওনা হতে হবে কখন?

—দুইটা তিনটায় রওনা হইলেই হইবো। তুমি কিন্তু গল্ফ খেইলা আইথে

পারো।

—আর একবার এসে গল্ফ খেলা যাবে। আলসেমির আমেজটা বড় ভালো লাগছে।

লুচি বেগুনভাজা কফিসহযোগে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে এসে আবার বোসলাম বারান্দায়। চাচা, আপনার কাহিনী শোনান।

—কাহিনী, না কেচ্ছা ?

—চাচা, কেচ্ছা শুনতেই তো লোকে ভালবাসে। সেই হোটেলে ফুটফরমায়েসের কাজ···

—ঠাকুরের লগে লগে থাইক্যা রান্নাটাও শিখথা ফালাইলাম। উড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যায় গাজা টাইন্যা যখন ঝিমাইতো তখন আমিই অর রান্নাটা সাইরা ফালাইতাম। রান্নার ফাকে ফাকে আবার বুড়োবাবুরে মাঝে মাঝে তামাক সাজাইয়া দিতে হইতো। দুই চাইর টান দিয়া টিকাটা ধরাইয়া দিতাম।

দুপুরে কাম সাইরা খাইয়া মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে গিয়া চুপ কইরা বইস্যা থাকতাম। গঙ্গার পাড়ে বইস্যা বুড়িগঙ্গার কথা ভাবতাম। পথে লাল লাহাগো বাড়ি দেইখ্যা ঢাকার নবাব-বাড়ির কথা মনে পড়তো।

একদিন গঙ্গার ঘাটে বইস্যা আছি। সামনে একটা ইষ্টিমার নোঙ্গর ফালাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছু দূরে মস্ত লাইন লাগছে। ব্যাপারটা কী দ্যাখনের লেইগ্যা কাছে গিয়া দেখলাম টিকিটের লাইন, বর্মা যাওনের।

ভিড়ের থিক্যা একজন ডাক দিল, এই তোর নাম ননী না ? তুই শান্তিনিকেতন হোটেলে কাজ করিস না।

আমি কইলাম, ঠিক কইছেন।

—যাবি নাকি, আমার সাথে বর্মায়। আমারও সেইখানে হোটেল আছে। কুড়ি টাকা মাইনে দেবো।

আমি রাজি হইয়া গেলাম।

—তারপর আপনি ওর সঙ্গে চলে গেলেন ?

আইলাম ঘাটে পরের দিন সকালে, আমার টিনের সুটকেস আর সতরঞ্চি পেচানো বিছানাটা বগলদাবা কইরা। বাবু ঘাটেই অপেক্ষা করতে আছিলেন। তার লগে দাঁড়াইয়া আছিল এক মহিলা ঘুমটায় মুখ ঢাইক্যা, পরনে সাদা থান।

জাহাজে উইঠ্যাই বাবু তার বিছানাটা ডেকে বিছাইয়া আমারে কইলেন, তোরটাও বিছিয়ে ফেল। তারপর এক কুঁজো জল নিয়ে আয়।

জল আইন্যা দাঁড়াইয়া আছিলাম। সেই মহিলা সারাটা শরীর ঢাইক্যা একটা পুটুলির মত বইস্যা আছিলেন। আমারে নাম জিগাইয়া কুঁজাটা রাইখ্যা, বইতে কইলেন পাশে।

খুব সুন্দরী মহিলা। বয়স বছর কুড়ি। তানরে দেইখ্যা আমার দিদির কথা মনে পড়তাছিল। আমার দিদিও আছিল বাল্যবিধবা।

মহিলা কইলেন, তুই আমাকে তরুদিদি ডাকবি। ভোলাদা কোথায় গেল রে?
—ভোলাদা ঐখানে আছিল না। কই গ্যাছে জানি না।
ভোলাবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবো। রংটা আমারই মত। প্যাটে একটা কলসী বাঁধা। নাকের নীচে খ্যাঙ্গরা কাঠির মত গোঁফ। মাথার পিছন দিকে টাকের রেখা দ্যাখা দিছে, পরণে লাল পাইরা ধুতি, গায়ে ফতুয়া, পায়ে তালতলার চটি। আমি চুপ কইরা বইস্যা আছিলাম।
মাথায় হাত বুলাইয়া তরুদি কইলেন, কী রে ভাই, মায়ের জন্যে মন কেমন করছে নাকি? আমিই তো আছি, তোর দিদি।
এই স্নেহের পরশ অনেকদিন পর পাইয়া চোখ দিয়া টস্ টস্ কইরা জল পড়তে লাগলো। তরুদি আঁচলটা দিয়া মুছাইয়া আমার মুখটা কোলের কাছে ট্যাইন্যা নিল। হাঁড়ি থিকা একটা সন্দেশ বাইর কইরা মুখে দিয়া দিল। কুজা থিকা এক গ্লাস জল ঢাইল্যা সামনে রাখলো। ঝাপসা চোখে এই নতুন পাওয়া দিদিটার মধ্যে হারাইয়া যাওয়া মায়ের দ্যাখা পাইলাম।
ভোলাবাবু আইসাই আদিখ্যেতা আরম্ভ করলেন, তরুদির লগে। লাল গামছায় হাত মুছতে মুছতে বললেন, কী গো তরু, একটা ভাই পেয়ে গেলে তো? আজ আর তোমাকে নিরম্বু একাদশী করতে হবে না। আর ও সব করে, কি হবে? দেশের মাটি ছেড়ে আমরা তো অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন তো জাহাজ কালাপাণিতে।
—না ভোলদা, উপবাস আর করবো না, তা বলে একাদশীও ছাড়বো না। কাঁচা ফলার খাবো।
—সে তো আমরাও খাবো। পাকা ফলার আর ডেকের যাত্রীদের কে দিচ্ছে? যাও এবার মুখ হাত ধুয়ে কাপড়টা ছেড়ে, তাঁতের শাড়িটা পরে, কপালে একটা সিঁদুরের টিপ দিয়ে নাও।
তরুদি কইলো, না, পারবো না।
ভোলাদা তখন বিড়ি ধরাইয়া মাত্র খুশির ধোঁয়া ছাড়ছেন। সিধা হইয়া বইসাই গলাটা চড়াইয়া কইলেন, এখানে সমাজের চোখরাঙানীর ভয় নেই। আর কার কথা মনে করে এ সব করবে? তার কথাতো মনেও নেই। যদি তার জন্য অতই দরদ, তা হলে এলে কেন আমার সঙ্গে?
—এসেছি একটা কারণেই, পোড়া শরীরটাকে শকুনির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। আমার খাবারের তো অভাব ছিল না। আর তুমিও বললে, তোমার দেখাশোনার কেউ নেই দিদি মারা যাবার পর, তাই চলে এলাম।
মুচকি হাইস্যা ভোলাদা কইলেন, বুড়ো ভট্টাচার্য মশাই তো দেখলাম, দুবেলা এসে তোমার দেখাশোনা করছিলেন। হঠাৎ তার ওপর রাগ হোলো কেন?
—একদিন ঐ ঘাটের মরাটাও লাফ দিয়ে উঠে আমাকে জাপটে ধরেছিল। সে দিনই, তোমার সঙ্গে আসা ঠিক করে ফেললাম।

তরুদি তারপর দই চিড়া মাইখ্যা সবাইরে কলা পাতায় ভাগ কইরা দিল। ভোলাদা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুইল্যা একটা পান মুখে দিয়া বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে তরুদির খাওয়া দ্যাখতাছিলেন, তারপর নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়লেন।

তরুদি আর আমি পাশাপাশি শুইয়া একজন আরেকজনের জীবন কাহিনী শুনলাম। তখনই জানতে পারলাম যে বিয়ার এক বছরের মধ্যে তরুদি ছাড়া অগো পরিবারের সবাই ওলাউটায় মারা গেছিল। পাশের গ্রামে ওর বাবা মা থাকতো, তারাও সব সাফ হইয়া গ্যাছে।

জাহাজের ডেকে কখনও যাওনের সৌভাগ্য হইছে? আইজকাল তো সব উইড়া যায়। জাহাজের ডেকে যাওনের একটা বড় মজা হইছে, বিনা পয়সায় থিয়েটার দ্যাখন যায়।

—আপনার মনে পড়ে, সে রকম কোনও থিয়েটারের কথা?

—ক্যান পড়বো না। শোনো তবে—

পাশের এক মহিলার চীৎকারে উইঠ্যা পড়ছিলাম। মহিলা কইতাছিল, আবার যদি দেখি, সেই বর্মি মেয়েটাকে, তা হলে তার গলা টিপে তো মারবোই আর তোমাকেও ছাড়বো না, তারপর নিজের গলায় দড়ি দেবো। ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে, তবু নোলা কমলো না, বুড়ো মিনসের। তিন কাল গিয়ে তো এক কালে ঠেকেছে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক মিনতি কইর‍্যা কইলো, আঃ থামো না বাপু, চেঁচিয়ে ঘরের কথা পরকে কি না জানালেই নয়? শুয়ে পড়। তাকে আমি বিদায় করেছি।

খাণ্ডারনি মহিলা কইলো, আমি আসছি বলে বিদায় করেছো। আমি চলে গেলেই তো আবার তাকে আনবে। আমার পোড়া কপাল, কইয়া মহিলা কাঁদতে লাগলো। কোথায় লাগে কাননদেবীর কান্না।

—চাচা, কাননদেবী না, বলুন, সুচিত্রা সেন।

—আমাগো সময় কি ঐ মাইয়াটা আছিল নাকি? আমাগো সময় আছিল, কাননদেবী, দেবীকারাণী, যমুনা, এই সব।

আমি আরও গল্প শোনার জন্য বললাম, আর কী দেখলেন?

—কিছু দূরে এক মোল্লাসাহেব শুইয়া আছিলেন। তার দুই পাশে দুই বিবি, ছোটটা তার মাইয়ার বয়সি। দুই বিবি তার দুইটা পা কোলের উপর লইয়া মাসাজ করতাছিল আর ছয়গা পোলাপান বইয়া গুটি খেলতাছিল। এই রকম ব্যবস্থা থাকলে, আর কে মাসাজ পার্লারে যায়?

—কেন, আপনার বাঙ্গলাদেশী কাস্টমাররা ব্যাংককে এসে এসকর্টদের ডাকে না?

—তা অবশ্য ঠিকই কইছো। ফুলে ফুলে মধু খাওনের সখ আর কী। গল্পে গল্পে তো অনেক বেলা হইলো। একটু বিয়ার খাওন যাউক।

দু বোতল বিয়ার চলে এলো, হাঁক মারার সঙ্গে সঙ্গে।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে চাচা বললেন, যাউক, গলাটা ভিজলো, বকর বকর করতে করতে গলাটা একেবারে শুকাইয়া গেছিলো।

হেঁসে বললাম, বেশ লাগছে আপনার গল্প শুনতে। তারপর?

—তা হইলে গপ্পের বদলে গল্পই শোনো।

—গপ্প তো সবসময়ই খেলা যায় কিন্তু এই রকম মজলিসি অসরের সুযোগ তো কালেভদ্রে পাওয়া যায়।

—এই সাড়ছে! তা হইলে তো আমার মাছ ধরণের ও ইতি হইলো।

আমি একটু কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললাম, ঠিক আছে আপনি মাছ ধরতে যান। আমি চুপটি করে এখানেই বসে থাকি।

—এই দ্যাখো, আবার রাগ করে। আমারও ভালো লাগতাছে সেই পুরানো দিনের কথা কইতে। মনে কইরো না তোমার লেইগ্যাই কইতাছি।

তারপর আর কী? ভোলাদার ফুসলানি, তরুদির বিরক্তি, দিদির স্নেহ, সমুদ্রের দোলানী, ইঞ্জিনের ঘসঘসানি, হাজারো লোকের চীৎকার আর দুই বেলা দই চিড়া খাইতে খাইতে পৌঁছাইয়া গেলাম ইরাবতী নদীর মুখে। ঐ জায়গাটা যেন চেনা চেনা লাগতাছিল—সেই দ্যাশের মত। নৌকা বাইয়া চলছে লুঙ্গি পরা লোকগুলি, বাড়ির দোরগড়ায় নৌকা বাঁধা, বাড়িগুলি অন্যরকম, মাচার ওপর কাঠের তৈরি এইখানের মত। আইস্যা গেলাম রেঙ্গুন।

খেয়ে একটা ঘুম দিয়ে দুটোয় রওনা হয়ে সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছে গেলাম ব্যাংককে।

॥ ১৮ ॥

আমাদের মহাজাতীক কম্পানির বিশ্বজোড়া ব্যবসা। এশিয়াটিক কম্পানিগুলি তদারকি করা হয় হংকং এর অফিস থেকে। ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডোনাল্ড রিডেব, একটা টেলেক্স এসেছে, কাল সন্ধ্যায় আসছে।

রাত্রে ফোন করলাম ওরিয়াণ্টাল হোটেলে।

—হ্যালো, গুড় ইভিনিং ডন্। ফ্লাইট ঠিক সময় এসেছিল? কোন অসুবিধা হয়নি তো?

—না, না এভ্রিথিঙ্গ ওয়াজ ফাইন।

—আমরা কি একসঙ্গে আজ ডিনার খাবো?

—না, আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বো। কাল সকালে কারখানায় যাবো। আটটায় চলে এসো। আমি রেডি থাকবো। আচ্ছা, গুড় নাইট।

ফোনে যেন শুনতে পেলাম, ডন্ বলছে ওয়েইট। হাল্কা…উত্তরও শুনতে পেলাম, ওকে, ডার্লিং।

সকাল আটটায় হোটেলে পৌঁছে দেখলাম, ডন্ রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিসেপশানের কাছে।

হোটেল থেকে বের হবার সময় সদর দরজাটা খুলে ধরল এক সর্দারজি। গাড়ির

নম্বর ও ড্রাইভারের নাম জিজ্ঞেস করলো। বাবুজী, আপ হিঁয়াই কাম্ করতে হায়, ক্যায়া ?

—হাঁ জী। তুম কেতনা সালসে হিঁয়া হায় ?

—বহুৎ সাল। হামারা পাওরাতমে কাপড়াকা দুকান হায়।

—ও কৌন দেখতা ?

—হামারা বিবি।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো। সর্দারিজি দরজা খুলে দাঁড়লো। সেলাম করে বললো, ফের আইয়েগা সাহাব।

এক ঘণ্টার পথ কারখানা, সেই ডন্ মুয়াঙ্গ এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে। পথে যেতে যেতে ডন্ ব্যবসার খুটিনাটি জিজ্ঞেস করলো। শুনে খুশি হলো যে লোকসানের পরিমাণ কমে আসছে আর শিগ্গিরই লাভের আশা আছে।

কারখানা দেখার পর কনফারেন্স রুমে এসে সবাই জমায়েত হলাম। এখানে সব বিভাগের বড়কর্ত্তারা তাদের নিজস্ব বিভাগের পারফরমেন্সের বিশদ আলোচনা করে আগামি বছরের স্ট্রেটেজিক্ প্ল্যান্ দেখালো নানান গ্রাফ্ ও চার্টের মাধ্যমে। মানসিং বললো, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কথা, সিরিসাক প্রডাকশান, জন্ শ্রমিক ইউনিয়ানের সঙ্গে নুতন সমঝোতার কথা আর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার সাতীত সবটার সারমর্ম অল্পকথায় জানালো। জন্ হলো পার্সোনাল ম্যানেজার। ক্যথলিক খৃষ্টান। কাজ করতো আগে আমেরিকান সৈন্যবিভাবে ভিয়েটনামের যুদ্ধের সময়।

ডন্ খুব মনযোগ দিয়ে শুনছিল। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিল, কখনও প্রশংসা করছিল। জন্‌কে জিজ্ঞেস করলো এগ্রিমেন্ট ক বছরের জন্য হয়েছে ?

জন্ বললো প্রতিবারের মত এবারেও এক বছরের জন্য।

—শ্রমিক মজুরি কত বেড়েছে ?

—দশ শতাংশ, যতটুকু দ্রব্যমূল্য বেড়েছে ?

ডন্ জিজ্ঞেস্ করলো, আলোচনা চলা কালে কোন কর্ম্মবিরতি বা স্লো ডাইন হয়েছে কী ?

জন বললো, এর আগে প্রতি বছরই ঝামেলা হতো, কিন্তু এবার কোনও ঝামেলা হয়নি।

আশ্চর্য হয়ে ডন্ জিজ্ঞেস্ করলো, না হওয়ার কারণ কী ?

—কারণ হলো, আমাদের এম. ডির উপর অগাধ বিশ্বাস। ওদের চাকরি না যাওয়ার আশ্বাসে ওরা আশ্বস্ত হয়েছে। তাছাড়া কিছুদিন আগে যে রেল ধর্ম্মঘট হয়ে গেল, তাতে কর্ম্মি ইউনিয়নরা দেখেছে যে সরকার তা কঠোর হাতে দমন করেছে। নেতাদের জেলে পুড়ে কর্ম্মবিরতি বেআইনি ঘোষণা করেছে। তাই সব কর্ম্মিইউনিয়ানই অত্যন্ত সচেতন।

ডন্ দারুণ খুশি হয়েছে পারফরমেন্সে আর সুন্দর নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে বিশ্লেষণভিত্তিক কর্ম্মসূচি দেখে। আমাকে নিভৃতে বললো, তুমি তো দেখছি

থাইদের সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে দিলে। এত তাড়াতাড়ি এদের দিয়ে এত ভালো কাজ করাতে পারবে আমি কখনই ভাবিনি।

আমি বললাম, ডন্ মনে পড়ে, এই কাজটা দেবার আগে তুমি তাজ হোটেলে আমাকে ডেকে দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলে। বলেছিলে এদের যেন আমি তাড়া দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা না করি কারণ এরা ধীরে ধীরে কাজ করতেই অভ্যস্ত। আমি তখন তোমাকে কোনও প্রত্যুত্তর দেইনি। আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে সব দেশের মানুষের মন একই রকম। তাদের একটু সমবেদনা, একটু স্নেহ, একটু শ্রদ্ধা দেখিয়ে সবাই মিলে লক্ষ্যাস্থির করলে, সবাই অনুপ্রাণিত হবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে।

—তোমার কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। প্রত্যেক দেশের একটা নিজস্ব কৃষ্টি থাকে একটা ট্র্যাডিসান থাকে। নিজস্ব একটা চরিত্র থাকে। সবাই সেই বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। জাপানিদের দেখ, কী তাদের দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ আর কর্ম্মানুরাগ, আর দেখ তোমাদের দেশকে।

—আমাদের দেশের লোকদের দিয়েও আমি প্রচুর কাজ করিয়ে নিয়েছি। এখানে একটা সুবিধা আছে, লোকসানের দোহাই দিয়ে কর্ম্মীদের ছাটাই করা যায় তিন মাসের মাইনে ক্ষতিপূরণ দিয়ে।

—তা ঠিকই বলেছো। এই সব সুবিধার জন্যেই তো এখানে প্রতিবছর বিদেশি মূলধন বিনিয়োগ হচ্ছে তিন/চার বিলিয়ন ডলার আর তোমাদের দেশে হয় একেরও কম। একটা তো বাজলো, আমরা খাচ্ছি কোথায়? চারটেয় কিন্তু আমাদের এপয়েণ্টমেণ্ট আছে বিঃ ওঃ আইর (বোর্ড অফ ইনভেস্টমেণ্ট) চেয়ারম্যানের সঙ্গে।

আমরা খাবো, এ. আই. টিতে (এশিয়াটিক্ ইন্স্টিটিউট অফ টেকনলজি)। সিনিয়ার অফিসারদেরও ডেকেছি তোমার সঙ্গে খেতে।

এ. আই. টি ইউনেস্কোর টাকায় তৈরি হয়েছে এশিয়ার ছাত্রদের টেকনলজি পড়াবার জন্যে। ম্যানিলায় আছে এ. আই. এম ম্যানেজমেণ্ট পড়াবার জন্যে। এখানে প্রায় সব ছাত্রদেরই বৃত্তি দেওয়া হয়, আর তাতেই এদের পড়ার ও থাকার খরচ চলে যায়। গ্রাম উন্নয়ণ, কৃষি উন্নয়ণের ওপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে, থাকেও একসঙ্গে পাশাপাশি ঘরে। পাশাপাশি ঘরের মাঝে আছে একটা বাথরুম। খাওয়ার জন্যে রয়েছে ক্যাণ্টিন। জাপান, আর লাল হয়ে যাওয়া দেশগুলো ছাড়া এশিয়ার সব দেশেরই ছাত্র-ছাত্রি আছে।

গেস্টদের জন্যে রয়েছে চার তারার হোটেল। জায়গা থাকলে বাইরের লোকরাও থাকতে পারে। ন হোলের গল্ফ্ কোর্সও আছে। এখানকার ডাইনিং হলেই খাওয়া হবে।

বিরাট ডাইনিং হল। প্রায় একশো লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে। দুদিকের দেওয়াল কাঁচের, ওপর থেকে নীচ অবধি পর্দা। হলের বাইরে দেখা যায় একটা বাঁধানো পুকুর, তাতে ফুটে আছে নানান রঙ-এর সাফলা, আর ভাসছে নানান

রঙের হাঁস।

আমরা বসতেই একটি মেয়ে ড্রিংকের লিস্ট আর ফিক্সড মেনুর কার্ডটা দিয়ে গেল।

ডন্ বিয়ারের ট্যাঙ্কারে চুমুক দিতে দিতে সবাইর সঙ্গে আলাপ করছিল। তাদের কাজের উৎসাহে ও উদ্যমে নিজে উৎসাহিত হয়ে আমার দিকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

আমায় জিজ্ঞেস করলো, জাপানি ফয়েলের আমদানি বন্ধ করবে কি করে? ওটা না করলে তো তোমার বাজার বাড়াতে পারবে না।

—তার জন্য দরকার কিছু মেশিনপত্রের রদবদল, আমার প্ল্যান রেডি আছে, তুমি রাজি হলেই পাঠিয়ে দেবো।

—কত খরচ পড়বে?

—তা প্রায় পঞ্চাশ লাখ।

—ঠিক আছে। তোমার স্কিম পাঠিয়ে দিও।

—অতীশ, এ বছর তুমি লাভ দেখাতে পারবে?

—মনে হচ্ছে পারবো।

—কী করে?

—সিঙ্গাপুরে গিয়ে ফিনিস এজেন্টের থেকে কাগজের পুরোনো অর্ডারের উপর ছাড আদাই করেছি। নূতন সাপ্লাইর দাম কমিয়েছি। হেসে বললাম, অনেক কমিসান পাওনা ছিল যা অর্ডারে লেখা নেই, সেটা কম্পানির নামে আদাই করেছি, আমদানি কাগজের ওপর বেশী শুল্ক চাপানো হয়েছিল। তার জন্য অ্যাপিল করেছি। অফিসার বলেছে পাওনা টাকার দশমাংশ তাকে দিলে সে টাকা ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা করবে। আমি দুইশতাংশ দিতে রাজি হয়েছি। শ্রীলঙ্কা আর সিঙ্গাপুরে কিছু মাল রপ্তানি করেছি। আমরা সমবেত চেষ্টায় লাভ করবোই।

ডন্ সবাইকে আকুণ্ঠ প্রশংসা করে উঠলো।

আমরা খাওয়া সেরে শহরের পথে রওনা হলাম। বি. ও. আই অফিসে যখন পৌঁছলাম তখন বাজে সাড়ে তিনটে। সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন অফিস। কোথাও হাতল ভাঙ্গা চেয়ার, বার্নিস ওঠা টেবিল, ডালা ভাঙ্গা আলমারি নেই। গাদা করা ফাইলের পেছনে বাবুরা চাপা পড়ে যায়নি। চার পাঁচটা কম্পিউটারে সব সংখ্যাতত্ত্বের কাজ হচ্ছে। দিল্লীর উদ্যোগ-ভবনের সাথে কতই না ফারাক। কোথাও টু শব্দটি নেই।

বি. ও. আই সমস্ত শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করে, বাধা সৃষ্টি করে না আমাদের দেশের মত। বিদেশি আমানত নিয়োগের জন্যে এরা নানান সুবিধা দেয়। পুঁজি-পতিদের পেছন পেছন এরাই ঘুরে বেড়ায়। নানান সুবিধা দিয়ে ডেকে আনে। এদের অফিস আছে সিডনি, (অস্ট্রেলিয়ার) ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানি) টোকিও (জাপান) লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লস্ এঞ্জেলস্, তা ছাড়াও আছে সব

এক্সপোর্ট হাউজ। এদের কাজই হোলো বিদেশি ব্যবসাদারদের নানান সম্ভাবনার কথা বোঝানো —সস্তার শ্রমিক, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ানের সীমিত ক্ষমতা, কৃষিজাত ও জলজ প্রাণীর প্রাচুর্য্য, ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বিদেশিদের সুন্দর আবাসন, আমোদ-প্রমোদের নানান ব্যবস্থা। তুলনা করলে আমাদের দেশে এ সবগুলোরই অভাব। তাই এ দেশে যদি বছরে চার বিলিয়ন ডলার বিদেশি মূলধন বিনিয়োগ হয় তবে আমাদের দেশে এক বিলিয়নও হয় না। হংকং, তাইওয়ান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরে শ্রমিকের খরচ বেড়ে যাওয়ায় এখানেই বেশী বিনিয়োগ হবার সম্ভাবনা, বিশেষ করে জাপানিদের। নেহেরুর আধা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর ইন্দিরা গান্ধী নিজে ক্ষমতায় আসার জন্যে যে ব্যাংক জাতীয়করণ করেছিল তার ফলেই আমরা নিজেদের কর্ম্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি, পিছিয়ে যাচ্ছি সবার থেকে।

সেক্রেটারির ডাকে চমক ভাঙ্গলো। স্যার আপনার চা। আপনাদের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট তো চারটেয়। ঠিক সময় আমি ডাকবো।

আমি বললাম, থ্যাংক ইউ।

মহিলা বেশ সুন্দরী। তামাটে রঙ, হলদে সিল্কের ফ্রক, সাদা পেনসিল হিল জুতো, মানানসই কসমেটিক, আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজি, মনে ধরা ইণ্টারনাল ডেকোরের এটাও একটা অঙ্গ।

ঠিক চারটের সময় চেয়ারম্যান সাহেব নিজেই উঠে এলেন তার ঘর থেকে। হেসে হাত ঝাকুনি দিয়ে বললেন, হ্যালো ডন্, হাউ ডু ইউ ডু। আমায় ও জিজ্ঞেস করলেন, রয়, হাউ আর ইউ, লাইকিং আওয়ার প্লেস? চলুন ভেতরে।

ভেতরে সোফায় আরাম করে বসতেই সেই সুন্দরী তিন কাপ কফি ট্রে করে এনে দিয়ে গেল।

আমার মনে পড়লো, একবার উদ্যোগ ভবনে গিয়েছিলাম সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে। করিডরে খইনি টেপা চাপরাশির পাশে একটা বেঞ্চে বসেছিলাম। এপয়েণ্টমেণ্ট ছিল তিনটায়। সাড়ে তিনটায়ও ডাক এলো না। চাপরাশির হাতে পাঁচটা টাকা দিতে, ডাক পড়লো। সেক্রেটারি সাহেব পাঁচ মিনিট কথা বলে বললেন আপনার প্রোজেক্টের ফাইলটা এখনও আমার এক্সপার্টদের কাছ থেকে আসেনি। পনেরো দিন পর খোঁজ নেবেন। আচ্ছা আসুন, আমার একটা জরুরি মিটিং আছে। গুড বাই এণ্ড গুড লাক।

এই ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের শেষ বোর্ড মিটিং-এর রিপোর্টে দেখলাম আপনারা কিছুটা লাভ করেছেন। এই কম্পানি কাইজারের হাতে যে দশ বছর ছিল, ততদিন তো লোকসানই দিয়ে গেছে। আপনাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?

ডন্ বললো, না সে রকম কিছু নয়। তবে জাপানিদের সঙ্গে পেরে উঠছি না।

—কেন, ওদের মালের ওপর তো শতকরা চল্লিশ ভাগ শুল্ক দিতে হয়, তা হলে পারবেন না কেন ?

আমি বললাম, এল্যুমিনিয়াম ইনগটের উপরও তো আমরা চল্লিশ শতাংশ শুল্ক দেই, তেমনি দেই কাগজের উপর। ওটা কমানো দরকার।

—ঠিক আছে, আমি অর্থমন্ত্রীকে নোট পাঠাবো কালই। তবে বাজেটের আগে কিছু হবে না। আমাদের এখানে অনেক এ্যগ্রোইন্ডাস্ট্রিস ও ফুড ইন্ডাস্ট্রিস আসছে, তাতে ফয়েল লাগবে অনেক। আপনারা তার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছেন ?

আমি বললাম, আমরা কিছু মেসিনপত্র বসাচ্ছি। তার জন্য টাকা চাই। মেশিনের উপর যে তিরিশ শতাংশ শুল্ক আছে ওটা না নেওয়াই উচিত। উনি জিজ্ঞেস করলেন, ওগুলো কি নূতন মেশিন না যন্ত্রাংশ ?

আমি বললাম, হ্যাঁ যন্ত্রাংশই বটে।

ভদ্রলোককে চিন্তিত মনে হলো। তাহলে তো মুসকিল। আপনারা এক কাজ করুন আমাকে একটা নোট পাঠান, যে এগুলো এলে আমাদের কত বিদেশি মুদ্রা বাঁচবে বেশী ফয়েল তৈরি করে। আর শুল্ক চালু থাকলে কত আদাই হতো। যদি আপনার প্রোপোজালে আমাদের বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় হয় তা হলে আপনাদের কেসটা আমি খুব জোড় রিকমেন্ড করবো। আর টাকা, রয়েল ইনভেস্টমেন্ট করপরেসানের সেয়ার আছে এখন পয়ত্রিশ শতাংশ সেটা ওরা পয়তাল্লিশ শতাংশ করতে রাজি আছে। তা হলেই তো আপনাদের টাকা হয়ে যাবে।

ডনু বললো, খুব খুশি হলাম আপনার আশ্বাস পেয়ে।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, আপনারা আরও কিছু ইন্ডাস্ট্রি করুণ আপনাদের অনেক সুবিধা দেবো।

—আচ্ছা ভেবে দেখি।

আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার কোনও অসুবিধা হলেই ফোন করে চলে আসবেন। আমরা চাই আমাদের দেশে আরও ইনভেস্টমেন্ট হোক।

ডনু বললো, থ্যাঙ্ক ইউ, আজ তা হলে উঠি। সতীশ আপনার সঙ্গে দেখা করবে, ইমপোর্টডিউটি সম্বন্ধে কথা বলতে ও নতুন এক্সপানসান সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে।

ডনুকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি এসে ভাবছিলাম—যাদের উপর দায়িত্ব আছে তাদের এমনি ক্ষমতা থাকলেই তো তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করতে পারে আর তারা আরও উদ্যোগী হয় উৎসাহিত হয় নিজের দায়িত্ব পালন করে দেশের উন্নতি করতে পারে। আমাদের দেশে সব ব্যপারেই রাজনীতিকরা নাক গলায় আর নিজের স্বার্থটাই বড় করে দেখে। দেশের কথা কেউই চিন্তা করে না। তাই আমরা এগোতে পারছি না। এই দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে অথচ আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষিতের হারও যেমন বেশী, মানও বেশী। এদের চাইতে আমরা অনেক বেশী আত্মনির্ভর।

যে সব এশিয়ায় দেশগুলি তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছে—কোরিয়া, তাইওয়ান, জাপান, হংকং, থাইল্যাণ্ডমালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আর এখন চীন এরা কিন্তু গণতন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করেনি যা আমরা করেছি। গণতন্ত্রে বেশী বিশ্বাসি বলেই কি আমরা এগোতে পারছি না? তাই তো নেতাজি বলেছিলেন, কয়েক বছর আমাদের দেশে মঙ্গলকামী একনায়কত্ব থাকা উচিত হবে, আমাদের শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে আনার জন্যে।

॥ ১৯ ॥

সেই যে একদিন নেত্রার সঙ্গে একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছি, তারপর ও আর আসেনি। দু একদিন ফোনে কথা হয়েছে, কিন্তু দেখা হয়নি নানান কারণে।

এক শুক্রবার ফোন করলো, কী করছেন?

জানালাম কিছুই না। আপনি কি করছেন?

—আমিও কিছুই না। সেই শুক্রবারটা কিন্তু বেশ কেটেছিল। কাল কী করছেন?

—কী আর করবো। গল্ফ খেলতে যাবো।

—চলুন না, রোজ গার্ডেনে খেলতে? আপনি সেখানে খেলেছেন কখনও?

—না খেলিনি। ওখানে কখনও যাইনি।

—তাহলে কাল সকালে চলুন ওখানে গল্ফ খেলে আপনাকে আমাদের দেশের একটা তিন ঘণ্টার ক্যাপসুলে প্রোগ্রাম দেখিয়ে দেবো।

—খুব ভালো হয়, তাহলে।

—সকাল ছ'টায় বের হতে হবে। আমি আমার বন্ধু ভাসনাকে নিয়ে আপনার ওখানে চলে আসবো। আপনি আর একজনকে ঠিক করে নিন।

—তা হলে আর একটু আগে চলে আসবেন। আমরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়বো।

—ঠিক আছে। গুড্ নাইট।

ঠিক ভোর পাঁচটায় ঘড়িটা ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আজ পিয়ালী নেই। নিজেই চা করে ঘুমের জড়তা ভাঙালাম। বাথরুম থেকেই শুনতে পেলাম টুং টাং বেলের শব্দ। খুলতে দেরী দেখে আরও ঘন ঘন ঘণ্টাটা বাজতে লাগলো।

—কী ব্যাপার, এখনও ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি। এই আমার বন্ধু ভাসনা।

নমস্কার করে বললাম, আমি অতীশ। ভাসনা অতি সাধারণ দেখতে, খাঁটি থাইরা যেমন হয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখের আদল মঙ্গোলিয়ানদের মত। লম্বায় নেত্রার চাইতে খাটো। ইংরেজি বলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা, থাই ভাষা মিশিয়ে। চেহারায় পুরুষালীভাব রয়েছে।

—আসুন, আসুন। আপনারা একটু বসুন। আমি ব্রেকফাস্টটা তৈরি করে ফেলি। আজ আমার মেইড ছুটি নিয়েছে।

নেত্রা বললো, সে কী আমরা থাকতে আপনি কেন করবেন? আপনি সব

দেখিয়ে দিন আমরা দুজন মিলে করে ফেলছি। ততক্ষণে আপনি তৈরি হতে পারবেন।'

আমি ওদের সব দেখিয়ে জামা কাপড় পরতে চলে গেলাম। এসে দেখলাম ব্রেকফাস্ট টেবিলে অপেক্ষারত। গ্লাসে গ্লাসে কমলালেবুর রস, স্ক্র্যাম্বল্ড এগ্ অন টোস্ট। খুঁজে খুঁজে বেকন বার করে তাও ভেজে ফেলেছে।

বললাম—সত্যি, মেয়েদের সার্ভ করা খাবারের স্বাদই আলাদা।

ভাসনা বললো—তা হলে বাড়িতে একজন পাকাপাকি মেয়েকে রাখছেন না কেন?

—পাচ্ছি না যে। পেলেই নিয়ে নেবো।

নেত্রা হাসছে, আমায় নেবেন?

—তা হলে তো দারুন হয়। আপনি রাজি আছেন?

—আর কিছুদিন যাক, তারপর বলবো। আর দেরী করলে চলবে না। চলুন। ও ভালো কথা আমাদের চতুর্থজন কে?

—উম্নি বলে এক ভদ্রলোক। ছটা এখনও বাজেনি। ঠিক ছটার সময় উম্নি এসে পড়বে।

ওপর থেকেই দেখলাম উম্নির গাড়ি ঢুকছে।

—চলুন, এসে গেছে উম্নি।

উম্নির বয়েস হবে সত্তরের কাছে। কেরালার লোক। এখানে আছে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। আমরা প্রায়ই একসঙ্গে গল্ফ খেলি। নেত্রা আর ভাসনার সঙ্গে উম্নির আলাপ করিয়ে দিলাম।

ভাসনা মুচকি হেসে নেত্রাকে বললো, তুই খুনু অতীশের সঙ্গে যা। আমি বুড়োর সঙ্গে যাচ্ছি। বেশ ভালো ভাষা থাই বলতে পারেন উনি।

নেত্রা আমার ন্যাভিগেটার হয়েছে। আমার এপার্টমেণ্টের গেটের ঠিক সামনেই একটা দোতালা বাড়ি। যে বাড়িতে একটা বড় থাই পরিবার থাকে। ঐ বাড়িটার সামনে রাস্তার ওপারে একটা বাঁশঝাড়, চাইনিজ বাঁশ, তার পেছনেই ছোট্ট একটা খাল। ঐ বাঁশঝাড়ের নীচে একটা টেবিল আর গোটা চারেক চেয়ার পাতা আছে। ওটাই ওদের ড্রইং কাম ডাইনিং রুম। অতো সকালেই বুড়ো বুড়ি সেই ড্রইংরুমে এসে বসেছে, পায়ের কাছে কালো কুকুরটা কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে আছে।

একজন সাহেব ওয়াকম্যান কানে লাগিয়ে জগিং করছে সরটনুসন দিয়ে। একটি অল্পবয়সি থাই মেয়ে বেরিয়ে এল এক সাহেবের বাড়ি থেকে; কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে হাতের টাকাগুলো রাখতে রাখতে। মোড়ের মাথায় রাস্তার ধারের খাবারের দোকানগুলোয় ব্রেকফাস্ট তৈরি সুরু হয়ে গেছে। একটি মেয়ে চেয়ারগুলো গুছিয়ে রাখছে।

প্রয়েনচেট রোডে গাড়ির ভিড় এখনও আরম্ভ হয় নি। সেণ্ট্রাল, সোগো ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর ছাড়িয়ে ইরাওয়ান হোটেলের কাছে এসেছি। এখানে ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্তির কাছে কয়েকজন ভক্ত পুজো দিচ্ছে। সব ভক্তই থাই।

নেত্রা জিজ্ঞেস করলো, 'কি চুপ কেন ?'

—ভাবছি, আপনার সঙ্গে অজান্তে বড্ড ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছি। সেটা কি উচিত ?

নেত্রা অবাক হয়ে বললো, উচিত অনুচিত দেখে কেউ ঘনিষ্ঠ হয় না। ওটা অজান্তেই হয়। আরে আরে বাঁ দিকে গাড়ি ঘোরান। সাথন রোড দিয়ে গিয়ে নিউ রোডে পড়ে, দক্ষিণে কিছুটা গিয়ে, চাউ পিয়াও নদী পার হয়ে যেতে হবে। এই যে সাথন রোড দেখছেন, এটা কিছুদিন আগেও খাল ছিল। সেই খালের কিছুটা এখনও আছে কংক্রিটের ঐ দেওয়ালটার পেছনে।

ব্রিজের ওপর থেকে চাউপিয়াও নদীটা সুন্দর দেখাচ্ছিল। দূরে ক্লঙতয়ের পোর্ট দেখা যাচ্ছে আর নদীতে দেখা যাচ্ছে সব লঞ্চ আর মোটর বোট। ওরিয়েন্টাল হোটেলের সামনে দাঁড়ানো রয়েছে সুন্দর দুধ সাদা একটা বিরাট লঞ্চ। নেত্রাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওটা সব টুরিস্টদের নিয়ে যায় আয়োথিয়া পর্যন্ত পরে বার্ড স্যাঙচুয়ারী দেখায়। লঞ্চটা পুরো বাত্যানুকুল করা ? ভালো লাঞ্চ দেয় পথে।

নেত্রা বললো,—এই নদীপথেই এসেছে চিনা, ভারতীয়, পর্তুগীজ, স্প্যানিস, ইংরেজ আর ফরাসি বনিকরা, আর সে সব দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি। আপনাদের গঙ্গা, ইংলণ্ডের টেমস, জার্ম্মানীর রাইন, রাশিয়ার ভল্গা, চিনের ইয়াং-সি-কিয়াং আর আমাদের চাউপিয়াও নদী। নদীর ওপারটা হচ্ছে থনবুড়ি।

বললাম, এত প্রিয় নদীটাকে তো আপনারা বাড়ি ঘর দিয়ে প্রায় শ্বাসরোধ করে রেখেছেন।

—তা ঠিকই। এবার সোজা আধঘণ্টা চালিয়ে গেলে আমরা রোজ গার্ডেনে পৌঁছে যাবো।

থনবুড়ি ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছি। গ্রাম বলতে আমাদের দেশের মত নয়—পরিচ্ছন্ন, ছাড়া ছাড়া বাড়ি। সবুজ ধানের ক্ষেত দিকবলয় পর্যন্ত বিস্তৃত মাঝে মধ্যেই কমলালেবুর বাগান। কিছু দূরে দূরে দেখা যায় ওয়াট।

ঘাড় ঘুরিয়ে বান্ধবীর গাড়ি দেখতে না পেয়ে নেত্রা চিন্তিতভাবে বললো, একটু দাঁড়ান। ওদের গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না।

গাড়িটা পাশ করে দাঁড় করালাম একটা দোকানের সামনে। দোকানে বিক্রি হচ্ছে ডাব, তাজা কমলা, আর ছোট ছোট থলে ভর্তি চাল। সব জিনিসগুলো সুন্দর ভাবে থাকে থাকে সাজানো। দোকানের মেয়েটি এসে বললো, কিছু নেবেন ?

নেত্রাকে বললাম, আসুন ডাব খাওয়া যাক।

ডাবের শুধু মুখটাই কাটা নয়, চারিদিকের চোকলাও কেটে পরিস্কার করা। মুখ কেটে স্ট্র ঢুকিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিল। জল খাওয়া শেষ হলে একটা চামচ দিয়ে লেওয়াটা চেঁছে দিল। পয়সা দিলে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালো ? এদের সব কাজেই একটা রুচিবোধ আছে।

এর মধ্যে ভাসনাবাও এসে পড়লো।

জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?

নেত্রা বললো, তোদের জন্যেই তো। এত দেরী হচ্ছিল কেন?

নেত্রার কানের কাছে মুখ এনে বললো, আমার 'খনরথের' (খনু-মানুষ, রথ-গাড়ি) বয়েস যে তোর খনরথের চাইতে অনেক বেশী। তাছাড়া আমাকে জমাবার খুব চেষ্টা করছে। ভদ্রলোকের বৌ নেই জানিস তো।

কিছুদূর গিয়ে ডান দিকে সরু রাস্তা। ছোট্ট ছোট্ট বাড়িগুলোর সামনে এক টুকরো করে বাগান। উল্টো দিক থেকে দুটো হাতি গজেন্দ্র গমনে আসছে। হাতি কিছুতেই রাস্তা ছাড়বে না। তাই আমাকেই পাশে নেমে দাঁড়াতে হলো। আর একটু এগিয়েই ক্লাবের চত্বর। চারিদেকে ঝাউগাছের ছড়াছড়ি। এত সকালেও অনেক গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের গাড়ি দাড়াতেই চারজন মেয়ে ক্যাডি এসে দাঁড়ালো। ওদের সবারই পরনে কাঁচা হলুদ রঙের সদ্য ইস্ত্রী করা ফুল প্যান্ট, আর ফুলহাতা সার্ট। সার্টের হাতটা একটু লম্বা হয়ে হাতের ওপরটা ঢেকে রেখেছে, যাতে হাতটা রোদে না পোড়ে। পায়ে সাদা পরিস্কার স্নিকার, মাথায় বাঁশের টুপি।

ওদের মধ্যে যে সবচাইতে সুন্দরী সে দৌড়ে আমার হাত ধরে বললো, 'ফমু খুন ক্যাডি। ও কে?'

নেত্রা ফিস্ ফিস্ করে ভাসনাকে বললো, মাই গড্। সি উইল বি মাই রাইভেল।

মেয়েটাকে ভালো করে নজর করলাম। বয়েস আঠারো উনিশের বেশী নয়। দুধে আলতায় রঙ, লাল টকটকে লিপস্টিক ঠোঁটে, হাতেয় নখগুলো সুন্দর করে ছেটে তাতে রঙ লাগানো, কানে দুটো পাথর বসানো লম্বা দুল, ঘাড় অবধি ছাটা চুল। অমন সুন্দর ক্যাডিকে কী, না করা যায়। ক্লাব হাউজে গিয়ে দুই হাজার বাট (এক হাজার টাকা) দিয়ে পাস নিলাম চারজনের জন্যে। জুতো বদলে বের হয়ে দেখলাম ক্যাডিরা কেউ নেই।

আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়ায় নেত্রা বললো, ওরা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে, চিন্তা নেই আপনার।

সত্যি, ওরা আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। বেশ ভিড়, বিদেশিদের ভিড়ই বেশী, জাপানীতে ভর্তি। ওরা গল্ফ্ খেলতে ভীষণ ভালবাসে। দেশে ওদের গল্ফ্ খেলতে অনেক খরচ, কারণ ফাঁকা জায়গার অভাবে। গল্ফের মাঠ খুবই কম। ওরা অনেকে ছুটিতে এখানে চলে আসে গল্ফ্ খেলতে। প্লেন ভাড়া দিয়েও নাকি সস্তা পড়ে। তাছাড়া এখানে কাজ করেও অনেক জাপানি।

ঠিক হলো আমি আর নেত্রা একদিকে আরেক দিকে ভাসনা আর উর্মি।

চমৎকার কোর্স। ফেয়ার ওয়ে সবুজ দুর্বা ঘাসের কার্পেট। বড় বড় ঝাউগাছ লাগিয়ে কোর্সটাকে সঙ্কির্ণ করে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মধ্যে আছে পুকুরে। গ্রীন-

গুলি বেশ নরম।

আমার ক্যাডি সুন্দরই নয়, খেলাও সুন্দর বোঝে। আমায় ঠিক ঠিক ক্লাব এগিয়ে দিচ্ছে, বলে দিচ্ছে কোথায় মারতে হবে। গ্রীনে বল গেলে লাইন দেখিয়ে দিচ্ছে। ভালো মারলে হাত তালি দিয়ে বলছে 'সু-আই।' কখনও—'ডী-মাগ' (খুব ভালো) বলে উৎসাহিত করছে।

নেত্রা একটু দূরে সরে গেলেই আমার কাছ ঘেসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, আমার নাম কি, কোথায় থাকি, কি করি?

আমিও ওকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, ওর এক বুড়ি মা আছে, বাবা ছেড়ে চলে গেছে, ছোট্ট একটা ভাই আছে। ওর বেশ কষ্ট করেই চলে।

ও একসময় জিজ্ঞেস করলো, মাস্টার, 'ফম্ মী ফানাইয়া (তোমার স্ত্রী আছে)

আমি বললাম, 'মাই মী।' 'ফম্ মী স্বামী।' (তোমার স্বামী আছে)

—মাই মী স্বামী বলে, দুধ-সাদা দাঁত বের করে হেসে ফেললো। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'খুন্ ছু আরাই ম্রাপ?' (তোমার নাম কি?)

—ফম ছু আনঙ্গ।

নেত্রা কাছে এলেই জিজ্ঞেস করে, অতো কী কথা বলছিলেন ওর সঙ্গে। বলের দিকে না তাকিয়ে তো কেবল ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন দেখছি। আমরা যে হারছি তার খেয়াল আছে? এ পর্যন্ত পাঁচশো বাট হারছি। এবার দয়া করে একটু ভালো করে খেলুন।

আনঙ্গ একটু মুখ ভেঙচে সরে গেল।

ঠিকই বলেছিল নেত্রা। আমার নজর ওর দিকেই বেশী ছিল। তারপর থেকে খেলায় মন দিলাম। আনঙ্গ খুব খুশি।

নেত্রা কাছে এলে ওকে বললো, দেখেছ, আমার মাস্টার কি ভালো খেলছে। আপনি এবার একটু মন দিয়ে খেলুন। তা হলে আমরা সবগুলো হোলই জিততে পারবো। আপনার নজর তো শুধু আমাদের দিকে। বলের দিকে নজর দিন।

নেত্রা হেসে বললো, দেখেছেন কি রকম বদলা নিল।

ন নম্বর হোলে আমরা জিততে পারলে সমান সমান হয়ে যাবো। পাঁচ স্ট্রোকের লম্বা হোল। তৃতীয় মারে ফ্ল্যাগের কাছে পেঁছিতে পারলে জিতে যাবো। উমি তিন মারে গ্রীণের ধারে আছে।

আনঙ্গ পা মেপে গ্রীণ পর্যন্ত গেল। তারপর ঠিক ক্লাব দিয়ে বললো, ফ্ল্যাগ থেকে এক ক্লাব দূরে ড্রপ ফেলবেন। নিন, প্র্যাকটিস্ সুইঙ্গ নিন।

না না, মাই র‍্যাও র‍্যাও (অত তাড়াতাড়ি না)

গর্তের থেকে এক হাত দূরে বলটা গিয়ে থামলো। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠলো এবার বার্ডি। আমাদের জিৎ।

ন হোলের পর বসবার জায়গা আছে। আছে তাতে টয়লেট। নানান রকম ড্রিংক পাওয়া যায়, কিছু খাবারও।

অনঙ্গকে জিজ্ঞেস করলাম, আহান কিন খাও (কী খাবে ?)

আনঙ্গ বললো, সকালে কিছু খেয়ে আসিনি। আপনি খাওয়াবেন ?

—নিশ্চয়।

ও এক বাটি ক্যুইতিও, ডিম ভাজা আর একটা কোক নিল। আমি একটা কোক নিলাম।

উর্মি বললো, অতীশ তুমি একটা দারুণ ক্যাডি পেয়েছ।

—তা পেয়েছি। আচ্ছা, এরা এমন কিছু তো রোজগার করে না, তাহলে এত সাজে কি করে ?

—প্যাকেজিং ভালো না হলে কি আজকাল জিনিস বিক্রি হয়! জামা কাপড় জুতোতো ক্লাব থেকে দেয়। এখানে একটা ভালো হোটেল আছে। টুরিস্টরা ওখানে থাকে। সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে, গোলাপের মিস্টি গন্ধ মেশানো বাতাসের নিঃশ্বাসে বুক ভরে। সুইমিং পুলের ধারে সাদা রঙটাকে তামাটে করে মাঝে মাঝে সাঁতার কাটে তারপর তোমার মত একজন সুন্দরী ক্যাডির কাঁধে ব্যাগ চাপিয়ে গলফ্ খেলে। খেলা শেষে ক্লান্ত হয়ে সঙ্গে নিয়ে যায় সেই ক্যাডিকে। সারারাত ডলাই মলাই করে সমস্ত ক্লান্তি দূর করে লদকা-লদকি করে পাশটিতে ঘুমিয়ে পড়ে, এ রকম টুরিস্ট আকর্ষণ কোথায় পাওয়া যায়, বলতে পারো ?

— শুনেছি ফিলিপাইনও এ রকম।

—এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন সাজানো গোছানো আর জগৎজোড়া প্রচার কোথাও নেই।

খেলা ভালই হচ্ছিল। এক ফাঁকে আনঙ্গ বললো, মাস্টার আপনি তো 'ফু চাটকানু' (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) তো আমায় একটা কাজ দিন না ?

—তুমি কতদূর পড়েছো ?

—আমি লিখতে পড়তে পারি। কারখানার কাজে অত পড়াশোনার দরকার কী ?

—আমার কারখানা তো অনেক দূর। তুমি থাকবে কোথায় ?

একটু চিন্তা করে বললো তা অবশ্য ঠিক। তা হলে আপনার বাড়ির কাজ দিন। আমি আপনার সব কাজ করে দেবো।

—আমার তো মেইড আছে।

—সে আপনাকে খেলাতে পারে ? সে খেলার পর আপনার নুয়াৎ (ম্যাসাজ) করে দেয় ? আমার মত সে সুন্দর দেখতে ?

—কোনওটাই নয়।

—আমি আপনার সব করে দেবো। অবশ্য যে আছে তাকে ছাড়ানোটাও ঠিক হবে না। আমার ভাগ্যটাই খারাপ।

খেলার শেষে আমরাই জিতলাম পাঁচশো বাট। আমি আনঙ্গকে সেই টাকাটা দিতে গেলে ও কিছুতেই নিতে চাইল না।

—না, মাস্টার আপনি ভালো খেলেছেন ওটা আপনারই। আমার পাওনা একশো

বাট আমি ক্লাব থেকেই পাবো। আমাকে সামান্য বকশিস দিলেই আমি খুশি।

আমি জোর করে ওর সার্টের ওপরের পকেটে সে নোটটা ঢুকিয়ে দিলাম। হাতটা একটু শিরশিরিয়ে উঠলো।

ও একটু মুচকি হেসে আমার হাতটা জোরে বুকের কাছে চেপে ধরে বললো, 'থ্যাপ্ খুন য়াপ।' আবার আসবেন। আমায় কিন্তু নেবেন। সেদিন ঐ ফুইঙ্গকে আনবেন না।

ও ব্যাগটা গাড়ির বুটে রেখে দাঁড়িয়ে রইল আর এক রাউণ্ডের আশায়।

ক্লাব ঘরে ফিরে এলাম। ওদের তিনজনের মাঝে গিয়ে আমিও বোসলাম। উম্নি চারটে গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিল। আমরা সবাই তুলে নিলাম। নেন্না চুপ করে বসে রইলো।

ভাসনা বললো, কি রে রাগ করেছিস কেন? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আরও আনঙ্গের সঙ্গে ঢলাঢলি করুন। গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কী কথা হচ্ছিল? নেন্না তো দেখে ফেলেছে, ওর পকেটে আপনি টাকা ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন। আপনারা পুরুষরা সত্যি পারেন ও।

—দেখুন এই জিতটা ওরই জন্যে। তাই ভাবলাম ওটা ওরই প্রাপ্য। ও নিতে চাইছিল না। তাই পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম।

খাবার পরও নেন্না আমার সঙ্গে কথা বলছিল না। আমি বললাম, নেন্না, আপনি কিন্তু আমাকে প্রোগ্রাম দেখাবেন বলেছিলেন।

নেন্না গম্ভীর—আজ আর হবে না। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি ওদের সঙ্গে ফিরে যাবো।

—তা হলে তো আমার দেখাই হবে না। আমি তো পথই চিনি না। ফিরবো কি করে?

আনঙ্গ আপনাকে পৌঁছে দেবে। ওর সঙ্গে গলাগলি করে প্রোগ্রাক দেখবেন। আগাম পয়সা তো দিয়েই দিয়েছেন। ভাসনা আর আমি অনেক সাধ্য সাধনা করে ওর মান ভঞ্জন করলাম। মেঘ তবুও কাটলো না সম্পূর্ণ।

ভাসনা উম্নির সঙ্গে চলে গেল, ওর নাকি কার সঙ্গে ভেট্ আছে।

আমি নেন্নাকে নিয়ে রোজ্ গার্ডেনে গেলাম।

॥ ২০ ॥

নেত্রার মন কিছুটা হাল্কা হয়েছে। কিন্তু মুখে কথা নেই।

—কী, কথা না বললে আমি পথ চিনবো কি করে ?

—চলুন না সোজা বড় রাস্তাটা পার হয়ে। এবার দেখতে পেয়েছেন তো সাইন-বোর্ডটা।

গাড়িটা পার্ক করে নেত্রাকে ধরে নামালাম।

সত্যিই রোজ গার্ডেন, গোলাপ বাগ, অনেকটা মোগল গার্ডেনের মত। নানান রঙের নানান আকারের অসংখ্য গোলাপ। জানা অজানা নানান রঙের ফুলের বাহারও চারিদিকে। মাঝে সবুজ ঘাসের লন। এক খন্ড কালো মেঘ দূরের নারকেল গাছের আড়াল থেকে উঠে আসছে। নেত্রার সোনালী মুখেও সেই মেঘের ছায়া। একটা ঘুঘু ঘু-ঘু ডেকে চলেছে। আম গাছের আড়াল থেকে একটা কোকিল কুহু কুহু শব্দে তার প্রিয়াকে ডাকছে। প্রিয়ার দেখা নেই। আমার রাধার মুখেও রা নেই। দমবন্ধ করা শহুরে আবহাওয়া থেকে এসে এই শান্ত, সুন্দর পরিবেশ মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম।

কোথা থেকে একটা ম্যাকাও পাখি উড়ে এসে নেত্রার কাঁধে বসে মাথা ঠুকরে বললো, গুড্ আফটারনুন, ওয়েলকাম।

নেত্রা ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ম্যাকাও পাখিটা ক্যা ক্যা করে উড়ে গেল।

আমি ওকে কাছে টেনে হেসে বললাম, এই যে বীরাঙ্গনা, পাখির আদরে ভয় পেয়ে গেলে ?

—বারে ! ও যে আমার মাথায় ঠোক্কর মারছিল। আর একটু হলে তে মাথাটাই ফুটো হয়ে যেতো। আপনি তা হলে খুব খুশি হতেন, তাই না ?

—মোটেও না। আমার সার্ট ছিড়ে তোমার মাথা বেঁধে দিতাম। জিভ দিয়ে চেটে তোমার রক্ত পরিস্কার করতাম।

—খুব হয়েছে। কত দরদ !

—চল, একটু বসি গিয়ে ঐ আমগাছটার তলায়।

ও আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি ওর মাথায় বিলি কাটতে কাটতে দেখছিলাম। নানান রঙের প্রজাপতির মধু আহরণ।

নেত্রার গালে হাত বুলিয়ে বললাম, কেমন লাগছে ?

—খুব ভালো। আমার মন কিন্তু চলে গেছে অনেক দূরে অনেক পেছনে ; যেখানে তুমি নেই আছে অভিজিৎ এমনি করেই আমরা বসে থাকতাম, নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে।

ওর গালের ওপর নেমে আসা আঙুলটা কখন অজান্তে ওর ঠোঁটের ওপর চলে এসেছিল। আমি কৃত্রিম চীৎকার করে আঙুলটা সরিয়ে নিলাম।

ও হেসে বললো, বেশ হয়েছে! কুমারী মেয়ের ঠোঁটে কী হাত দিতে আছে? দেখি আঙুলটা। সত্যিই তো দাগ বসে গেছে। আই এ্যাম সরি। তোমার ব্যথা নেই তো?

—তা একটু আছে বই কী। হাতের ব্যথা তো কমে যাবে। কিন্তু বুকের ব্যথার কী হবে?

নেত্রা হেসে বললো, আমি মালিস করে দেবো তা হলেই কমে যাবে।

ঘড়ি দেখে বললো, চল এবার। কিন্তু হস্তশিল্পের প্রদর্শনী আছে সেগুলো দেখে ভেতরে ঢুকবো।

হস্তশিল্পের প্রদর্শনীতে শিল্পী সামনে বসে তৈরী করে দেখাচ্ছে। গুটিপোকা থেকে সিল্ক, তার থেকে সুতো হাত তাঁতে কাপড় বোনা, পাতলা মোষের চামড়া কেটে কেটে নৃত্যরতা মেয়েদের ছবি, যা দিয়ে ওরা ছায়ানৃত্য 'নাঙ্গইয়াই' দেখায়, বেত আর বাঁশ দিয়ে নানান আসবাবপত্র, কৃত্রিম ফুল, পাতা গাছ তৈরি। এক জায়গায় চারজন ছেলে একটা বেতের বোনা বল দিয়ে খেলছে—ঘাড়, হাঁটু, মাথা দিয়ে মেরে নেট পার করছে। খেলার নাম 'টকরাও'। এরপর আমরা অডিটোরিয়ামে ঢুকলাম। অডিটোরিয়াম রবীন্দ্রসদনের মত পাকা দালান নয়, খড় ছাওয়া আটচালা, কাঠামো অবশ্য লোহার। বসবার জন্যে আছে গ্যালারী। প্রত্যেক দর্শকের জন্যে একটা করে তালপাতার হাত পাখা, যদিও মাঝে মাঝে প্রপেলার ফ্যান আছে। মাটি থেকে উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে খোলা স্টেজ।

প্রথমে হলো থাই নাচ। সুন্দর নাচের পোশাক অনেকটা ভারতনাট্যমের মত, মাথায় সব সুন্দর কাজ করা জরির মুকুট। নাচ রামায়ণভিত্তিক। রামায়ণকে এরা বলে রামাকিয়েণ। অশোক বনে হনুমানের সীতাদর্শন, লংকাদহন, তোষাকান্তের রাবণের) সঙ্গে রামের যুদ্ধ। হনুমান মুখোশ পরেছে, দেখতে লম্বা লেজ। হনুমানের নাচ মানে লাফ ঝাঁপ। তোষাকান্তের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত। ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় ভাষ্য।

নাচের অঙ্গভঙ্গি ভারতীয় নাচের মতই। কিন্তু পায়ের কোনও তাল নেই। তাই পায়ে ঘুঙুরও নেই। নাচের সঙ্গে সঙ্গত করছিল ঢোল, করতাল, একতারা, এক ধরণের সেতার, বাঁশের বাঁশি, আর কাঠের একটা বাদ্যযন্ত্র যার নাম 'পাই-নাই'। একটি ছোট কাঠের নৌকের ওপর কয়েকটা বিভিন্ন মাপের কাঠের টুকরো সাজানো আছে একটা লম্বা কাঠের ওপর। ঐ লম্বা কাঠের টুকরোটা নৌকোর ওপর বসানো। কাঠের ফালিগুলোর এক দিকে একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে মারলে ওটা কাঁপতে থাকে লম্বা কাঠটার ওপর ভর দিয়ে আর তা থেকে হাওয়ায় লাগে কাঁপুনি, আর সেই কাঁপুনি থেকে সৃষ্টি হয় সুরের বাজনা।

নেত্রা বললো, তোমাদের কানে আমাদের বাজনা বেসুরো শোনাবে, কারণ আমরা

চিনাদের মত পাঁচটা স্বরলিপি ব্যবহার করি আর তোমরা ইউরোপিয়দের মত ব্যবহার কর আটটা।

এরপর এল হাতির পিঠে একটি ছেলে। আগে আগে চলেছে ঢোল করতাল নিয়ে বাজানদার। সঙ্গে আছে বরযাত্রীর দল। কনে এলো ডুলিতে। মেয়ের মা বরকে নামালো হাত ধরে হাতির পিঠ থেকে। বরের পরনে মালকোচা দিয়ে ধুতি হাটু পর্যন্ত ওঠানো, গায়ে গলাবন্ধ হাফ হাতা কোট, মাথায় পাগড়ি। কনের পরণে রঙিন 'পাসিন' অর্থাৎ লুঙ্গি গায়ে ব্লাউজ, মাথায় মুকুট। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৈদিক মন্ত্রপাঠ করলো, তারপর বৌদ্ধ 'প্রা'। (প্রধান সন্ন্যাসী) সৎ জীবন, সৎ চিন্তা, সৎ সঙ্গ করার উপদেশ দিয়ে দুজনের হাত একটা সুতো দিয়ে বেঁধে দিল। কুশের গুচ্ছ দিয়ে গঙ্গার জল ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি বলে সবাইর গায়ে ছিটিয়ে দিল। এক বুড়ি শঙ্খ থেকে জল ঢেলে দিল কনের আঁজলায়। বর কনে হাত ধরে এগিয়ে এসে সবাইর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে চলে গেল। সন্ন্যাসীদের পাত্র ভরে ভিক্ষা দেওয়া হলো।

আমি নেব্রাকে বললাম, এ যে প্রায় আমাদের দেশের বিয়ের মতই তোমাদের বিয়ে।

—বড়লোকদের বিয়েতে অবশ্য আজকাল অনেক পাশ্চাত্য প্রভাব এসে গেছে। হেসে বললো, আমার যদি বিয়ে হয় তা হবে কোনও এক হোটেলের ব্যাংকয়েট হল ভাড়া করে। আমার পরণে থাকবে সাদা সিল্কের লম্বা ফ্রক, লম্বা ওড়না মাটিতে লুটোবে, মাথায় থাকবে সুন্দর মুকুট। বর আসবে সাহেবি পোশাকে। মিলিট ব্যান্ড বাজবে। গেস্টরা এলবামে আশীর্বাদ লিখে সই করবে। উপহার গ্রহণ করবে একজন লিস্টে নাম ঠিকানা লিখে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত হয়তো থাকবে না। ড্রিংক আর ডিনারের অঢেল বন্দোবস্ত। হোটেলের ব্রাইডেল সুইটেই বর কনে রাত কাটাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামে কি ছেলে মেয়ের মা বাবা বিয়ে ঠিক করে?

—সেটা আজকাল উঠেই গেছে। মেলায়, উৎসবে, হাটে বাজারে হয়তো দুজনের দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা তারপর ঘর বাঁধার বাসনা। তখন দুজনের বাবা বিয়ের দিন স্থির করে।

—যৌতুক দেওয়ার প্রথা আছে?

—না, সে রকম কিছু নেই।

—তোমাদের বিয়েতে কি রেজিস্ট্রি করা হয়?

—গ্রামে জেলা অফিসে গিয়ে বিয়ে নথিভুক্ত করা হয়।

এর মধ্যে দুটে মেয়ে, এসে গেছে মালকোচা মারা ধুতি পরে, হাতে তরোয়াল নিয়ে। দুজনের দারুণ যুদ্ধ সুরু হলো। তরোয়ালে ঠোকাঠুকি লেগে আগুনের ফুলকি ছুটছিল। শরীরে আঘাত লাগলে আর রক্ষা নেই।

—তোমাদের দেশের মেয়েরা বুঝি যুদ্ধে যেতো?

—তা তো যেতোই।

—আর সেই দেশের মেয়ে হয়ে তুমি ম্যাকাও পাখির একটু চুমু খেয়ে ভয় পেয়ে গেলে।

নেত্রা আমার বাহুতে আলতো চাপড় মারলো——আবার, সেই এক কথা।

এর পর এলো দুটো ছেলে, একজনের হাতে লাঠি আর একজনের হাতে তরোয়াল। দুজনের তুমুল যুদ্ধ। তরোয়ালধারী মারছে তরোয়াল ঘুরিয়ে আর লাঠিয়াল তা আটকাচ্ছে লাঠি দিয়ে। অদ্ভুত কেরামতি লাঠিয়ালের। আমাদের গ্রামেও ঐরকম লাঠিয়াল দেখেছি। হারু মণ্ডল এককালে ডাকাত ছিল। পরে বাবার লাঠিয়াল হয়েছিল। আমাকে লাঠি খেলা শেখাতো। এমন জোরে সে লাঠি ঘোরাতো যে লাঠিটা দেখাই যেতো না। পাকা লাঠিটার মতই শক্ত ছিল তার শরীরটা। শুনেছি সে লাঠি দিয়ে বন্দুকের গুলি আটকাতে পারতো।

এরপর বক্সিং। স্টেজের এক কোণা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বক্সার দুজন এলো খালি গা খালি পা, হাফ প্যান্ট পরণে, হাতে গ্লাবস্। ওরা হাতে হাত মেলালো, রেফারি বাঁশি বাজালো। রিং এর চারিদিকের লোকেরা হল্লা আরম্ভ করলো। ঘুষোঘুষি চলছে আর তার মাঝে চলছে পাঁচ শিক্কা ওজনের লাথি। এরা হাত পা দুটোই চালায়।

সব শেষে লাঠি দিয়ে নাচ। চারজন লোক দুটো লম্বা লাঠির দুই মাথা ধরে হাঁটু ভাজ করে বসলো। ওরা লাঠি দুটো একবার ফাঁক করে ধরে তারপরই একত্র করে শব্দ করে তাল দেয়। চারটে মেয়ে কোমরে হাত দিয়ে কখনও একজন আর একজনকে ধরে কখনও হাততালি দিয়ে লাঠির মাঝখানে লাফিয়ে এসে দাঁড়ায়, আবার পরমুহূর্তেই লাফিয়ে বেরিয়ে আসে। আমাদের দেশের নাগারাও এমনি নাচ নাচে।

—জানো নেত্রা, আমাদের দেশে এমনি নাচ গান, হাতের কাজ, মার্শেল আর্ট কতই না আছে, কিন্তু এমনি ঠাসা প্রোগ্রামের বন্দোবস্ত নেই টুরিস্টদের জন্যে, যেমন আছে তোমাদের এখানে। এগুলো কি টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থা?

নেত্রা বললো, না, প্রাইভেট। টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট অবশ্য সাহায্য করে, যেমন সস্তায় জমি দিয়েছে, বিনা সুদে টাকা দিয়েছে, হয়তো লাভের ওপর আয়কর ছাড় দিয়েছে।

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামনেই একটা ছোট্ট জলাশয়, সিমেন্ট বাধানো। অল্প জলে কতগুলো বড় বড় কাঠের গুঁড়ি রাখা আছে জলের ধারে। দুটো হাতি। পাড়েও আছে কয়েকটা কাঠের বড় বড় গুঁড়ি। একটা হাতি শুঁড় দিয়ে একটা গুঁড়ি পেঁচিয়ে জলে ফেলে দিল। আর একটা হাতি জল থেকে মাথা দিয়ে ঠেলে সেটা তুলে আনলো পাড়ে। জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে হাতির ব্যবহার দেখাচ্ছে বিদেশি টুরিস্টদের।

সেই কোকিলটা এখনও তার প্রিয়ার খোঁজ পায় নি, তার খোঁজে ডেকেই চলেছে।

দিনান্তে আরও কত রকম পাখি ফিরে এসেছে খাদ্যান্বেষণের পালা শেষ করে। চার পাঁচটা ম্যাকাও পাখি ক্যাক্ ক্যাক করছে। একটা হাতি তার ছোট্ট বাচ্চাটাকে শুঁড় দিয়ে আদর করছে। বাচ্চাটা একটু দূরে সরে গেলে অস্থির হয়ে উঠছে। কি প্রগাঢ় মাতৃস্নেহ।

আমি বললাম, চল, নেত্রা আমরাও এবার বাড়ি ফিরি।

আমার হাতটায় একটা চাপ দিয়ে বললো, চল, ভালোই কাটলো।

ওর মুখটা তুলে ধরে বললাম, আজ আপনি থেকে তুমিতে নামলে কেন ?

নেত্রা আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—ইচ্ছে হয়েছিল তাই। তুমি যদি আপনিতে ঠেকে থাকতে তা হলে আমিও ফিরে যেতাম আপনিতে।

গাড়ির কাছে এসে বললো, এবার আমি চালাই। অচেনা রাস্তায় তোমার অসুবিধা হবে।

—ঠিক আছে। এতে আমার আর একটা সুবিধা হবে।

–কী সুবিধা ?

—তোমায় টিজ্ করতে পারবো।

—এই, তা হলে কিন্তু এক্‌সিড্যাণ্ট হয়ে যাবে। সাবধান।

টিজ্ অবশ্য কিছুই করা যায় নি, কারণ বাকেট সিট্ মাঝখানে গিয়ার সিস্টিং রড। গ্রাম মধ্যের লম্বা পথ পেরোতে বেশী সময় লাগলো না। কিন্তু যতই ব্যাংককের কাছাকাছি যাচ্ছি ততই গাড়ির ভিড়। ম্যাসাজ পার্লার, আর ডিসকথিকের হলগুলোর সামনে লাল নীল ছুটন্ত আলোগুলো হাততালি দিয়ে ডাকছে। ফুটপাথের খোলা বাজারে ছুটির ভিড় জমেছে।

সাথন্ রোডে এসে গাড়ির গতি আরও কমে গেল। রাম দি ফোর আর সাথন্ রোডের মোড়ে লাল সংকেতে গাড়ি থেমে গেল। নেত্রা তাড়াতাড়ি করার জন্যে লেন চেঞ্জ করলো। অমনি একটা মোটর সাইকেল এসে ওর পাশে দাঁড়ালো, আরোহি একজন পুলিশ ইন্সপেক্টার। নেত্রার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে বললো, আর এরকম-ভাবে লাইন চেঞ্জ করবেন না। তা হলে ফাইন করে দেবো। এবার ছেড়ে দিলাম।

একটু পরে একটি অল্পবয়সি মেয়ে এগিয়ে এলো আমার জানলার পাশে। এক গুচ্ছ লাল গোলাপ এগিয়ে দিয়ে বললো, 'সুয়াই গুলাপ ক্লাই। ফুয়িঙ্গ তঙ্গকান্।' (সুন্দর গোলাপ কিনুন। বান্ধবী পছন্দ করবেন।)

একগুচ্ছ লাল গোলাপ কিনলাম।

আর একগুচ্ছ চাঁপাফুল আর বেলির মালা এগিয়ে বললো, 'চম্পক, মাল্টার মালি ক্লাই ?'

ওগুলো নেত্রাকে দিতেই ও বললো, ভারি সুন্দর গন্ধ। তোমাদের দেশে এ ফুল আছে ?

বললাম, আছে মানে। আমাদের বাড়িতেই ছিল। মজার ব্যাপার হলো আমরা

এই একই নামে ফুলগুলো চিনি।

একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললো, সে ফুল কাকে দিতে?

—দেবার মত তখনও বয়েস হয়নি। আমার পিসিমা সেই ফুল দিয়ে পুজো করতেন।

—কার পুজো?

—শিবের, বিষ্ণুর।

—আরে, আমরাও তো ঐ ঠাকুরের পুজো করি। তোমার অফিসবাড়ির নাম শিবাভাঙ্গ না?

—ঠিকই বলেছো।

নীল আলো জ্বললো। আমরা মোড় পার হয়ে লুম্পিনী পার্কের পাশ দিয়ে সয় চেট্ (সাত নং গলি) দিয়ে সয় টন্‌সনসনে এসে পড়লাম। সেই বুড়ো বুড়ি, নাতি নাতনি নিয়ে রাস্তার লাইটের নীচে বাঁশ ঝাড়ের পাশে তখনও বসে আছে।

হর্ণ বাজাতে দারোয়ান গেট খুলে দিল।

আমি বললাম, নেত্রা ওপরে আসবে না?

নেত্রা মাথা নাড়লো, আজ আর নয়। বাবা বসে আছে আমার অপেক্ষায়। আজ একসঙ্গে বাড়িতে খাবো।

হাতটা চেপে ধরে বললো, আর একদিন হবে। আজ চলি গুড্ নাইট। আই স্যাল বি উইথ ইউ ইন ইয়োর ড্রিম্।

ওর গাড়িটা চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উপরে উঠে এলাম।

॥ ২১ ॥

যেরকম রোজ অফিসে যাই সেই রকমই সাড়ে আটটায় অফিসে পৌঁছে গেছি। আমি ঢুকতেই আমার 'লেখা', (সেক্রেটারি) তাথঙ্গ ছুটে এসে খুব ভীত স্বরে বললো, আপনি রাস্তায় কিছু দেখলেন?

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, কেন, কী দেখবো? সবই তো স্বাভাবিক। কেন কী হয়েছে?

অবাক হয়ে ও বললো, সে কী, আপনি জানেন না, কাল রাত দুটোর সময় সৈন্য বিদ্রোহ হয়েছে।

—কোথায়?

—কোথায় আবার, ব্যাংককে।

অবাক হয়ে আমি বললাম, এ আবার কি রকম বিদ্রোহ? রাস্তায় তো কোনও সৈন্য দেখলাম না; ট্যাংকও চলছে না।

—ট্যাংক বেরিয়েছে রাজাদামর্নির রোডে। রেডিও আর টি ভি স্টেশান ঘিরে রেখেছে।

—তা হলে কি অফিস ছুটি দিয়ে দিতে হবে নাকি? এ তো আগুনের মত ছড়িয়ে পড়বে। তুমি আমেরিকান চেম্বার অফ্ কমার্সে ফোন করে জানো অন্য সব প্রতিষ্ঠান কী করছে?

ও ফোন করে কিছুক্ষণ পর এসে বললো, সব অফিস ঠিক ঠিক চলছে। বিকেলে আবার খোঁজ নিতে বলেছে। বিকেল তিনটের সময় জানা গেল বিদ্রোহ মিটে গেছে। দুজন অস্ট্রেলিয়ান জার্নালিস্ট মারা গেছে। তারা ট্যাংকের সামনে গিয়ে ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলছিল আর ঠিক সেইসময় এক ঝাঁক গুলি এসে ওদের লাগে।

সন্ধ্যার সময় ভাবছিলাম এই বিদ্রোহের কথা। প্রধানমন্ত্রী প্রেম এখন দেশের বাইরে। প্রধান সেনাপতি আতীথও গেছে দেশের বাইরে। এখানে নামেই আছে গণতন্ত্র আসলে সেনাপতিদের রাজত্ব। প্রধান সেনাপতি কার্যভার শেষ হবার আগে প্রধানমন্ত্রী হয়। প্রেমও ছিল প্রধান সেনাপতি। এখন আতীথও চায় প্রধানমন্ত্রী হতে। কিন্তু প্রেমর তার গদি ছাড়তে নারাজ।

এর আগেরবার যখন আমি এসেছিলাম, তখনও সৈন্য বিদ্রোহ হয়েছিল। বিমান বন্দরে নামতেই দেখেছিলাম সব ট্যাংক কামান উঁচিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। পথে সব সৈন্য বোঝাই লরি চলাচল করছে। হোটেলের ম্যানেজার সাবধান করে দিয়েছিল, আমি রাতে যেন বের না হই।

পরের দিন কাগজে দেখেছিলাম যে ব্যাংককের সেনাপতি বিদ্রোহ করেছে। তখনও প্রধানমন্ত্রী ছিল প্রেম। প্রেম বিদ্রোহের কথা জেনে রাজা ও রাণীকে নিয়ে কপ্টারে পালিয়ে গিয়েছিল উত্তরে। উত্তরখণ্ডের সেনাপতি ছিল আতীথ। আতীথের সৈন্যদল তখন ব্যাংককের দিকে এগিয়ে আসতেই বিদ্রোহ থেমে গেল। বিদ্রোহীদের নেতা কর্ণেল মানুনকে বিমানবাহিনীর প্লেনে করে সিঙ্গাপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রক্তপাতহীন বিদ্রোহ। এমনি বিদ্রোহ হয়েছে ষোলবার। কোনও বিদ্রোহী সেনাপতির সাজা হয়নি।

পরের দিন কাগজে দেখেছি—ঐ মানুনই ফিরে এসে এবারও বিদ্রোহ করেছে। রাত দুটোর সময় অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো জেনারেল সাভালিৎকে ঘুম থেকে উঠিয়ে মানুন বিদ্রোহের ঘোষণা করিয়েছিল।

এবারও কিন্তু কারুরই সাজা হলো না, রক্তপাত হলো না। এ রকম সৈন্য বিদ্রোহ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

অহিংসার পুজারী বৌদ্ধ বলে কী এটা সম্ভব হয়েছে? চিন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্মদেশও তো বৌদ্ধ তা হলে সেখানে তো এরকমটা হয় না। অদ্ভুত এদের ট্র্যাডিসান্। এ ট্র্যাডিসান কী করে এলো, কেনই বা এলো তার হদিশ এখনও পাইনি।

এর হদিশ কোথায় পাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো কীর্তিসুন্দরের কথা। যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মুখার্জিদার বাড়িতে।

মুখার্জি'দার বাড়িতে সেই যে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে তারপর আর কোনও যোগাযোগ নেই।

মুখার্জি'দা ফিরে গেছে দেশে। মনে পড়লো কীর্তিসুন্দর একটা কার্ড দিয়েছিল। সেটা খুঁজতে লাগলাম পাতিপাতি করে। শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ারে।

ফোন করলাম. হ্যালো, কীর্তিসুন্দর ?

—বলছি। আপনি কে ?

—আমার নাম অতীশ।

—ঠিক চিনতে পারলাম না তো।

—মুখার্জি'দাকে মনে আছে ?

—তা আছে, বই কী। উনি তো দেশে ফিরে গেছেন।

—তাঁর বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। সে তো অনেক দিনের কথা। এতদিন কোথায় ছিলেন ? বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে ?

—আপনার বাড়ি যেতে চাই একদিন।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, কাল আসুন সন্ধ্যায়।

কীর্তিসুন্দরের বাড়িটা ভারি সুন্দর। কাঠের দোতালা বাংলো বাড়ি, সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। পেছনে আম, নারকেল, সুপারি আর কলার গাছ। বারান্দায় ঝুলছে টবে নানান রঙের অর্কিড।

বেলের শব্দ শুনে অধ্যাপক মহাশয় দরজা খুলে সুস্বাগতম্ বলে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমি জুতোটা দোরগোড়ায় রেখে বসলাম একটা সোফায়।

ঘরের সাজসজ্জায় বোঝা যায় এদের একটা সুন্দর রুচিবোধ আছে। থাই কৃষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্যের সাজসজ্জাকে সুন্দর ভাবে খাপ খাওয়ানো হয়েছে।

—কি দেখছেন ?

—দেখছিলাম আপনার বাড়ি যেমন সুন্দর বাইরেটা সাজানো গাছগাছালি আর ফুলপাকারীতে, তেমনি সুন্দর সাজানো ভেতরটা।

কীর্তিসুন্দর গর্বের সঙ্গে বললেন, দেখুন বাড়িটা আমার পৈত্রিক। বাকি যা দেখলেন তার কৃতিত্ব আমার অর্ধাঙ্গিনীর। আমি একটা নিষ্কর্মা লোক। ছাত্র পড়াই আর পড়ি, মাঝে মাঝে আড্ডা মারি। তার জন্যে অবশ্য অনেক কথা শুনতে হয়। তা লাগছে কি রকম আমাদের 'দেশে ?

—দারুন ভালো। কাজ ভালো, লোক ভালো, খাবার-দাবার জিনিস ভালো, মেইড ভালো, শুধু একটাই ভালো না।

উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কী ?

—সেটা হলো ক্লাইমেট, আপনাদের দেশে শীত নেই।

হো হো করে হেসে উঠে বললেন, যাক বাঁচা গেল। আমি তো ভয়ে ভয়ে ছিলাম

কিনা কি বিষয়ে নিন্দে করে বসবেন।

—আপনাদের সবচাইতে প্রশংসনীয় চরিত্রগত গুন হলো সহনশীলতা ও সহাবস্থান।

—সেটা কি রকম ?

—বৈদিক ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম আপনাদের মাঝে সহাবস্থান করছে, কোথাও বিরোধ নেই, দ্বন্দ্ব নেই। বারবনিতারা যেখানে সেখানে তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছে, তার জন্য কোনও প্রতিবাদ নেই। সৈন্য বিদ্রোহ হচ্ছে তাতে রক্তপাত নেই, বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার কথা কেউই চিন্তা করে না। রাজার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আছে রাজার প্রতি সবাইর অসীম ভক্তি শ্রদ্ধা। স্বৈরাধিকার আছে কিন্তু গনতন্ত্র নেই। একনায়কত্ব আছে কিন্তু তার উলঙ্গ প্রকাশ নেই। অরাপসান আছে কিন্তু ইনফ্লেশান নেই। এরকম একটা বিপরীত সমন্বয় বড় কোথাও দেখা যায় না।

কীর্তিসুন্দর হেসে বললেন, আপনিতো এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে গেলেন। অথচ সবগুলোই সত্যি, যদিও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে সবগুলোরই কারণ খুঁজে বার করা যায়। আগে আসুন, গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। কি খাবেন বলুন? হার্ড, না সফট, না হট ?

আপত্তি না থাকলে অল্পমাত্রায় একটু হার্ড হলেই তর্কটা ভাল জমবে।

—হুইস্কি, জিন, না বিয়ার ?

—হুইস্কি, হলেই তো ভাল হয়।

উনি বসে বসেই চীৎকার করতে লাগলেন, সুজাতা, সুজাতা।

এক মধ্যবয়সি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলা তড়িঘড়ি এসে বললেন, এত চীৎকার কেন, কী হলো ? তোমার জ্বালায় শান্তিতে কোনও কাজ করা যায় না। আমায় দেখে লজ্জা পেয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না।

একটু নরম হাসি দিয়ে কর্তামশায় বললেন, এই যে এসে গেছে। ইনি হলেন অতীশ আর এই হচ্ছেন আমার পরিচালিকা ও সর্বময় কর্ত্রী।

নমস্কার জানিয়ে মহিলা বললেন, আমি সুজাতা।

আমি হেসে বললাম, তা, হলে তো আপনার হাতে পায়েস খাওয়া উচিত।

উনিও হেসে বললেন, তা হলে তো আমার অধ্যাপিকার কাজ ছেড়ে আগে অন্যভাবে আপনার আনন্দবিনোদন করতে হবে। হ্যাঁ গো, চীৎকার করে ডাকছিলে কেন ?

—ডাকছিলাম, তোমায় অনেকক্ষণ দেখি না, আর তা-ছাড়া এই ভদ্রলোক এমন সব প্রশ্ন করেছে যে তার সব যথাযথ উত্তর আমার একার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি আমার পাশটিতে বসো। তার আগে তিন গ্লাস জল আর বরফ নিয়ে এসো। আমরা হুইস্কি খাবো। তুমি ?

মহিলার চেহারা মানানসই। চোখে মুখে একটা দীপ্তি আছে। ভালই ইংরেজি বলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব নিয়ে এসে বসলেন।

কীর্তিসুন্দর বললেন, আপনার রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর উত্তর উনিই দেবেন, কারণ ঐটাই ওনার অধ্যাপনার বিষয়। প্রশ্নগুলো উনি স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন।

সুজাতাদেবী বললেন, আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে গেলে আপনাকে আমাদের ইতিহাসের পাতা উল্টোতে হবে।

চক্রিবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন মঙ্কুট্ এবং তার ছেলে চুয়ালংকর্ণ, অর্থাৎ চতুর্থ আর পঞ্চম রাম। মঙ্কুট রাজা হবার আগে সাতাস বছর সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে সারাটা দেশ ঘুরেছিলেন ভিক্ষাপাত্র আর পুঁথি নিয়ে। ল্যাটিন আর ইংরেজি ভাষা বেশ ভালো ভাবেই রপ্ত করেছিলেন। উনি যখন রাজা তখন ইংরেজদের হাতে ব্রহ্মদেশ আর ফরাসীদের হাতে ইন্দোচায়না। তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধির ফলেই থাইল্যান্ড আজও স্বাধীন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে ইংরেজি শব্দের খুবই ব্যবহার দেখতে পাই। এটা কি তাঁর সময় থেকেই চালু হয়েছে?

—তা বলতে পারেন। শাসনব্যবস্থা ও সেনাবিভাগকে নতুন ভাবে সাজানোর জন্যে উনি অনেক ইংরেজকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আর তখন থেকেই ইংরেজি শব্দের প্রচলন শুরু হলো। সেই সময় ব্যবসার জন্য বিশেষ সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল ইংরেজদের।

তার ছেলে চুয়ালংকর্ন, শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজালেন ইংলন্ডের ধাচে। ভাল ভাল ছেলেদের পাঠানো হলো ইংলন্ডে পড়তে।

সম্রাট নিজেও ইউরোপের সব দেশ ঘুরেছিলেন, আপনাদের দেশ ও বাদ যায়নি।

—চুয়ালংকর্নই কি তার নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন?

—না সেটা করেছিল তার ছেলে ভাজিরাবুধ। (বজ্রবুধের অপভ্রংশ) যে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছিল।

তারপরে এলো তিরিশের মন্দা, রাজকোষ শূন্য। বিদেশের রপ্তানি বন্ধ। রাজা তখন প্রজাধিপক্। ইটনের ছাত্র। তিনি আর শক্ত হাতে হাল ধরতে পারলেন না। বত্রিশ সালে হলো সৈন্যবিদ্রোহ। রক্তপাতহীন বিদ্রোহ। রাজা হারালেন তার ক্ষমতা, হলো কন্সটিটুইশনাল মনার্ক। সে হারানো ক্ষমতা পেলো, প্রধানমন্ত্রী আর সেইপদে অধিষ্ঠিত হলো একের পর এক সৈন্যাধ্যক্ষরা। প্রধানমন্ত্রীর গদি দখলের লড়াই তখন থেকেই।

— সেই বিদ্রোহেরই সাক্ষ্য কী ডেমক্রেসি মনুমেন্ট?

—ঠিকই বলেছেন।

—আপনাদের এক প্রধানমন্ত্রীর নাম শুনেছি পিবুল সংগ্রাম (বিপুল) তার আমলে নাকি দেশের অনেক উন্নতি হয়েছিল।

সুজাতা দেবী বললেন, আমাদের অর্থনীতির শক্ত ভীত গড়েছিল ফিল্ডমার্শাল সারিথ থানারাথ (শ্রী সারনাথের অপভ্রংশ)। ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনা করা, টুরিজম ডিপার্টমেন্ট, কারখানা, রাস্তাঘাট তৈরির বিরাট প্রয়াস তার সময়ই শুরু হয়েছিল। ক্ষমতার

লড়াইতে যার ক্ষমতা বেশী সেই জিতবে। কার ক্ষমতা বেশী তা বুঝবার জন্যে কি লড়াইর প্রয়োজন হয়। আর তা যদি না হয় তা হলে আর রক্তপাত হবে কেন? বিদ্রোহীদের হাতে যদি ক্ষমতাই না থাকে তা হলে তার পক্ষে আর কোনও ক্ষতি করা সম্ভব নয়। তা হলে আর তাকে মেরে কি লাভ? থানারাথ প্রধানমন্ত্রী হবার পর পিবুল সংগ্রাম মঠে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেল।

মিঃ অতীশ অনেক রাত হয়ে গেল। আপনি আসুন না আমাদের সঙ্গে খেয়ে নেবেন।

—আমার কোনও আপত্তি নেই যদি আপনাদের কোনও অসুবিধা না হয়।

—আমাদের আর অসুবিধা কী? পায়েস কিন্তু খাওয়াতে পারবো না। তার জন্যে নোটিশ চাই।

সুজাতা বললেন, আপনারা আর এক গ্লাস করে নিয়ে নিন, এর মধ্যে আমি খাবার টেবিল সাজিয়ে ফেলি। ও ভালো কথা, থাই খাবার; চলবে তো?

বললাম, দারুণ চলবে। আমি সর্বভুক। শুধু দুটো জিনিস খাইনি এখানে সাপের মাংস আর কালো কুকুরের মাংস।

সুজাতাদেবী গম্ভীর হয়ে বললেন, ও দুটো কিন্তু থাইরা খায় না। খায় চিনারা। আর সাপের রক্ত আর মাংস খাওয়ার মত বয়স আপনার এখনও হয়নি। আর যদি হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তার দেখান।

কীর্ত্তিসুন্দর এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। এবার মুখ খুললেন। আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ক্ষমতাহীন রাজার কেন আমাদের এত ভক্তি আর তাঁর এত ক্ষমতা?

—খাতায় কলমে রাজার কোনও ক্ষমতা নেই। আসলে কিন্তু রাজার হাতেই প্রধানমন্ত্রীর সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি। তার কারণ হলো আমাদের লোয়ার হাউ-জে কোনও দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না। সকলেই চায় প্রধান মন্ত্রী হতে।

রাজনৈতিক দল আর বেশীর ভাগ দলেরই নেতা হলো সেনাপতিরা অবশ্য অবসর নেবার পর। রাজাই তাদের মধ্যে ব্যালেন্স রক্ষা করে। সেনেটের অর্দ্ধেক সভ্যই তো রাজার মনোনীত লোক। রাজাই দেশটাকে একত্র করে রেখেছে। রাজা রানী আর তার মা, যারা সবাই বিদেশে পড়াশুনো করেছে. গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ চাষীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন, তাদের অভাব অভিযোগের সুরাহা করার চেষ্টা করেন। তার উপদেশ প্রধারমন্ত্রীও অগ্রাহ্য করতে পারেন না। জনগনের সঙ্গে রাজার সংযোগ অনেক বেশী।

—শুনেছি আপনাদের ফসল আর মাছ চাষে আধুনিক প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারে যে উন্নতি হয়েছে তার মূল অবদান রাজার।

—ঠিকই বলেছেন।

এমন সময় সুজাতা দেবীর গলা শোনা গেল, তোমরা খেতে এসো।

আমরা খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। ধোঁয়া ওঠা খাবার গামলায় করে দিয়ে গেল মেইড। সুজাতা সেই থেকে সবাইকে বাটি বাটি করে তুলে দিলেন। সেদ্ধ করা

ডিমশূন্য চালের নুডল (কুইতিও) তাতে আছে মাংসের রস আর ফুলকপির পাতার মত একরকম পাতা ডাটাশুদ্ধ। তারপর এলো মাছ গরম জলে সেদ্ধ। শেষে ভাত আর একটু মুরগির মাংস। সব শেষে কাটা ফল, এমন ভাবে কাটা হয়েছে যেন এক গুচ্ছ ফুল।

খেতে খেতে কীর্তিসুন্দর বললেন, আপনার আর একটা প্রশ্ন ছিল 'বারবনিতার' ছড়াছড়ি অথচ প্রতিবাদ নেই। এ সব যা কিছু দেখছেন তার শুরু হলো ভায়েট-নামের যুদ্ধের সময়। আমেরিকান সৈন্যরা স্বল্প সময়ের ছুটি কাটাতে আসতো এখানে। আর তাদের জৈবিক ক্ষুধা মেটাবার জন্য এখানকার মেয়েদের ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে। এখন তাদের ব্যবহার করছে আমাদের সরকার ট্যুরিস্টদের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা রোজগারের ধান্দায়। এটা আমাদের একটা ডিসগ্রেস্। কিন্তু শক্ত রাজনৈতিক সংগঠন না থাকায় কোনও জোরালো প্রতিবাদ উঠছে না।

ডিনার শেষ হয়ে গিয়েছিল সুজাতার ধারণা যথেষ্ট অতিথি সংকার হয় নি। বললেন, আপনার পেট ভরলো তো ? কি আর করবো, যা ছিল তাই দিয়েছি।

বললাম, ম্যাডাম, কি খাওয়ালেন সেটা বড় কথা নয়। কী ভাবে খাওয়ালেন সেটাই বড় কথা। ইউরোপ আমেরিকার গৃহিনীরা কখনই কোনও অপরিচিত লোককে এ ভাবে বাড়িতে খাওয়ায় না। এশিয়ার মেয়েরাই কেবল তা পারে। অনেক ধন্যবাদ। আজ তা হলে আসি। আমি কিন্তু আবার আসবো।

সুজাতা বললেন, নিশ্চয় আসবেন, কিন্তু এবার নোটিশ দিয়ে। সুজাতার হাতের পায়েস খেয়ে হয়তো তাহলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন।

কীর্তিসুন্দর বললেন, আমি কিন্তু ওর হাতের পায়েস খেয়ে বুদ্ধ হয়ে গেছি। দেখছেন না, ওঁকে দেখলে। কি রকম ভেড়া বনে যাই।

সুজাতা দেবী বললেন, তা তো বটেই। আমি না থাকলে দেখতাম এই ভেড়াটার কী অবস্থা হতো।

- তা অবশ্য হতো। খুব ভালো লাগলো। আসবেন কিন্তু।

২২ ॥

ভোর পাঁচটার সময় পিয়ালী দরজায় টকা মেরে ঘরে ঢুকলো চায়ের ট্রেটা নিয়ে। এঃ সিটা বন্ধ করে পর্দা সরিয়ে জানলা খুলে দিল। সকালের মিষ্টি রোদ বিছানার ওপর পড়েছে। পিয়ালী হাটু ভাজ করে মেঝেতে বসলো।

আমি পলিইস্টারের হাল্কা লেপটা গা থেকে সরিয়ে উঠে বসলাম। চা বানিয়ে কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, আজ সন্ধ্যায় আমার এক বন্ধু আসবে। ও খাবে রাতে। কি খাওয়াবে ?

—তুমি যা বলবে।

—ফ্রায়াড রাইস, ফুলকপি আর কলাইশুটি দিয়ে ডালনা, ছোলার জল, মুরগির মাংস, পরোটা। দই আছে তো?

—তোমার জন্য তো এক বাটি করে রোজই বানাই. সেটা আছে।

—শশা আছে তো?

—হ্যাঁ, আছে।

—তাহলে শশা কুঁচি কুঁচি করে কেটে দই এর মধ্যে দিয়ে তাতে একটু চিনি, গোলমরিচের গুড়ো আর নুন দিয়ে মিশিয়ে দেবে। বুঝেছো তো সব?

পিয়ালী মাথা নাড়ছে, খাউ চাই (বুঝেছি)

– আজ আমি কারখানায় যাবো, একটু গল্ফ খেলে। বিকেল নাগাদ ফিরবো।

—তা হলে তুমি ব্রেকফাস্ট ক্লাবেই খেয়ে নেবে তো? এক গ্লাস কমলালেবুর রস খেয়ে যাও। খালি পেটে খেলা উচিত নয়। তিন ঘন্টা পর পর কিছু খাওয়া উচিত।

—তাই দেখি তোমরা সব সময়ই কিছু না কিছু খাচ্ছো, অল্প অল্প করে।

—জানো মাস্টার, বার বার অল্প অল্প করে খেলে মোটা হয় না। থাই ছেলেরা মোটা হলে তাকে কোনও মেয়ে বিয়ে করে না।

—সত্যি তোমাদের দেশে পেট মোটা মেয়ে তো দেখা যায়ই না, এমনকি ছেলেও না।

বন্ধু মোহন পাঞ্জাবি। জন্ম কর্ম কলকাতায়। আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টারস করেছে। জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করতে ভালবাসে। বড়লোকের ছেলে। কলেজে থাকতেই লক্ষ্ণৌতে বাইজীর নাচ দেখেছে। মেয়ে দলের কাওয়ালি শুনেছে। চেহারা-লেডি কিলার। আমরা একই অফিসে কাজ করতাম। ও চার পাঁচ দিনের জন্যে ব্যাংকক এসেছে। উঠেছে ওর আত্মীয়ের বাড়ি সীকুমভিতে।

আমার ড্রাইভার সাকনকে আগেই বলা ছিল সকাল সকাল আসতে।

ড্যাসবোর্ডের ওপর দেখলাম নতুন লাগানো হয়েছে সোনালী রঙের প্লাস্টিকের গনেশের মূর্তি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাকন এটা লাগিয়েছ কেন?

—মাস্টার, তুমি জানো না? এই মূর্তি গাড়িতে থাকলে কোনও এ্যাকসিড্যান্ট হবে না, বলে ভক্তিভরে একটা নমস্কার করে নিল।

গাড়ি গল্ফ কোর্সের গেটের কাছে দাঁড়াতেই পেছনে নম্বর লাগানো লাল জামা পরা একজন ক্যাডি এগিয়ে এলো। সাকন ভেতর থেকে বুটটা খুলে দিল। ক্যাডি ব্যাগ দুটো নিয়ে সামিয়ানার কাছে চলে গেল। সাকন আর একটু এগিয়ে গিয়ে পোর্টিকোতে গাড়িটা দাঁড় করালো। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো জামা প্যান্ট আর জুতো জোড়া চেঞ্জরুমের লোকটার হাতে দিয়ে পার্কিং স্পেসে চলে গেল।

আমি ন হোল খেলে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলাম. ডিম, টোস্ট আর কফি। সামনের কাউন্টার থেকে খাবারটা এনে দিল একটি অল্পবয়সি মেয়ে। পরনে সাদা মিনি ফ্রক সামনে নীল এ্যাপ্রন।

লিপস্টিক মাখা লাল ঠোঁটে হাসি ধরে মেয়েটি বললো, গুড মর্নিং মুন অতীশ, কেমন আছেন ?

—ভালো, তুমি কেমন আছ ?

—আপনি কিন্তু অনেকদিন পর এলেন।

—আপনার বন্ধু, উমি কোথায় ? অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হয় না। বলবেন তো আমার কথা। আমার নাম জানেন তো ?

—জানি, বলবো।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে চান করে জামা কাপড় পরে পোর্টিকোতে এসে দাঁড়াতেই উর্দিপরা লোকটা এনাউন্স করলো সাকনের নাম।

গাড়িতে উঠে আমি বললাম, কারখানায় চল।

শহরটা ছাড়িয়ে সাকন্ চওড়া একমুখী রাস্তার পরে গাড়ির গতি বাড়ালো। আমি এঃ সিটা আর একটু ঠান্ডা করে চেয়ারটাকে কাত করে, একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত টেপ চালিয়ে আরাম করে গা এলিয়ে দিলাম।

চার লেনের কংক্রিটের রাস্তা। আড়াআড়ি কোনও রাস্তা, পথচারির ভিড়, মন্থর গতির যানবাহন, কিছুই নেই যে গাড়ির গতি রোধ করবে। অস্থা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যে ডানদিকে আধপাকা লেন আছে। গাড়ি এখানে বাঁ দিক ধরে যায়। একদম বাঁ দিকের লেনটা ভারি গাড়ি চলবার জন্যে নির্দিষ্ট। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা থামলো। এখানে টোল চার্জ দিতে হবে দশ বাট (পাঁচ টাকা)। কাঁচ ঢাকা ঘর থেকে হলদে ক্যাপ্ পরা মেয়েটা হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে ক্যাস কাউন্টারে টাকা রেখে টিকেট দিলে, গেটের ডান্ডা উঠে গেল। গাড়ি চলে গেলে গেট আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তার মাঝখানের গাছগুলোতে তখন ট্যাঙ্কার থেকে পাইপ দিয়ে জল দিচ্ছিল। ছেটে দেওয়া ঝাউ গাছ, নানান রঙের মুসান্ডা আর বেগুনীভিলিয়া ফুটে আছে রাস্তা দুটোর মাঝখানে, আর রাস্তার দুধারে পরিস্কার জলে ফুটে আছে পদ্ম আর শালুক।

আমি চোখ বুজে শুয়ে। পরের পর এক একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে চলেছে। মন তখন চলে গেছে গঙ্গা পাড়ে। গান বাজছে—

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি—

—হায় বুঝি তার খবর পেলে না।

এ গানটা যার মুখে শুনেছিলাম গঙ্গার পাড়ে—সে এখন কোথায় হারিয়ে গেছে।

গান শেষ হয়ে টেপ থেমে গেল। গাড়ি এসে থামলো কারখানায়।

কাজ সেরে সাড়ে চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরে এলাম। এসে পিয়ালীকে জিজ্ঞেস করলাম সব রান্না হয়ে গেছে কিনা।

ও খুব খুশি হয়ে বললো, দেখ না মাস্টার, সব হয়ে গেছে যা যা বলেছিলে।

ঢাকনা তুলে দেখলাম—কফির তরকারি, মুরগির মাংস, ছোলার ডাল, ময়দা মাখা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফ্রায়াড রাইস্ কোথায় ?

ও বললো, সব রেডি করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। এলে গরম গরম ভেজে দেবো।

আমি বললাম, ফ্রিজে রেডি করে রেখেছ, সে আবার কী?

—দ্যাখো না, বলে ফ্রিজ থেকে যা বের করলো সেটা এক বাটি মুসুরির ডাল বাটা।

আমি বললাম, এটা কি হবে?

—তুমি যা বলেছো, তাই তো করেছি।

—এটা নয়। তুমি বুঝতে পারোনি। ঠিক আছে, তুমি আমাকে চা দাও। চা খেয়ে আমি বানিয়ে দেবো। ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

আমায় চা দিয়ে ও একটা খাতা নিয়ে এলো। বললো, এই তো আমি লিখে রেখেছি। তুমি তো এটা খেতে খুব ভালবাস। তাও লেখা আছে। তা হলে ভুলটা হলো কোথায়?

—তুমি এ সব রন্ধন প্রণালী লিখেছো, কিন্তু কোনটাকে কি বলে তা কি লিখেছো?

মাথা চুলকে বললো, তা অবশ্য লিখিনি। তুমিও তো বলনি। এটা রাঁধতে কি লাগবে বল,

আমি তখন বললাম, চাল, কড়াইশুটি, গাজর, একটু চিংড়ি মাছ, ডিমের অমলেট।

ও বললো, মাস্টার তোমাকে আর উঠতে হবে না। তুমি সারাদিন পরিশ্রম করে এসেছ। 'ভেয়নি ক্রম্ খাউ চাই (এখন আমি বুঝেছি) ইন্ডিয়া খাউ ভাত ক্যুন সাই। মাই মি কাই (মুরগির মাংস নেই)।

রাঁধবার সময় তবু একবার দেখে এলাম। না, ঠিকই রাঁধছে।

আমি স্নান করতে চলে গেলাম। পিয়ালীও রান্না সেরে খাবার টেবিল সাজিয়ে গেল গা ধুতে।

ঠিক ছটার সময় মোহন এল, এক ঢাউস সুটকেস হাতে। সেই আগের মতই দেখতে আছে।

আমায় জড়িয়ে ধরে বললো, তা আছিস কেমন? অবশ্য সেটা না জিজ্ঞেস করলেও চলে। দেখতেই পাচ্ছি ছিমছাম এপার্টমেন্ট, জানি দারুণ কাজ করছিস, রয়েছিস থাই-ল্যান্ডে, ব্যাং-ককে। খারাপ থাকার কথাই নয়। ওটা ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞেস করা।

বললাম, যত ভাল জায়গাই হোক না কেন, কিছুর তো অভাব থেকেই যায়।

মোহন ভুরু কুঁচকে বললো, কিসের অভাব আবার?

—আপন জনের অভাব, বন্ধুর অভাব, আরও কত কিছুর অভাব এই ধর না —কোথায় পাবো এখানে একাডেমির নাটক, ইডেনের ক্রিকেট, ফুটবল মাঠের উত্তেজনা?

—ওটা অন্যভাবে পুষিয়ে নিবি। অত ঘরকুনো হলে চলে?

মোহন সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে। আরে বাব্বা, গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ভুবনকাকে আগে পানীয় দে।

—পানি চাই, না পানীয় ?

—তুই ও যেমন, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। এখনও সেই বাঙ্গালই রয়ে গেছিস। বের কর তোর স্কচ্। সিভাস্ রিগাল্ আছে তো ?

—তা আছে। কোথায় এত ঘাম ঝরালি ?

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললো, গিন্নির হুকুম তামিল করতেই আজ সারাটা দিন চলে গেল।

–তোর গিন্নি যে আসেনি, তুই বললি।

—উনি আসেননি, কিন্তু হুকুমনামা দিয়ে দিয়েছেন।

দেখছিস না এই সুট্‌কেসটা। এটাও লিস্টে ছিল। আর ওটা ভর্তি জিনিস।

—কোথা থেকে কিনলি সব ?

—বাজার ঘুরে জিনিস কেনার মত আমার ধৈর্য্য নেই। আমি সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কিনেছি। দারুন সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আমেরিকার চেয়ে অনেক ভাল। এঃ সিটা আর একটু বাড়িয়ে দে।

—তফাৎটা কি দেখলি ?

এখানে প্রত্যেক সেকসানে সেলস্ গার্ল রয়েছে। তারা তোমার কিনতে সাহায্য করছে, কিছুটা পার্সোনালাইজড্ সার্ভিস দিচ্ছে।

—তুই কিন্তু প্রাতুনাম, পাওরাট., ক্রস ওয় আর সুকমান্ডিতে গেলে অনেক সস্তায় পেতি। আমায় জানালে আমার ড্রাইভার আর গাড়ি দিয়ে দিতাম।

—দু পয়সা সস্তায় পেতাম ঠিকই, কিন্তু ধকলটা কে সহ্য করতো। ওখানে দিব্যি এয়ার কন্ডিসান্ড দোকান, এসকালেটার, চোখের সামনে সাজানো জিনিস আর কত রকম চয়েস্, গোলাপি ফ্রক পরা পুতুলের মত সব মেয়ে। এই ভালো হয়েছে।

—কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়েছিলি ?

—রবিনসন, সোগো, সেন্ট্রাল আর একটার নাম ভুলে গেলাম। তোর বাড়ির সামনেই তো দুটো। একটায় দেখলাম্ পশু পাখিও বিক্রি হচ্ছে।

দু পেগ্ হুইস্কি খেয়ে ও অনেকটা শান্ত হয়ে বসেছে। কাজু বাদামের প্লেটটাও খালি হয়ে গেছে।

ককটেপ সসেজ্ মুখে দিয়ে বললো, তোর মেইড্ তো বেশ ওয়েল ট্রেইন্ড। এখান-কার মেয়েদের একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যে কাজই করুক না কেন, সেই কাজেই ওরা বেশ ওয়েল ট্রেইন্ড এবং সেই কাজ ওরা খুব মন দিয়ে করে।

—ওদের তুই কি কাজ করতে দেখছিস যে একটা মতামত জাহির করে ফেললি ?

—কেন ? ম্যাসাজ পার্লার দেখলাম, লাইফ শো দেখলাম, এসকর্ট নিয়ে ঘুরলাম, বারের হোস্টেসদের দেখলাম।

—ও সব দেখা হয়ে গেছে ?

মোহন পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লো, দেখিসনি তুই ?

—না, এখনও দেখার সময় করে উঠতে পারিনি।

—সাধে কি আর বলি তুই গাঁইয়া। আরে গাঁ থেকে এসেও তো লোকে চালাক চতুর হয়ে শহুরে হবার চেষ্টা করে। তুই কাজপাগলাই রয়ে গেলি। অবশ্য সেই জন্যেই এতটা উঠতে পেরেছিস, আর আমি পারিনি। জানিস বাপের টাকা থাকলে চ্যালেঞ্জিং এটিচুড্‌টাই নষ্ট হয়ে যায়। আমার তাই হয়েছে। বাপের টাকা, শশুরের টাকা, আর কী হবে, এই একটা ভাব।

—ম্যাসাজ পার্লারে কি দেখলি? ঘ্রাণেনং অর্ধভোজনের মত শুনেই কিছুটা স্বাদ নেবার চেষ্টা করি। কোথায় গিয়েছিলি?

—বড় বড় হোর্ডিং দেখেছিস তো ক্লিওপেট্রা কাত হয়ে শুয়ে আছে। সেই ক্লিওপেট্রায়। কি দারুণ ব্যবস্থা। নে আরেকটা নে। আরাম করে রিলাকস্‌ড্‌ হয়ে বোস, তারপর বলছি।

—ঢুকতেই একটি মেয়ে হাসিমুখে হাত ধরে বললো, আসুন। একটা হলে সোফায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললো, বিয়ার দেবো? মাত্র পঞ্চাশ বাট। ও ড্রিঙ্ক আনতে চলে গেল। আমার মত অনেকেই বসে আছে। সবার দৃষ্টি একটা কাঁচের ঘরের দিকে। কাঁচের ঘরে গ্যালারিতে বসে আছে জনা পনেরো, সুন্দরী। সবাই পরেছে সাদা পরিচ্ছন্ন ফ্রক্‌। বুকের কাছে সবারই একটা নম্বর লাগানো লাল চাকতির ওপর সাদা প্লাস্টিকে লেখা। সদ্য স্যাম্পু করা চুল, কসমেটিক করা মুখ, আর ম্যানিকিওর করা হাত। ফ্রকের গলার কাছটা অনেকটা নীচে নামানো, যাতে শরীরের দর্শনীয় অংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্যি দর্শনীয় সবাই। হের ফের—কেউ স্লিম্‌ কেউ গোলগাল, কারও বুকে ডালিম ফল, কারও বাতাবি লেবু।

বিয়ার নিয়ে মেয়েটি পাশে এসে বসে বললো, কি ম্যাসাজ চান?

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ম্যাসাজ আবার ক'রকম হয়?

মেয়েটি বললো, তিন রকম—এমনি হাত দিয়ে ম্যাসাজ, বডি ম্যাসাজ, স্যান্ডউইচ্‌ ম্যাসাজ। বডি ম্যাসাজ এ আপনাকে রাবারের ম্যাটে শুইয়ে সারা গায়ে সাবানের ফ্যানা মাখিয়ে বডি দিয়ে ম্যাসাজ করবে আর স্যান্ডউইচ ম্যাসাজে দুটো মেয়ে আপনাকে স্যান্ডউইচ করে ম্যাসাজ করবে।

আমি বললাম, কার কত খরচা?

—প্রথমটায় দুশো বাট, দ্বিতীয়টায় তিনশো আর তৃতীয়টায় চারশো বাট।

আমি বললাম, প্রথমটা দিয়েই আগে অভিজ্ঞতা হোক।

—স্যান্ডউইচটা নিলেই পারতেন—এ অভিজ্ঞতা আর কোথাও পাবেন না।

—পরের বার হবে। এবার প্রথমটাই হোক।

—কাকে চাই তাহলে ঠিক করুন। একটু ইংরেজি জানা যদি চান, তাহলে কুড়ি, পঁচিশ, তিরিশ নম্বরের মধ্যে একজনকে নিন।

আমি আবার সবার দিকে একবার চোখ বোলালাম। সব মেয়েগুলোই সোজাসুজি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের যেন সাজানো সব জিনিস।

টিপে টিপে দেখে যেন তাজা জিনিস কেনা। আমার মত লোকেরও মনটা একটু বিষিয়ে উঠেছিল। দুষ্ট মনের শক্তিই তো বেশী। ভালো মনটাকে দাবিয়ে বললো, 'তোর অত মন খারাপ করার কি আছে ? তুই না নিলে আর একজন নেবে। তুই এসেছিস ফূর্তি করতে দু দিনের জন্য, তোর এত মাথা ব্যাথা কেন ?'

মেয়েটা বললো, দেরী করবেন না, তা হলে ওদের কিন্তু ভাড়া হয়ে যাবে। দেখছেন না কত সাহেব টুরিস্ট বসে আছে।

—ঠিক আছে তিরিশ নং।

টীন্ এজের সুন্দরী, বুকটা বেশ সুডোল, কোমরটা এক হাতেই ধরা যায়, সরল দৃষ্টি, বাঁকা হাসি।

মেয়েটি মাইকে ঘোষণা করতেই তিরিশ নং বেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

হেসে বললো, গুড ইভিনিং ডার্লিং। চলুন।

নরম হাতে আমার হাত ধরে নিয়ে চললো লাল কার্পেটে হাল্কা পায়ে হেঁটে দোতলায়, যেখানে করিডরের দু পাশে হোটেলের মত সব নম্বর লাগানো সারি সারি ঘর। একটা ঘর চাবি দিয়ে খুললো। ঘরে একটা উঁচু চৌকিতে পরিষ্কার সাদা বিছানা পাতা, এক পাশে আয়না, চিরুণি, ব্রাস, পাউডার। আর এক ধারে বাথ টাব, প্লাস্টিকের পর্দা লাগানো, টেলিফোন সাওয়ার, ঠান্ডা গরম জলের ট্যাপ, নতুন সাবান।

জুতো জামা খুলে ও হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। একটা সাদা ধোয়ানো তোয়ালে দিল কোমরে জড়াতে। নিজেও জামাটা খুলে পাট করে রাখলো। ওর পরনে তখন বিকিনি।

—আপনি শুয়ে পড়ুন।

তারপর গায়ে পাউডার মাখিয়ে সারা গায়ে ম্যাসাজ করতে লাগলো। শির শির করা আরামে আমার চোখ বুজে আসছিল।

আমার মুখের কাছে মুখটা এনে ও ফিসফিস করে বললো, কী ঘুমিয়ে পড়লেন যে ?

আমি ওর মুখটা মুখের ওপর টেনে নিলাম। ও মুখটা সরিয়ে নিয়ে বললো, উঁঃ হুঁ, ওটার জন্য এক্সট্রা।

—কত ?

—পাঁচশো।

বারগেনিং করতে চেষ্টা করলাম,—তিনশো।

—দেখুন ওটাই যা আমার লাভ। ম্যাসাজের টাকা থেকে তো পাবো মোটে পঞ্চাশ। এই রোজগার থেকেই আমার কোনও মতে সংসার চালাতে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, সংসারে কে আছে ?

আমার বুড়ি মা আর একটি দুই বছরের ছেলে।

—তোমার স্বামী ?

—নেই। আমার সঙ্গে প্রেম করে পেট বাধিয়ে পালিয়েছে। রাত বারোটায়

গিয়ে দেখবো হয়তো আমার ছেলে কাঁদছে ম্যা ম্যা করে, আমার বুড়ি মা পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছে রাত জেগে।

মেয়েটি সত্যিই ভালো। পয়সা উসুল হয়েছে।

তারপর সাবান দিয়ে আমায় স্নান করিয়ে, নিজে স্নান করে জামা কাপড় পরে কসমেটিক লাগিয়ে বললো, আপনাকে খুশি করতে পেরেছি তো ?

আমি ওকে চারশো বাট দিলাম।

ও আমার গালে একটা চুমু দিয়ে বললো, খাপ্ খুন্ খ্রাপ। আবার আসবেন।

মোহন একটা তৃপ্তির আওয়াজ করে বললো, এমন সুবন্দোবস্ত কোথাও দেখিনি। মেয়েগুলোও খুব ভালো। ফাঁকি দেবার কোনও চেষ্টা নেই। কোনও ইন্‌হিবিসান্‌ও নেই।

আমি বললাম, লাইফ শো'র অভিজ্ঞতাটা এবার শোনা।

—দাঁড়া, খিদে পেয়েছে। আগে খেয়েনি।

—আজ রাতটা থেকেই যা না ?

—বলছিস ? ঠিক আছে। তোর ফোনটা কোথায় ? ওদের বাড়িতে একটা ফোন করে দি। কাল সকালে কিন্তু চলে যাবো। এ আই টি-তে আমার মেটিরিয়েল ম্যানেজমেন্টের ওপর বক্তৃতা দিতে হবে। ওরা আটটায় গাড়ি পাঠাবে।

—ঠিক আছে। পিয়ালীকে ডেকে খেতে দিতে বললাম।

মোহন খেতে খেতে বললো, তুই বুঝি আজ অফিস যাসনি ?

—কেন ?

—এত রান্না করে তো আর অফিস যাওয়া যায় না। তুই যে ভালো রাঁধতে পারিস তা তো আমার জানাই আছে।

আমি হেসে বললাম, আমি কিন্তু রাঁধিনি। সবই পিয়ালী রেঁধেছে।

ও পিয়ালীকে ডেকে বললো, এ সব তুমি রেঁধেছ ?

ও ভয়ে ভয়ে বললো, হ্যাঁ, ভালো হয়নি বুঝি ?

—দারুন। কে বলবে তুমি থাই। আমাদের দেশের আজকালকার মেয়েরা কেউই এ রকম রাঁধতে পারবে না।

ওর মুখে হাসি ফুটলো। সব মাস্টার শিখিয়েছে ?

সোফায় বসে একটা মস্ত ঢেকুর তুলে ও বললো, খুব তৃপ্তি করে খেলাম। তুই তো জানিস আমি পাঞ্জাবী রান্নার চাইতে বাঙ্গালী রান্নাই বেশী পছন্দ করি। নে এবার বের কর কনিয়াক। কি কনিয়াক আছে তোর স্টকে ?

—নেপোলিয়োঁ। চলবে ?

—কি যে বলিস ? নেপোলিয়োঁ তো কতদিন হয়ে গেল চোখেই দেখিনি।

ছোট্ট বাউলে ব্রান্ডি ঢেলে ওকে দিলাম। হাত ঘসে ঘসে ওটা গরম করে একটু সিপ্ করে বললো, এবার বল কি শুনতে চাস ?

বললাম, লাইফ শো।

—লাইভ শো দেখার জিনিস। ও শুনে কি মন ভরবে? তবে একটা কথা ও সব দেখে কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তেজনার চাইতে বোরাই হয়ে বেশী। তবু ওটাও একটা অভিজ্ঞতা। তুই আগে কখনও দেখিসনি?

—না। শুনেছি প্যারিসে পিগালে এ রকম শো আছে। তোর এ কাহিনী মাথায়ই তো দেখায়।

—ওখানে নাকি বিদেশি টুরিস্টরাই ঢুকতে পারে?

তোকে নিয়ে গেল কে?

—নাইট লাইফ ইন ব্যাংকক, কনডাকটেড টুয়ারে এটা দেখায়। টিকিটে পাসপোর্টের নাম্বার থাকে।

—তুই কি যে বলিস? শক্ত আটুনি ফসকা গেরো—পত্রপত্রে তো আমাকে কাঁঠালের ওপর মাছির মত সব ছেকে ধরেছিল এ দেখার জন্যে।

—সে জানি না।

আমাদের টিকিট গাইডের কাছেই ছিল। ভেতরে একজন পুলিশ ইনস্পেকটারও ছিল। জানি না সে আসল না নকল। হলে ঢুকতেই আমাদের একজন হোসটেস নিয়ে বসালো।

আমি একটু আরাম করে বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। হল প্রায় ভরে এসেছে। দলে দলে সব টুরিস্ট—জাপানিই বেশী।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, দর্শকদের মধ্যে নিশ্চয় কোনও মহিলা ছিল না?

—থাকবে না কেন—অনেক জাপানি আর আমেরিকান মহিলাও ছিল বৈ কী।

ও ব্রাণ্ডির বাউলে একটা চুমুক দিয়ে আবার আরম্ভ করলো—

আমার পাশের খালি চেয়ারটায় মিনিস্কার্ট পরা একটা থাই মেয়ে এসে বসলো। আমি একটু আশ্চর্যান্বিত হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও হেসে আমার হাতটা ধরে বললো, হাউ আর ইউ টুডে?

আমি বললাম. ফাইন্।

ও হাতে সুড়সুড়ি দিয়ে বললো, লাইক মি?

আমি বললাম, আই লাইক ইউ বাট আই হ্যাভ কাম টু সি দি শো।

ওর ইংরেজির ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেছে তখন থাই ভাষায় বলছে—ফম্ নুয়াই আরও কি যেন বললো।

তখন ও আমার জানুদেশে হাত বোলাচ্ছিল। আমি আস্তে করে ওর হাতটা সরিয়ে গালটা টিপে দিয়ে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ।

ও তখন বললো, বিয়ার কিন্‌খাও। ফম্ ক্রাই নুস ড্রিঙ্ক প্লিজ্।

কিছু মানে না বুঝে বললাম, ও কে।

—ফরটি বাট্।

—দিয়ে দিলাম চল্লিশ বাট্।

ও উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা ট্যাঙ্কারে বিয়ার আর একটা গ্লাসে কোক এনে

আমাকে বিয়ারটা দিল। পাশে আবার বসে দুটো গ্লাস ঠোকাঠুকি করে এক চুমুকে কোক গলায় ঢেলে বললো, খাপ খুন খাপ।

আবার ও হাতটা আমার কোলের উপর রাখতেই, আমি সরিয়ে দিলাম। তখন গম্ভীর হয়ে বুকটা ফুলিয়ে মুখের কাছে এনে বললো, আই নট্ গুড্ ? ভেরি গুড্।

তাকিয়ে দেখলাম, ওর বুকের কাছে স্কার্টটা অনেকটাই কাটা। চোখের দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, ভেরি গুড্।

আমার দিক থেকে কোনও উৎসাহ না পেয়ে ও উঠে গেল। যাবার সময় বলে গেল, ইউ ওল্ড ফুল।

হল ভর্ত্তি হয়ে গেছে। সবার হাতেই ফ্রি ড্রিংকের গ্লাস। কারও মুখেই কথা নেই। বিটল্‌সের প্রেমের গান চলছে টেপে। সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে কখন পর্দ্দা উঠবে।

গান বন্ধ হলো। হাল্কা বাজনায় ভেতরের ঠান্ডা হাওয়া শিরশিরিয়ে উঠলো। পর্দ্দা সরে গেল। স্টেজে দুটি থাই মেয়ে। একটি মেয়ের হাতে একটা ছোট্ট বালতি। বালতিটা রেখে ওরা দুজনে কোমর দুলিয়ে হাত নেড়ে পা ছুড়ে নাচতে আরম্ভ করলো।

নাচতে নাচতে একটি মেয়ে জামাটা খুলে ফেললো। এখন শুধু পরনে দু ফালি চিকনের কাজ করা কাপড়ের টুকরো নারীত্ব ঢেকে রেখেছে। পায়ে কালো মোজা, আর পেন্সিল হিলের জুতো। নাচতে নাচতেই ওরা জুতোটা ছুঁড়ে ফেললো, মোজাটা খুলে ছুঁড়ে দিল সামনে বসা এক দর্শকের মুখের উপর।

তারপর অন্য মেয়েটি আর একজনের শরীরের সঙ্গে লেপটে রেখে ওপরের কাচুলিটা খুলে আর একজন জাপানি বুড়োর টাকে ছুঁড়ে দিল। এবার নাচের তালে তালে বাঁধন-ছাড়া স্তন দুটিও নাচছে। আবার আলিঙ্গন। নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবাসটুকুও খুলে ফেলেছে। সেটা এসে পড়লো এক আমেরিকানের কাছে। তার বোধহয় বেসবাস খেলা অভ্যেস আছে। লুফে নিয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে দেখিয়ে আবার ভিড়ের মধ্যে সেটা ছুঁড়ে দিল।

এবার একটি উলঙ্গ মেয়ে হাটু ভাজ করে উপুড় হয়ে বসলো। বালতি থেকে ছটা পিঙ্ পঙ্ বল বের করে গুহাপথে লুকিয়ে ফেললো—ম্যাজিক। কিছুক্ষণ পর হাঁসের ডিম পাড়ার মত একটা একটা করে ছুটে বেরিয়ে এলো সামনে বসা দর্শকদের মুখের উপর।

এমনি করে এক একটি মেয়ে আসছে বিশেষ জায়গার মাসল্ কন্ট্রোল দেখাচ্ছে—কেউ সুতো দিয়ে বাঁধা পাঁচটা ব্লেড ভ্যানিস করে একে একে বের করে আনছে, কেউ সিগারেট ধরিয়ে ধুঁয়োর রিঙ করছে, কেউ ছোট্ট বাঁশের নল থেকে ছোট ছোট বল ছুঁড়ে মারছে, কেউ এক ফালি রঙিন কাগজ বের করছে-সে যেন আর শেষই হতে চায় না। সব চাইতে শেষে একটি মেয়ে একটা কোক ভর্ত্তি বোতলের উপর বসে-তার ছিপি খুলে ফেললো। এও যেন এক যোগাভ্যাস। সেই একই জায়গা দিয়ে, হাত না লাগিয়ে।

এসব তুই দেখিসনি ?

—না, এখনও দেখা হয়নি। সত্যি-মানুষ পয়সা রোজগারের জন্য কি না করে।

ও, আর একটা তো বলাই হয়নি। একটি মেয়ে একটা ফেল্ট পেন লাগিয়ে কাগজের উপর লিখলো, কাম, কিস মি।

তখন এক আমেরিকান ছোঁড়া স্টেজে উঠে এলো। মেয়েটা পালাবার চেষ্টা করলো, পারলো না। ও জড়িয়ে ধরে কিস করলো মেয়েটিকে। তারপর একটা দশ ডলারের নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে দর্শকদের হাততালি কুড়িয়ে ছেলেটি নেমে এলো। মেয়েটিও খুশি হয়ে ওকে নমস্কার করলো। তখনও কিন্তু ও বিবস্ত্রা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই কি তোর লাইফ শো নাকি ?

—আর একটু ব্রান্ডি দে। বলছি। সবুরে মেওয়া ফলে।

আর একটু ব্রান্ডি ঢেলে দিলাম মোহনকে। মোহনের তখন কিছুটা নেশা হয়েছে। বল এবার।

—এবার যখন পর্দা উঠলো তখন বাজনার সুর খুব কোমল। স্টেজের লাইটের রঙ বদলে গেছে, একটু নীলাভ—যেন কতগুলো তারা জ্বলছে, মাঝে একটা গোল আলো অনেকটা চাঁদের মত। স্টেজের পেছনে একটা পর্দা, তাতে আঁকা আছে একটা খরস্রোতা নদী আর বনানী।

একটি সুঠামদেহি ছেলে, আর একটি সুগঠনা মেয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে নানান ভাবে প্রেম নিবেদন করছে—উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, তারপর কামসূত্রের ডিমন-স্ট্রেসান ধাপে ধাপে। খাজুরাহের মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দিচ্ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলেছিল এ ডিমনস্ট্রেসান।

—তোর ভাল লাগছিল ?

—গা ঘিন্ ঘিন্ করছিল। প্রেম একটা মনের ভাব প্রকাশ। মনটাই মুখ্য, শরীরটা গৌণ। এটা একটা শরীরচর্চা নয়। এ নগ্নতার প্রকাশ অনেকটা রাস্তার কুকুরগুলোর মত। এর চাইতে ঐ পাশে বসা মেয়েটার সুড়সুড়িও ভালো লাগছিল। তুই দেখিসনি, ভালই করেছিস বোধহয়। এ দেখলে মেয়েদের প্রতি সম্মানবোধও নষ্ট হয়ে যায়, যা হয়েছে পাশ্চাত্যে। মেয়েরা যে কমনীয়, নমনীয়। টুরিস্টদের জন্য এরা যেমন উঠেছে তেমনি নেমেছেও অনেকটা। এবার তোর কথা বল শুনি।

আমার কথা—কাজ, গল্ফ্ খেলা, বই পড়া, নিজের মনে গান শোনা, ডিং সিং আর এ কখনও সখনও সিনেমা দেখা, খাওয়া দাওয়া, ঘুম—দিনটা শেষ হয়ে গেল।

—তুই কি বিয়ে করবি না ঠিক করেছিস ?

—সময় হলেই করবো।

—সময় আর কবে হবে ? বিয়েও করবি না, বদমাইসিও করবি না, তা হলে তোর তো রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়া উচিত। পৃথিবীতে ভগবান তোকে পাঠিয়েছেন কি জন্যে—ব্রহ্মচর্য্য পালন করার জন্যে ? আমাকে দেখ, চুটিয়ে ভোগ করছি। কোনও

খেদ নেই। যে কোনও সময় ত্যাগ করতে পারি। তুই ভোগই করলি না ত্যাগ করবি কি করে?

—তোর মত মিথ্যাচারী হতে আমার বাধে।

—কি বললি, আমি মিথ্যাচারী? আমি নিজেকে মিথ্যা ভোলাই না। কাউকেই বঞ্চিত করি না। সবাইকেই খুশি রেখেছি—স্ত্রী, পুত্র এবং নিজেকে—তুই তা পেরেছিস? এমনকি বাবা মাকেও সুখী করতে পারিস নি।

—কেন, বাবা মাকে তো সুখে রেখেছি।

—তারা তোর বৌ দেখেছে? নাতির মুখ দেখেছে? মাসীমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কত দুঃখ করলেন। জীবনটা বড্ড ছোট। এক একটা দিন যায় আর আমরা মৃত্যুর নিকটবর্তী হই। আর দেরি করিস না। আসলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। চল, আজ এখানেই ইতি টেনে শুয়ে পড়া যাক। আমাকে সকালে ডেকে দিস।

গেস্টরুমে এঃ সি টা চালিয়ে বললাম, পাশেই তোর বাথরুম। ওখানে পিয়ালী নতুন টুথব্রাস রেখে দিয়েছে। দাড়ি কাটার সরঞ্জাম ও আছে। গুড নাইট।

॥ ২৩ ॥

নন্দদুলাল এসেছে অফিস ফেরৎ, সঙ্গে ওর সেক্রেটারি।

নন্দদুলালের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আলাপ হয়েছে।

ওর কয়েক বছরই কেটে গেছে এই দেশে। কালীঘাটের ছেলে। কানপুর আই আই টি থেকে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পাশ করে গিয়েছিল জাপানে। সেখানে এক বছর থেকে মাস্টারস করতে আসে এ আই টিতে। সেখানে ওর পাশের ঘরে থাকতো একটি থাই মেয়ে। তার সঙ্গে ঘনিষ্টতা হতে হতে একদিন বিয়ে হয়ে গেল। ও কাজ করে এক ভারতীয় বোরা মুসলমানের কাছে, নাম তার কাজী সাহেব। তাদের ব্যবসার ডান হাত হলো নন্দ। ব্যবসা কাজী সাহেবরা আরম্ভ করেছিল চাল, গম, সুপারি ভারতে রপ্তানি দিয়ে। তারপর এজেন্সি নিয়েছে ভারতীয় যন্ত্রপাতির। নন্দর বৌ কাজ করে এক বিদেশি প্রতিষ্ঠানে, আর কাজের পর ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করে ওর ভাইদের সঙ্গে। ওদের দুটি মেয়ে আছে।

ওর সেক্রেটারি মধ্যবয়সি, ডাইভোর্সি। কিছুক্ষণ গল্প করে নন্দ বললো, চলুন আজ চাচার ওখানে খেয়ে আসি। টিম্ ওখানে খেতে খুব ভালবাসে।

চাচা দেখেই দূর থেকে চীৎকার করে স্বাগত জানালো, আরে নন্দদুলাল আর অতীশ, আসো, আসো। এইখানে তিনটা জায়গা হইয়া যাইব আইজকা তোমাগো মাগুর মাছের ঝোল খাওয়ামু, তার লগে আছে মুলা শোল। বসো আমি আই-আছি। বিয়ার খাইবানি? ওইডা আমার পয়সায় কী যেন কয়, ইংরেজিতে—

আমি বললাম, উইথ্ কম্‌প্লিমেন্ট্‌স—অন দ্য হাউস্।

চাচা পিঠে আলতো চাপড় মারলেন। হ, ঠিক কইছ। হালাগো ভাষাটা ঠিক রপ্ত করতে পারলাম না। প্যাটে নাই বিদ্যা তা হইব কইথ্‌থিকা। জম্মলগ্ন তো খারাপ আছিল না। ভাগ্যটাই আছিল খারাপ। না হইলে, ভাইস্যা ভাইস্যা এইখানে আইস্যা ঠেক্‌ম ক্যান্? সবই কপালের লিখন্। আমি চট্‌ কইর‍্যা আইথাছি।

টিম্ বেশ ভালো মেয়ে। কথাবার্তায় মার্জিত। থেমে থেমে ইংরেজি বলে।

জিজ্ঞেস করলাম, তা, নন্দ, তোমার বৌর সঙ্গে দেখা হয় কখন?

—সাধারণত রোববার। ও সকালে আটটায় বেরিয়ে যায় আর ফেরে রাত দশটায়। বাপের বাড়ি থেকেই খেয়ে ফেরে। আমি ততক্ষণে শুয়ে পড়ি। যেদিন একটু বেশী ড্রিঙ্ক করি সেদিন দেখা হয়, কিন্তু তখন আমার চোখ থাকে ঘোলাটে, বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খানিকটা হেসে নিল।

—তোমার সেক্রেটারীটি কিন্তু বেশ ভালো পেয়েছো।

নন্দদুলাল একমত,—দারুন এফিসিয়েন্ট।

বললাম হুঁ—তাতো দেখতেই পাচ্ছি—দুধের স্বাদ ক্ষীরে মেটাচ্ছ।

নন্দ ফিস্‌ফিস্ করে বললো, তা আর কি করা যাবে—বাড়ির গরুর দুধ না পেলে তো কিনেই খেতে হবে।

আমরা বাঙলায় কথা বলছি বলে ও ঠিক বুঝতে পারছে না, যদিও ভাবসাবে বুঝতে পারছে যে ওর সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। আমায় বললো, কি জিজ্ঞেস করছেন?

আমি বললাম, না, বলছি তোমার যোগ্যতার কথা।

ও একটু হাসলো।

খাবার এসে গেছে চাচার কথামত।

চাচা এক ফাঁকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, রান্না কেমন হইছে? মুলা শোলটা আমার রান্না।

—দারুন হয়েছে। আমার মায়ের রান্নার মত।

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, তা নন্দ, তুমি তো ঘটি, তোমার জিভে কি রকম লাগতাছে?

নন্দ খেতে খেতে ভুরু তুললো—কেন বাঙাল আর ঘটির কি জিভ আলাদা?

—তা না, কিন্তু স্বয়াদ তো অভ্যাসের ব্যাপার। তোমরা যেমন শুটকি মাছের নাম শুনলেই সিটকাইয়া যাও, আর বাঙ্গালগো সেই নামটা শুনলেই জিভের ডগায় জল আসে। ভায়েট্‌নামে কুকুরের ঠ্যাং ধইরা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে জোরে মাথাটা ঠুইক্যা দেয়। কুকুরটা একটু চীৎকার কইর‍্যা মইরা যায়। তারপর তার মাংস রাইন্ধা জোর খায় অরা। তুমি পারবা? কইবা কী জঙ্গলি ওরা।

নন্দদুলাল খাওয়া শেষ করেই উঠে পড়লো, একটা কাজের ছুতো করে।

আমি চাচাকে বললাম, একদিন আমার বাড়িতে আসুন। আমার রান্না খাওয়াবো আর আপনার শেষ না করা গল্পটুকু শুনবো। গলা নামিয়ে বললাম, সিভাস্‌রিগাল

খাওয়াবো।

চাচা খানিক ভেবে বললেন—ঠিক আছে সামনের সোমবার যামু। তুমি আমারে সাড়ে পাঁচটায় লইয়া যাইও। সোমবার ভিড় একটু কমে থাকে।

সোমবার চাচাকে নিয়ে এলাম। দুগ্লাস হুইস্কি শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করলাম, রেঙ্গুনে আসবার পর কী হলো ?

চাচা বেশ মৌজ করে বসেছে। তুমিতো আচ্ছা নাছোড়বান্দা পোলা। এইর লেইগাই বুঝি আইজ আমারে খাইতে কইছো ? ঠিক আছে শোন তবে। আমারও সেই দিনগুলির কথা কইথে ভালই লাগে।

ভোলাদার আছিল দুই তলা কাঠের বাড়ি। উপরে আছিল ওনার থাকনের ঘর আর নীচটা আছিল হোটেল। দুইটা শোয়ার ঘরে ছয়জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক থাকতেন। বাইরের লোকও খাইতো জনা দশেক—সবাই বাঙ্গালী। তারা সকলেই সাহেব কম্পানিতে কেরানীর কাজ করতো।

রান্না করতো এক উড়িয়া ঠাকুর আর ঘরের কাম করতো দুইজন বর্মি মাইয়া।

তরুদি আইথেই আঁচলে বাইন্ধা দিল ভোলাদা তার চাবির গোছা। আমি হইলাম হুকুম বরদার। সাত সকালে ভোলাদার লগে বাজার যাইতাম। তরুদির ফর্দ অনুসারে বাজার হইত। তারপর তরুদির হুকুমমাফিক চলতাম। তরুদি আমারে খুব স্নেহ করতো।

সকাল সাড়ে আটটা থিকা লোক খাইতো, দুইটা পর্যন্ত, আর সন্ধ্যায় সাতটা থিকা রাইত দশটা। এই সময়টা ক্যাশবাকস সামলাইত ভোলাদা। মাঝে মাঝে পানটা তামাকটা দিতে হইতো আমার। হোটেলের বাবুগো আমিই পরিবেশন করতাম, আর তরুদি ঘোমটা ঢাকা মুখে আমারে ফিস্‌ফিস্ কইরা কইথো, এখানে একটু ডাল দাও এখানে একটু তরকারি। মাছ কিন্তু এক টুকরার বেশী দ্যাওনের নিয়ম আছিল না।

ঘুমটার আড়ালে সুন্দর মুখখানা দ্যাখনের কারও সৌভাগ্য হইতো না, কিন্তু চুড়ির আওয়াজ, ফিস্‌ফিস্ করা কথার মিষ্টত্ব, আর অপরূপ হাত পা দেইখ্যা কল্পনায় একটা অন্নপূর্ণার মূর্তি ভাইব্যা লইত সকলে। সোনার হার, চুড়ি, রঙ্গিন শাড়ি পইরা তরুদির সৌন্দর্য দিনদিন শশিকলার লেখান বাড়তাছিল।

সুতৃপ্ত আহার আর ঘরোয়া পরিবেশের লেইগ্যা ভোলাদার হোটেলের আরও রমরমা অবস্থা। সবাই আড়ালে কইথো ভোলাদার এলেম্ আছে! খুজে পেতে এনেছে বটে এক অন্নপূর্ণা। এ রকম একজন পেলে আর লুঙ্গির পেছনে ধাওয়া করে কে ?

জানতে চাইলাম—তরুদিকে কি ভোলাদা বিয়ে করে ফেলেছিল এর মধ্যে ?

চাচা হেসে বললেন,—বর্মামুলে কে বিয়ার দরকার হয় না। ঐসব লইয়া কারও মাথা ব্যথা নাই, তাই বাঙ্গালী সধবা, বিধবা পলাইলে ঐখানে চইল্যা আইথো।

—রেঙ্গুনে কি অনেক বাঙ্গালী ছিল তখন ?

—ডাক্তার, উকিল তো সবই প্রায় আছিল বাঙ্গালী, আর বাবুগো একটু বিদ্যা আছিল

অথচ দ্যাশে কিছু হয় নাই তারাও এইখানে আইস্যা জুটতো। একটা চাকরির যোগাড় হইয়া যাইতই—হয় ভ্যানের, না হইলে টিনের খনিতে বা চায়ের বাগানে আর না হইলে কাঠ সাপ্লাইর অফিসে। হাজার, বুদ্ধি পোলাগুলি সব অলস, তার উপর আবার ইংরেজি পড়াশুনা, তখনও অগো মগজে ঢুকে নাই।

—ভোলাদার সঙ্গে তাহলে তরুদি স্বামী স্ত্রীর মতই থাকতো ?

—না তরুদি আমার ঘরে আলাদা শুইতো। পাশের ঘরে থাকতো ভোলাদা। খাওয়া দাওয়া সাইরা তরুদি ভোলাদার পায়ের কাছে বইস্যা সারাদিনের খরচের হিসাব দিত আর ভোলাদা গড়গড়ায় সুখটান দিত, কাইথ হইয়া শুইয়া। তখন মাঝের দরজাটা ভ্যাজানো থাকতো। রোজই শুনতে পাইতাম শেষমেষ তরুদির গলা, না, না তা হয় না। তুমি ঘুমাও ভোলাদা, কইয়াই ছুইটা চইল্যা আইথো আমাগো ঘরে আর দরজাটায় কুলুপ লাগাইয়া ধপ্ কইরা শুইয়া পইড়া কইথো, কী রে ভাইটি, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ?

আমি রাও কাড়তাম না।

আমি আর তরুদি হোটেল চালাইতাম। ভোলাদা তাই একটা মনোহারি দোকান করলো। সকাল আটটায় বাইর হইয়া বাড়ি ফিরত রাত আটটায়, মাঝে দুপুরে তিন ঘন্টা বিশ্রাম।

চাচা নিজের খালি গ্লাস বাড়িয়ে ধরলেন,—কই হে, আর এক গ্লাস দাও। বকর বকর করতে করতে যে গলা শুকাইয়া গ্যাছে।

বললাম,—চাচা, আপনার আর খাওয়া ঠিক হবে না। ডাক্তারের বারণ আছে না ?

—দ্যাখো, আর কয়টা বছর বাঁচুম হয় পাঁচ না হইলে শূন্য ? আত্মারে কষ্ট দিয়া লাভ কী ? শূন্যের নীচে তো আর কোনও সংখ্যা নাই। দাও, দাও। বড় ভালো হুইস্কিটা। কি নাম কইল্যা ব্যান—মনে পড়ছে সিভাস্। ভেরি গুড্। ধেনো দিয়া তো আরম্ভ করছিলাম তাই ঠিক বুঝতে পারি তফাৎটা।

বাধ্য হলাম আর একটা ছোট্ট দিতে। তারপর চাচা ?

—সব বাবুরা অফিস চইলা গ্যালে আমি আর তরুদি সব বোর্ডারগো বিছানা পত্র গুছাইয়া রাখতাম। একজন বোর্ডারের নাম আছিল অপরেশ। সেই দামড়া খুব বই পড়তো। কারও লগে বড় একটা কথা কইতো না। তরুদি সেইখান থিকা বই নিয়া পড়তো, আবার পড়া হইলে রাইখ্যা যাইতো।

আমারে একদিন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলো, তুই পড়তে জানিস ?

আমি কইলাম, তা জানি, একটু আধটু।

—তুই আমার এইখান থেকে বই নিস বুঝি ? খুব ভালো।

আমি সত্যি কথাটাই কইয়া ফালাইলাম। তারপর থিকা উনিই বই বাইছা সামনে রাইখ্যা যাইতেন।

একদিন অপরেশবাবু খাইতে আইলেন না। আমি ভাবলাম কোথাও গ্যাছেন বোধহয়। মাঝে মাঝে উনি উধাও হইতেন। সকলে চইল্যা গেলে ঘর গুছাইতে গিয়া

দেখি ওনার মুখ দিয়া গ্যাজলা বাইর হইতাছে, আর গোঁ গোঁ শব্দ। গায়ে হাত দিয়া দেখি ধুম জ্বর। তরুদিরে ডাইক্যা আনলাম। দুইজনে মিলা মাথায় জল ঢালতে ঢালতে জ্ঞান হইল। মাথায় জলপটি দিয়া হাওয়া করতে করতে অপরেশবাবু চোখ খুললো, খুইল্যাই দ্যাখলো, তার মুখের কাছে কালা ম্যাঘের ফাঁকদিয়া পূর্ণিমায় চাঁদ হাসতাছে। ডাগর চোখের চাহুনি, মাথার ঘুমটা পইড়া গ্যাছে।

তরুদি তাড়াতাড়ি ঘুমটা টাইন্যা কইলো, এখন কেমন লাগছে?

বাবু হাইস্যা কইলেন, এরকম ভালো কখনও লাগেনি। তরুদির চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি ধইরা আবার কইলেন, এ যাত্রা আপনার জন্যেই বেঁচে গেলাম।

তরুদি লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি উইঠ্যা, যাই আপনার জন্যে একটু দুধ, বার্লি করে আনি। আর ননীকে পাঠাই হারান ডাক্তারকে ডেকে আনতে। উনি যতদিন অসুস্থ ছিলেন তরুদি ওনার সঙ্গে বইস্যা গল্প করতো, ভোলাদা বাইর হইয়া গেলেই। গান্ধিজী, নেতাজী, মাস্টারদা এইসব লইয়া তর্ক হইতো। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পইড়া শুনাইতো।

একদিন সকালবেলা পুলিশ আইস্যা হোটেল ঘিরা ফালাইল। অপরেশবাবু আমারে একটা প্যাকেট দিয়া কইলেন, তোমার তরুদিকে বলো এটা ব্লাউজের ভেতর লুকিয়ে রাখতে।

পুলিশ খোজ কইরা আর কিছু পাইল না। ভোলাদা পুলিশ চইল্যা গেলে লাফালাফি করতে সুরু করলেন।

পরের দিন অপরেশবাবু বিছানাপত্র লইয়া কোথায় চইলা গেলেন। যাবার আগে অবশ্য তরুদির নামে আমার কাছে একটা চিঠি দিয়া গেছিলেন।

একদিন বিকালে আর তরুদিরে পাওয়া গেল না। ভোলাদা পুলিশে খবর দিল। অপরেশবাবুর নামে ডাইরী করলেন। তরুদি না থাকাতে আমার মনটাও খারাপ হইয়া গেল। আমিও একদিন ভোলাদার হোটেল ছাইড়্যা একটা মেসবাড়ি চইল্যা গেলাম।

সেই মেসের নৃপতি বাবু আছিল, বড় ভালো লোক। সময় পাইলেই আমারে পড়াইতে বসাইতো। এইখানেও পুলিশ হানা দিত মাঝে মাঝে, কিন্তু কিছুই পাইতো না, কারণ চিন্তাহরণ দারোগাবাবু আগের থিকা খবর পাঠাইয়া আমাগো চিন্তা দূর করতেন।

—তরুদির কি হলো?

অনেকদিন পর ভোলাদার সাথে বাজারে দেখা।

আমারে দেইখ্যা কইলো, তোর দিদি তোর খোঁজ করছিল। একদিন আসিস।

গেছিলাম। পাকা গিন্নি হইয়া বইছে। ভোলাদাও খুব খুশি। আমারে বসাইয়া মিষ্টি খাওয়াইল। আর কখনও যাই নাই ওইখানে। আরে খুদা পাইয়া গ্যাছে। আইজ খাইতে দিবা, না শুধু গল্পই শুনবা?

খেয়ে চাচা বললেন, তুমি তো পাকা রাঁধুনি হে। দারুন রাঁধছো। তুমিও কি ঠাকুরের লগে রাঁধতা নাকি আমার মত? দেইখ্যা তো তা মনে হয় না?

—তারপর কী হলো ?

—যুদ্ধ লাগল। জাপানিগো হামলা, বৃটিশ সিংহের কৃতিত্বের সহিত্ত পশ্চাদ-অপসরণ আর আমার বর্ম্মা মুলুক থিকা পলায়ন। আমার গল্পটি ফুরাইল, নটে গাছটি মুড়াইল।

আমি বললাম, দারুণ আপনার জীবনকাহিনী—রঙে, রসে ভরা।

—আমারও ভালো লাগলো, তোমারে শুনাইয়া। এইবার চল, আমারে দিয়া আইবা।

চাচাকে পৌঁছে দিয়ে এলাম যখন, তখন ঘড়িতে বাজে প্রায় এগারোটা। ব্যাংককের রাত্রি তখনও জমজমাট।

॥ ২৪ ॥

কাল ছুটি। কি করবো ভাবছি, চোখ পড়লো বাংলা ক্যালেণ্ডারটারের দিকে। বাংলা ক্যালেণ্ডারটা মা দিয়ে দিয়েছিল যখন দেশে গিয়েছিলাম শেষবার। পথ তো আড়াই ঘন্টার আর ভাড়া তো আড়াই হাজার, কলকাতা থেকে বম্বে যাওয়া আর কী। তাই প্রায়ই যাই। মার আদর, মন পছন্দ খাওয়া দাওয়া, বাবার প্রাণভরা আশীর্বাদ, বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকদিন মনখুলে আড্ডা দিয়ে চাচার কথায় 'ব্যাটারিটা চার্জ" দিয়ে আবার এসে লেগে পড়ি কাজে।

ক্যালেণ্ডারে দেখলাম কাল দোল। কলেজে থাকতে খুব দোল খেলতাম। একবার মনীষাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম দলবেঁধে দোল খেলতে। খুব হুল্লোড় করে দোল খেলা হলো, তারপর সমবেত কন্ঠের গান আর মধুরেণ সমাপয়েৎ। এসব মনে পড়লেই মনটা খারাপ হয়ে যায় আর সেটা কাটাতেই উম্নিকে ফোন করলাম। কী করছেন কাল ?

উম্নি জানালেন, কাল মন্দিরে যাবো।

—কোন মন্দিরে ?

—কাল দোলযাত্রা, জানো তো ? যাবো প্রথমে রামমন্দির তারপর দুর্গা মন্দির, তারপর শিবমন্দির, শেষে যাবো হরেকৃষ্ণ মন্দির।

একটু ইতস্তত করে বললাম, আমায় নিয়ে যাবেন ?

উম্নি তৎক্ষণাৎ রাজি, নিশ্চয়। তা হলে তৈরি হয়ে থেকো। আমি ছটার মধ্যেই আসছি।

বেরিয়ে পড়লাম উম্নির সঙ্গে। পথে দেখলাম থাই মেয়েরা ফুলের মালা নিয়ে ত্রিমূর্তি'র চারিদিক প্রদক্ষিণ করছে। ধূপ দীপ দিয়ে পুজো করছে। উম্নি সেখানে নেমে ধূপ আর দীপ জ্বালালো। আমিও তাই করলাম। কয়েকজন থাই, সোনার পাতলা পাত লাগিয়ে দিচ্ছে মূর্তি'র গায়ে। কিছুদিন আগেও মূর্তি'টা

ছিল কষ্টিপাথরের, এখন প্রায় সবটাই সোনায় মুড়ে গেছে।

গাড়িতে উঠে উনি বললো, এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানো?

আমি বললাম তা তো জানা নেই।

—এই সামনের হোটেলটা হলো ইরাবান হোটেল, একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান। ইরাবান জানো তো, কৃষ্ণের এক ছেলের নাম ছিল। এই হোটেল তৈরির জন্যে মার্বেল পাথর আসছিল ইতালি থেকে। জাহাজটা পাথর সুদ্ধ সমুদ্রে ডুবে যায়। তারপর দুজন মিস্ত্রি উপর থেকে পড়ে মারা গেল। তখন পণ্ডিতরা বললো, এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। সেই প্রতিষ্ঠিত হলো এই সুন্দর কষ্টিপাথরের মূর্তি। তারপর বিনা বিপত্তিতে হোটেল তৈরির কাজ শেষ হলো।

এরপর আমরা গেলাম রামমন্দির। অনেকটা জায়গা নিয়ে এই রামমন্দির। পূজারী কাশীর ব্রাহ্মণ। আমরা পূজো দিলে, পুরোহিত আমাদের কপালে আবীরের টিপ্ দিয়ে দিল।

হলে ঢোল বাজিয়ে এক দল হোলির গান গাইছে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে।

আ গৈল হোলি, আ গৈল হোলি।
বৃন্দাবনমে হোলি খেলে কৃষ্ণ মহারাজ,
শ্যামদেশমে হোলি খেলে আপন্ লোক, আপন্ লোক।
গোপি মিলে বৃন্দাবন, গোপি মিলে হিঁয়া,
ইসি লিয়ে নাম লিয়া শ্যামদেশ ভাইয়া।

এদের স্বরচিত গান, এক জন প্রথমে গাইছে আর সবাই মিলে দোহার দিচ্ছে। মাঝে মাঝে হোলি হো, হোলি হো বলে, আবীর উড়িয়ে দিচ্ছে।

উনি বললেন, এরা সব গোরক্ষপুরের লোক, বুঝেছ অতীশ। ওখানকার বোধহয় হাজার দশেক লোক আছে এখানে।

—এরা করে কী?

—কেউ দারোয়ানি, কেউ কাজ করে ভারতীয়দের কারখানায়, কারও হয়তো আছে কাপড়ের দোকান, কেউ বিক্রি করে ছোলা ভাজা, বা বাদাম ভাজা। একটা ঘর ভাড়া করে পাচ সাত জন একসঙ্গে থাকে।

জিজ্ঞেস করলাম—ওয়ার্ক পারমিট পায় কোথায়?

আরে তুমিও যেমন, কিসের ওয়ার্ক পারমিট? সব থাকে বেআইনিভাবে।

যার পাশে বসেছিলাম, তাকে জিজ্ঞেস করলাম,—আপ কেত্তনা সাল সে হিঁয়া হায়?

সে খানিক ভেবে বললো, করিবন দশ সাল।

—আয়া কিঁউ?

—আনপড় আদমি। দেশমে তো ক্ষেতমজুরকো কাম করতা থা। উসসে কেয়া মিলতা থা—কুছ্ নেহি। পেটভি নেই ভরতা থা। হিঁয়া তো কমসে কম পাঁচ হাজার বাট মিল জাতা মাহিনামে। লেড়কা দেশমে বি. এ. পাশ কিয়া, ফের ভি

বেকার।

কী করে এলো জানতে চাইলে, বললো, থোড়া বো জমিন. থা, উ বিক্‌কে চলে আয়া।

জিজ্ঞেস করলাম, ছ্‌পাকে চলা আয়া, কেয়া ?

সে ঘাড় ঝাঁকাল, যেন এটাই স্বাভাবিক—আউর কেয়া ?

—ফির দেশ যাতা কেইসে ?

মাথা চুলকে বললো—উ হো যাতা বন্দ্‌বস্ত্‌। থোড়া যাদা পইসা লাগতা, বাস্‌। পইসা হোনেসে এ দ্‌নিয়া মে সব কুছ্‌ হো যাতা, বাব্‌ সাহাব।

সবাই ধ্‌তি পাঞ্জাবি পরে হোলির গান করে বিদেশে দেশের বাতাবরণ স্‌ষ্টি করেছে। ভালই আছে। এ রকমই একজনকে সঙ্গী পেয়েছিলাম, প্রথম আসবার সময় কলকাতা বিমানবন্দরে, গামছা কাঁধে, কানে পৈতে, হাতে থলে।

এরপর দ্‌র্গাবাড়ি, সিলোম রোডে। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য। গেটের সামনে শিবের ষাঁড়। উঠোন পেরিয়ে মন্দিরে ঢ্‌কলে দেখা গেল চারিদিকে সব দেব-দেবীর ম্‌র্তির সাথে ব্‌দ্ধের ম্‌র্তিও স্থাপিত। শেষপ্রান্তে চন্দ্রাতপের নীচে দ্‌র্গাম্‌র্তি। ভারতীয়দের চাইতে থাইদের ভিড়ই বেশী। থাইরা ষাঁড় থেকে আরম্ভ করে সব ঠাকুরের কাছে নৈবেদ্য দিচ্ছে, বাতি জ্বালাচ্ছে। রাধা কৃষ্ণকে খুব ভক্তিভরে নতুন সাজে সাজাচ্ছে একটি থাই মেয়ে। প্‌রোহিত সব তামিলনাড়্‌র ব্রাহ্মণ।

আমরা সেখানে প্‌জো দিয়ে সমবেত সবাইকে, থাই মেয়েদের শ্‌দ্ধ, বেশ কিছ্‌টা আবীর মাখিয়ে, কলাপাতায় প্রসাদম্‌ খেয়ে বেরিয়ে এলাম। এরপর শিবমন্দির।

শিব মন্দির স্থাপন করেছে আর্যসমাজ থেকে। অনেকটা জায়গা নিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠিত। একটা হলঘরের একপ্রান্তে মন্দির। শ্বেতপাথরের শিবের ম্‌র্তি। এখানেও প্‌জারী ছাড়া সব ভক্তই থাই।

হরেকৃষ্ণ মন্দিরে শিষ্যের দল দ্‌ই একজন সাহেব ছাড়া সবই থাই। সাদা ধ্‌তি পাঞ্জাবি পরা, মাথা নেড়া শিষ্য, হাতে জপের মালা, ম্‌খে কৃষ্ণ নাম। ওখানে ল্‌চি তরকারি ভোগ খাচ্ছিল সব থাইরা।

উম্নি বললেন, চল আমরা ক্লাবে গিয়ে লাঞ্চ্‌ খাবো। ক্লাবের বারান্দায় গিয়ে বসলাম। বিয়ারের গাসে চুম্‌ক দিয়ে আমি উম্নিকে জিজ্ঞেস করলাম, চল্লিশ বছর ধরে তো আছেন এখানে, আপনার স্ত্রী কোনদেশী ?

হেসে বললেন, আমার স্ত্রী অনেকদিন থেকেই নেই। সে ছিল চিনা থাই।

আমি সমবেদনার স্‌রে বললাম, মারা গেছেন ব্‌ঝি ?

—না মারা যায়নি। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

—কেন ? বলেই মনে হলো ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌত্‌হল ঠিক নয়।

উম্নি নিঃসঙ্কোচে বললেন, না। আমার একটি মেয়ে হয়েছিল। তাকে ভীষণ অযত্ন করতো মেয়ে বলে। সে চাইছিল একটি ছেলে। আমি দেশে গিয়েছিলাম, এসে দেখলাম আমার মেয়েটি মারা গেছে ওর অযত্নে। তাই আমি ওকে ডাইভোর্স করলাম। কিছ্‌দিন পর এক থাইর সঙ্গে ওকে বিয়েও দিয়ে দিলাম।

—আপনি কি তাহলে একাই আছেন ?

—না, আমার তিনটি মেয়ে আছে। দুজন গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। তাদের ভালো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আমার নাতি নাতনিও আছে।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, এটা কি রকম হলো ? আপনার সন্তান নেই অথচ নাতি নাতনি ?

—ভয় পেলে নাকি ? ওরা অবৈধ নয় আমার দত্তক মেয়ের সন্তান।

প্রথম দুজন দত্তক, আমার স্ত্রীর বোন। ওদের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। দুটি মেয়ের বিয়ের পর বড্ড একা হয়ে পড়লাম, তখন তৃতীয়টিকে এডপট্ করলাম। এটি অর্ফেনেজ থেকে নেওয়া। এই মেয়েটিও এখন বড় হয়ে গেছে। কনভেণ্ট স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। আমার একটা ছোট্ট নাতনি আছে, যে আমার গার্জিয়েন। রাত্রে আমার সঙ্গেই খায়, আমার কাছে শোয়। ওর মাকে আমিই বাড়ি করে দিয়েছি। ওর মা বাবা দুজনেই কাজে বেরিয়ে যায়। ওর বাবা উকিল, আর মা স্কুলে পড়ায়।

বললাম – তাহলে আপনি তো বেশ খোস মেজাজে আছেন, বলুন।

উনি পরিতৃপ্তির হাসি দিলেন, খারাপ কিছু নয়। তবে এক এক সময় মনে হয় দেহটা রাখবো কোথায়—দেশের মাটিতে, না বিদেশে ?

—দেশে আপনার কে আছে ?

—এক বোন আছে নিজের, আর বৈমাত্রেয় ভাইরা আছে। ভাইদের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। দেশে একটা বাড়ি করেছি। ওখানে আমার বোন থাকে। বোন বিধবা।

—আপনি এখানে এত সম্পত্তি করলেন কী করে ?

— আমার এজেন্সি আছে স্মল্ আর্মসের দুটো কোম্পানির, একটা আমেরিকান আর একটা চেক্।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এত স্মল্ আর্মস বিক্রি হয় কোথায় ?

— কেন ? এখানকার সেনাবিভাগ নেয়, সান্ত্রা নেয়, লাওস থেকে কেনে তাছাড়া প্রাইভেট বিক্রিও অনেক হয়। এখানে যত বড়লোক দেখছো, তাদের সবারই নিজস্ব দেহরক্ষীর দল আছে, কারণ এদের নানান রকম ব্যবসা আছে, যা চোখের আড়ালে, রাতের অন্ধকারে হয়। সে ব্যবসায় দু দলের লড়াই, স্বার্থের সংঘাত লেগেই থাকে। হাজার বাট খরচ করলেই তুমি কাউকে হাপিস্ করে ফেলতে পারবে।

একটি ওয়েইট্রেস গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলো খাবারের অর্ডার নিতে। মেয়েটির রঙ ফর্সা, লম্বা, গোলগাল চেহারা, পরনে সাদা ফ্রকের ওপর নীল এপ্রন, কানে দামি রুবির দুল, গলায় মুক্তোর মালা।

আমায় জিজ্ঞেস করলো, ভালো আছেন তো ?

আমার মনে পড়লো, ঐ আমাকে উমির কথা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল। অথচ আজ উমির সঙ্গে কোনও কথা বলছে না।

উমিই জিজ্ঞেস করলো, উ-থাই ভালো আছ তো ? তোমায় অনেক দিন পর দেখছি।

ও ঘাড় নেড়ে জানাল, ভালো আছে। এলে তবেই না দেখা হবে?

উনি খানিকটা কৈফিয়ত দেবার মতো বললেন, এবার যাবো। আমার শরীরটা ভালো ছিল না।

মেয়েটি বললো, এ বয়সে একটু সামলে চলতে হয়। এদিক ওদিক যেতে নেই।

—এদিক ওদিক আর যাই কোথায়? আর একটু গলা নামিয়ে, তা তোমার সপ্তাহের ছুটি কবে?

মেয়েটি তীর্যক, হাসছে—সোমবার।

—ঠিক আছে। দেখা হবে সেদিন সন্ধ্যার পর।

—দেখা যাবে, বলে পরিচারিকা চলে গেল।

আগেকার প্রসঙ্গের খেই টেনে—বললাম, আপনি চল্লিশ বছর আগে যখন এসেছিলেন, তখন নিশ্চয় লোটা কম্বল নিয়েই দেশ থেকে এসেছিলেন?

—তা যা বলেছো। তবে আমি প্রথমে এখানে আসিনি। প্রথমে গিয়েছিলাম সিঙ্গাপুরে। সম্বল শুধু সিভিল ইঞ্জিয়ারিং এর একটা ডিপ্লোমা। কাজ পেলাম একটা কনস্ট্রাকসন কোম্পানিতে।

—তারপর এখানে এলেন কি করে?

—যুদ্ধ লাগলো। জাপানিরা পার্ল হারবারে আমেরিকান নৌঘাটি গুঁড়িয়ে দিয়ে ঝড়ের গতিতে স্থলপথে এগিয়ে এলো মালয়েশিয়ায়। ওদিকে হিটলার সারা ইউরোপ তার বুটের তলায় দাবিয়ে ডবল মার্চ করে এগিয়ে চলেছে মস্কোর দিকে। বৃটিশরা সাফল্যের সঙ্গে পেছু হটলো। সিঙ্গাপুরে দুটো বিরাট যুদ্ধ জাহাজ, প্রিন্স অফ ওয়েলস আর রিপালস সমুদ্র উপকূল পাহারা দিচ্ছে। হাজার হাজার গুর্খা, অস্ট্রেলিয়ান, ইংরেজ আর ভারতীয় সৈন্যে ভরে গেছে সিঙ্গাপুর। আমাদের কাজ সব বন্ধ হয়ে গেছে। একদিন জাপানি সুইসাইড স্কোয়াড, 'কামিকামা' ঐ দুটো জাহাজের চোঙার মধ্যে ডাইভ করলো বোমা নিয়ে। তার দুদিন পর পেনাঙের মধ্য দিয়ে ব্রিজ পার হয়ে সিঙ্গাপুর আক্রমণ করলো জাপানিরা। ইংরেজ সেনাপতি, পার্সিভেল, তখন ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলছিলেন। একজন বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে বললো, এক জেনারেল সাহেব আপনার সঙ্গে জরুরি কথা বলতে এসেছেন।

পার্সিভেল রেগে বললেন, আস্ক দা বস্টার্ড টু ওয়েইট। লেট মি ফিনিস দি গেম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অপেক্ষারত জেনারেল খেলার ঘরে ঢুকে স্যালুইট করে অত্যন্ত বিনীত ভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন, সরি টু ডিস্টার্ব স্যার, আই জেনারেল ইয়ামাসিটা।

পার্সিভেলের তখন প্রায় প্যান্ট হলুদ হয়ে গেছে। হতচকিত হয়ে টুপি খুলে সেলাম করে বললো, আই এম সরি স্যার। ইউ হ্যাভ কাম্ টু ডেজ টু সুন স্যার।

তার কয়েকদিন পরই মৌলমিনের পতন হলো।

—তারপরই নিশ্চয় নেতাজী আই. এন্. এ. তৈরী করেছিলেন?

—ঠিক তাই। নেতাজী জার্মানি থেকে জার্মান সাবমেরিনে আফ্রিকা ঘুরে তখন টোকিওতে এসেছেন। রাসবিহারী বোসের সাহায্যে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর সাথে দেখা করে চলে এসেছেন সিঙ্গাপুরে। তিনি ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে দেখা করে আই. এন. এ. গঠন করলেন। সব ভারতীয়দের বললেন, তোমরা আমায় রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।

দলে দলে ভারতীয় যুবক-যুবতী সাড়া দিল তার ডাকে। আমিও সেই দলে যোগ দিলাম। অদ্ভুত নেতৃত্ব, অদ্ভুত তার সংগঠন শক্তি, আর কি তার অক্লান্ত পরিশ্রম। কিছুদিনের মধ্যেই এক শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যদল সৃষ্টি হলো। প্রধান সেনাপতি নেতাজী, তার নীচে শানাওয়াজখান আর মহিলা বাহিনীর নেতা লক্ষ্মীবাই, এক তামিল মেয়ে।

খাবার এসে গেছে। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কাজটা ছিল কী ধরনের?

—আমি ছিলাম পাবলিক রিলেসান অফিসার। আমাকে পাঠানো হলো ব্যাংককে।

আমি এবার বললাম, তারপরের ঘটনা কিছুটা আমার জানা আছে। ভারতীয় সৈন্য ইম্ফলে ঢুকেছিল; কিন্তু এর মধ্যে জার্মানরা হেরে গেল, নাগাসাকি ও হিরোসিমায় এটম্ বম্ব পড়লো। আমেরিকায় তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো ম্যাকআর্থারের সাথে সন্ধি করলেন। অনেক জাপানি জেনারেল হারিকিরি করে মারা গেল। নেতাজী প্লেন এ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন ম্যানিলার কাছে, এটম বম্ব পড়ার কিছুদিন আগে।

উনি মাথা নাড়লেন—আমার মনে হয়না প্লেন এ্যাকসিডেন্ট উনি মারা গিয়েছিলেন আমার ধারনা ওকে মেরে ফেলেছিল জাপানি সেনাপতি। এ্যাকসিডেন্টের খবরটা রটানো হয়েছিল।

জানতে চাইলাম—আপনার এরকম ধারণা হলো কেন?

—যদি উনি প্লেনে করে চলে যেতেন, তা হলে সবাইর থেকে বিদায় নিয়ে যেতেন। আই. এন. এর কেউই জানতো না, ওনার প্লেনে করে কোথাও যাবার খবর।

আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, জাপানি সেনাপতি ওঁকে মারবে কেন?

—জাপানিদের মতলব ছিল ভারতবর্ষকে ওদের উপনিবেশ করবে আর নরওয়ের কুইসলিং এর মত উনিও হবেন আর এক কুইসলিং। ঐ প্রস্তাবে উনি রাজি হননি কখনও। তাছাড়া নেতাজী জাপানিদের বলেছিল যে ভারতের মাটিতে ইংরেজদের সাথে লড়াই করবে শুধু আই. এন. এ.। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একবার যদি দেশের মাটিতে ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে দেশের জনগণের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়, তা হলে দাবানলের মত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। জাপানিদের ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। যখন ওরা বুঝলো, হি ইজ এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক তখনই ওঁকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

আমি বললাম, আপনার কথায় বেশ যৌক্তিকতা আছে। আপনি তো ছিলেন পাবলিক রিলেসান অফিসার। সেই কাজের জন্যে আপনাকে তখন ব্যাংককে থাকতে হতো কেনো ?

তার কারণ তখন ব্যাংককই ছিল জাপানিদের সাপ্লাই সেন্টার এবং ওদের সাউথ এশিয়ান হেড কোয়ার্টার। থাইল্যান্ডে কোনও যুদ্ধ হয়নি। থাইরা বিনা যুদ্ধেই জাপানিদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিল। এখান থেকে বাইরে প্রচার করারও অনেক সুবিধা ছিল।

—থাইরা জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি ?

—থাইরা বর্মি আর খামেরদের সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গেই কখনও যুদ্ধ করেনি।

আমি বললাম, থাইরা কিন্তু গর্বের সঙ্গে বলে যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ওদের দেশই কখনও পাশ্চাত্য শক্তির পদানত হয়নি।

উমির বললেন, সে কথাটা মিথ্যে নয়। আসলে ইংরেজ, ফরাসি আর ডাচরা ওদের দেশটাকে বাফার স্টেট করে রেখেছিল। সে সময় বর্মা, মালয়েশিয়া পর্যন্ত ছিল ইংরেজদের অধীনে, ভায়েটনাম, কম্বোডিয়া ও লাওসের একত্র নাম ছিল ইন্দোচায়না আর সেটা ছিল ফরাসিদের অধীনে আর ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচদের। জাপানিরা দরজার কড়া নাড়াতেই ওরা দরজা খুলে দিয়েছিল। তখন এ দেশটার নাম ছিল শ্যামদেশ, পাল্টে হলো থাইল্যান্ড অর্থাৎ ল্যান্ড অফ ফ্রি পিপল্।

—জাপানিরা যখন হেরে গেল আর নেতাজী মারা গেলেন, তারপর আপনি কি করলেন ?

—কি আর করবো, নিস্বঃ, বেকার প্রায় পথের ভিখারি। থাকতাম এক থাই পরিবারের সঙ্গে। হাতের কাছে যা পেতাম তাই করে কোনও মতে পেট চালাতাম। পথে একদিন এক জাপানি কর্ণেলের সঙ্গে দেখা।

সে বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে, সঙ্গে আছে কাঁড়ি কাঁড়ি বর্মি টাকা। আমাকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো, ওয়ান্ট থাই বাট্। হেল্প। গিভ মানি।

পরিচারিকা, উ, থাই খাবার টেবিলে উমিরের চেয়ারের হাতলটা ধরে বললো, আর কিছু লাগবে ?

উমির ওর হাত ধরে বললো, আর এক বোতল বিয়ার।

ও দৌড়ে বিয়ার নিয়ে এল। সেটা গ্লাস দুটোতে ঢেলে উমিরের কানের কাছে মুখটা নিয়ে থাই ভাষায় বললো, কাল রাত্রে কিন্তু আমরা একসঙ্গেই খাবো।

উমির ওর হাতে হাত রেখে বললো, সে তো নিশ্চয়।

মনে মনে ভাবলাম, উমির স্ত্রীর সব প্রয়োজন বিকল্পতায় মিটিয়ে ফেলেছে। ও চলে গেল সুন্দর একটা হাসি দিয়ে আমি বললাম, তারপর ?

তারপর আমি ওকে নিয়ে চলে গেলাম থাই বর্ডারে এক কাঠের কারবারির কাছে। তার কাছ থেকে ভালো দামেই বাট পেলাম। কমিশন্ ছাড়াও ও আমায় অনেক বাট দিল। আমি সেই টাকা পেয়েই চলে গেলাম আমেরিকা। আই. এল্. এ-তে

থাকার সময় স্মল আর্মস সম্বন্ধে ভালই ধারণা ছিল। একটা কোম্পানির থেকে এজেন্সি নিলাম। সেই আমার ব্যবসার সুরু। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাইনি

হঠাৎ ঘড়ি দেখে চঞ্চল হয়ে উনি উঠে পড়েছে – এই, এবার চল। আমার মেয়েকে স্কুল থেকে তুলে নিতে হবে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে, না ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাবে ?

—আমার জন্য ভাববেন না, ঠিক চলে যাবো। সারাদিনটা বেশ কাটলো। ধন্যবাদ।

॥ ২৫ ॥

অফিস থেকে এসে ভীষণ একা লাগছিল। চিন্ময়ের একটা গানের টেপ লাগিয়ে জামা কাপড় না ছেড়েই লম্বা হয়ে খাটে গা এলিয়ে চোখ বুজে শুনছিলাম।

"ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
মন নিয়ে ·"

পিয়ালী নেই। নিজে নিজে চাও করতে ইচ্ছে করছিল না। দরজার বেলটা বেজে উঠল। খুলেই দেখলাম, সামনে দাঁড়িয়ে আছে নেত্রা আর ভাসনা।

নেত্রা হেসে বললো ডিস্টার্ব করলাম না তো ?

বললাম, ডিস্টার্বড তো দূরের কথা, অসম্ভব ডিলাইটেড্। এসো, এসো।

পাশ থেকে ভাসনা বললো, আমাকে দেখে নিশ্চয় খুশি হননি ?

—তা কেন ? বড্ড একা লাগছিল। ভীষণ বোর হচ্ছিলাম। তাই শুয়ে শুয়ে গান শুনছিলাম। দেখ না, অফিসের জামা কাপড়ও ছাড়িনি। নিজে চা করে খেতেও ইচ্ছে করছে না।

ওরা সমস্বরে বললো, কেন ? পিয়ালী কোথায় ?

—ওর মেয়েটার অসুখ হয়েছে, তাই শ্বশুর বাড়ি গেছে। কাল চলে আসবে।

নেত্রা বললো, আমাকে দেখিয়ে দাও, কোথায় কী আছে, আমি চা করে দিচ্ছি। তুমি স্নান করে এসো।

স্নান করে যখন এলাম তখন চা পাঁপর ভাজা আর ফ্রেঞ্চটোস্ট রেডি।

অবাক হয়ে—আরে পাঁপর ভাজতে শিখলে কী করে ?

নেত্রা হেসে বললো—কেন, সেদিন শিখে নিয়েছিলাম, পিয়ালীর থেকে।

দ্রুত করে খেয়ে বললাম—যাক তুমি না এলে আজ আর চা খাওয়াই হতো না।

ভাসনা বললো, আমি এসেছি কেন জানেন ?

—নেত্রার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। এদিকে নাছোড়বান্দা, আপনার কাছে আসবেই। অনেকদিন নাকি দেখা হয়নি। ট্যাক্সি করে আসছিল। ওকে একা ট্যাক্সি

করে আসতে দিতে ভয় হলো—সুন্দরী বড়লোকের মেয়ে ; তাই পেঁছে দিতে এলাম। বলেন তো চলে যাই।

—এসেছো তো ভালই হয়েছে। আমায় ফোন করলে, আমিই গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতাম। না হলে আমি গিয়েও নিয়ে আসতে পারতাম।

—তা, আমি বলেছিলাম কিন্তু ও আপনাকে সারপ্রাইজ দিতে চাইল।

—আজ তোমরা কিন্তু খুব সুন্দর সেজেছ। এই পোশাকে দারুন দেখাচ্ছে, সিল্কের পাসীণ, এম্ব্রয়ডারি করা ব্লাউজ, পিজিয়ান রেড রুবির দুল তার সঙ্গে ম্যাচ করা গলার হার। দারুন, মনে হচ্ছে খাই মন্ডেল।

ভাসনা বললো, ওটা তো আপনি নেত্রাকে দেখে বলছেন। আমাকে কি রকম দেখাচ্ছে, তা তো বললেন না ?

বললাম—তোমার নীল পাসীনের সাথে এমারেল্ডের গয়নাও খুব মানিয়েছে।

ভাসনা আমার পিছনে লাগার জন্য বদ্ধপরিকর। কেমন খেলেন ?

—খুব ভালো।

ভাসনা মিটি মিটি হাসছে—ওটা কিন্তু আমার তৈরি।

—তোমরা আজ আমার সঙ্গে খাবে তো ?

খাওয়ালে নিশ্চয়ই খাবো—বললো ভাসনা।

—বাইরে না ঘরে ?

নেত্রা আর ভাসনা দুজনে এক সঙ্গে বলে উঠলো, আমরা আজ এখানেই খাবো। আপনাকে কিন্তু পৌঁছে দিতে হবে।

বললাম,—সেটা কোনও ব্যাপারই নয়।

নেত্রা আমার পাশে বসেছিল। মিষ্টি পারফিউমের গন্ধে আমার নিশ্বাস ভারি হয়ে আসছিল। ভাসনা না থাকলে হয়তো সে গন্ধ গায়ে মেখে নিতাম।

আমি নেত্রাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বুঝি একা আসতে ভয় পাচ্ছিলে ?

ভাসনা গম্ভীর হয়ে বললো, আমি আসাতে সত্যি আপনার মন খারাপ হয়ে গেছে। আমি তাহলে আজ চলি, বলে উঠে দাঁড়ালো।

আমি হাত ধরে ওকে বসিয়ে বললাম, তিনজন থাকলে গল্প ভালো জমে। দুজন থাকলে গল্প হয় না।

ভাসনা বসে পড়ে মুচকি হেসে বললো, দুজনে থাকলে কী হয় ?

আমি চট্ জলদি উত্তর দিলাম, প্রথমে জোরে জোরে কথা, তারপর ধীরে, অতি ধীরে তারপর কথা বন্ধ।

—বাঃ সে সুযোগটা মাঠে মারা গেল। গল্পই তা হলে হোক। কালকে কোথায় গিয়েছিলেন ?

—কেন, ফোন করেছিলে বুঝি ?

সকালে গিয়েছিলাম টেনিস খেলতে। তারপর চায়ের সময় একটু হাঁটতে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে যখন দীপ্তিপনী পার্কের কাছে গিয়েছি, তখন এক টুকটুকে-

ওয়ালা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো. হোয়ার ইউ ওয়াণ্ট টু গো, স্যার ?

থাই ভাষায় বললাম, কোথাও না।

—টুকটুক চালক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইউ ক্যান নট্ স্পিক ইংলিস ?

—আমি বললাম, ইয়েস আই ক্যান।

—স্পিক্ ইংলিস উইথ মি। আই লার্নিং ইংলিস। টেক ইউ টু মার্কেট। ভেরি চিপ্। এভ্রি থিং চিপ্।

—ঠিক আছে। চল।

—আই টেক। চিপ। টয়েণ্টি বাট।

ভাসনা বললো, বুঝেছি, এয়ার পোর্টের কাছে, সানডে মার্কেট। বিরাট বাজার। সব জিনিস পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ সব জিনিস পাওয়া যায়। জামা, কাপড়, হাড়ি কুড়ি, চীনা মাটির বাসন, তরি তরকারি, মাছ, মাংস, ফুল গাছ, বনসাই, দুর্বাঘাসের রোল (দেড়ফিট চওড়া আর লম্বায় প্রায় পাচ ফিট। রোল খুলে পাশে পাশে বিছিয়ে জল দিলে সাতদিনের মধ্যে লন্ তৈরি।)

টুকটুক ওয়ালা আমার সঙ্গেই ঘুরছিল। বললো, স্যার আই টেক ব্যাক। সো ইউ। নো এক্সট্রা।

ওর হাতে একটা নোটবুক। নতুন ইংরেজি শব্দ পেলেই তা নোটবুকে লিখে নিচ্ছিল। ওই দরাদরি করে সস্তায় জিনিস কিনিয়ে দিল।

নেত্রা জিজ্ঞেস করলো, কী কিনলে ?

বললাম—দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এনে দেখলাম, একটা ফেডেড্ জীন, একটা চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ, আর একটা এম্ব্রয়ডারি করা, ড্রেস্।

দাম শুনে নেত্রা বললো, সত্যি সস্তা। একদিন যেতে হবে তো। মুচকি হেসে বললো, মেয়েদের জিনিস দুটো কার ?

বললাম—যে নেয় তার। কারও উদ্দেশ্য করে কিনিনি। তোমাদের পছন্দ হলে তোমরা দুজন ভাগাভাগি করে নাও।

ভাসনা বললো, নিশ্চয় আমাকে উদ্দেশ্য করে কেনেন নি ? তা হলে আর আমি নেই কি করে ?

—শোন ভাসনা, জামাটা তোমার হবে না। তুমি ব্যাগটা নাও। আর নেত্রা দেখ এ জামাটা তোমার হয় কিনা ?

নেত্রা জামাটা পরে এসে বললো, ঠিক আছে। তারপর দুজনে অতীশের দুইগালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ।

—জানো ঐ টুকটুকওয়ালা দেখালো, ওর নোটবুকে অনেক আমেরিকান টুরিস্টদের নাম ঠিকানা আর সই রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, ঠিকানা দিয়ে তুমি কি কর ?

—আমি ইংরেজিতে চিঠি লিখি ওদের কাছে।

—ওরা উত্তর দেয় ?

—বেশীর ভাগই বের না।

ইংরেজি শিখে কি করবে, জিজ্ঞেস করায় বললো, আমেরিকা যাবে। রাত্রে ও ইংরেজি পড়ে। এমনি ও গ্র্যাজুয়েট। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে টুকটুকটা কিনেছে। ওর বাড়ি দক্ষিণে, মালয়েশিয়ার বর্ডারে।

ভাসনা জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমাদের এপার্টমেন্টে কখনও গেছেন ?

—না বললে কি করে যাই ?

নেত্রা বললো, আমাকে কি তুমি আসতে বলেছিলে আজ ?

—হার মানলাম। একদিন যাবো। শুনেছি তোমাদের বড় বাড়ি আছে, তা হলে এপার্টমেন্টে থাকো কেন ?

নেত্রা একটু অন্যমনা—তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম সৎমার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। আমার এই মার বয়েস আমার থেকে কয়েক বছর বেশী হবে। সি ইজ জেলাস অফ মি। আমি রোববার বাড়ি যাই সবাইর সঙ্গে খেতে। এই এপার্টমেন্টটা বাবাই আমাকে কিনে দিয়েছে।

কাল কাগজে দেখছিলাম পুলিশ একটা চোরাই ক্যাসিনোতে হামলা করেছে। সেখানে অনেক বড় বড় লোক ছিল। তাদের মধ্যে তোমার বাবার নামও দেখলাম।

—ঠিকই দেখেছ, তবে আমার বাবা জুয়া খেলছিল না। বাবা পুলিশদের সঙ্গে গিয়েছিল ড্রাগ ডিলারদের ধরবার জন্যে। ও ক্যাসিনোটা এক মহিলার। মহিলা এয়ারফোর্সের এক বড় অফিসারের স্ত্রী।

—কাগজে লিখেছে, তার একটা প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট কম্পানি ছিল। ওরা অনেক সুদের লোভ দেখিয়ে টাকা জমা নিত। থাই সরকার মহিলাকে ধরেছে, তার চারটে বাড়ির দখল নিয়েছে, দুটো মার্সিডিজ গাড়ি নিয়ে নিয়েছে।

ভাসনা বললো, আমারও পঞ্চাশ হাজার বাট গেছে, শতকরা ৪০ বাট করে সুদ দিত। বহু মধ্যবিত্ত লোক সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। অনেকে জমিজমা বিক্রি করে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে ঐ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছিল। সব গেছে।

আমি বললাম, ঐ মহিলা সরকারকে দিয়ে ইচ্ছে করেই ব্যাঙ্ক লাটে তুলে দিয়েছে। আমাদের দেশেও এমনি ছিল তার নাম সঞ্চয়িতা। এইভাবেই দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয় আর ধনীরা আরও ধনী। এই টাকাতেই ওরা জুয়া খেলে, রেস খেলে, অল্পবয়সি মেয়েদের দিয়ে নানান রকম পার্লার চালায়, অল্পবয়সি ছেলে মেয়েদের মাদকাসক্ত করে।

নেত্রা বললো, ছাড়ো তো ওসব কথা। এসো একটু স্ফূর্তি করা যাক ?

ভাসনা আবদার করলো, সেদিন ওকে স্যাম্পেন খাইয়েছিলেন, আজ আমাকে খাওয়ান।

বার খুঁজে বললাম, সরি, স্যাম্পেন নেই। রেড রাইন ওয়াইন আছে।

—বেশ তাই বার করুন। মিউজিক সিস্টেমে একটা এলভিস্ না হলে জনডেনো গান লাগান।

গানের আওয়াজে বাতাস কাঁপছে, ওয়াইনের নেশায় শরীর দুলছে। চোখ লাল হয়ে আসছে। ভালো মন্দের বিচার বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।

ভাসনা উঠে এসে আমাকে টেনে তুলে নাচতে আরম্ভ করলো।

—এ কী, আপনি দাঁড়িয়ে কেন? আমার সঙ্গে নাচবেন না বুঝি?

বাধ্য হয়ে কিছুটা নাচতে হলো। ভাসনা কিছুটা আউট হলেও বেশ ভালোই নাচলো। আমি নেহাকেও টেনে তুললাম। ভাসনা আবার ওয়াইনের গ্লাসটা ভরে নিল। নেহা মাঝে মাঝে আমার হাত ধরে নাচছিল, আর গানের কলি আওড়াচ্ছিল—আই লাভ ইউ ডার্লিং। লাভ মাই সুইট বডি। ডোন্ট লিভ মি এলোন।

আমি তখন ওর ঠোঁটে হাত বুলিয়ে বললাম, তুমি যদি বাঙালী মেয়ে হতে তা হলে এই গানটা করতে—বলে কানের কাছে মুখ নিয়ে গাইলাম—

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।

অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলাম।

ভাসনা হাততালি দিচ্ছে, এনকোর এনকোর, দারুন গান। উই আর রিয়েলি থার্স্ট ইন আওয়ার হার্ট বলে আমাকে টেনে আনলো।

নেহা একটু রেগে বললো, ভাসনা পাগলামি করিস না তো। চুপ করে বোস।

আমি বসে বললাম, চল এবার খাওয়ার জোগাড় করি। ফ্রিজে রান্না করা আছে সেগুলো গরম কর। ভাত রেধে নিলেই হবে।

নেহা বললো, তোমায় চিন্তা করতে হবে না। শুধু চালটা বের করে দাও। তুমি কি আর একটা হুইস্কি নেবে? ভাসনা আর নয়। তুই কিন্তু টিপ্সি হয়ে গেছিস।

ভাসনা বললো, কে বললো আমি টিপ্সি হয়েছি। এই দেখ আমি দিব্যি হাটতে পারছি, বলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। আমি ওকে ধরে বাথরুমে নিয়ে মাথায় জল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম।

আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে বললো, 'থাপ্ খুন খ্রাপ'। আমাকে অনেকদিন কেউ এভাবে আদর করে মাথা ধুইয়ে দেয় নি। ছোট্ট বেলায় আমার মা মারা গেছে। আমার বাবা আমাকে মামাবাড়ি রেখে চলে গিয়েছিল। হাউ সুইট।

আমার ঠোঁটটা একটু জল দিয়ে ধুয়ে নিলাম। ও মাথা আঁচড়ে লিপস্টিক লাগিয়ে গালে একটু পাউডারের পাফটা বুলিয়ে ফ্রেস হলো।

নেহার গলা শোনা গেল, কী হচ্ছে? এত দেরী হচ্ছে কেনরে?

ভাসনা টেবিল সাজাল, আমি আর নেহা খাবার সাজিয়ে ফেললাম।

খাবার দেখে ভাসনা বললো, আমি কিন্তু রুই মাছের মাথাটা খাবো। জানেন আমরা কার্প মাছের মাথা আর চোখ খেতে খুব ভালবাসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী রকম লাগছে আমাদের খাবার?

ভাসনা চুকচুক আওয়াজ করে বললো, বেশ ভালো। মাছের ঝোল আর মাংসের ঝোলে খুব একটা তফাৎ নেই। মালয়েশিয়ার বর্ডারে মাংস তো এভাবেই রাঁধে শুধু তফাৎ তাতে জল না দিয়ে নারকেলের দুধ দেয়, আর বর্মা বর্ডারে নারকেল কাঁকড়ার

স্বাদ মোটামুটি এ রকমই, শুধু তাতে থাকে তুলসি পাতা আরো বেশী আদা, আর কিছুটা নারকেলের দুধ ?

ভাসনা বললো, দারুন খেলাম। রোজ রোজ দোকানের খাওয়া খেয়ে মুখ পচে গিয়েছিল। আমার দিকে একটু মুচকি হেসে বললো, যাক আজ মুখটা বদলান গেল।

নেত্রা ওকটু রেগে বললো, হ্যাঁ তাতো গেলই ? আমি আয়নায় দেখেছি তোর মুখ বদলাবার ঢং। সত্যি তোর লজ্জাও নেই।

ভাসনা মুচকি হাসছে লজ্জার কী আছে ? ইচ্ছে হয়েছিল ব্যাস। আমার ছোঁয়া লেগে তোর খাবার কি পচে গেল নাকি ?

সব বাসন ধুয়ে গুছিয়ে রাখল ওরাই দুজনে মিলে।

নেত্রা হাত মুছে এসে আবার আমার পাশটিতে বসলো।

ভাসনা বললো, কি রে আজ যাবি, না এখানেই থাকবি ?

আমি বললাম, থাকলে আমার কোনও অসুবিধা নেই। আমার আর একটা বেডরুম রেডি আছে।

ভাসনা বললো, না বাবা, শেষে আধরাতে দেখবো নেত্রা পাশে নেই। চল নেত্রা। দুষ্টুমির হাসি টেনে বললো, আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।

ও চোখের আড়াল হতেই নেত্রা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। কিছুক্ষণ পর ভাসনা গলা খাঁখরি দিয়ে বললো, আসতে পারি ?

॥ ২৬ ॥

বিকেলে অফিস থেকে আসতেই পিয়ালী বললো, মাস্টার দুপুরে ফম্‌ মা খোরাসাপ (দূরশব্দের অপভ্রংশ অর্থাৎ টেলিফোন)। খয়, ফোন নং টা আবার কোথায় রাখলাম। দৌড়ে গিয়ে ওর খাতাটা এনে নম্বরটা বললো, নুঙ্গ সাম সঙ্গ চেট পায়েট শুনে নুজ (১৩২৭৮০১) তোমাকে ফোন করতে বলেছে।

—ছু আরাই ? (নাম কী ?)

আবার ওর খাতা দেখে বললো, 'মাইনজ'। আঙ্গরেৎ বক রেও রেও মাই সাপ্‌। (তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে বলেছে বুঝতে পারিনি। থি রঙ্গ র‍্যাম মনোরা (মনহারার অপভ্রংশ)।

ভাবতে লাগলাম, মাইনজ আবার কে ? হঠাৎ মনে হলো, তা হলে হয়তো মনোজই হবে তার তো ফোন করার কথা নয়। সে তো থাকে আমেরিকায়। হ্যাঁ, এককালে আমার প্রাণের বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু এখন তো আর সে বন্ধুত্বের দাবি করতে পারে না। জেনে শুনে আমার মনীষাকে ও নিজের করে নিয়েছে। আমার মনটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। কোন সাহসে আমায় ও ফোন করলো ? নম্বরই বা পাবে কোথায়। নিশ্চয় অন্য কেউ, কিন্তু 'ম' আদ্যাক্ষরের কাউকে আমি চিনি বলে তো মনে পড়ছে না। মনোজ যদি হয় তা হলে আমি ফোন করবো না। কিন্তু যদি না হয়-এই কিন্তুটাই খটকা লাগলো।

আস্তে ফোনটা তুলে নিলাম। নম্বরগুলো টিপলাম। রিসেপ্‌শানিস্ট ফোন ধরে জিজ্ঞেস করলো, ওর রুম নাম্বার জানেন ? জানেন না, আচ্ছা কবে এসেছে বলতে পারেন ? তাও বলতে পারেন না। ঠিক আছে একটু ধরুন। কিছুক্ষণ পর বললো, রুম নং ৮৩০। কাল রাত্রে এসেছে আমেরিকা থেকে। এখন ঘরে নেই। কোনও মেসেজ দেবেন কী ?

—হ্যাঁ, না মেসেজ দেবার কোনও দরকার নেই। এবার নিঃসন্দেহ হয়েছি ও মনোজই। মনোজ যদি আবার ফোন করে, তা হলে কী করবো ?

না, ওর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াব কেন ? সামনাসামনিই ওর একটা ফয়সলা করবো, কিন্তু ফয়সলাটা কী হবে, বড়জোর একটা ঝগড়া হতে পারে। তাই হোক। ওকে আসতেই বলবো। ঠিক নটার সময় ফোন এল।

—তুই তো আমার ওপর ভীষণ রেগে আছিস। রাগারই কথা। বিশ্বাস কর, আমি তোকে ঠকাইনি, নিজেই ঠকে গেছি।

আমি বেশ রেগে বললাম, কেন, যে হার সোনা বলে চুরি করেছিলি তা কী গিল্টি করা ?

—না সোনা খাঁটি, কিন্তু সেটা আমার গলার কাঁটা হয়ে আছে ফেলতেও পারছি না, পরতেও পারছি না। এ এক ত্রিশংকু অবস্থা। তার ফয়সলা করতেই এতদূরে এসেছি। সব ঘটনা শুনে তুইই বিচার করিস, আমি ঠিক বলছি না বেঠিক।

—তোর সঙ্গে কী মনীষাও এসেছে?

—হ্যাঁ, এসেছে।

—তোরা কী আমার এখানে থাকতে চাস?

—তুই যদি বলিস, তা হলে থাকবো। মনীষা তো তোর কথা ভেবে ভেবেই শুকিয়ে যাচ্ছে। ও মরে বেঁচে আছে। তুই যদি ওকে না থাকতে বলিস তা হলে আর ওকে বাঁচানো যাবে না। এবার তুই বল কী করবি?

তা হলে কাল সকাল সাতটায় নিয়ে আসবো। আচ্ছা, তুই আমার ফোন নং পেলি কোথায়?

—আমি তোদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে জ্যাঠামশায়কে চিঠি দিয়েছিলাম তোর খবর জানতে,—তার সঙ্গে তোর ঠিকানা আর ফোন নং। তোর ঠিকানা পেয়েই এখানে আসার একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললাম।

—কাল তাহলে দেখা হবে। মনীষা উদগ্রীব হয়ে আছে। রাখলাম।

মনোজ বলছে ও ঠকেছে, আমায় ঠকায়নি, মনীষা আমার কথা ভেবে ভেবে মরে বেঁচে আছে। অথচ আমি ওদের ভোলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এ যে এক জটিল সমস্যা। ভাবছি আর ভাবছি, কূল কিনারা কিছুই পাচ্ছি না শুধু মাথাটাই গরম হয়ে উঠছে। ঘুমকে কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না। ঘড়ির কাঁটা এগিয়েই চলেছে। উঠে একটা ভ্যালিয়াম খেয়ে নিলাম। ঘণ্টা চারেক পরে ঘুম ভাঙলো, পিয়ালীর ডাকে।

—মাস্টার, চা।

ঠিক সাতটায় পেঁছে গেলাম। লাউঞ্জেই বসেছিল ওরা দুজনে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে। আমি কাছে যেতে, ওরা উঠে দাঁড়ালো। আমি আর মনীষা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

মুখে আমাদের কথা নেই। দেখার যেন শেষ নেই। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা একে একে মনে পড়ছিল—সুন্দর বসন্তের দিনগুলি। মিলিয়ে দেখছিলাম সেই মানসপ্রতীম মনীষাকে আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মনীষাকে, যার বিনিদ্র রজনীর কালো ছায়া চোখের চারিদিকে, কালো হরিণীর চোখ হারিয়েছে তার চঞ্চল চাহুনি, লম্বা বিনুনি হারিয়ে গেছে, মুখের লাবণ্য ঢাকা পড়েছে দুঃখের আবর্তে। একটা আর্ত আবেদন সারা চোখে-মুখে। আমার উদ্বেল মন কিছুটা শান্ত হলে জিজ্ঞেস করলাম, ভালো আছ?

সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শুধু বললো, অতীশ আমি এসেছি।

মনোজ আমার হাত ধরে বললো, চল অতীশ।

বাড়ি পেঁছলে মা সাকনু সব স্যুটকেসগুলো ওপরে নিয়ে এল। আমরা বাইরের

ঘরে বসলাম।

—তোরা ব্রেকফাস্ট খাবি তো? আমার আজ অফিসে জরুরি মিটিং আছে যেতেই হবে। তোদের যদি গাড়ি লাগে তা হলে আমি অফিসে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

মনোজ একটু হেসে বললো, তুই পালাচ্ছিস কেন? মনীষা যে তোকে সব কথা বলবে বলে এসেছে।

—সে কথা শুনে আর কারও কিছু লাভ নেই। অতএব তা না শুনলেও চলবে। সে অজানা অধ্যায়টুকু অজানা থাকাই ভালো।

মনীষা বললো, অতীশ তোমার অফিস কী আজ না গেলেই নয়? সারাটা দিন তা হলে আমি কী করবো, অতীশ? তোমাকে যে শুনতেই হবে। শুনে তারপর তো রায় দেবে। ও উঠে এসে আমার হাত ধরে কান্নার সুরে বললো, অতীশ আজকের দিনটা যেয়ো না, প্লিজ।

—আমার যে আজ বোর্ড মিটিং, যেতেই হবে। আমি এসে তোমার গল্প শুনবো।

—গল্প বলো না! আমার জীবনের সবচাইতে বড় দুর্ঘটনা থেকে যে বাঁচিয়েছে, সে হলো মনোজ।

—সেই কৃতজ্ঞতায়ই তো তুমি ওর সঙ্গে ঘর বেঁধেছ।

—অতীশ, তোমার রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু একটু ধৈর্য ধর।

—ঠিক আছে। এতদিন যখন ধৈর্য ধরেছি আর একটা দিন নিশ্চয় পারবো।

মনোজ বললো, আমাকেও যে বের হতে হবে। এ আই. টি. তে আমার একটা লেকচার আছে।

—তা হলে তো মুশকিলে ফেললি। মনীষাকে তাহলে যে একা থাকতে হবে। ঠিক আছে আমি দুপুরে খেতে আসবো।

অভিমানের সুরে বললো, আমি একাই থাকতে পারবো।

পিয়ালীকে আগেই বলেছিলাম আমার বন্ধু আর স্ত্রী আসবে। ও ব্রেকফাস্ট দিয়েছে ফলের রস, সিরিয়েল, অমলেট টোস্ট আর কফি। আমি বললাম যে মনীষাকে ছেড়ে যেন ও নীচে না যায় আজ।

—আমাকে তাহলে অফিসে নামিয়ে দিয়ে তুই গাড়িটা নিয়ে যা। ফেরার সময় নিশ্চয় ওরা তোকে পৌঁছে দেবে।

—মনীষা, সরি, তোমায় একা ফেলে যেতে হচ্ছে।

দুপুরে ফোন করে মনীষাকে বললাম, খেয়ে নিতে, কারণ বিজনেস লাঞ্চ এভয়েড করা গেল না। মনীষা শুনে শুধু বললো, ঠিক আছে। তিনটের সময় যখন বাড়ি ফিরলাম তখন মনীষা আমার খাটে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। চুলগুলো উস্কোখুস্কো ঠোঁট বিবর্ণ, অনেক রোগা হয়ে গেছে। ওকে ও অবস্থায় দেখে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো—তা কী ভালোবাসা, না করুণা, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আমি এসেছি।

ও লাফ দিয়ে উঠে বললো, কখন যে চোখটা লেগে গিয়েছিল বুঝতেই পারিনি। তুমি এসেছ। অবশ্য চোখেরই বা দোষ কী? অনেকদিনই ও বিশ্রাম পায়নি। আজ তোমাকে দেখে তবু একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

ন-দশটা বছরের কথা একেকবারে ভুলে গেলাম। ওর পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, মনি, তুমি খেয়েছ?

এই নামটা শোনার অপেক্ষায় যেন এতদিন ছিল। আমার কোলে মাথা দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

ওর কান্না আর থামতে চায় না। যতই চোখ মুছিয়ে দিচ্ছি ততই ছাপিয়ে পড়ছে। এক ঝলক দেখেই বুঝতে পেরেছি এক জোড়া দরদি হাত সারা বাড়ি গুছিয়ে বেরিয়েছে, তার চিহ্ন সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, মনি, তুমি খেয়েছ?

ঘাড় নেড়ে জানালো, না। তোমার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবো, ভেবেছিলাম।

—তা হলে আমি বসছি, তুমি খাও।

—এত বেলায় আর ভাত খাবো না। তোমার পিয়ালী রুটি করতে পারে? তা হলে দুখানা রুটি খাবো।

পিয়ালীর ঘরের সাথে যোগাযোগ করা বেলটা বাজালাম। ও এসেই আমায় নালিশ করলো যে মেমসাহেব খায়নি। সারাদিন ঘর গুছিয়েছে। তারপর ওকে দিয়ে ক্রিম আনিয়ে আমার জন্যে নাকি কি খাবার বানিয়েছে। পিয়ালী ওর খাতায় তা লিখে নিয়েছে। ওকে বললাম, চারটে রুটি বানাতে।

খাবারও রুটি বলে। রুটি বানাতে গিয়ে যদি সেঁকবার সময় তা গোল হয়ে না ফোলে পিয়ালী সেটা ফেলে দেয়।

পিয়ালী ডাকলে, আমরা খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। মনীষা এক বাটি ফ্রিজে ঠাণ্ডা করা পায়েস এনে আমার সামনে রাখলো।

এক চামচ মুখে দিয়ে বললাম, দারুণ হয়েছে। এ যে আমার পিসিমার হাতের পায়েসের মত। তুমি জানলে কী করে যে আমি পায়েস ভালোবাসি?

মনীষার ঠোঁটে আলগা হাসি। মনে নেই একবার তোমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে গিয়েছিলাম গাড়ি করে আমার ভাইদের নিয়ে।

—শীতের সকাল। খালে বিলে তখন শালুক ফুটেছে। তুমি আলোয়ান জড়িয়ে বারান্দায় বসেছিলে। তোমার পিসিমা পুজোর ফুল তুলছিলেন। তোমার বাবা চৌকির ওপর পদ্মাসনে বসে জপ করছিলেন। তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে আমায় দেখে। তোমায় সেদিন দেখেছিলাম নলেনগুড়ের পায়েসের বাটি চেটেপুটে খেতে।

—তোমার সে সব কথা মনে আছে?

—মনের মধ্যে সেই দিনগুলোর ভিডিও টেপ দেখেই তো আজও বেঁচে আছি, অতীশ। আমার যা জীবনের ট্র্যাজেডি তাতে তো বেঁচে থাকার কথা নয়।

—চল মনি, শোয়ার ঘরে চল। তোমার সব কথা শুনবো। তোমার ট্র্যাজেডি যে আমারও ট্র্যাজেডি। এখন অবশ্য বেপরোয়া হয়ে গেছি। তোমাকে ভুলবার চেষ্টা করছি। ভাবছিলাম, তুমি আনন্দে আছ তাহলে আমিই বা জীবনটাকে ভোগ করবো না কেন?

আমরা আবার শোবার ঘরে ফিরে এলাম।

মনীষা বললো, যাও কাপড় জামা ছেড়ে এসো।

আমি বেরিয়ে দেখলাম, ওর চেহারাও পাল্টে গেছে। যেন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ও ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। শাড়ি বদলে, চুল আঁচড়ে. মুখে পাউডার আর লিপস্টিক লাগিয়ে যখন এসে দাঁড়াল, তখন এ যেন অন্য মনীষা, যে আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে।

আমার মন থেকে সব সংশয় উবে গেল। বুঝলাম ও এখনও আমারই হতে চায়। মনোজেরও তাতে আপত্তি নেই। না হলে ওকে নিয়ে এখানে কখনই আসতো না।

ওকে জড়িয়ে ধরে মুখটা তুলে ধরে বললাম, মনি, তোমার না বলা কথা আমি শুনেছি।

আমার বুকের কাছে মাথা রেখে বললো, অতীশ তোমাকে যা দুঃখ দিয়েছি তার হাজারগুণ কষ্ট নিজে পেয়েছি।

আমরা দুজনে খাটে বসলাম। ওর হাতটা আমার মুঠোর মধ্যে।

—তুমি সারাদিন অফিস করেছ, ক্লান্ত। তার মধ্যে আমি হঠাৎ এসে তোমার মনের মধ্যে ঝড় তুলে দিয়েছি। সেই ঝড়ের তোড়ে হয়তো তোমার কালকে ঘুমই হয়নি।

—তা হয়নি।

ও আমার মাথার কাছে বসে বিলি কাটছিল। আমি ওর চেনা মুখখানা অনেকদিন পর মন ভরে দেখছিলাম। তারপর শুনলাম ওর দুঃস্বপ্নের অধ্যায়—

ও আমেরিকায় বস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। আর মনোজ পড়তো এম. আই. টিতে। হস্টেলে সিট না পেয়ে একটা ছোট এপার্টমেন্ট নিয়েছিল। থাকতো ওর ক্লাসেরই একটি আমেরিকান মেয়ের সাথে। ওখানে সবাই অনেক রাত পর্যন্ত লাইব্রেরিতে পড়ে। মনীষাও। লাইব্রেরি ওর এপার্টমেন্ট থেকে অনেকটা দূরে। হেঁটেই যেতো। ফিরতো সাধারণত ওর রুমমেটের সাথে। একদিন ওর রুমমেটকে লাইব্রেরিতে দেখতে পেলো না। ফিরছিল একা। একটি চেনা পাকিস্থানি ছেলে ওর পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় ওকে দেখে গাড়ি থামিয়ে, ওকে লিফট দেয়। বাড়ির কাছে এসে বলে যে ওর খিদে পেয়েছে কিন্তু এতো রাত্রে তো বাইরে কোথাও খাবার পাবে না। ওর কাছে খেতে চাওয়ার নাম করে ওর ঘরে এলো। মনীষা দেখলো ওর রুমমেট নেই। একটা চিরকুটে লিখে গেছে যে ও রাত্রে ফিরবে না। ওর বয় ফ্রেইন্ডের সাথে থাকবে। ছেলেটি ওই সুযোগে ওকে ধর্ষণ করে। ও

লজ্জায় সেই কথা কাউকে জানায় না। পাকিস্থানি ছেলেটাও তখন গরমের ছুটিতে দেশে চলে গেছে। দুমাস অন্তঃসত্ত্বা হবার পর ও মনোজকে জানায়। মনোজ ডাক্তারের কাছে এবোরসান করার জন্যে নিয়ে গেলে, ডাক্তার বেআইনি কাজের জন্যে তিন হাজার ডলার চায়। ওরা টাকা জোগাড় করতে পারলো না। ঐও কান্না-ভাঙ্গা গলায় বললো, বল অতীশ, এটা কী গল্প না জীবনের অভিশাপ? যেদিন আমি ধর্ষিতা, সেদিন থেকে শুধুই কেঁদেছি, গুমরে গুমরে কেঁদেছি, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারবো না, এই ভাবনাটাই আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। বিনা দোষে সবার কাছে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। আমি কী করবো এই জারজ সন্তান নিয়ে? সবাই যে আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে হাসবে। আমার পরিবারের সম্মান মাটিতে লুটোবে।

মনোজ রোজ আসতো আমায় সান্ত্বনা দিতে। জোর করে খাওয়াতো। ভ্যালিয়াম খাইয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যেতো। একদিন আমি অনেকগুলো সেডেটিভ একসাথে খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলাম। আমার রুমমেটের ফোন পেয়ে মনোজ ছুটে এলো। হাসপাতালে নিয়ে গেল। পোড়া কপাল আমার, মরা আর হলো না।

—তারপরই মনোজ আমাকে জোর করে বিয়ে করলো, জারজ সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে। এবার বল অতীশ, ও কী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? এতদিনের মধ্যে একদিনও ও জোর করে আমার গায়ে হাত দেয়নি। এবার তুমি বিচার কর।

—তুমি আমাকে জানালে না কেন?

—জানালে কী হতো অতীশ? আমার পড়া বন্ধ হতো। তোমার মাথা হেঁট হতো। আমাদের পরিবারের সম্মান ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। তোমার বাবা মা আঘাত পেতেন। এ সব ভেবেই তোমায় জানাইনি।

আমি ওর মুখটা আমার মুখের কাছে টেনে এনে বললাম, মনি, আমি না জেনে তোমাদের ওপর অবিচার করেছি। আঘাত দিতে গিয়ে নিজেই আহত হয়েছি। আমায় ক্ষমা কর। ওর চোখের জল মুছিয়ে, মুখটা আমার মুখের সাথে মিলিয়ে দিলাম। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, মনোজের মত উদার মন আজকাল বিরল। জানি না, আমারও এতটা মনোবল আছে কিনা।

—তুমি যে আমাকে ক্ষমা করেছ, অতু তাতেই আমার অপার শান্তি। মনোজের উদারতার কথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।—

আমার একটি ফুটফুটে মেয়ে হলো। আমি ওর দিকে ফিরেও তাকাতাম না। ওকে দেখলেই আমার সেই বিভীষিকাময় রাত্রির কথা মনে পড়ে যেতো। আমি ওকে চাইল্ড এডপসন্ সেণ্টারে দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। মনোজ দিতে দেয়নি। ওকে নিজে ফিডিং বটলে খাওয়াতো। নিজের কাছে শোওয়াতো, ডায়েপার বদলাতো। ও কাঁদলে, আমার বুকটাও টন্‌টন্ করে উঠতো। ও বাড়ি না থাকলে বাধ্য হয়ে কোলে নিতাম। তখন মনে হতো ও তো নিষ্পাপ। ওর হাসি দেখলে সব ভুলে

যেতাম। যখন বড় হলো, কী যে সুন্দর দেখতে হয়েছিল তোমায় কী আর বলবো। বাবার ভীষণ ন্যাওটা ছিল।

—সত্যি মনোজের উদারতা, সমবেদনশীলতা ও মমত্ববোধের তুলনা মেলা ভার। তুমি মেয়েটির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ছিল বলছো কেন?

—তনুশ্রী নেই। সমস্ত পাপ ও ধুয়ে মুছে চলে গেছে। যেটুকু হাসি খুশি ছিল বাড়িতে সেটুকুও চলে গেল ওর সঙ্গে সঙ্গে।

—কী হয়েছিল?

—ব্রেইন ক্যানসার।

মনীষা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে পড়লো। কী বলে ওকে সান্ত্বনা দেবো তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি শুধু ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাচ্ছিলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। দরজায় বেলের আওয়াজ হওয়ায় বুঝলাম মনোজ এসেছে। মনীষা তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে চলে গেল। আমি দরজাটা খুলে দিলাম।

—আয় মনোজ। কি রকম হলো তোর কোলচার?

—ভালো। তুই ফিরলি কখন?

—তিনটের সময়।

—মনীষা কোথায়?

—ও বাথরুমে ঢুকেছে বোধহয়।

মনোজ চীৎকার করে ডাকলো, কী করছো মনীষা? তাড়াতাড়ি এসো।

বাথরুম থেকে তখন রবীন্দ্র সঙ্গীতের ছাড়া ছাড়া গানের কলি শোনা যাচ্ছে।

মনোজ বললো, প্রায় ন'বছর পর ওর গলার সুর ফিরে এসেছে। অব্যবহারে কথা ভুলে গেছে। তোর তাহলে সংশয় ঘুচেছে। আমিও বাঁচলাম। বিষাদের বোঝা আর বইতে পারছিলাম না।

আমি ওকে হাত ধরে বসিয়ে বললাম, আমায় ক্ষমা করিস। তোর মহত্বের কাছে নিজেকে বড্ড ছোট মনে হচ্ছে।

মনীষা আজ দারুণ সেজেছে। একটা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি পরেছে, নীলের ওপর ছাপানো। এ শাড়িটা যেন চেনা চেনা। মনে পড়লো ওর জন্মদিনে অনেক কষ্টে আমিই কিনে দিয়েছিলাম।

ও হাসতে হাসতে এসে বললো, তোমরা আগে স্নান করে নাও। আজ আমরা বাইরে খাবো। কাল তো আবার মনোজ থাকবে না।

—কোথায় যাবি?

—কাল আমার একটা সেমিনার আছে পাত্যায়ায়. দুদিন চলবে। পরশু শনিবার। তোর অফিস তো ছুটি। তুই পরশু সকালে মনীষাকে নিয়ে চলে আয়। ওখানে তা হলে দুটো দিন একসঙ্গে কাটানো যাবে।

আমি বললাম, খুবই উত্তম প্রস্তাব।

মনীষা জিজ্ঞেস করলো মনোজকে, তোমার লেকচার বেশ এপ্রিশিয়েটেড্ হয়েছে তো ?

—তোমার নোটই আমার বক্তৃতাটা উতরে দিল। মাইক্রো ইকনমিক ডেটাগুলো, তুমি জোগাড় করে না দিলে এত পয়েন্টেড্ হতো না। খুব হাততালি পেয়েছি।

হাল্কা হাওয়ায় সবাই আমরা সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারছি। আমরা চান করতে চলে গেলাম। মনীষা চায়ের জোগাড়ে গেল।

মনোজ বেরিয়ে এসে বললো, কি খাওয়াচ্ছো এখন ? আমার পেটে ছুঁচোয় ডন্ মারছে।

মনীষা ভ্রূভঙ্গী করছে, কেন, ওখানে খাওয়ায়নি ?

—খাইয়েছে, থাই খাবার। আমার পেট ভরেনি। তাছাড়া, তোমার হাতের রান্না অনেকদিন খাওয়া হয়নি।

আমি আলমারি খুলে একটা ভালো জামা প্যান্ট বের করতে গিয়ে দেখলাম, সব সুন্দর ভাবে গোছানো। আমি ভীষন আগোছালো করে রেখেছিলাম।

মনোজের কথা শুনে বললাম, তা হলে তোরা কি ওখানে হরি মটর ভাজতি ?

—প্রায় তা বল্লেই চলে। হয় আমি রাঁধতাম, না হলে রেডি ফুড্ মাইক্রোওয়েভে গরম করে, না হলে বাইরে।

মনোজ ফিস্ফ্রাই খেয়ে বললো, দারুণ হয়েছে, মনীষা। এগারো বারো বছর পর বোধহয় খেলাম, আমাদের দেশী ফ্রাই। আচ্ছা মনীষা, জানলে কী করে যে আমি ফ্রাই ভালবাসি ?

—তুমিই তো বলেছিলে, কার বিয়েতে তুমি দশটা ফ্রাই খেয়েছিলে।

আমিও বললাম, জানিস মনোজ, আমি ভালবাসি বলে আজ পায়েস বানিয়েছে।

আজ চারিদিকে খুশির হাওয়া। ওর মধ্যে যে অবদমিত সেবাপরায়ণা নারী লুকিয়েছিল, তা আজ চেতনা পেয়েছে। ও সবাইকে খুশি করতে ব্যস্ত।

মনোজ পরিতৃপ্তির হাসি দিচ্ছে—যাক, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। আমরা আজ কোথায় যাচ্ছি ?

তোরা তো ব্যাংককের কিছুই প্রায় দেখিসনি, তাই এমন জায়গায় খাওয়াতে নিয়ে যাবো, যেখানে একটা গ্রাম্য পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। থাই নাচ গান আছে আর আছে থাই খাবার। সেটার নামও ভারি সুন্দর, সিলম্ ভিলেজ্। সিলম্ একটা রাস্তার নাম, এ রাস্তার ওপরই ঐ রেস্তোঁরা।

—এত খেয়ে এখনই আর খাওয়া যাবে না।

আমি জানিয়ে দিলাম, সাতটায় নাচ আরম্ভ হয়। আমরা সাড়ে ছটায় রওনা হবো, মানে আর আধঘণ্টা পরে। খাবারটা একটু দেরী করে খেলেই হবে।

মনোজ বললো, তা হলে মনীষা পায়েসটা রেখে দাও, ব্রেকফাস্টে খাবো।

জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে মনোজ, কাল তুই যাবি কিসে ?

—সকাল ছটায় ওরা গাড়ি পাঠাবে। সাড়ে দশটায় আমাদের সেমিনার আরম্ভ। অন্য সবাই আজকেই চলে গেছে। আমার পেপার অবশ্য চারটের সময়।

—পরশু তা'হলে আমরাও ছটার মধ্যে রওনা হবো। কোন হোটেলে তুই থাকছিস ?

ডায়েরিটা দেখে বললো, শ্যাম-বে-সোর হোটেলে। আমি পাশাপাশি আর একটা ঘর বুক্ করে রাখবো।

মনীষা বললো, চলো, সাড়ে ছটা তো বাজলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিলম্ ভিলেজে পেঁৗছে গেলাম। ভেতরে ঢোকার মুখে এক সারি দোকান। দোকানে বিদেশি টুরিস্টদের খুব ভিড়। দোকানগুলোতে রয়েছে চামড়ার জিনিস—ভ্যানিটি ব্যাগ, বেল্ট, পার্স, জ্যাকেট। পাশের দোকানে রয়েছে নানান ধরনের মূর্তি—ব্রোঞ্জের শিব, কৃষ্ণ, সরস্বতী, বুদ্ধ, জেডের জেন (ধ্যানের অপভ্রংশ) মুণি, হাতির দাঁতের জিনিস। নানান রকম থাই পুতুল—কাপড়ের তৈরি। তার পাশের দোকানে সিল্কের ফ্রক্। আমি একটা ব্যাগ কিনে দিলাম মনীষাকে আর মনোজকে ওয়ালেট।

দোকান পার হয়ে ভেতরে ঢুকেই ডান পাশে কাঁচের ছোট আলমারিতে সব রকম থাই খাবার প্লেটে সাজানো আছে আর তাতে ইংরেজিতে আর জাপানি ভাষায় খাবারের নাম ও দাম লেখা আছে।

বাঁ পাশে তিনটি মেয়ে মাটির পাত্রে পিঠে তৈরি করছে গ্রাম্য পোশাক পরে। উঠোন দিয়ে আর একটু এগিয়ে গেলে দেখা যায়, খাবারের জায়গা একদিকে আর তার উল্টো দিকে স্টেজে তখন বাজনা বাজছে।

মনোজ বললো, দারুণ করেছে। এদের নিশ্চিত ধারণা আছে যে আমেরিকান টুরিস্টরা কী চায়। ওরা জানে যে আমেরিকানদের, সবই ফাস্ট, হাতে সময় কম আর ঐ সময়ের মধ্যে যতটা পারে দেখে নিতে চায়, তাই এরা গ্রামটাকেই এখানে তুলে এনেছে।

মনীষা বললো, ঠিক বলেছো। দেখ বাড়িগুলো আলাদা আলাদা, খড়ের ছাউনি দেওয়া। উঠোনটায় ইট পাতা, পাশ দিয়ে আবার সরু খালও কেটেছে। দেখেছ, ঐ সরু খালে কি সুন্দর পদ্ম ফুটে আছে? ত্রুটি রাখেনি কোথাও। হাঁসগুলো কেমন ডানার মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

আমি বললাম, কোথায় বসবে বলো, এয়ার কণ্ডিশান্ ঘরে না বারান্দায় ? বাইরে কিন্তু বেশ গরম আছে।

আমরা বারান্দায়ই বসলাম। চারিদিকে সব লাল—টেবিলের ঢাকনা লাল, ন্যাপকিন্ লাল, ওয়েইটারের পোশাক লাল, মেনুর বইও লাল। আমরা ড্রিংকের অর্ডার দিলাম।

স্টেজে তখন ঢুকছে একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে। ছেলেদের পরনে হাঁটু অবধি তোলা মালকোচা মারা ধুতি, সামনে জরির কাজ, হাফহাতা জরির কাজ করা ফতুয়া,

মাথায় লাল পাগড়ি। মেয়েটার পরনে পাসিন, সামনাটা পাট করা কুচি, ব্লাউজের ওপর ভাঁজ করা চাদর, মাথায় মুকুট। জরির ফুল লতা সব অঙ্গবস্ত্রেই ছড়ানো। হাতের ফাঁদে মনের ভাব ব্যক্ত। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে ঢোলের তালে তালে, ভাষ্যকার ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় বলছে, এনাচের নাম, 'লাকান' যাত্রী' এক ধরনের নৃত্যনাট্য, দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডের মানোরা ফোক আর্টের অঙ্গ। (মানোরা অর্থাৎ মনহরা)।

মনীষা আজ মনের খুশিতে জিন নিয়েছে। ও হেসে বললো, মেয়েটার অবস্থা যে আমারই মত দুই প্রেমিকের ত্রিভুজ।

মনোজ বললো, একটু ভুল করলে। আমার ক্ষেত্রে ত্রিভুজ সৃষ্টি হয়নি। আমি শুধু অন্যের ধন গচ্ছিত রেখেছি। তবে মিথ্যে বলবো না, যে বুভুক্ষু সে ধনে কখনও লোভ হয়নি। তনুশ্রী যদি মন কেড়ে না নিত তা হলে যে কি হতো তা বলতে পারি না।

এরপর পিঠে ঝুড়ি বাঁধা চা বাগানের ছেলে-মেয়েদের নাচ, অনেকটা অসমিয়া নাচের মত।

আমি বললাম, মনোজ এবার খাবার দিতে বলি, কি বলিস? চল ওখানে খাবার দেখে পছন্দ করি। ওয়েইটারকে নিয়ে সেই খাবারের আলমারির কাছে তিনজন গিয়ে খাবার পছন্দ করলাম।

তখনও গ্লাসে পানীয় রয়েছে। ওয়েইটার দু প্লেট স্ন্যাক দিয়ে গেছে। মনীষা বললো, নারকেল পাতা জড়ানো পদার্থটা আবার কী দিয়ে গেল?

পাতাটা খুলে ফর্কে তুলে মনীষা মুখে দিয়েই বললো, দারুণ তো বোনলেস, মাংসটা। আমাদের তন্দুরির মতই খেতে, বরং আরও ভালো বেশ নরম আর মসলা দেওয়া। পাতাটা তো নারকেল পাতা নয় তার চাইতে নরম, অথচ দেখ একটুও পাতাটা পোড়েনি।

স্টেজে তখন ছায়ানৃত্য হচ্ছে, এটাকে বলে, 'নাঙ্গ টানুঙ্গ,' ইন্ডোনেশিয়ার 'ওয়েআঙ্গ' নাচের মত। নাচের সাথে গান চলছে।

এরপর এল সুপ 'তম ইয়াম কুঙ্গ, অর্থাৎ চিংড়ি মাছের সুপ।

মনোজ বললো, দারুণ, ঝাল হলেও স্বাদ কিন্তু অপূর্ব। খাউ ভাত খাই সাই (মিক্সড ফ্রায়েড রাইস) এর সাথে মাগুর মাছের রোস্ট।

মনীষা বললো, দারুণ খেলাম। এক ঝলক থাই নাচ গানও দেখা হলো। দোকানগুলোতে ওদের হাতের কাজও দেখলাম। থ্যাংক ইউ অতীশ।

—আরে পিঠে খাবে না? দাঁড়াও নিয়ে আসছি।

মনোজ একটা মুখে দিয়ে উচ্ছ্বসিত, 'এ যে চিতই পিঠে', নারকেলের দুধ আর গুড়ে ভেজানো। কতো বছর পর খেলাম। আমার ঠাকুমা দুধ দিয়ে করতো।

—এরা দুধের পিঠে করতে জানে না। পিঠে বানায় নারকেলের দুধ, না হলে সয়াবিনের দুধ দিয়ে, আর থাকে তাতে চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি কোনও একটা বস্তু।

গতপঙ্গের পাশ দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, ঢুঁ মারবি নাকি একবার ?

—মনীষাকে নিয়ে কি করে যাবো ?

—তাতে কোনও অসুবিধে নেই বরং মাছির ভনভনানি থেকে বাঁচবি, অবশ্য মনীষা যদি রাজি থাকে ?

মনীষা বললো, আই এম গেম।

পথে আমাদের কেউ পেছন নিল না। বারে কেউ খাতির করলো না। দুটো বিয়ার আর কোক নিয়ে আমরা চুপচাপ একটা কোনায় গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ টপলেস্ মেয়েদের নাচ আর ঢলানি দেখে মনীষা বললো, চল আর নয়। সবাই আমার দিকে ট্যারা নজরে দেখছে। আমার গা ঘিন্ঘিন্ করছে।

মনোজ বাড়ি এসে বললো, অনেকদিন পর তিনজন একসাথে একটু আনন্দ করা গেল। বসন্ত কেবিনে টোস্ট অমলেট আর প্লেট ভাসিয়ে চা খেতে খেতে আমরা যে আড্ডা দিতাম, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল। কে জানতো তখন, আমাদের জীবনটা এমনি করে পাল্টে যাবে ? আমি কিন্তু এবার শুয়ে পড়বো। কাল আবার সককালে উঠতে হবে। মনোজ বালিশটা নিয়ে আমার ঘরে শুয়ে পড়লো।

মনীষাকে জিজ্ঞেস করলাম, মনোজ তোমার কাছে শোয় না।

—সে তো আগেই বলেছি।

—চল. তোমাকে শুইয়ে দেই।

জানলা দরজা বন্ধ করে এ. সিটা চালিয়ে দিলাম। ও বাথরুম থেকে শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরে এসে সামনে দাঁড়ালো। লাল নাইটির মাঝ থেকে ওর শরীর ফুটে বের হয়েছে।

দুষ্টু হাসি হেসে মনীষা বললো, একদিন তুমি আমায় লুকিয়ে চুমু খেয়েছিলে, তার স্বাদ এখনও ভুলতে পারিনি। আজ আর লুকোচুরি নয়। দেখি তো এতদিন পরও সেই স্বাদ পাওয়া যায় কিনা ?

—চুরি করে খাওয়ার স্বাদই আলাদা। তাছাড়া প্রথম চুম্বনের স্বাদ আর পরে পাওয়া যায় না, মনি।

ওর শরীর আমার গায়ে লেপটে গেল। পৃথিবী নিশ্চল। শুধু এ.সি.র. সামান্য আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

—জানো অতু, সেদিন মার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। তুমি চলে গেলে মা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, কিছুই অবশ্য বলেন নি। সেই অব্যক্ত চাহুনিতে অনেককিছু ব্যক্ত করেছিলেন। আমি মুখ নীচু করে বাথরুমে চলে গিয়েছিলাম।

— আমি বললাল, মনি,—এটা কী ঠিক হলো ? তুমি যে এখন পরস্ত্রী।

—সমাজের চোখে আমি ওর বৌ কিন্তু অর্দ্ধাঙ্গিনী নই।

—তা হলে বলবো, তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর ও অকৃতজ্ঞ।

—তা নিশ্চয়ই বলতে পারো। এই সুন্দর সময়টুকু আমরা কি ঝগড়া করে

কাটাবো ?

—না, আমি এবার যাই। মনোজ কি ভাবছে ? তুমি শুয়ে পড়।

ওর গালে মাথায় হাত বুলিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ঘরে এসে দেখলাম,মনোজের দিব্যি নাক ডাকছে। আমিওর পাশে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কলেজ পালিয়ে মনীষার সাথে সিনেমা যাওয়া, ওর পয়সায় রেস্তোরায় খাওয়া, হেঁটে হেঁটে ওকে, বাড়ি পর্যান্ত পেঁছে দেওয়া, গঙ্গার ধারে বসে দুজনের গুনগুন করে গান গাওয়া, ও কৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে চলে গেলে মার আর পিসিমার মন্তব্য ভারি সুন্দর মাইয়াটা। অতুর লগে দারুণ মানাইবো ; হবে তবে অত বড়লোকের মাইয়া কি আমাগো লগে মানাইয়া লইতে পারবো , এ সব কথাই মনে পড়ছিল।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। রোজকার মত আজও পিয়ালীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। মনোজকে ডেকে তুললাম।

হাই তুলে বললো, খুব ঘুমোলাম আজ। দে চায়ের কাপটা।

—আচ্ছা, তুই মানুষ না কী রে ? তুই দেখছি দেবতাদেরও বাড়া।

—কেন ? যার জিনিস তার কাছে পেঁছে দিলাম। আমার এবার মুক্তি।

মনীষা চায়ের কাপটা নিয়ে এই ঘরে এসে বেতের চেয়ারটা টেনে বসলো।

মনোজ জিজ্ঞেস করলো, কি মনীষা কাল শুলে কখন ?

—শুয়েছি তো তুমি শোবার পরই, কিন্তু ঘুম এলো অনেক রাতে।

—কেন ? সমঝোতা তো হয়ে গেছে।

—এরপর কী, তাই ভাবছিলাম।

—অত ভেবো না। যা ভালো মনে হবে তাই করবে। আমি বাথরুমে চলি।

মনীষা জিজ্ঞেস করলো, তোমার ঘুম হয়েছিল ?

—অনেক পরে।

—কী ভাবছিলে ?

—পুরোনো দিনগুলোর কথা।

—ভবিষ্যতের কথা ভাবো নি ?

—ভাববার সময় পাইনি। ভেবেছি শুধু এটুকুই যে মনোজও তোমাকে খুব ভালোবাসে, না হলে এতটা ত্যাগ স্বীকার করা ওর পক্ষে সম্ভব হতো না।

—তাহলে কী হবে অতু ? আমি যে ভেবে কূল পাচ্ছি না।

—ভবিতব্যের হাওয়া যে ঘাটে নিয়ে ভেড়াবে সেখানেই নোঙ্গর ফেলতে হবে। ভেবে লাভ নেই মনি।

—তুমি তো দেখছি ফ্যাটালিস্ট হয়ে গেছ।

—না হয়ে আর উপায় কী ? তুমিই বলনা, আমাদের কী এ রকমটা হওয়ার কথা ছিল ? আমরা তিনজনেই ভাগ্যের তাড়নায় ব্রহ্মচারী হয়ে কাটিয়ে ছিলাম এতগুলো বছর। জীবন কিন্তু থেমে থাকেনি।

আমাদের দুজনার কথা থেমে গেল, ভাবনা বেড়ে গেল।

মনোজ বেরিয়ে এল। ও রেডি হতে হতে আমরাও মুখটুখ ধুয়ে এলাম।

মনীষা ওর স্যুটকেসটা এনে বললো, দেখো তো তোমার কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা? কাল রাত্রে আমি জামাকাপড় গুছিয়ে রেখেছি। তোমার সেভিং কিটটা শুধু দেওয়া হয়নি আর ক্যারেম্প্রলের ওষুধটা।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেই মনোজ বললো, অতীশ তোর পিয়ালী করেছে কী? এযে রীতিমত জামাই আদর।

আজ পিয়ালী ব্রেকফাস্টে নভুতত্ব এনেছে টোস্ট অমলেটের বদলে লুচি বেগুন-ভাজা, তার আগে লাল পেপের টুকরো তার সাথে এক টুকরো লেবু। চা কফি দুটোরই বন্দোবস্ত আছে, যে যেটা পছন্দ করে।

—তুই তো বিয়ে না করেই দারুণ গৃহিণী পেয়েছিস, আর আমার অবস্থা দেখ, বিয়ে করেছি অথচ গৃহিণী পাইনি।

যদিও কথাটা ও হেসেই বলেছিল কিন্তু ওটা যে কত দুঃখের সাথে বলেছিল তা আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম। মনীষা ঠেস মারা কথাটা শুনেও চুপ করে গেল কারণ ও যা বলেছে তার সবটাই যে সত্যি।

মনোজের গাড়ি এসে গেছে। আমরা দুজনে ওকে পেঁছে দিয়ে এলাম। বললাম, তাহলে কাল দেখা হচ্ছে। ও চলে গেল।

মনীষা বললো, আজ নিশ্চয় তুমি অফিস যাচ্ছো না?

—যেতে হবে, চেকটেক সই করবার জন্যে ঘণ্টা দু'একের জন্যে। আটটায় বের হবো দশটার মধ্যে ফিরে আসবো।

—যদি না আসো, তা হলে কিন্তু আমি আজ সারাদিন উপোস করবো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এলেও খাওয়াতে পারবে না। তুমি আমার জিদ জানো তো?

ওর গালটা টিপে বললাম, না গো না আজ আর কথার অন্যথা হবে না। যদি হয় তা হলে আমরা দুজনেই না খেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বো।

—আর ইয়ার্কি করতে হবে না।

কাল তোমার আলমারি গোছাতে গিয়ে দেখলাম সব অগোছালো, শুধু একটা জিনিসই খুব গুছিয়ে রাখা, সেটা হলো আমার লেখা প্রথম দেড় বছরের চিঠিগুলো। তোমার রাগের আগুনে পুড়িয়ে দাওনি কেন?

—সেই দিনগুলির জন্য তো আমার কোনও রাগ নেই, শুধু অনুরাগ।

—যাও স্নান করতে যাও। আমি তোমার জামা কাপড় বের করে দিচ্ছি।

জামা কাপড় পরা হতেই বললো, এদিকে এসো তো। এ নট্ আজকাল অচল। ও নতুন করে টাই এর নট্ বেঁধে দিল।

তারপর আলতো করে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে বললো, অতু, দারুণ মিষ্টি লাগছে আজ তোমাকে। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।

আমি নেমে পেছন ফিরে দেখলাম ও জানলার কাছে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

প্রেসিডেন্ট ব্ল্যাক একটা সুন্দর পার্সোনাল কনগ্রাচুলেটারি চিঠি লিখেছে পর পর দু বছর মুনাফা করার সুবাদে। বাকি চিঠিগুলো তাড়াতাড়ি দেখে চেকগুলো সই করে কারখানায় একটা ফোন করে ঠিক দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরে এলাম।

মনীষা জানালা থেকেই দেখতে পেয়েছিল আমি আসছি।

—লিফট থেকে বেরিয়েই দেখি শিশির ভেজা শীত সকালের পদ্মফুলটির মত সুন্দর হাসি ভরা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—যাক কথা রেখেছ। আমি ঠিক পৌনে দশটা থেকে জানলার কাছে বসেছিলাম তোমার পথ চেয়ে। সিধে হয়ে দাঁড়াও।

জ্যাকেট আর টাইটা খুলে স্লিপ্‌-অন্‌ জুতোটা থাকে রেখে তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এগিয়ে দিল।

পিয়ালী অবাক হয়ে দেখছিল। ভাবছিল বোধহয় কি রকম বন্ধু পল্লীরে বাবা?

—মনি, কি করলে এতক্ষণ?

—কিছুই না। স্নান করে তোমার আনন্দময়ী মায়ের কাছে ফুল দিয়ে তোমার খাটে শুয়ে শুয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনছিলাম। তারপর একটা ফোন এলো, এক কোকিলকণ্ঠির। আমার গলা পেয়ে থাই ভাষায় কথা আরম্ভ করলো, ভেবেছিল বোধহয় পিয়ালী। আমি ইংরেজীতে বললাম, আমি পিয়ালী নই। আমি থাই ভাষা জানি না। সুন্দর অক্সফোর্ড উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলো আমি কে? আমি নামটা বলতেই বললো, তুমি মনীষা? তোমাকে আমি চিনি, কিন্তু দেখিনি। সন্ধ্যায় তোমাকে দেখতে আসবো।

—তুমি রাজি হয়ে গেলে?

—না হবার কী আছে। তোমার নতুন প্রেমিকাকে দেখবো না?

—কী করে জানলে?

—মেয়েরা গলার স্বরেই বুঝতে পারে, সুরটাই থাকে অন্যরকম। অনুরাগের ব্যঞ্জনাই আলাদা।

—কখন আসবে বলেছে?

—সন্ধ্যার সময়।

—কি রকম দেখতে গো?

—এলেই তো দেখতে পাবে।

—তবু তোমার মুখ থেকে শুনিই না?

—সুন্দর।

—সুন্দর তো নিশ্চয়ই, না হলে তুমি কি কাছে ভিড়তে? তা আলাপটা হলো কোথায়?

—গল্ফের মাঠে।

—ও বাবা! গল্ফও খেলে। সুন্দর ইংরেজি বলে স্মার্ট অথচ আপস্টার্ট নয়। বেশ মিশুকি। কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করে সময় কাটলো।

—ওসব কথা এখন থাক। তোমার কিছু কেনা-কাটা থাকলে চল এখন বেরিয়ে পড়ি।

—কেনা-কাটা তো আছেই।

—কার জন্যে কি কি কিনবে বল সেই বুঝে তোমাকে দোকানে নিয়ে যাবো।

—প্রথমত আমার ভাই আর বোনের জন্যে কিছু, মনোজের বোন আর তার ছেলের জিনিস। ইচ্ছে আছে তোমার বাবা মার জন্যেও কিছু নেবো।

—আমার বাবা মার জন্যে আবার কেন? ওরা তো কৃষ্ণনগরে। তুমি সেখানে যাবে নাকি?

—যাবার ইচ্ছে আছে।

—নাই বা গেলে ওখানে। তোমাকে দেখলে ওদের আনন্দের চাইতে কষ্টটাই বেশী হবে।

—কেন?

—কারণ, তোমাকে ওরা বাড়ির বৌ হিসাবে পেতে চেয়েছিল। যে অবস্থা বিপাকে পড়ে তোমাকে বিয়ে করতে হয়েছে, সে কথা তো তাদের বলতে পারবে না। না, তুমি সেখানে যেও না। তুমিও কষ্ট পাবে ওখানে গেলে, আতিথেয়তা পাবে কিন্তু হৃদ্যতা পাবে না।

খুব গম্ভীর হয়ে ও বললো. তা অবশ্য ঠিক। তা হলে যাবো না।

—চল তা হলে বেরিয়ে পড়ি।

গাড়ির চাপে রাস্তার নাভিশ্বাস উঠেছে, কিন্তু কোনও গাড়িই নিয়ম ভেঙ্গে চলছে না। পায়ে হাঁটা লোকেরা ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। আধঘণ্টার পথ এক ঘণ্টায় পাড়ি দিয়ে প্রাতুনাম বাজারে পেঁছিলাম। ইন্দ্রপ্লাজার কাছে গাড়ি থেকে নেমে আমরা হেঁটে জামা কাপড়ের বাজারে ঢুকলাম।

অসংখ্য ছোট ছোট দোকান—সবই প্রায় তৈরি জামা কাপড়ের ফ্রক, জীন, প্যাণ্ট, সার্ট, ব্লাউজ। গলিপথে ঠেলাঠেলি গুতোগুতি তার মধ্যে আবার মোটর সাইকেল চালিয়ে মাল নিয়ে যাচ্ছে সাপ্লায়াররা।

মনীষা বললো, ভাইর জন্য একটা কর্ডুরেভের জীন, বোনের জন্য ফ্রক আর মনোজের বোনঝির জন্য ফ্রক কিনবো।

জীন পছন্দ করে দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম থাউলাই (দাম কত?)

দোকানী মেয়েটি বললো, 'হা লয় বাট' (পাঁচশো)

—ফ্যাঙ্গ পাই মাক পাই (দাম বড্ড বেশী) সঙ্গ লয় বাট। (দুই শো বাট)

—মাই ডাই (পারবো না) সামলয় বাট (তিনশো)

—মাই ক্রাই (কিনবো না) ফ্যাঙ্গ মা লেও (বড্ড দাম, চলি)

—আমাদের ডেকে দোকানী বললো, খাও থোঠ (এক্সকিউজ মি) সঙ্গ লয় হা সিপ শতাং (দুশো আর পঞ্চাশ শতাংশ)

—চান চিয়া সাই (আমি দুঃখিত) সঙ্গ লয় বাট।

দিয়ে দিল দুই শো বাটে।

—মনীষা জিজ্ঞেস করেলো, দুই শো বাট মানে কত ডলার হলো ?

—আমি বললাম চার ডলার।

—কী সস্তা। আমেরিকায় সেলেও তো দাম কমপক্ষে কুড়ি ডলার। তা হলে মনোজের জন্যেও একটা নিয়ে নাও।

আর একটা নেওয়া হলো।

মনীষা বললো, এখানে মেয়েদের জীনগুলোও ভারি সুন্দর।

—তা হলে একটা বাছো তো।

—কার জন্যে না বললে কী করে বাছবো ?

—আমার বান্ধবীর জন্যে।

একটু বাঁকা হাসি হেসে ও একটা পছন্দ করলো।

আমি দোকানীর থেকে মাপের ফিতেটা নিয়ে মনীষার কোমর আর কোমরের নীচটা মেপে সাইজ ঠিক করে কিনে ফেললাম।

— আমার জন্যে আবার কিনলে কেন ?

—নেত্রার আর তোমার মনে হয় একই সাইজ।

তারপর ফর্দ অনুসারে ঐ একই ভাবে সব জিনিস কেনা হলে মনীষা বললো, ড্যাম চিপ্। ডিজাইন আর কাপড়ও খুব ভালো।

—এগুলোই তো সব আমেরিকার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বিক্রি হয় পাঁচ ছয়গুণ বেশী দামে।

—এখানে কি শাড়ি পাওয়া যায় ? তা হলে আমার মার জন্যে একটা আর মনোজের মার জন্যে একটা কিনবো।

—পাওয়া যায় তবে সিনথেটিক, চাইনিজ সিল্ক।

—তুমি আবার এত জানলে কী করে ?

—মার জন্যে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম।

পাওরাট হলো ইণ্ডিয়ান মার্কেট। বেশীর ভাগ কাপড় জামার দোকানই হলো সর্দারজিদের। আমার চেনা সর্দারজির দোকানে নিয়ে গেলাম মনীষাকে। এখানে দরাদরি করার খুব একটা সুযোগ নেই। তাই কিনতে বেশী সময় লাগলো না। ফেরার পথে একটা মোড়ে গাড়ি থামতে একটি মেয়ে এগিয়ে এলো একগুচ্ছ ফুল নিয়ে। ওর কাছ থেকে দুটো মালির (বেলফুলের) মালা আর একগুচ্ছ লাল গোলাপ কিনলাম।

তারপর গেলাম সিলোম রোডে একটা গয়নার দোকানে, মনীষাকে গাড়িতে বসিয়ে। দোকানের সামনে দাঁড়াতে দোকানের মালিক প্রথম কাঁচের দরজাটার লক খুলে দিল সুইচ টিপে। সেই দরজাটা পার হতেই পেছনের দরজাটায় আবার তালা পড়ল তারপর সামনের আর একটা দরজা খুলে গেলে দোকানের ভেতর ঢুকতে পারলাম, এটাও এক সর্দারজির দোকান। ভদ্রলোক নিউইয়র্কে দামি পাথরের,

বিশেষ করে হীরে আর রুবির গয়না চালান দেয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। বেশ ভদ্র ও শিক্ষিত। আমি তাড়াতাড়ি একটা পিজিয়ান রেড রুবি বসানো ঝোলানো দুল কিনে পকেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে এলাম।

—কি কিনলে?

—কিছু না। ও কয়টা টাকা পেতো তাই দিয়ে এলাম।

বাড়ি আসতে আসতে দেড়টা বেজে গেছে।

আজ খাওয়ার টেবিলে মাছের মাথা দিয়ে লাউ ঘণ্ট আর বড় বড় কই মাছের ঝোল।

মনীষা পিয়ালীকে বললো, তুমি দারুণ বেঁধেছ।

কে শেখালো?

—মাস্টার ক্রু। (শিক্ষক) প্লা মো আলয়? (মাছ ডাক্তাক অর্থাৎ কৈ মাছ রুগিদের পথ্য, খেতে ভালো হয়েছে?)

—ডেলিসাস্।

আমি থাই ভাষায় বললাম, 'হক্ আলয় মাগ্ মাগ্'।

পিয়ালী খুশি হয়ে বললো, 'খাপ খুন খাপ্'।

খেয়ে আমরা দুজনে আমার ঘরে এ. সি. চালিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিলাম। ও কনুইয়ে ভর দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল।

—অতীশ, একদিন বিকেলে তুমি এসেছিলে আমাদের বাড়িতে। আমার বাবা, মা, ভাই বোনদের নিয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়েছিল। তুমি আসবে বলে আমি মাথা ধরার নাম করে বাড়িতেই ছিলাম। মনে পড়ে সেদিনের কথা?

—পড়বে না কেন? যত আজে বাজে গল্প করে সময় কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

—আর কিছুই করোনি, সাধুপুরুষ?

—একটুকু ছোঁয়া লাগে,...

—তারপর—এই রকম—দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।

—তোমার গলায় কিন্তু এখনও সুন্দর সুর আছে।

—তোমাকে দেখে আজ কত কথাই না মনে পড়ছে।

আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ও চুপটি করে শুয়ে বললো, কী অপার শান্তি। এ শান্তিটুকুর জন্যেই যেন এতদিন বেঁচেছিলাম। এভাবেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায় না অতীশ?

—জানি না, মনি। তোমার স্মৃতি নিয়ে একরকম করে কেটে যাচ্ছিল। তুমি এসে সব ওলট-পালট করে দিলে। কী করবো, কি হবে, নিজেই বুঝতে পারছি না। এই সুন্দর মুহূর্তকে এসো পূর্ণভাবে উপভোগ করা যাক, বাস্তবতার কষাঘাতে একে ভেঙ্গে ফেলে কি লাভ, বলে ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

—তাই ভালো অতীশ। ঐ চিন্তাটা কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততপক্ষে শিকায় তোলা থাক।

ঐ ভাবে আমরা কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না। পিয়ালীর দরজার টোকা শুনে সম্বিত ফিরে এলো। ও একটু গুছিয়ে শুলে আমি দরজা খুলে দিলাম। পিয়ালী চা দিয়ে যাবার সময় বললো 'খাও খোট' (আমি দুঃখিত)

মনীষা বললো, জীবনের সবচাইতে সুন্দর দিনটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। এ কয়েক ঘণ্টা আমরা সব ভুলে ছিলাম—শুধু ছিলাম আমরা দুজনে। সন্ধ্যা হয়ে এলো। তোমার সেই সুন্দরীর আসার সময় হলো। উঠি।

মনীষা একটা ঢাকাই জামদানি পরেছে। কপালে একটা লাল টিপ দিয়েছে লিপস্টিক দিয়ে। বড় বড় চোখ দুটোতে সুরমা লাগিয়ে আরও সুন্দর করেছে। গলায় একটা জড়োয়ার হার পরেছে, হাতে ম্যাচিং চওড়া চুড়ি।

—কাছে এসো।

—আমি ওর কানের দুল দুটো খুলে সেই রুবির দুল দুটো পরিয়ে দিলাম। চুলে বেল ফুলের মালাটা লাগিয়ে বললাম, মনি আজ তোমার জন্মদিন। তুমি সুখী হও।

ও আমাকে প্রণাম করে বললো, আমায় ভালো করে আশীর্বাদ করো অতীশ। ঐ জিনিসটার বড়ই অভাব আমার জীবনে। আশ্চর্য, তোমার কি করে মনে আছে এই দিনটা ? তুমি তাহলে এটা কিনতেই ঐ গয়নার দোকানে ঢুকেছিলে ? তখন মিথ্যে কথা বললে কেন ?

—মিথ্যে কথা না বললে, সার্প্রাইজ দিতাম কি করে ? তোমার পছন্দ হয়েছে ?

—দারুণ পছন্দ হয়েছে। রুবির দুল আমার একটাও নেই।

আমি আরও কাছে টেনে নিয়ে বললাম, তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি।

—অতীশ মনে আছে, কলকাতায় থাকতে তুমি আমার জন্মদিনে একটা শাড়ি দিয়েছিলে। সেটা সেদিন পরেছিলাম। তুমি চিনতে পেরেছিলে ?

—পেরেছিলাম। আমি যে প্যাণ্টটা পরে আছি সেটা তোমার দেওয়া।

বেল বাজলো। পিয়ালী দরজা খুলে দিল। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

নেত্রা মনীষার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দৌড়ে এসে গালে গাল লাগিয়ে বললো, হাই মনীষা, আই ডিড নট নো ইউ আর সো বিউটিফুল।

—ইউ আর মোর দ্যান বিউটিফুল, ইউ আর কিউট।

নেত্রা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা বড় বোনকে কী বলো ?

—দিদি।

ও মনীষার গালটা টিপে বললো, তা হলে তুমি আমার ডিডি। ঠিক আছে ?

—তুমি তাহলে আমার সিস্টার অর্থাৎ বোন। বোস বোন।

—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ডিডি ? অতীশ একা একা পাগল হয়ে উঠেছিল।

—সে অনেক কথা। পরে শুনো একদিন, বড় দুঃখের কথা। যাক মনে হচ্ছে তুমিই বোন অতীশকে হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে রেখেছ এই বিদেশে।

—তুমি আজ এত সেজেছ কেন ডিডি ?

—তুমি আসবে বলে।

—মোটেই না। বোনের জন্যে কি আর কেউ এত সাজে? দ্যাখো, আমি যে ভাবে অফিস গেছি সে ভাবেই এসেছি।

মনীষা বললো, ঐ সাদা ফ্রকেই তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, আজ ওর জন্মদিন। তাই সেজেছে।

—তাই? আমি তো কিছুই আনিনি তোমাকে দিতে। দাঁড়াও, বলেও র কানের মুক্তার দুলটা খুলে দিয়ে বললো, এটাই দিলাম তোমাকে। আমাকে তাহলে ভুলবে না।

মনীষা নিতে না চাইলেও ও কিছুতেই শুনলো না।

মনীষা বললো নেত্রা, কাল আমরা পাতায়া যাচ্ছি। তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে। আমাদের তো একজন এসকর্টও চাই।

—এসকর্ট, সে আমাদের এখানে অনেক পাওয়া যায়।

মনীষা হেসে বললো, মিক্সাড্ গ্রুপের জন্যে কোনও এসকর্ট পাওয়া যাবে না। হাত চেপে ধরে বলে, চল না বোন।

আমার দিকে তাকিয়ে নেত্রা সম্মতি চাইলো।

আমি বললাম, চল। আমার তো ভালই।

—তা হলে ঠিক আছে, যাবো। কখন রওনা হবে?

—সকাল পাঁচটার থেকে ছটার মধ্যে।

—ঠিক আছে। আমি পাঁচটায় চলে আসবো।

আমি বললাম, তা হলে এখানেই খেয়ে যাও। বাড়ি গিয়ে তো আবার রাঁধতে হবে, না হলে রাস্তা থেকে কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে।

মনীষা জিজ্ঞেস করলো, কেন ও বাড়িতে থাকে না?

—বাড়িতে থাকে তবে এক বান্ধবীর সাথে। দুজনই কাজ করে অফিসে।

—হ্যাঁ. তা হলে আর বলতে? নিশ্চয় খেয়ে যাবে। আমাদের খাবার চলবে তো?

—হ্যাঁ ভালই চলবে। আমি তো খেয়েছি এখানে।

মনীষা বললো, তাহলে বেশী দেরি করা ঠিক নয়। ওকে তো আবার জিনিস গুছিয়ে নিতে হবে। কাক না ডাকতেই আবার উঠতে হবে।

ডাল, ডালের বড়া আর মাছ দিয়ে বেশ সাপটে সুপটে খেয়ে নেত্রা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

মনীষাকে বললাম, চল আমরাও শুয়ে পড়ি। ওর ঘরে ওকে শুইয়ে মাথার কাছে একটু বসলাম।

—শোও না আমার পাশে একটু। গল্প করা যাক।

—আমি শুয়ে পড়লে ওর কম্বলটা আমার গায়ে কিছুটা দিয়ে বললো, নেত্রা বড় প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল। তোমার ঘরে যে পাহাড়ি ঝরণার ছবিটা আছে তার মত।

ওকে না ভালবেসে কারও উপায় নেই। নেহা সত্যি তোমাকে ভালোবাসে?

—ঠিক জানি না।

—কেন জানো না?

—ও অক্সফোর্ডে পড়বার সময় একটি বাঙ্গালী ছেলেকে ভালোবাসতো। ও মারা যায় সেখানে এক একসিডাণ্টে। আমি নাকি অনেকটা ওর মত। আমি হলাম ওর সাবস্টিটিউট। তাই ঠিক বুঝতে পারি না।

—গম্ভীর হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আর তুমি? তুমি ওকে ভালোবাসো?

—তাও বুঝতে পারি না ঠিক। পোড়া গরু তো সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। তবে এই নিঃসঙ্গ জীবনে ওর সঙ্গ ভালো লাগে। নিঃসঙ্গতা না থাকলে কী হবে তা জানি না। তুমি এবার ঘুমোও। আমি যাই।

আমি আমার ঘরে শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ বই না পড়লে আমার ঘুম আসে না। ঘণ্টা খানেক পরে বাতি নিভিয়ে দিলাম। তারপরই দরজা খোলার শব্দ। জানলার আলোতে দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে মনীষা, এক হাতে বালিশ আর হাতে কম্বল।

—তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? আমার ঘুম আসছে না। আমি এখানে শোবো।

—এসো।

আমার পাশে কুকুর কুণ্ডলি হয়ে ও শুয়ে পড়লো। ওর একটা হাত আমার গায়ের ওপর।

পরস্ত্রী আর পুরোনো প্রেমিক দুই এর যুদ্ধ লেগে গেল মনের মধ্যে যেন বালি আর সুগ্রিবের লড়াই। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল, প্রেমিকারেই জয় হলো। রক্তের চাপ স্বাভাবিক হলো। আমার হাতটাও ওর নরম শরীরে উঠে এলো। ওর পারফিউমের গন্ধ আমার গায়ে আটকে গেল।

রাতটা যেন বড় তাড়াতাড়ি কেটে গেল। ঘড়ির এলার্ম বাজলো।

॥ ২৭ ॥

নেভা বিলেতে পড়েছে তাই সময় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। ঠিক কথামত চলে এসেছে।

মনীষা বললো, একদম খাবার টেবিলে চলে এসো। তোমার জন্যেই বসে আছি। আজ তুমিও দেখছি আমার মত মেমসাহেব সেজেছো। জানো এই প্যান্টটা আর দুলটা অতীশ আমাকে দিয়েছে জন্মদিনে।

—জানো ডিডি, ও আমার জন্মদিনে কখনও কিছু দেয়নি।

—তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর কী তোমার জন্মদিন হয়েছে?

—তা হয়েছে বৈ কী, তবে আমি জানাই নি।

মালপত্র তুলে গাড়িতে ওঠবার সময় বললাম, আমি গাড়ি চালাবো। রাস্তা দেখতে হবে কিন্তু নেভা তোমার।

নেভা বললো, রোজ গার্ডেন যাবার সময় যে পথে গিয়েছিলাম সে পথ ধর, তার পর দক্ষিণ-পূব দিকে হাইওয়ে ধরবে। দেড়শো কিলোমিটার গেলেই পাত্তায়া।

—তা হলে তো আড়াই ঘণ্টায় পেঁছে যাওয়া যাবে।

—যদি কোথাও না থামো।

শহরের পথ তখন ফাঁকা তাই হাইওয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই পেয়ে গেলাম। দুমুখো চওড়া পিচ ঢালা পথ। দুদিকে সবুজ ধানের খেত। মাঝে মধ্যে ছত্রানো সব বাড়ি, একই রকম সব আদল, কাঠের মাচার ওপর টিনের চাল। অনেক বাড়ির মাথায়ই আছে এনটেনা। কয়েক কিলোমিটার পর পর দেখা যায় ওয়াট।

মনীষা বললো, ভারি সুন্দর তো এদের গ্রামগুলো। কোথাও দৈন্যতা নেই।

আমি বললাম, দৈন্য ওদের ঘর বাড়ি বা পোশাক দেখে বোঝা যায় না। এই ঠাঁট বজায় রাখতে গিয়ে কত মেয়ের যে সর্বনাশ হচ্ছে তা প্রত্যায়া গেলে দেখতে পাবে। ওরা এমনি সব গ্রামেরই ফুটফুটে মেয়ে।

ঘণ্টা খানেক চলবার পর মনীষা বললো, কোথাও থামিয়ে একটু কফি খেয়ে নিলে হতো না?

নেভা বললো, ঠিক আছে। একটু আগেই একটা রেস্তোরা আছে।

রেস্তোরাটা গ্রাম্য পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে তৈরি। খড়ের চালের একটা বড় খাবার পরিচ্ছন্ন ঘর, বাগানে ছোট কাটা খাল। খালের ধারে ধারে ছোট ছোট ছাউনি। তার নীচে বসবার বাধানো বেঞ্চ। খালের জলে নানান রঙের শালুক, রঙিন মাছ। আমরা বাইরে বসেই কফি খেয়ে নিলাম।

আরও এক ঘণ্টা চলার পর একটা ছোট শহরে এসে পেঁছলাম। সেখানে রাস্তার

দ্ব্ধারে দোকানে নানান রকম বেতের আর বাঁশের তৈরি জিনিস বিক্রি হচ্ছে।

মনীষা বললো, একটু থামাও না এখানে। দোকানগুলো একটু দেখি।

অপূর্ব্ব সব গার্ডেন চেয়ার, সোফা, দোলনা, ওয়াল প্যানেল, ফলের বাস্কেট, ভ্যানিটি ব্যাগ, পার্টিশান স্ক্রীন্। ত্রিপুরার স্টলে দেখেছি এ রকম সব জিনিস।

মনীষা কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনলো।

আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো, বললো নেত্রা।

শহরে ঢোকবার মুখে সব সস্তার গেস্ট হাউজ। কাছেই ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

নেত্রা বললো, এবার বাঁ দিকে নাও। এ রাস্তাটাই হচ্ছে এখানকার প্রধান সড়ক, বিচ্ রোড।

অত্যন্ত অপ্রশস্ত রাস্তা। সামনেই সমুদ্র, কিন্তু একটু পরেই তা ঢাকা পড়ে গেল এলোমেলো সব দোকানঘরে, খোলা বারে আর রেস্তোরায়। বারের উঁচু টুলে বসে যারা ড্রিঙ্ক করছে, তাদের প্রত্যেকের পাশেই একটি করে মেয়ে। শিষ দিতে দিতে আমেরিকান নৌ সৈন্যেরা হাটছে খাই মেয়েদের কোমর ধরে। রাস্তার দুপাশে ফুটপাথ নেই বললেই চলে। দোকান ঘরগুলোর কোনও ছিঁড়িছাদ নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম নেত্রাকে, এখানে মনে হয়, যে যেখানে পেরেছে, যে ভাবে খুশি সবঘর বানিয়ে দোকান করেছে। বেলাভূমি তো দেখতেই পাচ্ছি না।

—তুমি ঠিকই ধরেছ। পয়ষট্টি সালে যখন ভিয়েটনামে আমেরিকানরা যুদ্ধ করতে আসে তখন সৈন্যরা স্বল্প ছুটিতে আমাদের দেশে আসতো স্ফূর্তি করতে। সে স্ফূর্ত্তির খোরাক হলো মদ আর মেয়ে। সান স্যাণ্ড সি আর সেক্স ছিল ওদের দারুণ আকর্ষণ। ওরাই ব্যাংককের কাছে খুঁজে বার করে এই জায়গাটা।

এটা ছিল তখন জেলেদের একটা গ্রাম। কাঁচা পয়সা রোজগারের জন্যে গ্রামের গরিব মেয়েরা কাচা মাংস বিক্রি করতে এখানে ভিড় করতে আরম্ভ করে। তার সাথে সাথেই হয় ছোট ছোট হোটেল, দোকান পাট আর ইটারিজ্। সমুদ্রের ধারটাই সবাই দখল করে নিল। এই চললো সত্তোর সাল পর্য্যন্ত। তারপরই তৈরি হতে আরম্ভ হলো বড় বড় হোটেল আর অন্যান্য অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা, যা দেখতে পাবে এখন।

নেত্রা মৃদু ধাক্কা লাগালো আমাকে, কী করছো কী? রাস্তার দিকে চোখ রেখে চালাও। ঐ মেয়েটাকে আর একটু হলেই চাপা দিয়েছিলে আর কী?

—দোষটা আমার না ঐ মেয়েটার? ও তো মাতাল হয়ে পথ চলছে।

দোকান পাট, রাস্তার, ভিড় যেখানে শেষ হলো, সেখানেই শ্যাম-হবে-সোর হোটেল।

হোটেলের পোর্টিকোতে গাড়ি দাঁড় করালাম। নেত্রা আর মনীষা নেমে গেল ঘরের খোঁজ নিতে। সামনে শান্ত সমুদ্র। আর একদিকে সবুজ পাহাড়। অনেকটা জায়গা নিয়ে হোটেলটা। হোটেলের এই অংশটা এক তলা। বেগুনি রেজড্ টাইলের খোলা দিয়ে তৈরি চার চালা ছাদ। পেছন দিকে থাকবার দোতলা ঘর। তার সামনে সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট। মাঝখানে ঝাউবনের মাঝ দিয়ে একটা

শীর্ণ স্রোতস্বিনী। তার ওপর দিয়ে পারাপারের জন্য বাঁশের একটা পুল, অনেকটা জাপানি ঢংএ তৈরি। পরিপার্শ্বিকতার সাথে একটা সামঞ্জস্য রেখে তৈরি এর স্থাপত্য।

আমাদের দেশে কিন্তু এমনটি হয় না। কলকাতায় যে সব ঐতিহাসিক বাড়ি আছে কোনওটা গথিক, কোনওটা করিন্থিয়ান তার পাশেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাদা-মাটা দশ বারো তলা বাড়ি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় থাম-ওয়ালা দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং একটা ইতিহাসের ধারক ও বাহক ছিল। বাড়িটার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, একটা বলিষ্ঠ চরিত্র ছিল, আর ছিল সৌন্দর্য আর খ্যাতি। তখন সেখানে যারা পড়তো তারাও ছিল খ্যাতিমান, বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারি। ঐ বাড়িটা ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে একটা উদ্ধত উঁচু বাড়ি, যার না আছে চরিত্র, না আছে সৌন্দর্য। তাই বোধহয় এখনকার ছাত্ররাও ঐ একই রকম উদ্ধত।

নেত্রা ফিরে এসে বললো, ঘর বুক করে গেছে তোমার বন্ধু আর চিঠিও লিখে গেছে তোমার নামে একটা। চলো।

রিসেপশেনিস্ট বললো, মিঃ মনোজ তো একটা সিঙ্গল বেডেড রুম বুক করে গেছেন, বলেছেন দুজন গেস্ট আসবে। আপনারা তো দেখছি তিনজন এসেছেন। কী করবেন ?

—আমি বললাম, ওর ঘরের পাশে একটা ডাবল বেডেড রুম দিন।

—আমাদের সব ঘরই ডবল বেডেড। চার্জও প্রায় এক কারণ একক গেস্টরা রাত্রে আর একজন অদৃশ্য গেস্ট নিয়ে আসে। তাতে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবেন মা। তারা আপনাদের অগে চরেই আসবে যাবে।

আমাদের দুটো ঘরের মাঝে একটা দরজা আছে। সুন্দর ঘর, যেমন থাকে ফোর স্টার হোটেলে।

আমি মনীষার দিকে তাকিয়ে বলসাম, তোমরা দুজন তাহলে এক ঘরে থাকবে আর আমরা দুই বন্ধু এক ঘরে। আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক, তারপরে চান করা যাবে। মনোজ লিখেছে ও একসাথে খাবে।

চা খেতে খেতে মনীষা জিজ্ঞেস করলো, আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

নেত্রা বললো, বিকেলে চল সমুদ্রের ধারে তারপর সন্ধ্যায় তোমাদের নিয়ে যাবো আলকাজার শো দেখাতে। খেতে যাওয়ার সময় টিকেট কিনে নেবো। কাল সকালে প্রবাল দ্বীপ দেখে, বিউটি প্যারেড দেখা যাবে। তারপর সন্ধ্যায় রওনা। অনেক কিছুই কিন্তু বাদ পড়ে যাবে

মনীষা বললো, দেখ অতীশ সবাই কেমন সাঁতার কাটছে সুইমিং পুলে। চল না আমরাও একটু সাঁতার কাটি।

—তোমাকে তো লাল টুপি পরে নামতে হবে।

—না মশাই, আমি জানি। কিন্তু সাঁতারের পোশাক তো নেই।

—বল তো কিনে আনি। হয়তো হোটেলেই পাওয়া যাবে। নেত্রা, তুমি সাঁতার

জানো তো ?

—তা, ভাসতে পারি। চলই না দেখি।

—তা হলে চল, সুইমিং ট্রাংক কিনে আনি।

হোটেলেই ট্রাংক পাওয়া গেল। মেয়েদের বিকিনয়।

তিনজন যখন পুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালান, রোদে ভাজা সাহেব মেমেরা সব আড়চোখে তাকিয়েছিল। সত্যি, নেত্রা আর মনীষার শরীরের বাঁধন দেখবার মতন, স্বল্পবাসে তা আরও পরিস্ফুট।

আমি বললাম, দেখ সাহেবগুলো কি রকম হিংসার চোখে আমাকে দেখছে ?

মনীষা বললো, হিংসা নয় মশাই প্রশংসার। এরকম দুইজন সুন্দরীকে তুমি পটিয়েছ। কী করে ম্যানেজ করেছো, তাই ভাবছে ?

নেত্রা বললো, অতীশ চল রেস দেওয়া যাক।

—আমি বাঙ্গাল দেশের ছেলে। ছোট্ট বেলায় সাঁতার শিখেছি। একটু বড় হলে সাঁতরে নদী পার হয়েছি। কলেজে প্রাইজ পেয়েছি। তুমি কি করে পারবে আমার সঙ্গে ?

—দেখাই যাক না।

ও যখন জলে ড্রাইভ দিল তখন উদ বিড়ালির মত জলের তলা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল। হাত পায়ের স্ট্রোক সামঞ্জস্যপূর্ণ, নিশ্বাস প্রশ্বাস তার তালে তালে। ওকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেল আমাকে ছাড়িয়ে।

—পারলে না তো ? শোন অতীশ, আমি জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান ছিলাম।

—কী করে পারবো, আমি যে গ্রামে মজিদ ভাইর কাছে শিখেছি।

—আমি শিখেছি ন্যাশানাল চ্যাম্পিয়ানের কাছে।

মনীষা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, বাব্বা ; তোমাদের সঙ্গে কী আমি পাল্লা দিতে পারি ? যা হাঁপিয়েছি না ?

—ওয় বুকটা হাপরের মত উঠছিল নামছিল।

ঘরে গিয়ে সেজে এসে মনীষা বললো, দেখতো এই মেয়েটিকে চেনো কিনা ?

নেত্রা শাড়ি সামলাতে সামলাতে সলজ্জভাবে আমার দিকে তাকালো।

আমি অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, এখন তোমায় কে বলবে, তুমি বাঙ্গালী নও ? লাল শাড়িতে তোমাকে খুব সুইট দেখাচ্ছে।

—জানো অতীশ, ডিডি আমাকে এই শাড়িটা দিয়েছে। সি ইজ রিয়েলি মাই ডিডি। ওকে একটা চুমু খেয়ে বললো,—থ্যাংক ইউ ডিডি।

মনোজ ঘরে পা দিয়ে নেত্রাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। বাংলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এ সুন্দরী কে রে ? বাঙ্গালী তো নয় পাঞ্জাবি হতে পারে ? এখানে তোর চেনা কেউ নাকি রে ?

মনীষা এগিয়ে এসে বললো, এ হচ্ছে নেত্রা। খাঁটি থাই। অতীশের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আর নেত্রা, এই হচ্ছে অতীশের বন্ধু, মনোজ।

মনোজ ওর পরিচয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলো না। দুজনে হাত জোড় করে নমস্কার করলো। অতীশের পিঠে একটা চাপড় মেরে বললো, দারুণ বাগিয়েছিস তো? তুই তো দেখছি লেডি কিলার। তা হলে এখন আমাদের প্রোগ্রাম কী?

—আগে খাওয়া, তারপর সামান্য বিশ্রাম, তারপর নেত্রা যেখানে নিয়ে যাবে।

মনোজ এর মধ্যে নেত্রার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছে। আমার আর মনীষার ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছিল।

চা খেয়ে, একটু বিশ্রাম করে, আমরা হেঁটে বাজারের মধ্য দিয়ে বিচ্ রোড ধরে সমুদ্রের পারে যাচ্ছিলাম।

মনীষা আমাকে বললো, কি ফ্রেস বড় বড় গলদা চিংড়ি আর শাকশব্জি বিক্রি করছে। তোমার বাড়ি এখানে হলে কিনে নিতাম। বাজারে একটাই দোকান কেন নেত্রা?

নেত্রা বললো, এটা বাজার নয় ডিডি এটা সি ফুড্ রেস্তোঁরা।

—তা হলে এখানে একদিন খেতে হবে।

—ঠিক আছে। কাল খাওয়া যাবে।

—ডিডি, চামড়ার জিনিস কিনলে এ দোকানটা থেকে কেনো।

—সময় কোথায়, যে কিনবো?

রাস্তায় ভিড় বেড়েই চলেছে। পথচারিদের সঙ্গে গুতোগুতি করে চলেছে গাড়ি, টুকটুক আর মোটর সাইকেল।

এতক্ষণ পর আমরা একটা বিচে এসে পৌঁছলাম। বেলাভূমি দ্বিতীয়ার এক ফালি চাঁদের মত বেঁকে গেছে। দুদিকে পাহাড়। মাঝে মাঝে বহুতল হোটেল দেখা যাচ্ছে। একটা নারকেল গাছের তলায় এক বুড়ি কতগুলো ইজিচেয়ার নিয়ে বসেছিল। আমরা চারটে চেয়ার ভাড়া করলাম চল্লিশ বাট দিয়ে।

মনোজ বললো, আমি আর নেত্রা একটু হাটবো। তোরা যাবি, না বসবি? মনীষা চেয়ারে বসতে বসতে বললো, তোমরা হাটো। আমরা একটু গল্প করি।

মনীষা আমার হাতটা ধরে চুপ করে বসেছিল। দুজনেই পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই ভাবছিলাম।

মনীষা বললো, মনে পড়ে অতীশ সেই যে একবার আমরা কলেজের ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পুরী গিয়েছিলাম?

—তুমিও তো জানতে না যে আমিও যাবো। আমাকে ট্রেনে দেখে তো তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে।

—তুমি যাওয়াতে অন্য ছেলেদের কী মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে ওরা কথাই বলতো না। পুরীর সমুদ্রে কী ঢেউ আর গর্জন আমার তো নামতেই

ভয় করতো। তুমি জোর করে নামাতে। এখানে তো সমুদ্রের ঢেউই নেই। এ যেন লেকের জল।

—পুরীর বিচ মস্ত লম্বা, কিন্তু ওয়াটার স্পোর্টসের কোনও বন্দোবস্ত নেই। এখানে কী নেই—ওয়াটার স্কুটার, সার্ফিং ইয়াক্‌টিং, প্যারাসুটিং।

—ওয়াটার স্কুটারগুলো যা জোরে চলছে না, আমার তো ভয় হচ্ছে কখন উল্টে যাবে। দ্যাখো, দুটো মেয়ে চড়েছে, কিন্তু চালাতে জানে না। স্কুটারের লোকটার অবশ্য ভালোই লাগছে, পেছনে দাঁড়িয়ে ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা ধরেছে। ওর মুখটা মেয়েটার মুখের সঙ্গে সেঁটে আছে।

আমি বললাম, উইণ্ড্‌ সার্ফিংএর মেয়েটার কিন্তু সাহস আছে। মোটর বোটটা কী জোরে টেনে নিয়ে চলেছে। ও সুন্দর ঢেউ কেটে চলেছে। মেয়েটা আগে নিশ্চয় দেশে সার্ফিং করেছে। ফিগারটা দেখেছো?

—তোমার নজর কেবল ঐ ফিগারের দিকে। এই প্যারাসুটের নীচে রডটার উপর যে লোকটা বসে ভাসছে হাওয়ায়, ওকে নামাবে কী করে?

—দেখছো না মোটর বোটটার সঙ্গে ওটা বাঁধা আছে দড়ি দিয়ে।

—উপরে উঠলো কী করে?

—মোটর বোটটা খুব জোরে চালিয়ে দেয়। প্যারাসুটটা হাওয়ায় ফুলে ওঠে, তখন ওটা উপরে ভাসে, ঠিক সেই সময় লোকটা উঠে পড়ে।

—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মনীষা বললো, দূরের যুদ্ধ জাহাজটা দেখেছো?

—ওটা আমেরিকান সেভেন্থ ফ্লিটের জাহাজ।

—এখানে কী করছে?

—সৈন্যদের ফুর্তি করতে নিয়ে এসেছে। সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আর নিয়মের বাঁধনে আটকে থাকতে থাকতে এরা হাঁপিয়ে উঠে। নিজের খুশিমত বাঁধনহারা জীবনের স্বাদ মেটাতে কয়েক দিনের জন্যে এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এরা কেউ সকালে টেনিস্‌ বা গল্ফ্‌ খেলে, দুপুরে পুলে সাঁতার কাটে, রোদ লাগায় চেয়ারে গা এলিয়ে, দুপুরে খাঁটি ইতালিয়ান, স্প্যানিস, বা জার্মান রেস্তোরাঁয় খেয়ে মায়ের কথা মনে করে সন্ধ্যায় যায় ডিস্কোতে। সেখান থেকে সঙ্গিনী জোটায় ডবল বেডেড্‌ খাট ভরতে। জাহাজের বদ্ধ ঘরের বাংক্‌ বেডের কথা ওরা কয়েক দিনের জন্যে ভুলে যায়। মেয়েটার শরীর নিংড়ে পয়সা উসুল করে ওকে বের করে দেয় কাক-ভোরে। এমনি করে ওরা ওদের ব্যাটারি চার্জ করে নেয়। ওদের পয়সায়ই পাতায়া গড়ে উঠছে। এদের জন্যেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এত সব আনন্দমেলার খেলার সরঞ্জাম।

মনীষা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, দ্যাখো দ্যাখো, একটা স্কুটার উল্টে গেছে মোটর বোটের সঙ্গে ধাক্কা লেগে। মেয়েটা হাবুডুবু খাচ্ছে। ওর সঙ্গের সাহেবটা দিব্যি সাঁতার কেটে একটা লঞ্চে উঠে পড়লো। মেয়েটা যে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। বেচারা মনে হচ্ছে সাঁতার জানে না। হাতটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

আমি সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে—যাক, বেঁচে গেল। ঐ দ্যাখো, একটা লোক বোটটা থেকে লাফ দিয়ে মেয়েটার চুল ধরে টেনে আনছে। যাক, ওকে তুলে নিয়েছে। দ্যাখো, ঐ সাহেবটা নির্বিকার হয়ে বসে আছে।

মেয়েটাকে যখন নিয়ে এলো পাড়ে, তখন ও অচৈতন্য। ওরা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। আমি কাছে গেলাম। দেখলাম, একটা থাই মেয়ে।

আমি ওর নাড়ি দেখলাম। তখনও ধিক্ ধিক্ করে মন্থর গতিতে চলছে। ওর মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াবার চেষ্টা করতে ওর হৃদস্পন্দন বাড়লো। তারপর উপুড় করে চেপে বসে পেটে চাপ দিয়ে মুখ দিয়ে জল বের করে দিতেই, চোখ খুলে তাকালো। একটা করুণার দৃষ্টি। সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। চীৎকার করে বললো, 'খাপ খুন্ খাপ্।'

মনীষা বললো, এমনি ভাবেই তো তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে, পুরীতে যখন সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলাম।

—তখন তো আমি ঐ বদমায়েস সাহেবটার মত পালিয়ে যাই নি। সেদিন আমার একটা মস্ত লাভ হয়েছিল, বলতো কী?

—আমার অজান্তে আমার শরীরটাকে নিয়ে খুব ডলাই-মলাই করতে পেরেছিলে মনের সুখে। তাই না?

—অজান্তে কেন? জ্ঞানত। তুমি তো আমার গলা জড়িয়ে চুমু খেয়েছিলে। ভাগ্যিস, অন্য বন্ধুরা কাছে ছিল না।

জলে হুল্লোড় করা লোকেরা পাড়ে উঠে এসেছে। ওয়াটার স্কুটারের শব্দ থেমে গেছে। ইয়াক্টের পাল গুটিয়ে ফেলেছে, প্যারাসেইলিং-এর প্যারাসুটটা বেলাভূমিতে পড়ে আছে, মোটর বোটগুলো নোঙ্গর ফেলেছে। শুধু শোনা যাচ্ছে ঝাউগাছের শিরশিরে শব্দ আর ছোট ছোট ঢেউ-এর আনাগোনার আওয়াজ। দিনের আলো নিভে আসছে। নীল আকাশের রঙ বদলেছে। কর্মক্লান্ত লাল সূর্য সমুদ্রের জলে ডুব দিচ্ছে। দূরের পাহাড়ি দ্বীপগুলো সিলুহাউট হয়ে রাতের কালো চাদরটা টেনে নিচ্ছে। জাহাজের আলোর মালাগুলো জ্বলে উঠলো। আধবাঁকা বিচের আলোগুলো যেন পান্নায়ার নেকলেস্।

আমরা নিঃশব্দে রাতের আগমনের অপেক্ষায় বসেছিলাম। মনীষা আমার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছিল। কোন এক অদৃশ্য অশরীরিকে উদ্দেশ্য করে গুন্‌গুন্ করে গাইলো 'এই করেছো ভালো, নিঠুর হে নিঠুর হে, এই করেছো ভালো'। এমনি করে হৃদয়ে মোর…'

অর্দ্ধেক গেয়ে থেমে বললো, আসবার আগে ভেবেছিলাম, তোমার দেখা পেলে আর তোমায় ছাড়বো না। আজ এই সন্ধ্যায় মনে হচ্ছে, তোমার বন্ধু হিসাবে থাকাই ভাল। মনোজের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মূল্য না দিলে ভগবান আমাকে ছাড়বেন না। সেই দহন জ্বালায় আমরা তিনজনেই পুড়ে মরবো।

আমি ওকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে বুকের কাছে নিয়ে বললাম, মনি কাঁদছো কেন? তুমি ঠিক সিদ্ধান্তেই এসেছো। মনীষা, তুমি মানসী হয়ে সুখস্মৃতির মাঝে লুকিয়ে থাকলেই তোমাকে আরও নিবীড় করে পাবো। মনোজের ভালোবাসাকে তুচ্ছ করবে কী করে? ও বরাবরই তোমাকে নিঃশব্দে প্রেমনিবেদন করতো।

আমাদের শেষ চুম্বনের সাক্ষী রইলো শুধু বিদেশের এই সমুদ্র আর স্বীকৃতি দিল সেই ঢেউএর আছড়ে পড়া শব্দ।

মনোজরা যখন এলো তখনও আমরা দুজনে হাত ধরে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে ওর চোখের জল কেউই দেখতে পেলো না।

নেত্রা ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, ডিডি তোমার স্বামী ইজ্‌ এ নাইস্‌ পার্সন।

এ কি তুমি কাঁদছো কেন?

—না তো। চোখে বালি পড়েছে।

—চল, তা হলে ঐ লাইটটার নীচে।

ছোখটা মুছে বললো, আর দরকার নেই, বেরিয়ে গেছে।

মনোজ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

নেত্রা আবার তাগাদা লাগালো, চলো হোটেলে। সাড়ে ছটায় আমাদের তুলতে আসবে। ফেরবার পথে খেয়ে নিলেই হবে।

আলকাজার ছোট হলেও সুন্দর অডিটরিয়াম। ছাদটা একটা সেলের মত। স্টেজটা বিরাট। সাউণ্ড সিস্টেম খুবই স্পস্ট। কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে এসে আমাদের হাতে বিয়ারের গ্লাস ধরিয়ে দিল আর মেয়েদের হাতে কোক।

পর্দা উঠতেই প্রথমে সব ছেলে-মেয়েদের হাত পা ছুড়ে সমবেত নৃত্য। তার সঙ্গে একজনের ইংরেজি গান।

মনোজ বললো, কি দারুণ ফিগাররে এদের? আমেরিকার রেডিও সেণ্টারের রকেট গ্রুপের অবিকল নকল। সবারই এক হাইট। সব মেয়েগুলোর একই মাপ —বত্রিশ, ছাব্বিশ, চৌত্রিশ। পাগুলো দেখেছিস যেন সব রকেট। বাই মেয়েরা এত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না।

মনীষা অমনি নেত্রার গালটা টিপে বলে উঠলো, কেন, আমার বোনটি কম কিসে?

নেত্রা একটু মুচকি হাসলো।

আমি বললাম, এদের ইংরেজি উচ্চারণণ যেমনি সুন্দর তেমনি নকল করেছে সুরটা। হয়তো ঐ গানটা টেপে বাজছে মেয়েটা একটা কর্ডলেন স্পিকারের সামনে ঠোঁট নাড়ছে। তাই না নেত্রা?

—ঠিক তাই।

এরপর কসাক নাচ—কখনও কোমর ধরে হাত পা ছুঁড়ে. কখনও হাটু ভাজ করে লাফিয়ে লাফিয়ে, কখনও হাতে তালি বাজিয়ে তাল ঠুকে। সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের গান। সাজ পোশাক একদম কসাকদের মত। শরীরের গড়ন কিস্তুওদের সঙ্গে

মেলোনি। বুদ্ধবাজ কসাকরা আরও শক্তসামর্থ।

এরপর একটা ছোট্ট চিনা রোমান্টিক নাটক। মঙ্গোলিয়ান নাচ। কিমোনো পরা জাপানি কিবুকি নাটকের এক ঝলক্। আমেরিকান কমেডি, এক বুড়ির করুন প্রেমনিবেদন কেউই গ্রহণ করলো না। তখন সে গ্যালারিতে নেবে এক দর্শককে জড়িয়ে ধরলো। তার সঙ্গে হুরোহুরি করতে গিয়ে স্পঞ্জের দুধ দুটো খুলে পড়ে গেল। বুড়ি লজ্জা পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিল।

মনীষা বললো, দারুণ নকল করেছে। দুটো ঘন্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

বাইরে বেরিয়ে দেখি সব অভিনেতা অভিনেত্রিরা জোড় হাতে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই এক রকম লাল পোশাক, মেয়েদের ফ্রকের গলাটা অনেকটা নিরা-বরণ করেছে কুসুমিত যৌবনকে। দৃষ্টি কেড়ে নেবার মত চেহারা বটে এদের।

নেত্রা বললো, অতীশ অতটা তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকিয়ো না ওদের দিকে। ঠকে যাবে। দু একজন ছাড়া ওরা কেউই মেয়ে নয়। সবাই 'কাটাও' (অপারেশান) করে মেয়ে হয়েছে। বত্রিশ ইঞ্চি বুক বলছিলে না, ওটা সিলিকোনের মাপ। এখানকার সব মেয়েরাই ট্রান্সভেকটাইট, এমনকি স্ট্রিপটিজের মেয়েরাও।

মনোজ বললো, হা রাম অমৃত খুজতে গিয়ে যে গরল বের হলো।

ফেরবার পথে আমরা নেমে পড়লাম খাওয়ার জন্যে।

হঠাৎ মনীষা আমার হাত টেনে ধরলো, এই দ্যাখো, দ্যাখো, ভারতীয় রেস্তোরা। আজ চলো তন্দুরি খাওয়া যাক।

পাঞ্জাবির দোকান স্বামী স্ত্রী চালায়। চিকেন তন্দুরি, নান্, তরকা ভালই করেছিল। এখানকার চিকেন খুব চর্বি। বাজারে বিক্রি হয় সব আলাদা আলাদা করে। ঠ্যাঙের দাম সবচাইতে কম। চিকেনের মাংস এরা চালান দেয় জাপানে।

বারগুলোতে ভিড় কমে গেছে। হোস্টেসরাও নেই। তারা খইতে গেছে।

একটা গলির মুক্তাঙ্গনে তখন নাটক চলছিল। দর্শকরা রাস্তার উপরই বসে পড়েছে। বৌদ্ধ জাতকের একটা অংশ নাট্যায়িত হচ্ছে। এই নাটকের নাম 'খোন্'।

বেশ কাটলো সারাটা দিন আজ। কোন্ সাত সকালে উঠেছি। আর নয় এবার সবাই শুয়ে পড়, বলে মনীষাও আমাদের গুড নাইট বলে, নেত্রার পা হাত ধরে পাশের ঘরে চলে গেল।

বেড-টি এসে গেছে। চার জনে বসে চা খাচ্ছি। একদিকের কাঁচের দেওয়ালের পর্দাটা সরানো। পূব দিকের পাহাড়ের পেছনটা তখনও লাল। একটি থাই মেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে বাঁশের প্লেটার ওপর দিয়ে।

চায়ের কাপ রাখতে রাখতে মনোজ নেত্রার দিকে তাকালো, গাইড্ সাহেবা, আজ আমাদের কী দেখাচ্ছেন?

—বাঃ ভুলে গেলেন এর মধ্যেই। আজ কোরাল দ্বীপ আর ফ্লোট্।

মণীষা বললো, এত তাড়া ভালো লাগে না বাপু। আমরা আমেরিকায় থাকি বটে কিন্তু আমেরিকান নই। আমরা এখনও খাঁটি বাঙ্গালী, ধীরে সুস্থে গাড়িয়ে সাড়িয়ে চলতেই ভালবাসি।

মনোজ বললো, তা হলে কিছু দেখা বাদ দাও। বরং বসে গল্প করা যাক।

মণীষা বললো, না তাও হবে না। আমরা ডুডুও খাবো, তামাকও খাবো। অতীশ, নেত্রা অফিস কাট্ মারো সোমবার। আমরা তা হলে একটা দিন বেশী পাবো হাতে। অতীশ তো নিজেই বস্, কাট্ মারতে কোনও অসুবিধা নেই। নেত্রা, দ্যাখো তুমি ম্যানেজ করতে পারো কিনা?

—ঠিক আছে, বস্‌কে ফোন করে দেখবো। আমি অফিস না গেলেউনি বড্ড হেল্পলেস্ ফিল্ করেন।

মনোজ বললো, তোমার মত সেক্রেটারি থাকলে সবাই হেল্পলেস্ ফিল্ করবে।

—ঠিক আছে ডিডি, যদি আমি ছুটি না পাই, তবে আমি বাসে চলে যাবো, আজ সন্ধ্যায়। তোমরা কাল যেও গাড়িতে।

—তা হয় না। তোমায় ছেড়ে বোন, আমরা থাকছি না।

—এক কাজ করা যাক, সবাই আমরা রেডি হয়ে নি তারপর এক ঘণ্টা পর বসের বাড়ি ফোন করে দেখবো। যদি ছুটি পাই, তা হলে প্রোগ্রাম চেঞ্জ করবো, না হলে আগের প্রোগ্রামই থাকলো।

মনোজ হৈ হৈ করে নেত্রার হাত ঝাকুনি দিয়ে বললো, দ্যাটস্ গ্রেট। ঘরেই ব্রেক-ফাস্টের অর্ডার দিয়ে আমরা তৈরি হতে লেগে গেলাম।

নেত্রার বস্ জার্মান। তাকে ফোন করে ছুটি পেয়ে গেল। বস্ দুদিনের জন্য সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে।

আমিও আমার সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিলাম, সোমবার অফিস যাচ্ছি না।

নেত্রা কাউন্টারে ফোনে জানলো—বিউটি কনটেস্ট্ হবে গ্র্যাণ্ড প্যালেস হোটেলে, দশটা থেকে বারোটা। তারপর ওখান থেকে ফ্লোট বের হবে দেড়টায়। সাউথ পাত্তায়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে তিনটে বাজবে।

—তা হলে আমাদের আগের প্রোগ্রাম্ অনুসারে—চলো এখন কোরাল আইল্যাণ্ড দেখে, ওখানে খেয়ে ফ্লোট দেখবো। কাল দুপুরে 'নঙ্গনুচ্ ভিলেজে' যাবো।

—ওখানে আবার কি আছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—রোজ গার্ডেনের মত। ভিড়িদের তো সময় নেই রোজ গার্ডেনে যাবার। ওখানে গেলে থাই কৃষ্টি এক ঝলকে দেখে নিতে পারবে।

ওই প্রোগ্রাম অনুসারে আমরা সেই কালকের ঘিচে এসে দাঁড়ালাম। নেত্রা এক লঞ্চওয়ালার সাথে যাতায়াতের ভাড়া অনেক দরাদরি করে ঠিক করলো।

ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকো করে গিয়ে লঞ্চে উঠলাম। ডেকের ওপর বেঞ্চে আমারাই চারজন। তাড়াতাড়ির জন্য পুরো লঞ্চটাই ভাড়া করা হয়েছে। লঞ্চ ছাড়লো। ভেজা হাওয়া গায়ে লেগে বেশ শীত শীত করছে। টুরিস্টদের ভিড় এখনও আরম্ভ হয়নি। সমুদ্র শান্ত! আমরাও শান্ত হয়ে বসে আছি, যার যার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা নিয়ে।

ঈশান কোন থেকে একটা কালো মেঘ উঠে আসছে। টৌঙ্গুল তার ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দিল সারেঙ্গের ঘণ্টা শুনে। কালো মেঘটা ছড়িয়ে পড়ছে দমকা হাওয়ায়। শান্ত সমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠছে। লঞ্চের লোকগুলো অস্থির হয়ে আনাগোনা করছে। উথালি পাথালি ঢেউ-এর তালে তালে লঞ্চটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। জলের ছিটে গায়ে এসে লাগছে। ঝড়ের গতি আরও বাড়লো। সারেঙ্গ চীৎকার করে সবাইকে হুঁশিয়ার করছে। আমরা সেই আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েকজন নৌসেনা খালি গায় হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়েছিল রেলিং ধরে। ওরা বোধহয় কাল ছুটি পায়নি পাড়ে নামবার। একজনের হাতে ছিল বাইনোকুলার। মেয়েদের দেখে চীৎকার করে উঠলো, হাই ডার্লিং ডুবে যেয়ো না। এখানে চলে এসো। জোর বৃষ্টি নামলো। ঝড়ের বেগ আরও জোর, ঢেউ আরও উচু, লঞ্চটা ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ছে।

মণীষা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।···

—কী হবে অতীশ? আমাদের কী এখানে সলিল সমাধি হবে নাকি?

জলের ঝাপটায় আমাদের জামা কাপড় প্রায় ভিজে গেছে। মণীষা ভয়ে কাঁপছে। শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট দুর্গানাম। নেত্রা মনোজের হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। ওর মুখ নড়ছে, বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি।

আমি টৌঙ্গুলকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে ভয় আছে নাকি হে? লঞ্চ কখনও উল্টেছে এখানে? আগে জানলে আমরা আসতাম না।

—তা উল্টাবে না কেন? কখনো সখনো উল্টালে কী চড়তে নেই? রাস্তায় গাড়ি উল্টায় না? তা বলে কী আপনারা গাড়ি চড়েন না? তবে মরবেন না। আমরা চারজন আপনাদের ঠিক ভাসিয়ে রাখতে পারবো।

আমি যখন অনুবাদ করে ঐ কথাগুলো ওদের বললাম, তখন মনীষা বললো, দেখেছো কী রকম দার্শনিকের মত উত্তর দিল।'

একটা ঝাকুনি খেয়ে, ওরে বাবাগো গেলাম গো, বলে চীৎকার করে মণীষা ছিটকে পড়লো রেলিং এর ধারে। আমি চট্ করে ওর পাটা ধরে টেনে নিয়ে এলাম।

—বাব্বাঃ, একে দেখছি বেঘোরে প্রাণ যাবার যোগাড়। দ্যাখা আমার মাথায় থাকুক। দুর্গা, দুর্গা, গণেশ গণেশ।

যাই হোক দুর্গা ও বুদ্ধের কৃপায় মেঘ কেটে গেল, ঝড় কমে গেল, বৃষ্টি গেছে থেমে। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা প্রবাল দ্বীপে পৌঁছে গেলাম।

লঞ্চ নোঙর ফেলতেই ঘিরে ধরলো সব নৌকোর মাঝিরা। ওদের খোলা নৌকার তলাটা মোটা কাঁচের।

এরা নিয়ে যাবে কোরাল দেখাতে। নেত্রা একটা নৌকো ঠিক করলো। আমরা চারজন তাতে উঠে বসলাম। মিনিট পনেরো যাবার পর নৌকো থামলো। জলে দেখা যাচ্ছে নানান ঢং আর রঙের প্রবাল, যেন বাগানে মরসুমি ফুল ফুটে আছে, তবে ফুলের পাপড়িগুলো মাঝে মাঝে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

প্রবাল দ্বীপে কেন কবির বাসা বাঁধবার ইচ্ছে হয়েছিল, জানি না। এখানে কোনও লোকবসতি নেই। একটা বেলাভূমি আর ছোট্ট একটা পাহাড়। আছে কয়েকটা ঝুপড়ি, তাতে খাবারের দোকান।

নেত্রা বললো, কোরাল আইল্যাণ্ডকে আমরা থাই ভাষায় বলি, কোলার্ণ

চিংড়ি মাছ সেদ্ধ, মাছ ভাজা আর ভাত দিয়ে আমরা লাঞ্চ সেরে ফিরে এলাম সেই বিচে, কোনও অঘটন না ঘটিয়ে।

এই বিচের ধার দিয়েই যাবে ফুলপরীদের শোভাযাত্রা। লোক সমাগম আরম্ভ হয়ে গেছে।

আমরা চারটে ইজিচেয়ার ভাড়া করে একটু বসলাম।

মনীষা বললো, মনে থাকবে প্রাণ নিয়ে যে ফিরেছি সে নেহাৎই বাবা-মার ভাগ্যি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবা মার কেন ?

—না হলে বাবা মা এত বছর পরেও দেখতে পেতেন না। আমার না হলে মরতে কী, চারজনের হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে সমাধি হতো। অবশ্য সন্দেহ আছে। নেত্রা আর অতীশ যা ভালো সাঁতার জানে, ওরা ঠিক বেঁচে উঠতো। মরতাম আমরা দুজন।

মনোজ বললো, ভালই হতো, জীবনে তো তোমাকে পেলাম না, মরণে তোমাকে পেতাম। যাই হোক, কোরাল দেখলে কেমন ? খেলে কেমন ?'

—সেটা অবশ্য মন্দ নয়।

নেত্রা খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে শোভাযাত্রা সুরু হয়েছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়বে। রাস্তার ধারে ভিড় বাড়ছে। নেত্রার কথা মত চেয়ার ছেড়ে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তাকিয়ে আছি উৎসুক হয়ে। ইংরেজি ব্যাণ্ডের আওয়াজ কানে আসছে। ঠেলাঠেলি বেড়ে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে, 'ম্যা ল্যাও ম্যা ল্যাও।'—অর্থাৎ আসছে, আসছে।

হঠাৎ কানে এলো, থ্যাঙ্ক ইউ, বাট আই এ্যাম্ নট্ এ বোব।

ভারি গলায় তার উত্তর, দেন ইউ আর এ ডার্লিং। লাইক টু হ্যাভ এ ডেট্ ? গিভ ইউ হাণ্ড্রেড্ ডলার। বি এ স্পোর্ট।

আমি ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। নেত্রার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। ও চীৎকার করে বললো, ফের যদি মুখ খোলো তবে চাপকে মুখের ছাল তুলে দেবো।

আমেরিকানটার হাত ধরে একটা ঝাকুনি দিলাম, কী হচ্ছে ? সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছ নাকি তোমরা ? এ দেশের সব মেয়েদেরই কী তোমরা ভাবো ডলার দিয়ে কেনা যায় ?

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন। ওঁর ইংরেজি শুনেই আমার বোঝা উচিত ছিল।

নেত্রাকে আমার পাশে টেনে নিলাম। সাহেবটা লজ্জায় ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

ওরা সব এসে পড়েছে। প্রথমে ব্যান্ড পার্টি। তার পেছনে ফুল পাতা দিয়ে সব সাজানো গাড়ি—কোনওটা রাজহাঁসের মত, কোনওটা একটা ওয়াট, কোনওটা একটা নৌকো। ওর ওপরে সব সুন্দরীরা, যারা প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। তার পেছনের সারিতে মেয়েরা নাচছে, নৌকো থেকে জেলেরা মাছ ধরছে। মেয়েগুলো দেখতেও যেমন সুন্দরী, সেজেছেও তেমনি।

প্রতিযোগিনীরা পরেছে আধুনিক ডিজাইনের ফ্রক বাকি সবাই পরেছে থাই পোশাক, মাথায় মুকুট গলায় ফুলের মালা।

মনোজ কয়েকটা ছবি তুলে, দেখেছ মণীষা, টুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্যে কী রকম বন্দোবস্ত ?

—সত্যি দেখবার মত।

অনেক বিদেশি টুরিস্টরা সব ভি. ডি. ও ক্যামেরায় চলচ্চিত্র তুলছে।

মনোজ বললো, দেখেছিস অতীশ, এত যে লোক জমায়েত হয়েছে কোথাও কিন্তু কোন বিশৃঙ্খলা নেই। কেউ দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে না, কেউ সিটি মারছে না বা কোনও অশ্লীল কথা ছুড়ে দিচ্ছে না।

নেত্রাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সবের খরচা দেয় কে ?

—এই শহরের কাউন্সিল আর টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট। এখানে বছরে প্রায় দশ পনেরো লাখ বিদেশি টুরিস্ট আসে, তাছাড়া তো দেশের লোক আছেই। এরা এখানে এসে কম টাকা তো খরচ করে না। তাতে কাউন্সিলের উপায় হয় অনেক, সেলস ট্যাক্সের মাধ্যমে।

—জিজ্ঞেস করলাম, বিউটি কনটেস্টের সবাই কী পাত্তায়ারই মেয়ে ?

—না, না এতো সুন্দরী এখানে কোথা থেকে আসবে ? এরা সব সারা থাইল্যান্ড থেকে এসেছে।

মনীষা বললো, নেত্রা, তুমি নামোনি কেন কোনও দিন ?

—আমার বাবা পছন্দ করেন না।

শোভাযাত্রা পার হয়ে গেছে। আমরাও হোটেলে ফিরে এলাম।

—বড় ঠাসা প্রোগ্রাম বাপু। আমি ক্লান্ত, বলে, মনীষা বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

—না হেটেই এত ক্লান্ত হলে কী করে মনীষা ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—এতক্ষণ যে দাঁড়ালাম, তাতে বুঝি কিছু হয় না ?

—আমি ঠাট্টা করে বললাম, ম্যাসাজ করাবে ? হোটেলে ম্যাসাজের লোক আছে।

—মেয়ে হলে আমার আপত্তি নেই। একটা কনডিশান, তোমরা ম্যাসাজ করতে পারবে না।

মনোজ বললো, এক যাত্রায় আবার পৃথক ফল হয় নাকি ?

—ও চলবে না। রাজি থাকো তো ডাকো।

—ঠিক আছে, আমরা রাজি। ফোন তুলে কার্ডে নম্বর দেখে ডাকলাম, পাশের ঘরে গিয়ে। আগেই বলেছিলাম যে একজন মেয়ের ম্যাসাজ করতে হবে। প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে বললো, আমাদের ছেলে ম্যাসুয়ারও আছে। আমি বললাম, তার দরকার নেই। কিছুক্ষণ ভেবে বললো, ঠিক আছে, দুশো বাট লাগবে শুধু ম্যাসাজ করতে। শুধুর ওপর বেশ জোর দিয়ে বললো।

কিছুক্ষণ পরেই মনীষার ঘরে দরজায় টোকা পড়লো। ও গিয়ে দরজাটা খুলে মাঝের দরজাটায় হাত রেখে মনীষা বললো, কী গো তোমরাও করাবে নাকি ? মেয়েটি কিন্তু ভালই দেখতে, বলে দরজাটা বন্ধ করে দিল নেত্রাকে ডেকে নিয়ে।

আমরা দুজন ততক্ষণে স্নান করে নিলাম। এক ঘন্টা পরে মেয়েটিকে বিদায় করে মনীষা বললো, ভালই লাগছে। তোমরাও করালে পারতে। ও জিজ্ঞেস করছিল। মেয়েটার পরিচ্ছন্ন বেশবাস, পরিষ্কার চেহারা, বেশ হেসে হেসেই কথা বলছিল। ভালো ম্যাসাজ করে।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বুঝলে কী করে ওর কথা ?

—কেন, নেত্রা তো ছিল আমার সঙ্গে। ও এখানে কাজ করে। যা পায় তা থেকে বাঁচিয়ে টাকা পাঠালে তবে ওর বুড়ো মা দু মুঠো খেতে পায়। শুধু ম্যাসাজে ওদের কিছুই পয়সা থাকে না। অন্যভাবে উপায় করতে হয়। আর একটু বয়েস বাড়লে এ সব রোজগারও বন্ধ হয়ে যাবে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। আমি ওকে আরও একশো বাট বকশিস দিলাম। খুশি হয়ে নমস্কার করে চলে গেল।

এর মধ্যে চা আর পেস্ট্রি এসে গেছে।

মনোজ চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির আওয়াজ তুলে, আর একটা দিনও শেষ হয়ে গেল। সুন্দর দিনগুলো বড্ড তাড়াতাড়ি চলে যায়। নেত্রা, তুমি আসাতে আমরা যেমন সব জিনিস ভালো করে দেখতে পেলাম, তেমনি আমার সময়টাও ভালো কাটলো, বলে আড়চোখে মণীষার দিকে তাকালো।

—আমি না থাকলে কী হতো, আপনারা তিনজনই তো অনেক দিনের বন্ধু।

মনোজ বললো, ওদের দুজনের মনের কোঠায় অনেকদিনের অদেখার আর অজানার জঞ্জাল জমে ছিল। সেগুলো সাফ করতে হলে ওদের ছেড়ে আমাকে একা বসে বসে ঢেউ গুণতে হতো। তুমি থাকাতে সেই কষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছি।

আমি বললাম, আমরা এখন জঞ্জাল-মুক্ত, কোথাও আর ভুল বোঝাবুঝি নেই। তাই না মণীষা ?

মনীষা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

—অতীশ তুই আমাকে বাঁচালি। মেয়েটা যখন মারা গেল তখন আমার শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে গিয়েছিল। ওর হাসি ভরা মুখের বাবা ডাকটা যখন আর শুনতে

পাচ্ছিলাম না তখন আমার বুকটা জ্বলে যেতো। ওর কথা আটকে গেল। চোখের কোণে দুফোঁটা জল।

নেত্রার কথায় সবাই আবার একটু নড়েচড়ে বসলো। ডিডি, আপনার কী হয়েছিল তা আমি ঠিক বুঝতে না পারলেও একটা সাংঘাতিক আঘাত যে পেয়েছেন, তা বুঝতে পারছি। ইংরেজিতে বললে অবশ্য সবটাই বুঝতে পারতাম। মনোজের ঘাড়ে হাত দিয়ে বললো, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভাবলে শুধুই মন খারাপ। নতুন করে জীবনটাকে আরম্ভ করুন। আমিও তাই করেছি। চলো ডিডি আমরা স্নান করেনি। তারপর আবার বেরোনো যাবে।

ওরা চলে গেলে আমি মনোজকে সব কথা বললাম। বললাম, মণীষা ওর কাছেই ফিরে যাবে। আমি ওর বন্ধু হয়েই থাকলো। তুই আমাদের জন্যে যা করেছিস তা, ভুলে যাবার মত অমানুষ নই, মনোজ। তোর নিখাদ, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মূল্য ও বুঝেছে। তোরা সুখী হ এই প্রার্থনাই করি।

মনোজ আমার হাতটা ধরে চুপ করে কিছুক্ষণ থেকে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি তোর কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। এইবার তুইও সংসারি হ।

আমরা সেই বিচ রোডে হাটছি। পথে একই রকম লোকের ভিড়, বিদেশিরা থাই মেয়েদের নিয়ে পথ চলছে, কিন্তু অশ্লীলতা নেই কোথাও। খোলা বারে হোস্টেসরা পাশে বসে আছে কোকের গ্লাস নিয়ে, আর গ্রাহকরা বিয়ারের মগ হাতে, কিন্তু কোনও অসভ্যতা চোখে পড়েনা। এরা অনায়াসলভ্য বলেই বোধহয় পথেঘাটে চুরি করার কারও প্রয়োজনীয়তা হয় না।

এর মধ্যে একটা থাই ছেলে ফিসফিস করে বললো, শোন শোন একটা জিনিস নেবে? খুব দামি জিনিস সস্তায় দেবো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী জিনিস?

আমাকে একটা গলির মধ্যে নিয়ে গেল। নেত্রা আমাকে যেতে দেখে পেছনে পেছনে চলে এসেছে।

মনীষা ভয় পেয়ে গেছে। মনোজ চুপ করে দেখছে। নেত্রা চেচামেচি আরম্ভ করে দিয়েছে লোকটার সঙ্গে, তুমি ওকে এখানে ডেকে এনেছ কেন? তোমার কিছু বিক্রি করার থাকলে ওখানেই তো দেখাতে পারতে।

লোকটা বললো, এত ভালো জিনিস ওখানে দেখালে কেউ কেড়ে নিত। পাত্যায়া জায়গাটাতো ভালো নয়। তুমি পাত্যায়ার মেয়ে হয়ে জানো না?

—কে বলেছে, আমি পাত্যায়ার মেয়ে? আমি ব্যাংককের মেয়ে।

—ওখান থেকে এই ফারাঙ্গের সাথে এসেছ?

—আমি জানো কে? জেনারেলের মেয়ে। ফারাঙ্গ আমার বন্ধু। দেখি, তোমার জিনিস কী আছে?

ও খুব সন্তর্পনে পকেট থেকে বের করলো একটা লাল পাথর। পাথরটা রাফ। ধারগুলো কাটা নেই।

নেত্রা উল্টে পাল্টে দেখে বললো, এটা যে রুবি কী করে বুঝবো ?

—আমি নিজে খুঁড়ে বের করেছি, কাম্পুচিয়ার সীমায় একটা পাহাড় থেকে। একমাস খুঁড়ে এই একটাই পেয়েছি।

—চল, তা হলে ঐ গয়নার দোকানে। ওদের দিয়ে যাচাই করাবো।

—তা হলে বেচবো না।

আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললাম, ঠিক আছে দাম কত বল ?

—পাঁচ হাজার বাট।

নেত্রা বললো, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। দ্যাখো, আমার কানের দুল দুটোর দাম হলো ৫ হাজার বাট আর না কাটা পাথরটার দাম চাইছো পাঁচ হাজার। এক হাজার বাট হলে দিতে পারো।

লোকটা নেত্রার দিকে কটমট করে তাকিয়ে কী একটা বলে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

—তুমি এখানে অজানা লোকের সঙ্গে এ রকম কখনও আসবে না। জানো এখানে কী রকম ঠক্ জোচ্চর আছে ? ভাঙানি নেই বলে ট্যাক্সিওয়ালাকে বেশী বাটের নোট দিলে তা নিয়ে ভাগবে। ওটা রুবি কিনা সন্দেহ আছে। হলে তো ও দোকানেই বিক্রি করতো। এটা ঠিক, যে ক্যাম্পুচিয়ার বর্ডারে রুবি আর স্যাফায়ার পাওয়া যায়, অল্প একটু মাটির নীচে। তুমিও গিয়ে তার খোজ করতে পারো।

মনীষা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ? নেত্রার কাছে শুনে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, নেত্রা ছিল তাই ঠকের হাত থেকে বেঁচে গেল। অতীশের এই স্বভাবটা গেল না। কলেজে পড়বার সময়ও এই রকমই করতো।

সি ফুড্ বাজারে ঢুকে নেত্রা বললো, ডিডি, তুমি কাল এখানে খেতে চেয়েছিলে তো ?

—তা তো চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি বাপু বেড়াতে এসে রাঁধতে টানতে পারবো না। সবাই বুঝি ইচ্ছে মত রেঁধে নেয় জিনিস কিনে। এ রকম রেস্তোরা তো আমি কোথাও দেখিনি বাপের জন্মে।

নেত্রা হেসে বললো, তোমাকে কষ্ট করে বাঁধতে হবে না। যা খেতে চাও তা আগে পছন্দ করে কেন তো, তারপর দেখবে আলাদীন হাজির।

কাঁচের আলমারিতে বরফ দিয়ে রাখা আছে নানান রকম সামুদ্রিক মাছ। তার মধ্যে আছে বড় বড় গলদা চিংড়ি, পমফ্রেট, সার্ডিন, স্যাড্, স্কুইডস, অয়েস্টার, কাঁকড়া, অক্টোপাস্ আর শব্জির মধ্যে ফুলকপি, গাজর, একরকম শাক প্রভৃতি।

মনোজ এক চক্কর মেরে বললো, দারুণ তাজা সব জিনিস। এত ফ্রেস্ গলদা চিংড়ি তো ওখানে দেখাই যায় না। ওটা তো নিতেই হবে। পমফ্রেট মাছও ওখানে পাই না। সেটাও চাই। কাঁকড়া অনেক দিন খাইনি। কাঁকড়াও নাও। তরকারি নিয়ে কী হবে ? এবার নেত্রা ঠিক কর এই তিনটে দিয়ে কী উপাদেয় থাই খাবার তৈরি করা যায়।

আমি আর নেত্রা মিলে ঠিক করলাম, কাঁকড়া দিয়ে সুপ, চিংড়ি দিয়ে ঝোল আর পমফ্রেট ভাজা তার সঙ্গে থাউ ভাত কাইসাই (মুরগির মাংসের টুকরো দিয়ে মিক্সড্ ফ্রায়েড্ রাইস)। পরিমাপ মত সব জিনিস ওজন দরে কিনে, স্টুয়ার্ডকে সব বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

আমরা খাবার জায়গায় গিয়ে বসলাম। খাবার ঘরটা সমুদ্রের জলের ওপর খুঁটি পুতে তৈরি—তিনদিক খোলা, শুধু রেইলিং দেওয়া আছে। অনেকটা জাহাজের ডেকের মত। ঢেউএর আওয়াজ জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। নোনা হাওয়ায় শীত শীত করছে। মোটর বোটের আলোগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন ভাসানো প্রদীপ।

সবার পছন্দমত ড্রিঙ্কের গ্লাস হাতে হাতে।

মনীষা তন্ময় হয়ে অনেকক্ষণ দেখে বললো, ওদেশে লেকের ওপর ভাসমান রেঁস্তোরায় খেয়েছি কিন্তু সেগুলো সব বড্ড বেশী পরিষ্কার আর কৃত্রিম। এটায় বেশ পরিচ্ছন্নতা আছে অথচ কৃত্রিমতা নেই, বেশ এশিয়াটিক গন্ধ আছে।

দু রাউন্ড ড্রিঙ্ক হতে হতেই খাবার এসে গেল।

সুপে মুখ দিয়ে সবাই হুঃ,হাঃ আরম্ভ করে দিল। বাব্বাঃ, এ যে বুক অবধি জ্বলে যাচ্ছে।

মনোজ বললো, জিভে কিন্তু জল গড়াচ্ছে। আমার তো খুব ভালো লাগছে অনেকদিন পর ঝাল খেয়ে। চাটিগাঁর ছেলে, আমার অভ্যেস আছে। অবশ্য আছে বললে ভুল বলা হবে, মানে ছিল।'

প্লেট জোড়া চিংড়িমাছ পা মাথা সমেত।

মনীষা ঝোল মুখে দিয়ে বললো, এটা খুব উপাদেয় হয়েছে, একেবারে আমাদের মালাই কারি। এবার কিন্তু আমি হাত লাগাবো। না হলে চিংড়ি মাছের চোকলা ছাড়াবো কী করে?

মনোজ বললো, দারুণ খাওয়া হলো। থ্যাঙ্ক ইউ নেত্রা। অনেকদিন পর অনেকে মিলে এমনি একটা পরিবেশে আনন্দ করে খাওয়া গেল।

আমরা শুয়ে পড়ার আগে নেত্রা প্রোগ্রাম জানিয়ে দিল—দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত আমরা শো দেখতে যাবো নঙ্গনুচ ভিলেজে। সেখান থেকেই রওনা হওয়া যাবে ব্যাংককে। সকালের কোনও প্রোগ্রাম ঠিক করিনি।

মনীষা বললো, তা হলে সকালে আমরা সমুদ্রে স্নান করে এখানেই কোথাও খেয়ে যাবো নেত্রার প্রোগ্রাম দেখতে।

সবাই দেরীতে উঠেছে। আজ কারও তাড়া নেই। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোতে বেরোতেই বেজে গেল প্রায় দশটা। বিচ রোডের ওপারে হোটেলের সুন্দর বসবার জায়গা আছে। আছে একটা লিলিপুলে আর কয়েকটা সাওয়ার লাগানো বাথরুম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেই এক ফালি বেলাভূমি তারপরই শ্যাম উপসাগরের নীল জল। এখানে বিচে সাধারণ লোকের ভিড় নেই, নেই কোনও লঞ্চ, ওয়াটার স্কুটার বা মোটর বোট হোটেলের নিজস্ব বিচ বললেই চলে। সমুদ্র এখানে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে পাহাড় ঘেঁসে। আর একটু এগিয়ে গেলেই বেলাভূমির শেষ। মাঝ দরিয়ায় আজ আর সেই যুদ্ধ জাহাজটা নেই। পাতায়ার হোটেলওয়ালা, দোকানদার, বারের মেয়েগুলো সবাই চোখের উপর হাত দিয়ে তাকিয়ে থাকবে কখন আর একটা জাহাজ এসে নোঙর ফেলবে।

নেত্রা আর মনোজ সাঁতরে অনেক দূর চলে গেছে। ওরা ভেসে উঠছে একবার ঢেউএর ওপর আবার পর মুহূর্তেই তলিয়ে যাচ্ছে।

মনীষা আমার হাত ধরে ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে কোমর জলে দাঁড়িয়ে। হাত একটু টেনে এগিয়ে নিলেই গলা ধরে ঝুলে পড়ে চীৎকার করছে। ওর ভিজে শরীরটা আমার শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিলেই কিছুটা নোনা জল গিলে আবার আমাকে আরও জোরে জাপটে ধরছে। সেই অবস্থায় ওর মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে আমার মুখের ওপর টেনে নিলাম।

মনীষা খিলখিল করে হেসে বললো, শুধুই যে নোনা জলের স্বাদ আর সমুদ্র জলের শীতলতা?

—এই, ওরা কোথায় গেল? দেখা যাচ্ছে না তো?

অনেকক্ষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে চারিদিকে তাকিয়েও ওদের দেখতে পেলাম না।

মনীষা ভয় পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

—এই অতীশ, কী হবে? ওদের তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।

আমিও খুব চিন্তিত হয়ে মণীষার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে ওদের খুঁজতে লাগলাম। যত সময় বাড়ছে, চিন্তাও তত বাড়ছে। হোটেলের একজন লাইফ সেভারকে দেখে ওকেও গিয়ে বললাম। কিছু না দেখতে পেলে ঐ বেচারিই বা কী করবে?

মনীষা চিন্তার ভারে বসে পড়েছে বালিতে। আমিও প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছি। এমন সময় একটা মোটর বোট জল বাতাস কাঁপিয়ে এসে দাঁড়ালো পাড়ে। তার ছাউনি থেকে দুই মূর্তিমান হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো।

আমাদের বকুনি শেষ হলে মনোজ বললো, ঐ খালি বোটটা আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমারা ওটায় উঠে একটু চক্কর মেরে এলাম। আমরা তো তোদের হাত নেড়ে দেখিয়েছিলাম। তোরা দেখতে পাসনি তো কী করা যাবে। তখন তোরা জড়াজড়ি করে জলে দাঁড়িয়েছিলি।

ওপরের স্নানের ঘরে স্নান করে, হোটেলেই তাড়াতাড়ি খেয়ে, জিনিসপত্র গুছিয়ে আমরা রওনা হলাম নঙ্গনুচ ভিলেজের পথে।

আমরা চলেছি সাউথ পাত্তায়া রোড দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁসে। অনেকটা নীচে সমুদ্র। পাহাড়ের উপর সব বাংলো বাড়ি, দুই একটা হোটেল। সামনেই একটা দ্বীপ, তাতে লোকবসতি নেই। বাঁ দিকে বাঁক নিতেই লাল মুরামের গ্রাম্য পথ। দুদিকে ক্ষেত, খামার, ফল বাগানের মাঝে ছোট ছোট বাড়ি। এগুলো মাচার উপর উঠানো নয়। আধঘণ্টা সেই পথে যাবার পর পৌঁছলাম সেই নঙ্গনুচ।

এটা একটা বানানো গ্রাম। কাটা বিল একেবেঁকে বনানীর মাঝে হারিয়ে গেছে। জলে ভাসছে কয়েকটা দ্বীপ, নানান রঙের ছোট বড় হাঁস আর জলজ ফুল। ঢেউ খেলানো সবুজ মাঠে নানান রঙের ফুল। মাঝে মাঝে খড়ের ঘর, অতিথি আবাসনের জন্যে।

একটা বড় হলের সামনে অনেক টুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে গাড়ি থামলো। নেত্রা হল থেকে টিকিট কেটে আনলো। ঐ হলেই রেস্তোঁরা রয়েছে।

তারপর আমরা অডিটোরিয়ামে যাবার পথে গ্রাম্যশিল্পীদের নানান রকম হাতের জি তৈরি করতে দেখলাম। অডিটোরিয়াম ও প্রোগ্রাম সেই রোজ গার্ডেনেরই ছিত.. সংস্করণ। বোধহয় একই কোম্পানির তৈরি।

হাতির ব্যাপারে এখানে দেখানো হয়, কী করে বন্য হাতি ধরা হয়; পোষা হাতি দিয়ে, কী করে পোষ মানানো হয়। হাতির ফুটবল খেলা। যেটা সবচাইতে মজার, সেটা হচ্ছে বুকের উপর হাত নেওয়া। মাহুত একজন সাহেবকে দর্শকদের মধ্যে থেকে ডেকে নিল। তাকে একটা কার্পেটের উপর শুইয়ে তার বুকের উপর একটা কাঠের তক্তা পেতে দিল। একটা হাতি এসে দাঁড়ালো সেই লোকটার পাশে। ভদ্রলোকের স্ত্রী তো চীৎকার করতে আরম্ভ করছেন, বব্ কাম্ আউট। তোমাকে পিষে ফেলবে। বব্ শত হলেও সাহেবের বাচ্চা তো, তার একটা আত্মসম্মান আছে। সে উঠে এলো না, কিন্তু ভয়ে চোখ বুজে রইলো। হাতিটা প্রথমে তার শুঁড়টা দিয়ে সবাইকে সেলাম করলো, তারপর সাহেবের মুখে একটা চুমু খেলো। কানে কানে যেন বললো, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারবো না। তারপর খুব সন্তর্পণে তক্তার এপারে আর ওপারে পা দিয়ে পার হয়ে গেল।

এরপর বানর দিয়ে এরা কী করে নারকেল পাড়ে তা দেখালো।

মনীষা বললো, খুব ভালো লাগলো। দু ঘণ্টার প্রোগ্রামে মোটামুটি থাইল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেল।

এবার ফেরার পালা। নেত্রা আর আমি দুইজন মিলে চালিয়ে বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন রাত আটটা হয়েছে।

মনীষা নেত্রাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। মনোজেরও খুব ইচ্ছে যে আজ রাতটা ও থেকে যায়। কাল তো ওরা চলে যাবে।

নেত্রা ভাসনাকে ফোন করে জানলো যে ওর বাবা রোববার ওর খোঁজ করেছিল। পাত্তায়ায় কার সাথে গেছে, কেন গেছে নানান প্রশ্ন করেছে। ভীষণ নাকি চটে গেছে।

নেত্রা ওর বাবাকে ফোন করে অনেক বুঝিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করালো।

আমরা খেয়ে আবার আড্ডায় বসলাম। মনীষার এখন মনোজের ওপর টানটা স্বাভাবিক হয়েছে।

মনোজ বললো, অতীশ, কাল ওর জন্যে এক জোড়া ভাল জুতো আর গোটা কয়েক জামা কিনে দিস তো। ঘর সাজাবার জন্য কিছু মূর্তি আর পুতুলও কিনবো। এ দুটো দিন খুব আনন্দ করা গেল। শান্তিনিকেতনে আমরা তিনজন যে একবার গিয়েছিলাম পৌষমেলায়, সেই দিনগুলোর কথা আমার বার বার মনে পড়ছিল।

আমি বললাম, নেত্রা থাকাতে তোর একটু সঙ্গ বদল হলো।

—বদল কিছু হয়নি। কিছুই ছিল না, বদলাবো আর কী?

এরপর ওরা চেপে ধরে নেত্রার কলেজ জীবনের প্রেমের কাহিনী শুনলো। নেত্রা শুনলো মনীষার কাহিনী।

নেত্রা শেষে একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ডিডি এবার তুমি কী করবে ?

হেসে মনীষা জবাব দিল, কী আর করবো ? তোমার হাতে অতীশকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবো। তুমি ওকে দেখবে তো ?

—দেখবো ডিডি।

পরের দিন বাড়ি থেকে জামা কাপড় বদলে নেত্রা আবার চলে এসেছে। ওর কন্ এখনও ফেরেনি। আমি অফিসে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওদের রাজপ্রাসাদ এমারেল্ড বুদ্ধ, শায়িত বুদ্ধের মন্দির দেখিয়ে বাজার করতে নিয়ে যাবে নেত্রা। আমি দুপুরে খেতে গিয়ে আর অফিসে যাইনি। ওরা এক গাদা জিনিস কিনে ফিরলো যখন, তখন তিনটে বেজে গেছে।

মনোজ্ঞ সব জিনিস দেখাতে দেখাতে বললো, কি দারুণ তোদের এখানকার ডিপার্ট-মেণ্টাল স্টোরগুলো।

—কোন্ কোন্ ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে গিয়েছিলি ?

—রবিনসন্ আর সেণ্ট্রাল। চার পাঁচতলা স্টোরগুলো আমেরিকার স্টোরগুলোর চাইতে অনেক সুন্দর ভাবে সাজানো। যে কোনও বিভাগের সামনে দাঁড়ালেই ম্যানিকুইন জিজ্ঞেস করছে, মে আই হেল্প ইউ, স্যার।

আমেরিকার ম্যানিকুইনগুলো অচল। প্রত্যেক তলায় ক্যাস কাউণ্টারও নেই ওখানে। কিন্তু একটা কথা, বের হবার মুখে তো চেক্ করে না, তা হলে চুরি হবার সম্ভাবনা তো থাকতে পারে ?

—কেন, প্রত্যেক বিভাগের সেলস্ গার্লরাই তো জিনিস বের করে দেখাচ্ছে, তারাই রসিদ চুকিয়ে তোমার হাতে প্যাকেট তুলে দিচ্ছে। তা হলে আর চুরি হবার সম্ভাবনা কোথায় ? সব চাইতে ভাল লাগল, যে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর, অথচ পার্সোনেলাইজড, সার্ভিস। এরকম কতগুলো ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর আছে রে ?

—সেণ্ট্রালের ব্রাঞ্চ আছে চারটে, রবিনসনের দুটো আর আছে সোগো-জাপানি।

—এই নে অতীশ, মনীষা তোর জন্যে এই টাই আর সার্টটা কিনেছে। নেত্রা, এই সিল্কের ফ্রকটা তোমার।

—আমি ভেবেছিলাম, এটা ডিডির। তুমি তো ভারি দুষ্টু। মাপ নিলে ডিডির, পছন্দ করালে ওকে দিয়ে আর দিলে আমাকে। দাঁড়াও পরে দেখাই তোমাদের। পরে এসে বললো, দেখছো অতীশ, কী দারুন মানিয়েছে আমাকে। মনোজের গালে গাল ছুঁইয়ে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ ডাডা।

মনীষা এবার সব গোছাতে লেগে গেল। খাওয়া ওরা সেরেই এসেছিল সেণ্ট্রালে। প্লেন ওদের রাত দশটায়। বাড়ি থেকে বের হতে হবে সাতটায়। নেত্রা মণীষাকে সাহায্য করছিল। ওরা মেঝেতে বসে গোছাচ্ছিল আর আমরা দুই বন্ধু খাটে বসে দেখছিলাম।

বিদেশি মেয়ে নেত্রা যে কী করে দুদিনের মধ্যে এত ঘনিষ্ট হয়ে গেল তাই আশ্চর্য

হয়ে ভাবছিলাম। আমরা দেশ দেশ করি, কিন্তু মানুষে মানুষে কি কোনও তফাৎ আছে? প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ তো দেশ বিচার করে হয় না। মনীষা কী রকম দুদিনেই নেত্রার ডিডি হয়ে গেল।

—ডিডি, তুমি আজ চলে যাচ্ছো, আমার মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে। আবার করে দেখা হবে, কে জানে? তুমি সামনের বছর আবার আসবে। সেবার অনেকদিন থাকতে হবে কিন্তু।

—ঠিক আছে, তোর বিয়েতে আসবো। ডাকবি তো?

—নিশ্চয়।

—যাবার সময় পিয়ালীকে মনীষা একশো ডলার দিল। পিয়ালী দারুণ খুশি।

বিদায় মুহূর্ত বড়ই বিষাদময়। সবাইর চোখই ভেজা। মনীষা আমার বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়েছিল। আমার জামা ভিজে গেছে ওর চোখের জলে।

ওর মুখটা তুলে বললাম, কেঁদো না মণি। তুমি সুখী হও, এই প্রার্থনা করি। এবার গিয়ে মন দিয়ে সংসার করো।

—তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, অতু।

—মনোজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। বিদায়। আবার দেখা হবে।

নেত্রা ওর ডিডিকে বিদায় চুম্বন দিল।

মনোজ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, ভালো থাকিস। চিঠি লিখিস। থ্যাঙ্ক ইউ ফর অল দ্যাট্ ইউ ডিড্। চলি

ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। নেত্রা আর আমি হাত ধরে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওরা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আমি নেত্রাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে শূন্য ঘরে ফিরে এলাম। নিঃসঙ্গতা যেন গলা টিপে ধরছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ভবিতব্য জীবনের একটা অধ্যায় শেষে যবনিকা টেনে দিল। দুটো ক্যাম্পোস্ খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

আজ সকালে ক্লাবে গল্ফ ম্যাচ ছিল মিক্সড্ টু বল্ বেটার বল, স্টেবল্‌ফোর্ড। আমার পার্টনার ছিল নেত্রা, উর্মির ছিল ভাসনা। এই খেলাতে প্রতি হোলে দুই পার্টনারের মধ্যে যে সবচাইতে কম মারে গর্তে বল ফেলতে পারবে তার স্ট্রোক নিয়ে পয়েন্ট যোগ করা হবে। যে জোড়ার সবচাইতে বেশী পয়েন্ট হবে সে জিতবে। তিরিশটা টিম্ (জোড়া) নাম দিয়েছিল। শেষ হোলে যখন আমাদের অনেক পয়েন্ট হলো, তখন নেত্রা খুশির চোটে পরিবেশ ভুলে সবার সামনেই আমায় জড়িয়ে ধরেছিল গালে গাল লাগিয়ে। সবার খেলা শেষ হলে জানতে পারলাম, আমরাই জিতেছি। অনেকেই এসে অভিনন্দন করে গেল।

আমরা কফি খেয়ে সুইমিং পুলে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে, জিনে গলা ভিজিয়ে ক্লাবেই লাঞ্চ সেরে নিলাম। ও দারুণ খুশি যে আমি ভালো খেলেছি। অবশ্য ও খেলেছে আরও ভালো।

ওকে বাড়িতে নামিয়ে, আমি খুশির আমেজে একটা লম্বা ঘুম দিয়েছি। পিয়ালীর ডাকে যখন উঠলাম, তখন ঘড়িতে পাঁচটা।

চা খেয়ে শুয়ে শুয়েই সৈয়দ মুজতবার এক খণ্ড বই পড়ছিলাম। পিয়ালী জামা-কাপড় ইস্ত্রি করছে। ঠুক ঠাক্ শব্দ হচ্ছে। শোয়ার ঘরের দরজাটা বন্ধ। এ. সিটা নিঃশব্দে ছত্রিশ ডিগ্রির ঘেমো গরম কুড়ি ডিগ্রিতে নামিয়ে হিমেল হাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। রাস্তার ধারের ঝাউ গাছটা গরমে নিথর হয়ে হাফাচ্ছে।

দরজায় একটা ঠুক্ ঠুক্ শব্দ। দরজাটা খুলে পিয়ালী বললো, মাস্টার কারা এসেছে।

আমি উঠতে উঠতেই শুনতে পেলাম মেয়েলি গলায়, অতীশ আছো নাকি? আসতে পারি কী? অন্য কেউ নেই তো?

বেরিয়ে এসে দেখি অশোকদা আর সুমিতা বৌদি। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি, আরে আসুন, আসুন। আমার কি সৌভাগ্য। আপনাদের দুজনার এক সঙ্গে দেখা নেহাৎই সৌভাগ্যের ব্যাপার। বসুন, বসুন।

সুমিতা বৌদি বললেন, খুব একটা সারপ্রাইজ দিলাম তো? ভাবলাম সারপ্রাইজ দিয়ে একটা গুজবের খোরাক পাবো।

—সে গুড়ে বালি। একা ঘরে আর কাকে পাবেন?

বৌদি মিচকি হেসে দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার দাদা তো প্রায়ই বলেন, এদেশে নাকি একা থাকাই শ্রেয়। ওঁর তো মহা দুঃখ যে আমি ওঁর সঙ্গে আছি।

—ওটা আপনাকে রাগাবার জন্যে বলেন। একা থাকার যে কী কষ্ট তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি।

পাইপটা দুই ঠোঁটের মাঝে চেপে একটা গঁফো হাসি দিয়ে বললেন, তুমি নেহাৎ বাঙ্গাল, বাঙ্গালই রয়ে গেলে। শনিবার বিকেলে তোমাকে একা পাবো কখনও ভাবিনি।

ভেবেছিলাম তোমার সেই গল্পের সঙ্গিনীকে অন্তত আজ দেখতে পাবো। আমি খবর পেয়ে গেছি যে তোমরা আজ ম্যাচ জিতেছো। কন্‌গ্রাচুলেশান্‌।

বৌদি খুব কৌতূহল নিয়ে বললেন, তোমার দাদা তো ওর সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলা ভাষায় যত প্রযোজ্য বিশেষণ আছে তার ব্যবহার করার পর কোট্‌ করলেন উর্বশী থেকে, বিদ্যাপতি থেকে, চণ্ডিদাস থেকে। তাকে দেখার খুব ইচ্ছে। একদিন নিয়ে এসো না আমাদের বাড়ি। সেদিন খেয়ে আসবে। একটু আগে জানিয়ো।

আমি একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, বৌদি, ওকে সঙ্গিনী করার সম্ভাবনা যখন দেখবো তখন নিশ্চয় আপনার ওখানে নিয়ে যাবো। আপনার মতামত আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। সে সময় এখনও আসেনি। তা, অশোকদা আপনি ওকে কোথায় দেখলেন?

—তুমি তো ওকে বোরখা পরিয়ে রাখোনি, যে দেখতে পাবো না। তুমি এর মধ্যে পাত্তায়ত্ত গিয়েছিলে?

—তা গিয়েছিলাম।

—তোমরা চারজন আঙ্‌কোজায় দেখতে গিয়েছিলে, তাই না?

—ঠিক তাই।

—আমিও সেদিন গিয়েছিলাম, দুইজন আমেরিকানকে নিয়ে। আর একজন বাঙালী ছিলেন তোমার সঙ্গে, আর ছিল এক সুন্দরী, পরনে ছিল শাড়ি। ক্যামেফ্লেজ্‌ করেছিলে ভালই কিন্তু এ শর্মার চোখকে কি ফাঁকি দিতে পারবে? মহিলা, হোস্টেসের সঙ্গে সুন্দর থাই ভাষায় কথা বলছিল। একবার ভেবেছিলাম হয়তো এখানকার কোনও পাঞ্জাবি মেয়ে। ঐ বিশ্বাস নিয়েই কিন্তু এসেছিলাম আজ। কিন্তু যখন শুনলাম, তুমি তার সঙ্গে গল্ফ খেলেছ—তখন মনে হচ্ছে ও থাই।

বৌদি বললেন, কোন দেশী গো?

আমি বললাম, ও থাই।

বৌদি বললেন, তা হলে তো দারুণ ব্যাপার, থাই মেয়ে, গল্ফ খেলে, স্পোর্টস, ক্লাবের মেম্বার অর্থাৎ বড়লোকের মেয়ে, অথচ শাড়ি পরেছে, তার অর্থ মজে গেছে। তাও বলছো সম্ভাবনার কথা। অশোকদার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর ওকে হাঙ্গাল বাঙ্গাল বলবে? কি রকম ডুবে ডুবে জল খায় কেউ জানাত পারে না।

আমি বললাম, এটা আপনার অন্যায় দাদা। একটু হাঁক মারলেই আমি সবাইর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম।

অশোকদা জিজ্ঞেস করলেন, আর দুজন কে ছিল?

—ওরা আমার কলেজের বন্ধু, আমেরিকায় থাকে।

বৌদি আবার চেপে ধরলেন, সে রাত্রে নিশ্চয় ফিরে আসোনি তোমরা?

—না বৌদি, দু রাত ছিলাম।

—তা হলে তো, হইছে বামাই?

—অশোকদা জট্‌ ছাড়াতে বললেন, আর ওকে ঘাটিয়ো না তো। দাদা, নিবে যাওয়া পাইপটার দুবারের চেষ্টায় আগুন ধরিয়ে একটা সুখটান দিয়ে ঘরের এদিক ওদিক

ভালো করে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, আরে দেখেছ, অতীশ কি রকম ঘরের চেহারা পাল্টে ফেলেছে ?

বৌদি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, অই তো দেখছি অনেক কিছু পাল্টেছে— ঘরের রঙ পাল্টেছে, পর্দার খোল পাল্টেছে, খাওয়ার টেবিলের নীচে কুলকুলা সবুজ কার্পেট পেতেছে, নতুন মাল্টিপারপাজ আলমারি হয়েছে—খাসা লাগছে কিন্তু। মনে হচ্ছে বসন্তের হাওয়া লেগেছে। এ সব কী তোমার সিলেকসান, না এতে আর কারও হাত আছে ? যেই করুক না কেন, খুব সুন্দর হয়েছে।

—বৌদি, কাটখোট্টা কাজ করতে পারি কিন্তু হয়েছি নরম মাটির দেশে, যেখানে প্রকৃতির রঙ বদলায়, ঢং বদলায়, যেখানে উদাম গায়ের মানুষও মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখলে, পালেতে হাওয়া ধরলে, খালি পেটেও প্রাণ মাতানো গান গায়—ভাটিয়ালি সারি, জারি।

দাদা বললেন, তা অবশ্য ঠিক। এখানকার সব বাঙ্গালীদের এককাট্টা করার জন্য ওর বাংলায় লেখা আবেদনটা পড়লেই বোঝা যায় ওর শিল্পী মনের পরিচয়। ও লেখাটা কিন্তু তোমার দারুণ হয়েছে। সারা পেলে কি রকম ?

—খারাপ নয়।

—কতজনকে পেলে ?

—প্রায় তিরিশ ঘর হবে।

এত বাঙ্গালী এখানে আছে নাকি ? আমি তো দশ বছরে দশ ঘরের বেশী চিনি না। তুমি কি রাস্তাঘাটে শাড়ি পরা দেখলেই তার আঁচল ধরে জিজ্ঞেস করো নাকি যে সে বাঙ্গালী কিনা, এবং থাইল্যাণ্ডে থাকে কিনা ?

—প্রায় সে রকমই। একদিন নন্দদুলালের সঙ্গে সোনালী চাচার রেস্তোরায় বসে খাচ্ছিলাম। পাশের টেবিলে এক ছোকরা একটি থাই মেয়েকে নিয়ে খাচ্ছিল। কান পেতে শুনলাম ওরা ইংরেজিতে কথা বলছে। নন্দদুলাল বললো, ঐ ছোকরা বাঙ্গালী, আমি জানি। এক ইণ্ডিয়ান কোম্পানিতে কাজ নিয়ে এসেছে। অমনি আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে 'এক্সকিউজ মি' বলে জিজ্ঞেস করে জানলাম, যে তিনি বাঙ্গালী। তারপর আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বলে ওকে সেই আবেদন পত্রটা ধরিয়ে দিলাম। ছোকরা আবার বাঙ্গলা পড়তে পারে না, প্রবাসে জন্ম। মুখেই সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। ওর ঠিকানা আর ফোন নং লিখে নিলাম।

আর একদিন এয়ার পোর্টে অপেক্ষা করছি একজনকে রিসিভ করার জন্যে। দেখলাম শাড়ি পরা এক মহিলাও অপেক্ষা করছেন আমারই কাছে। নমস্কার করে বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলাম ইংরেজিতে, আপনি কি বাঙ্গালী ? উনি প্রতি নমস্কার করে বললেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো ? আমি মাতৃভাষায় আমার পরিচয় দিয়ে ওকে আমাদের আজ্জার কথা জানালাম। তিনি ওঁর স্বামীর একটা কার্ড দিয়ে বললেন, আসবেন আমার বাড়িতে, কথা হবে।

পরের দিনই ফোন করে ওঁর বাড়িতে গিয়ে আবেদন পত্রটি দিয়ে এসেছিলাম। প্রায়

বছর পাঁচেক হলো এখানে আছেন। খুব ঠাঁট নিয়ে থাকেন। নাম মন্দিরা পাল। চেনেন নাকি ?

বৌদি বললেন, নাম শুনেছি। ওঁর স্বামী থাপারের পেপার পাল্প কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেকটার। নিজেই একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারের চেষ্টা করছে। মহিলা শুনেছি সৌন্দর্য্যের ঠমকে আর স্বামীর দেমাকে, কোনও বাঙ্গালীর সঙ্গে মেশেন না।

—ঠিকই বলেছেন, কথায় কথায় দেমাকের ফুলঝুরি ছড়াচ্ছিলেন। শিংগরই বাড়ি কিনছেন, সে কথা জানাতেও ভোলেন নি ; কিন্তু আসবেন বলেছেন।

অশোকদা পাইপটা এ্যাসট্রেতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, তাও এত লোক পেলে কী করে ?

—এই আমি যাদের চিনি, তারা যাদের চেনে, তস্য তস্য করতে করতেই জুটে গেল। ইণ্ডিয়ান এ্যামবেসির সেনবাবুও সাহায্য করেছেন।

বৌদি বললেন, ধন্য তোমার অধ্যবসায়। তারপর দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ, অতীশ শুধু কাজই করে না, কাজ করে, খেলে, সমাজ সেবা করে, প্রেম করে, নিজেই ঘর সাজায়। দেখে একটু শেখো। অতীশ ঠিকই বলে, তুমি এক ধরনের নিশিকুটুম্ব —রাত জাগা কাজ, আর ঘুম জড়ানো দিন, মাঝে যে একটা দিন কাজের দারি টানা আছে সে দিন গল্ফের মাঠে চড়ে বেড়াও। বাড়ির কোনও কাজে লাগে না তোমাকে।

দাদা হেসে বললেন, দ্যাখো নিশিকুটুম্ব মানে সিঁদেল চোর। ওদের কাজটাও অবশ্য আমার মত রাতজাগা কাজ। আমিও অবশ্য খবরের ঘরে সিঁদ কাটি। বিক্রি করি আমার মহাজন, আমেরিকার কাছে, তবুও এরকম অপবাদ দেওয়া ঠিক নয় অতীশ। সিঁদ একবারই কেটেছি সুমিতার বাবার বাড়িতে, দিল্লীতে। বৌদির থুতনিটা একটু নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তাই তো আজও বেঁচে বর্তে আছি।

বৌদি জিজ্ঞেস করলেন এত বাঙ্গালী কাজ করে কোথায় হে ?

—সবাই প্রায় ভারতীয় কোনও না কোনও কোম্পানিতে, কেউ থাপারে, কেউ বিড়লার, কেউ উষা শ্যামে, কেউ কাজি সাহেবের কোম্পানিতে, কেউ ট্যাণ্ডনের কনস্ট্রাকসান কোম্পানিতে, কেউ অমৃত সিং এর এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানিতে, কেউ বা এশিয়াটিক ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে অধ্যাপক, আর একজন আছে ইণ্ডোথাই এসোসিয়েসান, আর তিনজন আছেন ইণ্ডিয়ান এ্যামবেসিতে।

অশোকদা বললেন, জানো তো ইণ্ডোথাই এসোসিয়েসানের উদ্যক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

—রবীন্দ্রনাথ কবে এসেছিলেন ?

—এসেছিলেন ১৯২৭ সালে। রাজ অতিথি ছিলেন পিয়াথাই প্রাসাদে। ঐ ইণ্ডো-থাইতে যিনি থাকেন তার নাম কী, করেন কী ?

—তরফদার আর ওঁর স্ত্রী দুজনে 'যোগ' শেখান। মহিলা আবার লাইব্রেরিয়ান ওখানকার। থাই বলতে ও লিখতে পারেন। দুজনেই বিষ্ণু ঘোষের কাছে যোগাভ্যাস করেছেন।

বৌদি বললেন, তোমার বাড়িতে এত লোকের রান্না করবে কে ? আমরা কি কিছু রান্না করে নিয়ে আসবো ?

—রান্না করবো আমি আর আমার গৃহিণী ?

বৌদি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, গৃহিণী মানে সেই থাই মেয়েটি নাকি ?

—না, না। গৃহিণী মানে, যে আপনাদের পরোটা আর আলু ছেচকি খাওয়ালো। গৃহকার্য্যে যে সুনিপুণা সেই তো গৃহিণী। আমার গৃহ দেখে কি মনে হচ্ছে না যে সুনিপুণ হাতে একজন এর পরিচালনা ও পরিচর্য্যা করছে ?

—তা করছে। রান্নাও মনে হয় ভালই শিখেছে।

অশোকদা জিজ্ঞেস করলেন, তা খাওয়াবে কী ?

—ঠিক করেছি ভাত, মুগের ডাল, আলু কফি, মটর শুটি দিয়ে, ইলিশ মাছ সরষে দিয়ে, পাপড় ভাজা আর পায়েস

— এ যে দারুণ ব্যাপার হে। আমার তো এখনই জল গড়াচ্ছে জীভের ডগায়।

—আচ্ছা দাদা, আমাদের সঙ্গে যদি বাঙ্গলাদেশীদের যোগ করি তাহলে প্রায় ষাট ঘর লোক হয়। তাহলে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলো আমরা একসঙ্গে করতে পারি—এই যেমন গানের আসর, নাটক, কবিতা পাঠ প্রভৃতি। ওদের মধ্যে অনেক ট্যালেন্টেড লোকও আছে। ইউনিসেফের অধিকর্তা একজন বাঙ্গলাদেশী, নাম কিরাই। তাঁর স্ত্রী যেমন ছবি আঁকেন, তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গান। তিনিই হচ্ছেন ওদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যমণি।

বৌদি বললেন, তুমি আবার এত খবর জানলে কি করে ?

—ওদের নববর্ষ উৎসবে গিয়েছিলাম ইম্পালা হোটেলে। খুব ভালো লেগেছিল। কি অপূর্ব রবীন্দ্রসঙ্গীত, তার সাথে ছিল অতুলপ্রসাদ আর নজরুল। অনেকে নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করলো। আমাদের ভাষা আর কৃষ্টিকে ওরাই সমৃদ্ধ করবে আর আমরা প্রবাসী বাঙালীদের মত নিজেদের ভাষাটা প্রায় ভুলে যাবো।

দাদা গম্ভীর হয়ে সব শুনে বললেন, দেশ যখন আলাদা হয়েই গেছে তখন আমরা আলাদাই থাকবো।

—দাদা, আপনি বুঝি এপার বাংলার লোক ? বৌদি আপনি ?

—আমরা দুজন দুপারের লোক।

—ঘর করতে কি অসুবিধা হচ্ছে ?

—তা আর কি করে বলি। পঁচিশ বছর তো কাটিয়ে দিলাম।

ঠিক আছে, আমজনতার কাছে তোমার প্রস্তাব রেখো। সবাই যদি রাজি হয়, আমিও অগত্যা রাজি হবো।

বৌদি বললেন, আজ তাহলে চলি ভাই। একদিন এসো, ওকে নিয়ে।

—আপনারা আসাতে বেশ কাটলো সন্ধ্যেটা।

অশোকদা দিল্লীর ছেলে। প্রবাসে মানুষ হলেও বাঙ্গলা ভাষায় প্রচুর দখল আছে। এখানে আছেন প্রায় দশ বছর ধরে। কাজ করেন আমেরিকান

এ্যামবেসিতে। ওঁর কাজ রাত্রে, যখন আমেরিকায় দিন। কাজটা হলো, ভারতবর্ষ, বাঙলাদেশ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কাগজ ও ম্যাগাজিন পড়ে খবরের সারাংশ যোগাড় করা যা আমেরিকার এ অঞ্চলের পলিসি ডিসিসানে সাহায্য করে। আর যার থেকে ওরা ভয়েস অব আমেরিকার খবর প্রচার করে। উনি আমেরিকার সিটিজেনসিপ নিয়েছেন। দুই ছেলে। এক ছেলে আমেরিকায় কলেজে পড়ে, আর ছোটটি এখানকার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। বেশ সুখী পরিবার।

॥ ২৯ ॥

কাল ছুটি, বুদ্ধপূর্ণিমা। এদের 'ভিসকা বুচা', বুদ্ধের জন্মদিন। নেত্রা নেই। ওর বাবা গেছে সার্কের (সাউথ ইস্ট এশিয়ান রেজিওনাল কাউন্সিল) ড্রাগ কন্ট্রোল মেজারস্ সম্বন্ধীয় মিটিং এ বালিতে (ইন্দোনেশিয়ায়)। ওকে নিয়ে গেছে। নেত্রার খুবই ইচ্ছে ছিল যে আমিও যাই। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল কারণ হিন্দুপ্রধান বালি আমার দেখা হয়নি। ওখানে অনেক সুন্দর সুন্দর হিন্দু মন্দির আছে, আছে বিস্তৃত সমুদ্র বেলাভূমি। বালির রামায়ণভিত্তিক নাচও খুবই বিখ্যাত। তার চাইতে বড় আকর্ষণ নেত্রা আছে। ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হলো না কারণ ওর বাবার সেটা পছন্দ হবে না। এতদিন হয়ে গেল নেত্রার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কোনও দিন ওর বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কথা বলেনি।

উমিও নেই। গেছে আমেরিকা, অই গল্ফখেলারও সঙ্গি নেই।

সন্ধ্যেটা নাসিরুদ্দিন আর শাবনা আজমীর একটা সিনেমা দেখে কাটিয়ে দিলাম।

সকালে চা দিতে এসে পিয়ালী বললো, মাস্টার আমাকে পাঁচ শো বাট দাও। তোমার হয়ে আমি সন্যাসীকে ভিক্ষা দেবো। তা হলে তোমার পুণ্য হবে। আমিও আজ উপবাস করে পুজো দিতে যাবো মন্দিরে। রান্না করে রেখে যাবো, তুমি খেয়ে নিও।

—তা হলে আমিও যাবো মন্দিরে।

—যাবে? তা হলে তো খুব ভালো। তুমি তাহলে ফ্রা ছেদী আর ওয়াট্ ফ্রা ক্যাউ (এমারেল্ড বুদ্ধ) দেখে এসো। ওয়াট ফ্রা ক্যাউতে আজ রাজা রাণী আসবে পুজো দিতে। আমি যাই। চট করে রান্না সেরে নেই। তুমি ব্রেকফাস্টটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

—আমিও আজ উপোস কর'বো।

—খু-উ-ব ভালো। বুদ্ধদেব দেখো তোমার মঙ্গল করবেন। আচ্ছা মাস্টার, যে ফুইঙ এসেছিল, সে তোমার কে হয়?

—ও আমার বান্ধবী। বিয়ে করেছে আমার বন্ধুকে।

—তুমি ওকে বিয়ে করলে না কেন? ও খুব ভালো মেয়ে। তোমাকে খুব ভালোবাসে।

—তুমি কী করে বুঝলে?

—হেসে বললো, আমি বুঝতে পেরেছি, আর তুমিও ওকে ভালোবাস, মাস্টার। না, আর দেরী নয়।

সাকনুকে বললাম, আগে চল ক্রা ছেদীতে। ছেদী শব্দের উৎপত্তি চৈত্য থেকে, আর চৈত্ত শব্দের উৎপত্তি বোধহয় চেতনা থেকে। যে স্তূপে ভগবান বুদ্ধের ভস্ম বা শরীরের কোনও অংশ থাকে, তার স্মরণেই তৈরি হয় চৈত্য বা এখানকার ভাষায় ছেদী।

ভগবান বুদ্ধ নাকি দেহরক্ষার পূর্বে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে তাঁর ভস্মাবশেষ যেন একটা স্তূপের নীচে রাখা হয়। সে স্তূপের আকৃতি যেন ধানের স্তূপের আকারের হয়। তাই স্তূপ হয় অর্ধ গোলাকার। এখানকার ছেদীর স্থাপত্যের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ঠ আছে। এর আকৃতি অনেকটা পুজোর ঘণ্টার মত। তার মাথায় বসানো থাকে বড় থেকে ছোট কতগুলো চাকতি যার শেষপ্রান্ত ছুঁচলো।

ক্রা ছেদীর কাছে গাড়ি থামলো।

অনেকটা জায়গা নিয়ে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানে রয়েছে বিহার, যেখানে সন্ন্যাসীরা ধ্যান করে। আছে 'হোত্রাই' তাতে আছে সব বৌদ্ধ পুঁথি—পালি ভাষায় তালপাতায় লেখা। আছে 'সালা', যেখানে নবদীক্ষিতদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছোট ছোট ঘর আছে সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্যে। আছে নানান রকম শিক্ষার ব্যবস্থা—শুধু ধর্মশিক্ষাই নয়, যোগ শিক্ষা, আয়ুর্বেদ শিক্ষা, পেশি বা অস্থিজনিত ব্যথা দূরীকরণের অঙ্গসংবাহন শিক্ষা, (ম্যাসাজ) এমন কি সাহিত্য ও জ্যোতিষ বিদ্যাও।

ছেদীর ভিতর অর্ধশায়িত বিরাট বুদ্ধ মূর্তি সোনার পাতে মোড়া। বুদ্ধ মূর্তির দৈর্ঘ্য ছেচল্লিশ মিটার, আর পনেরো মিটার উচ্চতা। এখানে বুদ্ধদেবের পায়ের ছাপ রাখা আছে।

আজ মন্দিরে খুব ভিড়। এত ভক্ত সমাগম, কিন্তু সোরগোল নেই। সবাই শান্তভাবে ভগবানকে স্মরণ করছে। ভক্তি ভরে ধূপ দীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এ সব মন্দিরের বয়স পাঁচশো বছরেরও কম। লোক সঙ্কুলানের কথা ভেবেই এ মূল মন্দিরের আভ্যন্তরিণ আকার স্থির করা হয়েছে। হয়তো গীর্জার গঠনপ্রণালীকে নকল করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম যেহেতু জনগণের ধর্ম, যে ধর্মে জাতপাত নেই, যে ধর্মে পুজো করবার অধিকার রয়েছে সবার, সেই দেবস্থানে ভক্তসমাবেশ তো হবারই কথা, আর সেই কথা মনে রেখেই স্থপতি তার নক্সা তৈরি করেছে।

হিন্দু মন্দিরে ঠাকুরের মূর্তিকে অন্ধকার গহ্বরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাতে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। ঠাকুর সেবা পান শুধু নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে। ফলে মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের দর্শন মেলে না, মেলে এক কোটি পুরোহিতের দর্শন,

যে তাঁর প্রতিভূ বলে নিজেকে ঘোষণা করে। এরই প্রয়োজনে স্থপতি তার নকসা বানায়। তাই আমাদের মন্দিরে এত সোরগোল।

বাইরে এলে দেখা যায় আরও চারটে ছেদী, রঙিন ভাঙ্গা টাইলের টুকরো দিয়ে তার বাইরের সাজসজ্জা। এই চারটে হলো চারজন চক্রি সম্রাটের স্মৃতিসৌধ। আরও অনেক ছোট ছোট ছেদী আছে এই চত্বরে, রাজপরিবারের অন্যান্যদের স্মৃতি বহন করে। অনেকদিন পর এসেছিলাম এখানে আর একবার। জোসমিনের বাবা ছিল খ্যাতিমান। তার মৃত্যুর পর কফিনে তার মৃতদেহ রাখা ছিল দশমাস। রোজ আসতো সন্ন্যাসীরা বুদ্ধের সংবাণী শোনাতে আর প্রার্থনা করতে যেন তার পুনর্জন্ম হয় সংব্যক্তির ঘরে। দশমাস পর, যখন তার পুনর্জন্ম হয়ে গেছে, তখন তার শবদাহের দিন স্থির হয়। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের সেদিন উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমিও এসেছিলাম। এখানকার একটা সালার খোলা বারান্দায় একটা কাঠের বেদীর ওপর রাখা ছিল সেই কফিন। সন্ন্যাসীরা পুজো করে বুদ্ধের নাম নিয়ে পাটকাঠি দিয়ে একটু আগুন ধরিয়ে বললো, বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামী।

আমাদের সকলের হাতেই দেওয়া হলো একটা পাটকাঠির টুকরো আর কয়েকটা ধূপকাঠি। পর পর সবাই গিয়ে আগুন ছোঁয়ালো সেই কফিনে। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে সেই শবদাহ করা হলো।

এবার আমি পুজো দিতে গেলাম ওয়াট-ফ্রা কিউতে। সেখানে দারুণ ভিড়। রাজা আর রানী এসেছেন পুজো দিতে। তাই মন্দির অভ্যন্তরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। রাজা মূর্তির বেশ পরিবর্তন করবেন। রাজা রাণী চলে গেলে ভক্তরা লাইন করে ঢুকছে একদিক দিয়ে, বের হচ্ছে আর একদিক দিয়ে।

দোকান থেকে কিছু ফুল, মোমবাতি আর ধূপকাঠি কিনে আমিও লাইন লাগালাম। আমার সামনে এক আধবয়সি মহিলা। মহিলাকে দেখে মনে হলো কোথায় যেন ওনাকে দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। একটা আন্দাজ করে জিজ্ঞেস করলাম, খাও থোট্ ফমছু উমাপঙ্গ। সাপু আঙ্গরেং? (ক্ষমা করবেন, আপনার নাম কী উমাপঙ্গ ইংরেজি বোঝেন?)

ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমার নাম উমাপঙ্গ। আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না।

—আপনি কয়েক বছর আগে কলকাতা থেকে ব্যাংকক আসছিলেন। তখন আমিও আসছিলাম আর আপনার পাশে বসেছিলাম। তখনই আপনার সঙ্গে আলাপ। আপনি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা, তাই না?

উমাপঙ্গ আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক ঠিক। মনে পড়েছে। আপনার কিন্তু স্মরণশক্তি দারুণ। আপনার যেন নামটা কী? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, আচার্য অতীশ দীপঙ্করের নামে আপনার নাম। তা এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনিও পুজো দেবেন? এখানে এসে কী বৌদ্ধ হয়ে গেলেন নাকি? এগোন।

—আসলে আপনার কার্ডটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হয়নি। এখানে বৌদ্ধরাও তো হিন্দু, আমি হিন্দুই বা বৌদ্ধ হব না কেন?

পুজো দেওয়া শেষ হলে উনি বললেন, চন্দনে বেদী ধুয়ে (খেজ-সোনা) একটু ধূপ দীপ দিয়ে আসি।

এ বেদী সোনার পাতে মোড়া। অপূর্ব এর গঠন বৈশিষ্ট্য, যেন সোনার একটা বিরাট পুজোর ঘণ্টা তাম্রপাত্রের উপর রাখা আছে।

এক পাশে কোনও রাজার স্মৃতি সৌধ, একটা বেদীর ওপর স্বর্ণছত্র আর চার কোণায় স্বর্ণদণ্ডের ওপর বড় থেকে ছোট লতা পাতার কারুকার্য করা সোনার ছাতা। ঐগুলো ষষ্ঠ রিপুর প্রতীক আর সপ্তমটি হলো মোক্ষ লাভ।

আমি ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিলে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আসুন না একদিন আমার এখানে। আমি একাই থাকি, এই বাড়িটার একতলা ভাড়া নিয়ে।

আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে এলাম।

॥ ৩০ ॥

রাত নটার সময় নেত্রার গলা পেলাম। ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেসে করলো,

এই, কেমন আছ ?

—মন ভালো ছিল না।

—কেন ?

—কী করে থাকবে, তুমি নেই।

—তোমার তো ডিডির কথা ভাবা উচিত। সেই ছোট্ট বেলার প্রেম, লুকিয়ে চুমু খাওয়া, এর মধ্যে আমার কথা ভাবা খুবই খারাপ। তোমরা ছেলেরা খুব তাড়াতাড়ি ভুলতে পারো।

—মোটেই তা নয়। ও এখন মনোজের, তাই ঐ দিকের দরজাটা বন্ধ করে অন্য দরজা খুলে দিয়েছি, যেমন তুমি করেছো।

—আমি তো আর তাকে ফিরে পাবো না।

—আমিও আর আমার মণিকে ফিরে পাবো'না।

—ঠিক আছে বাবা, হার মানছি।

—ওখানে কি রকম কাটলো ?

—খুব খারাপ।

—কেন ? বালি তো খুব সুন্দর জায়গা।

—আমি কী বলেছি, সুন্দর নয় ?

—তবে ?

—দেখা হলে বলবো।

—কবে দেখা হবে ?

—কাল সন্ধ্যায়।

—এখন বুঝি বাড়িতে, তাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা।

—হুঁ রাখছি। বাবা আসছে।

চুক্‌ করে আওয়াজ। তারপরই ফোন কেটে যাবার শব্দ।

পরের দিন সন্ধ্যায় ওর অপেক্ষায় বসেছিলাম। দরজা খুলতেই ও আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে থেমে গেল পিয়ালীকে দেখে। সামলে নিয়ে হাত ধরে এসে সোফায় আমার পাশে ধপ্‌ করে বসে মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

পিয়ালী এসে জিজ্ঞেস করলো, কী খাবে ?

নেত্রা বললো, পরোটা, বেগুন ভাজা আর চা

বললাম, আজ আমরা বাইরে খাবো কিন্তু রাত্রে। বেশী খেয়ো না।

একটা প্লেট থেকেই আমরা দুজনে তুলে খেলাম।

নেত্রা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলো, তারপর তুমি কী করলে এ ক'দিন ?

—তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই সময় কেটে গেল। তোমার খারাপ কাটলো কেন ?

—আর বলো না, পেছনে একটা ফেউ লেগেছিল।

—ইন্দোনেশিয়ান ফেউ ?

—না, না থাই।

—ওখানে থাই এল কোথা থেকে ?

—এখান থেকে গিয়েছিল, ওর বাবা মার সঙ্গে। ওর বাবা আমার বাবার সহকারি। সেও গিয়েছিল, বাবার সঙ্গে ঐ মিটিংএ।

বললাম, ভালই তো, তুমি একজন সঙ্গী পেয়েছিলে। তা হলে তো খারাপ লাগার কথা নয়।

পিয়ালী একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, মাস্টার আমি যাচ্ছি।

নেত্রা নাকটা কুঁচকে, মুখটা ভেঙচে বললো, ও সারাক্ষণ আমার সঙ্গে আঁঠার মত সেঁটে থাকতো। ওর মাও আমাকে একটু বেশীই দেখাশোনা করছিল।

—আমার বাবাকে বললে বলতো, ভালই তো, ছেলেটিও তো খুব ভাল, অস্ট্রেলিয়ায় লেখাপড়া শিখেছে, প্রাইস্‌ ওয়াটারে কাজ করে। আমার তো ছেলেটিকে খুব ভাল লাগে।

বুঝলাম, বাবাই ওদের চালাকি করে এনেছে।

গম্ভীর হয়ে বললাম, ভাল ছেলে পেলে সব মেয়ের বাবারাই এ রকম করে। তা দেখতে কেমন ?

—খারাপ নয়, তবে তোমার মত সুন্দরও নয়। লম্বায় তোমার থেকে খাটো, রঙও

এখায় চাইতে ময়লা। আমার মুখটা দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললো, কোথায় পাবে এ রকম মুখ? এ মুখটাই ভাসতো সব সময় চোখের সামনে।

দমআটকানো ভাবটা কমে গেলে জিজ্ঞেস করলাম, ও কী তোমাকে প্রোপোজ করেছিল?

নেত্রা আমার কাঁধে মাথা রাখলো, ও বিয়ে প্রোপজ করেনি, অন্য বিষয় প্রোপোজ করেছিল; একদিন দুপুরে, আমার ঘরে এসে গায়ের জোর দেখাতে গেলে, আমি একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর আমার কাছে ঘেঁষেনি।

—বাবাকে সে কথা জানিয়েছিলে?

—বাবার জেরায় একদিন বলতেই হলো।

—বাবা কী বললেন?

—অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক ওর বাপেরই মতন।

আমি খুশি হয়ে বললাম, তা হলে তো চুকেবুকে গেছে। জায়গাটা কি রকম?

—নাথিং লাইক দিস্ প্লেস্।

—রিয়েলি?

—রিয়েলি অভীশ, বলে আমার কোলে মাথা দিয়ে লম্বা হয়ে সোফার ওপর শুয়ে পড়লো। তুমি যেখানে, সে জায়গাই সুন্দর।

আমি ওর মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে, ইউ আর রাইট নেত্রা। সব কিছু স্থির হয়ে গেল। আমরাও তৈল ছবির মত ফ্রেমে আটকে রইলাম। কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিলাম তা কারও খেয়াল নেই। আমি ওকে আলতো করে উঠিয়ে বললাম, চল এবার খেতে যাই।

ও বাথরুমে গিয়ে চুল আঁচড়ে, মেকআপ ঠিক করে, হাসতে হাসতে বললো, ঠিক আছে তো? চল।

গাড়িতে বসে ও জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে?'

—গ্যালাক্সিতে কখনও যাইনি। যাবে সেখানে?

—যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাবো।

রামা ফোর রোড দিয়ে কিছুটা গিয়ে বা দিকে মোড় ঘুরলেই গ্যালাক্সি। ওর পাশেই একটা রেঁস্তোরা, তার সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা আছে, কাম, হোস্টেস উইল ফিড্ ইউ।

নেত্রা বললো, ওদিকে তাকাতে হবে না। চাই তো, আমিই তোমাকে খাইয়ে দেবো।

গ্যালাক্সির বিরাট হল। সামনে স্টেজ। তার সামনের ফ্লোরের দুইদিকে এক ফালি জায়গা সামান্য উঁচুতে। মাথার ওপর কিছু অংশ কাঁচ ঘেরা ঝোলান বারান্দা। সেখানেও খাবার জায়গা আছে। ওখানে বসলে, হোস্টেসরা গল্প করতে করতে খাইয়ে দেয়। কার পার্কিং থেকে এখানে আসতেই ঘেমে গিয়েছিলাম। ভেতরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরাম হলো। একটি মেয়ে আমাদের দুজনকে বসিয়ে মেনুকার্ড এগিয়ে দিল।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এবার বল, বালি জায়গাটা কী রকম? ছিলে কোথায়?

—ছিলাম বালি ওবেরয়েতে। দারুণ হোটেল। 'কুটা বিচ' বেশ লম্বা, তার প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দেখা যায় না। ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা সবুজের ছড়াছড়ি, তার মধ্যে অসংখ্য হিন্দু মন্দির। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রিমূর্তিরই পুজো হয়। একটা আগ্নেয়গিরি আছে তার নাম 'আগুঙ্গ' পাহাড়। তার গায়ে সবচাইতে পুরোনো একটা মন্দির আছে, নাম তার 'পুরা বৈশাখী' পুরা মানে মন্দির। ওখানে 'লেগঙ্গ' নাচ দেখলাম, অনেকটা আমাদের নাচেরই মত।

স্টেজের পর্দা উঠলো। একটি চিনা মেয়ে প্রেমের গান গাইছে। তার প্রেমিক ব্যালকান থেকে সেই গান শুনে নেমে এল। তারপর দুজনের খুশির নাচ ও দ্বৈত সঙ্গীত। তারপর চিনা মেয়েদের এক্রোবেটিক্স।

আমাদের খাবার এসে গেছে। একটা প্লেটে পিকিং ডাক (আস্ত হাঁসটার পালক ছাড়িয়ে স্টিমে সেদ্ধ করে সয়া সস্ দিয়ে বোধহয় ভাজা) একটা প্লেটে নরম চালের গুড়োর রুটি (সরু চাকুলির মত) আর একটা প্লেটে শশার টুকরো একটা বাটিতে ঝোলা গুড়। ওয়েইট্রেস্ হাঁসের চামড়াটা চাকু দিয়ে পাতলা করে কেটে রুটির মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে দু-টুকরো শশা আর ঝোলাগুড় মিশিয়ে রোল করে আমাদের প্লেটে তুলে দিল। খেতে ভালই। হাঁসের চামড়া ভাজা খাওয়া হলে মাংসটা নিয়ে গেল রাঁধবার জন্যে। এরপর ফ্রায়েড প্রণ।

স্টেজে তখন তিনজন অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে নাচছে, অনেকটা ব্যালে ডান্সের মত খুব লঘু পায়ে আঙুলে ভর দিয়ে, হাত বাঁকিয়ে, ঘাড় কাত করে নাচতে নাচতে ওপরের জামা কাপড় খুব সন্তর্পণে খুলে ফেলছে। শেষে রইল শুধু একটা গায়ের রঙ মেলানো ব্রাউন প্যান্টি। সরু কোমর, অনম্র সুগোল স্তন। এমনিই সুন্দর, তাকে আরও সুন্দর করেছে কিছুটা কস্‌মেটিক্স ব্যবহার করে।

বাজনার সুর পাল্টে গেছে, উদ্দাম, উত্তাল ছন্দের সঙ্গে তাল মেলানো নাচ।

নেত্রা আমাকে কনুই এর গুঁতো মারছে—অতীশ তোমার খাওয়া যে বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েটা পরের খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—সার। তাড়াতাড়ি কয়েকটা প্রণ মুখে পুরে দিলাম। সামনে বড় বড় গোল টেবিলে সব চিনা পরিবার বসেছে, বুড়ো-বুড়ি ছেলে বৌ নাতি নাতনি নিয়ে। এক একটা টেবিলে দশজন করে। ওদের টেবিলে প্লেটে রয়েছে দুটো করে শুকোর ছানা, খয়েরি রঙের। ওগুলো হলো সাকলিং পিগ্। ওদের পায়ের নখ, দাঁত, চোখ কিছুই কেটে বাদ দেওয়া হয়নি।

আমাদের টেবিলে এবার এল নুডল্‌স্, সেই হাঁসের রান্না করা মাংস আর স্যুপ্। মাংসের অর্ধেকটা দুটো ব্যাগে ভাগ করে দিতে বললাম। খাওয়া শেষ হতে না হতেই সামনের খাওয়ার জায়গার টেবিল চেয়ার উঠিয়ে ফেলা হলো।

ইংরেজি গান সাউন্ড সিস্টেমে বেজে উঠলো। লেজারের সাদা, লাল, নীল আলো বাতাসের পর্দায় হিজিবিজি কেটে মাঝে মাঝে স্থির হয়ে জানাচ্ছিল জাম্প, জাম্প, গ্যালাক্সি।

কয়েক জন ছেলে মেয়ে নাচের আসরে নেমে পড়েছে। বুড়ো বুড়ি আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর কেউ হলে নেই। অনেক ছোকরা ওদের সঙ্গিনীদের নিয়ে ঢুকছে শুধু নাচবার জন্যে।

আমি বললাম, নাচবে নাকি একটু?

দুজনে হাত ধরে নেমে গেলাম। ঘণ্টা খানেক নেচে আর একটা ড্রিঙ্ক শেষ করে উঠলাম।

—তোমার ফিরে আসার সেলিব্রেশানটা ভালই হলো, কী বলো?

আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে বললো, ওয়াণ্ডারফুল।

॥ ৩১ ॥

একদিন বিকেলে উমাপঙ্গকে ফোন করে বললাম, আজ আসছি আপনার ওখানে গল্প করতে। তারপর কোথাও একসঙ্গে খেয়ে নেওয়া যাবে। আপত্তি নেই তো?

—একটু আপত্তি আছে। আমার বাড়িতে আপনি আসছেন, খাওয়াবার কথা তো আমার।

—দেখুন, আপনার বাড়িতে আপনার হাতের রান্নাই খেতাম কিন্তু যে সময় নষ্ট হবে, তাতে আমার অনেক কিছু জানা হবে না। তা হলে তাই কথা রইলো।

সন্ধ্যার আগেই পেঁছে গেছি। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। দোতলায় থাকে বাড়িওয়ালা আর নীচে উমাপঙ্গ। বাড়ির সামনে এক ফালি বাগান।

উমাপঙ্গ আমার অপেক্ষায়ই বাইরের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলেন। দেখলাম রাধাকৃষ্ণানের ভগবৎ গীতা।

—আপনি বসুন, আপনার চাটা নিয়ে আসি।

এঁর ঘরে প্রচুর বই, তার মধ্যে বেদ উপনিষদও বাদ যায়নি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী, শ্রীঅরবিন্দের ডিভাইন পাওয়ারও যেমন আছে তেমনি বৌদ্ধ দর্শনের উপরও অনেক বই রয়েছে।

চা ঢালতে ঢালতে উনি জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম দেখলেন আমাদের দেশ?

বললাম, খুব সুন্দর। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের এ রকম একটা মিলন ক্ষেত্র আর কোথাও দেখিনি। বৈদিক ধর্মের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সৃষ্টি হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম কিন্তু এখানে দেখছি দুটোরই একটা সুন্দর সমন্বয় হয়েছে।

—কী দেখে ভাবলেন এর সমন্বয়ের কথা।

—সর্বত্র—রাজপ্রাসাদে হিন্দু দেব দেবীর নাম ও মূর্তি, বৌদ্ধ মন্দিরের দেওয়ালে

রামায়ণের ঘটনাবলির চিত্র, হিন্দু মন্দিরে থাই ভক্তদের সমাগম, এমন কি আমার ড্রাইভারের পর্যন্ত গণেশ ঠাকুরের প্রতি অগাধ ভক্তি। এটা কী করে সম্ভব হলো, তার উত্তর হয়তো আপনি দিতে পারবেন।

—সেটা জানতে হলে আমাদের কিছুটা ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। কম্বোডিয়ার আগে নাম ছিল কম্বোজ। সেখানে ছিল হিন্দু রাজা-দ্বারাবতী সাম্রাজ্য। তাদের রাজধানী ছিল আঙ্কোরে। বিখ্যাত আঙ্কোরবাটের মন্দিরের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?

—তা শুনেছি বই কি। বিরাট মন্দির, ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। তার ওপরে গরুড় আরূঢ় বিষ্ণু মূর্তি। সেই মন্দির তো আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা আমাদের টাকায় সংস্কার করছে।

—ঠিকই বলেছেন। এক সময় থাইল্যাণ্ডের অনেকটাই খামেরদের অর্থাৎ কম্বোজের অধীনে ছিল। কিছু অংশ ছিল ব্রহ্মদেশের মনদের অধীনে। তাই খামের সভ্যতার প্রচুর প্রভাব রয়েছে আমাদের সভ্যতায়। কম্বোজের রাজারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সহায়তায় নিজেদের ভগবানের প্রতিভূ হিসাবে প্রচার করেছিল, যাতে তাদের ক্ষমতার কোনও প্রতিবাদ না ওঠে। আপনারা যেমন শিবলিঙ্গ পূজা করেন, তেমনি এক সময় মন্দিরে রাজার লিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পূজার বিধি প্রচলিত ছিল।

—শিবলিঙ্গের পূজা তো একটা ফার্টিলিটির পূজা, যেটা সেকালে প্রচলিত ছিল সব ধর্মেই। এমন কি খৃষ্টানরা ইস্টারে যে একটা বিরাট ডিম বানিয়ে রঙ করে রাখে বা বড়দিনে একটা ক্রিস্টমাস ট্রি রাখে সেটাও তারই প্রতীক।

—ঠিক কথা।

বাইরে ফুটফুটে চাঁদের আলো দেখে বললাম, চলুন, না বাইরে গিয়ে বসি?

—চলুন। জানেন, জাপানে বসন্তকালে যখন চেরি গাছ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে তখন এমনি পূর্ণিমার রাতে জাপানিরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাইরে বসে। সবাই নির্বাক হয়ে চন্দ্রাবিধৌত প্রকৃতিকে তন্ময় হয়ে দেখে আর স্রষ্টার কথা স্মরণ করে। সঙ্গে থাকে সাথে কিছুক্ষণ আমরাও জাপানিদের মত চাঁদ দেখে উমাপঙ্গকে বললাম, তা আপনাদের দেশে তখন কী হলো?

—খামেরদের তাড়িয়ে থাইরা স্বাধীন হলো। প্রথমে সুখথাই পরে আয়োথিয়ায় রাজধানী স্থাপিত হলো। সম্রাট রামাধিবোধী ছিল বৌদ্ধ, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে সম্রাটকে ভগবানের প্রতিভূ বলে স্বীকার করেনি। সন্ন্যাসীকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছিল সমাজে। সেই সমাজ ব্যবস্থায় রাজার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকৃত হয়। প্রজা বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে, তাই প্রয়োজন হলো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার। কাশী থেকে আটজন সৎব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনানো হলো। তারা রাজানুকূল্যে হিন্দু দেব দেবীর পূজার প্রচলন করলো। রাজাকে ভগবানের প্রতিভূ হিসাবে প্রচার করা হলো। রাজার অভিষেক উৎসবে সেই ব্রাহ্মণের বংশধররা আজও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে। হলকর্ষণের আগে ইন্দ্রের পূজো হয়। বৌদ্ধ মন্দির তৈরির

আগে ব্রহ্মার স্মরণ লওয়া হয়। সমাজে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের মেয়েদের আগে ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদ করে অগ্নিকে স্মরণ করে। এ সব উৎসবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দ্বিতীয় ধাপে থাকে। এই ভাবেই আমাদের দেশে দুই ধর্মমতের এক মিলনক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে।

—এবার ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনাদের ভাষায় যে অনেক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দেখি সেটাও কী সেই ব্রাহ্মণদের প্রভাবেই?

—ঠিক তা নয়। বৌদ্ধ জাতক বা ত্রিপিটক তো পালি ভাষায় লেখা। পালি তো সংস্কৃত থেকেই এসেছে। বৌদ্ধ ওয়াটে সব সন্ন্যাসীকেই পালি ভাষা শিখতে হয়। ওরই মাধ্যমে সব সংস্কৃত শব্দ আমাদের কথায় এসে গেছে। আমাদের ব্যাকরণে খুব একটা নিয়মের আটসাট নেই, যেমন আছে পাণীনির ব্যাকরণে। আমাদের শব্দ যোজনারও বাধা নিয়ম নেই। তাই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় আমরা এখনও সংস্কৃতের আশ্রয় নিয়ে থাকি।

—আপনাদের লিপি তো শব্দ ভিত্তিক এবং ক, খ ই আপনাদের বর্ণমালা, তাই না?

—হ্যাঁ, আমাদের বত্রিশটা স্বরবর্ণ আর চুয়াল্লিশটা ব্যঞ্জনবর্ণ।

—সংস্কৃতে তো এতগুলো বর্ণ নেই। আপনাদের লিপির দুই একটির সাথে দেবনাগরী বর্ণের মিল থাকলেও, গরমিলই বেশী।

—আমাদের লিপি এসেছে কম্বোজ থেকে। শোনা যায় ওখানকার লিপি দক্ষিণ ভারতের কোনও লিপির সাথে অনেকটা মিল আছে।

—আপনাদের এ লিপি কতদিনের?

—হেসে উমাশঙ্গ, বললো অত্যন্ত শিশু। মোটে পাঁচ শো বছর হবে এর বয়স। আপনাদের তো পাঁচ হাজারেরও বেশী।

—তৈরি করেছিল কে?

—সম্রাট রামাখামেঙ্গ এই লিপি সৃষ্টি করেছিল।

—রামায়ণের এত জনপ্রিয়তা হলো কী করে?

—রামায়ণই তো আর্যদের প্রথম মহাকাব্য। যেই মহাকাব্য ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয়, সবটাই রাজানুকূল্য।

—চলুন, তা হলে কোথাও খেয়ে নেই।

—বেশ তো লাগছে, এখানে বসে থাকতে চাঁদের আলোর নীচে। এক কাজ করা যাক, আপনার কী ড্রাইভার আছে?

—আছে।

—আপনার থাই খাওয়ায় অরুচি নেই তো?

—একদমই না।

—তা হলে ড্রাইভারকে ডাকুন।

—সাকন এলে, উমাপঙ্গ বুঝিয়ে দিল কোন দোকানে যাবে, কী খাবার আনবে। আমি ওকে বাট দিয়ে দিলাম।

আধঘন্টার মধ্যে প্লাস্টিকের থলে ভর্তি করে খাবার নিয়ে এলো সাকন।

উমাপঙ্গ আর আমি দুজনে মিলে এর মধ্যে বাইরে খাবারের টেবিল সাজিয়ে ফেলেছি। সাকনকে জোর করে বসালো উমাপঙ্গ ওর পাশে। ভালই খাওয়া হলো, নুডল, স্টিম বয়েন্ড মুরগি, ভাত, মাগুর মাছের ঝোল তুলসি পাতা দিয়ে।

উমাপঙ্গকে ধন্যবাদ দিলে উনি বললেন, ধন্যবাদ তো আপনার প্রাপ্য।

—কেন?

—আপনি মনযোগী ছাত্রের মত আমার বক্তৃতা শুনলেন, চাঁদের আলোতে আমাকে সঙ্গ দিলেন, তারপর পয়সা খরচ করে আবার খাওয়ালেনও। আবার আসবেন।

॥ ৩২ ॥

একদিন নেত্রার এপার্টমেন্টে হাজির হলাম। ও নেমন্তণ করেছিল খাওয়ার। দুটো বেডরুমওয়ালা এপার্টমেন্টটা ভালই। সুন্দর গোছানো। দুই বন্ধুতে বেশ হাত পা ছড়িয়ে থাকে। একজন ঠিকা ঝি ঘরদোর পরিস্কার করে, কাপড় জামা কেচে ইস্ত্রি করে দেয়। রান্না ইচ্ছে হলে নিজেরা করে নেয়; না হলে রাস্তা থেকে কিনে আনে অফিস থেকে ফেরার পথে। দুপুরে দোকানে খায়। আমি যখন গেলাম তখনও দুজনে গলদ ঘর্ম্ম হয়ে রান্না শেষ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

নেত্রা এ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে বললো, অতীশ একটু বসো। প্রায় হয়ে এসেছে। এই ভাসনা, হিটটা আর একটু কমা। পুড়ে যাবে। দাঁড়া, একটু দেখেনি।

—থাম তো তুই। তুই ও যা জানিস, আমিও ততটাই জানি। বেশী ওস্তাদি করতে হবে না তোর। তুই অতীশের কাছে বোস।

নেত্রা ওর কথায় কান না দিয়ে ওভেনের দরজাটা খুলে পাইরেক্সের ডিসটা বের করে বললো, নারে, ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। চামচে একটু কাই নিয়ে নিজে চেখে বললো, দারুণ হয়েছে। নে হা কর দেখি। কেমন হয়েছে?

ভাসনা—ভালো, আর একটু হবে।

আমি উঠে এসে বললাম, তোমাদের এক্সপেরিমান্টটা আজই করলে? মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত বাইরের থেকে খাবার এনে পেট ভরাতে হবে।

সাইড বোর্ডের উপর রেসিপির বইটা তখনও খোলাই ছিল।

নেত্রা বললো, তোমাকে আর টিটকিরি মারতে হবে না। চুপ করে বসো, যা হয়, অই

খাবে। উই স্যাল্ সার্ভ উইথ্ লাভ। খাবারে পেট না ভরলে, লাভ দিয়ে মন ভরাবো। ঠিক বলিনি, ভাসনা ?

ভাসনা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ওভেনের তাপটা একটু কমিয়ে দিয়ে বললো, আর কিছু করতে হবে না। আমি স্নান করে আসি, তারপর নেত্রা তুই যাস।

ভাসনা স্নানে গেল। নেত্রা মুখের ঘাম এপ্রনে মুছতে মুছতে আমাকে পাশে নিয়ে বসলো।

—কী এত রাঁধলে ?

—এ রান্না তুমি রেস্তোঁরায় কোথাও পাবে না। প্রচুর মেহনৎ। আগে খাও, তারপর বলবো।

ও গায়ের সঙ্গে লেগে বসেছে। তোমার ঘামের গন্ধ পারফিউমের গন্ধের চাইতে বেশী এক্সাইটিং। শুনেছি ফ্রান্সে ছেলেদের ঘামের থেকে এক রকম পারফিউম তৈরি করা হয়। সেটা নাকি মেয়েদের খুব ফেভারিট, অবশ্যই অবিবাহিত মেয়েদের। তোমারও কী তাই মনে হয় ?

নেত্রা বললো, তোমার ঘেমো শরীরের পাশে তো কখনও বসিনি, তাই জানবো কী করে ? হেসে বললো, আসলে এটা তোমার দুষ্টুমি করার একটা ফন্দি।

—মোটেই তা নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখ, তোমার গালদুটো কী রকম লাল হয়ে গেছে। রুজের আর প্রয়োজন নেই। চোখের চাহুনিতে একটা তীক্ষ্ণতা এসেছে। আলুথালু করা চুলগুলো চোখের উপর এসে পড়ায় তোমার রূপ পালটে গেছে। আমার বেশ একটা নতুনত্ব লাগছে।

—সোজা কথাটা এত ঘুরিয়ে না বললেই হতো।

—আঃ, স্বাদও আলাদা, নোনতা মুখরোচক।

—ছাড়ো, ভাসনা এসে পড়বে।

—চুরি করে খাওয়ার আবার আলাদা স্বাদ। আমাদের বাড়ির আমগাছে অনেক আম হতো। তাও ছোটবেলায় পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে আমরা দূরের আমবাগানে আম চুরি করতে যেতাম। পাহারাদার তাড়া করলে মাঠ দিয়ে ছুট লাগাতাম। পেটমোটা পাহারাদার আমাদের পেছন পেছন কিছুটা দৌড়ে থেমে পড়তো। তখন একটা গাছের তলায় বসে দুজনে চুরি করা আমগুলো ভাগ করে নিতাম। ভারি মজা হতো। এখন এটা অনেকটা নুন দিয়ে কাঁচা আম চুরি করে খাওয়ার মতো—ঝাল নুন দেওয়া আম। দারুন !

ভাসনার গলা শোনা গেল—হ্যাঁ রে, আসতে পারি ?

—আর না। অতীশ তো ওর ছোট বেলার গল্প করছে। তাই শুনছি।

ভাসনা বললো, শুধুই গল্প শুনলি, তাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। ওভেনের সুইচটা বন্ধ করেছিলি তো ? দ্যাওখা, সুইচটাও বন্ধ করিসনি, এতই ব্যস্ত ছিলি ? যা এবার স্নান করে আয়। আমি ওর কাছে বসছি।

ভাসনা পাশের চেয়ারটায় বসলো। ও আজ থাই সাজ করেছে, গায়ে চিকনের কাজ করা গোলাপি ব্লাউজ। ওড়না আর লাগায়নি। ও কথা বলে ইংরেজি আর থাই মিশিয়ে। আমার বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না।

—নেয়া তো আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সারাক্ষণই আপনার কথা বলে। ওর বাবা কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছে। উনি এটা মোটেই পছন্দ করছেন না।

—তুমি কী করে জানলে ?

—মেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করে যখন পারেন নি, ঝগড়া করেও যখন কিছু হয়নি, তখন আমাকে ডেকে একদিন বললেন, ওকে বোঝাবার জন্যে।

—আমার ওপর ওর রাগের কারণ ?

—উনি মেয়েকে খুবই ভালবাসেন। ওর মায়ের ওই একমাত্র সন্তান। আপনি এখানে আজ আছেন, কাল হয়তো চলে যাবেন। তাই ওঁর চিন্তা। আপনি অবশ্য খুবই ভালো ছেলে। দেখবেন, ওকে কিন্তু চিট্ করবেন না। ওর মনটা বড্ড নরম।

প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ কর ?

—ন্যাশনাল ইকনমিক এণ্ড সোস্যাল ডেভালপমেন্ট বোর্ডে। এই ডিপার্টমেণ্টের পরিচালক হচ্ছে প্রধান মন্ত্রী। ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট যে সব তথ্য সংগ্রহ করে, তার বিশ্লেষণ করে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা বিবরণ আমরা তৈরি করি। সেই অনুসারে পলিসি ডিসিসান হয়।

—তুমি এখানে কি করে চাকরি পেলে ?

—হেসে বললো, আমিও কিন্তু ইকনমেট্রিকসে স্নাতক।

—তোমাদের এখন জিঃ ডিঃ পিঃ কত ?

—এ বছর প্রায় দশ শতাংশ হবে, আশা করছি। গত বছর ছিল আট।

—তোমাদের ট্রেড্ ডেফিসিট্ কত ?

—ওটা বেড়েই চলেছে, কিন্তু ব্যালেন্স ওফ পেমেণ্ট খুব ভাল। আমাদের ফরেইন রিজার্ভও বেড়েই চলেছে।

—সেটা কি করে হচ্ছে ?

—সার্ভিস ইণ্ডাস্ট্রি, বিশেষ করে টুরিজম্ থেকে আমরা অনেক বিদেশি মুদ্রা পাই আর পাই বিদেশিদের মূলধন নিয়োগে, ও দুটোই খুব বাড়ছে। হংকং, সিঙ্গাপুর দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ানে শ্রমিক মূল্য বেড়ে যাওয়ায় জাপানিরা প্রচুর টাকা ঢালছে।

আমেরিকানরা চালাচ্ছে কৃষিভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিতে, বিশেষ করে খাবার জিনিসে। আমরা এই জন্য দেখবেন, টুরিজম্‌ আর ইন্ডাস্ট্রিয়েল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর খুব জোর দিয়েছি। তাছাড়া, বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য আমরা অনেক সুবিধা করে দিয়েছি।

বললাম—আর একটা সুবিধা আছে তোমাদের, ডিফেন্সের খরচটা এতদিন আমেরিকাই বহন করতো ভায়েটনাম কমিউনিস্ট হয়ে যাবার পর। আর তোমাদের ট্রেড ইউনিয়ানের ক্ষমতাও খুব সীমিত। তোমরা রপ্তানি কর কী কী ?

ভাসনা জানালো, রাবার, চাল, ট্যাপিওকা, তামাক, সামুদ্রিক মাছ, মুরগী, ফার্নিচার, গার্মেণ্ট, চামড়ার জিনিস, স্টিল কাস্টিং, ছোট ছোট ইলেকট্রিক মোটর, সফ্‌ট-ওয়ার, আর একটা করি সেটা হলো সেক্স। শেষেরটা জার্মানিতে, আর জাপানে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি, সেক্স এক্সপোর্ট আবার কী ?

ও হেসে বলে, সেক্সের যন্ত্র এক্সপোর্ট—অল্প বয়সী মেয়ে।

—তোমাদের ইকনমিক প্ল্যানিং সুরু হয় কবে থেকে ?

—ফিল্ড্‌ মার্শেল সারিৎ থানারাথ্‌ যখন প্রধানমন্ত্রী—১৯৬১। ওনার ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে হাইওয়ে, রেললাইন, ইলেট্রিসিটি, জলসেচের বাঁধ ও খাল; কৃষিবিদ্যালয়, ডিমনস্ট্রেসান ফার্ম। প্রাথমিক শিক্ষা করা হয়েছে বাধ্যতামূলক।

—তোমাদের সরকারি কারখানা আছে ?

—আছে বই কী, এই ধরুন টুবাকো মনপলি-সিগারেট তৈরি হয় শুধু ঐ সরকারি কারখানায়, রাবার ফ্যাক্টরি, ট্যানিং, জুট্‌ মিল, রেলওয়ে, পাওয়ার জেনারেসান্‌, ফুড্‌ প্রসেসিং, কোল্ড স্টোরেজ, অফ্‌সোর তেল, প্লাইউড, পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ প্রভৃতি।

—তোমার কাছ থেকে এতটা জানতে পারবো ভাবতে পারিনি আগে।

—আমি তো ঐ প্ল্যানিং বিভাগেই কাজ করি, তা হলে জানবো না কেন ?

—প্রসঙ্গ পাল্টাতে জিজ্ঞেস করলাম, ভাসনা, তোমার কোন বয় ফ্রেণ্ড নেই ?

—বয় ফ্রেণ্ড নেই, বললে মিথ্যে বলা হবে, তবে সে স্টেডি কিনা তা ঠিক বুঝতে পারি না।

—সে করে কী ?

—আমাদের একজন অফিসার।

—তা হলে ছেলে তো ভালই ?

—তা ভাল। থামাসাথ মহাবিদ্যালয় থেকে অর্থশাস্ত্রে এম. এ-তে প্রথম।

—স্টেডি কিনা বুঝতে পারো না কেন ?

—তার আর একজন গার্ল ফ্রেণ্ড জুটেছে, অথচ আমার সঙ্গে যখন থাকে তখন

মনে হয় আমি ছাড়া ওর জীবনটাই বৃথা। বিয়ে করার কথা বললেই বলে, 'অত তাড়াতাড়ির কী আছে? চাও তো, উই ক্যান লিভ টুগেদার।' তাতে আমি রাজি নই।

নেত্রা এর মধ্যে এসে গেল। ও ও আজ থাই পোশাক পরেছে ওড়না ছাড়া।

বরফের পাত্রে ডোবানো শ্যাম্পেনের বোতলটা আমার হাতে দিয়ে বললো, নাও খোলো।

আমি খুলে তিনটে গ্লাসে ঢেলে বললাম, টু ইওর হেল্থ নেত্রা এণ্ড ভাসনা।

নেত্রা বললো, না না, ভাসনার প্রেম অটুট হোক।

আমি বললাম, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। বোতলটা শেষ হয়ে গেলে ওরা উঠে গেল খাওয়ার সাজাতে।

খাওয়ার এনে সেণ্টার টেবিলে রাখছিল দেখে আমি বললাম, এখানে কেন, খাবার টেবিল আছে তো?

—আজ আমরা খাঁটি থাই খাবার খাওয়াবো, থাইদের মত পরিবেশন করে।

সেই টেবিলের চারিদিকে আমরা তিনজন কার্পেটে বসলাম। টেবিলের মাঝখানে সব খাবার সাজানো। তিনটে প্লেটের ওপর তিনটে খালি বাটি সাজানো। বাটিতে একটা করে চামচে। ছোট্ট শিশিতে সয়া সস্ আর নাম্‌প্লা (মাছের তেলে নুন দেওয়া)।

আয়োজন দেখে আমি থ। নেত্রা, কত রকম খাবার করেছ? এক-তম্-ইয়াম্-কুঙ্গ ছাড়া, আরগুলোর তো নামই জানি না। ও, আর একটা জানি, সেটা হলো খাউ (ভাত)। কলাপাতায় মোড়া, ওটা আবার কী? আমরাও কলাাপাতায় মুড়ে ইলিশ মাছ রাঁধি, সরষে বাটা দিয়ে। তাকে বলি পাতুরি। তোমরা এটাকে কী বল?

নেত্রা বললো—এটা হচ্ছে 'হাও মক্' ওর মধ্যেও মাছ আছে। নাও আগে সুপটা খেয়ে নাও। দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি তো আবার বেশী ঝাল খেতে পার না, প্রি কী নু (ধেনো লঙ্কা) তুলে ফেলি। ঝাল কমই দিয়েছি।

—খুব উপাদেয় হয়েছে। তোমরা দেখছি পাকা রাঁধুনি হয়ে গেছ।

ভাসনা হাসছে, দাঁড়ান অন্যগুলো মুখে দিয়ে দেখুন, তারপর একবারে বলবেন।

—এবার কোনটা নেবো ভাসনা?

ও প্লেটে তুলে দিয়ে বললো, এটা হচ্ছে 'গ্যাঙ্গ পেট'—এটা মুরগী। আপনি তো আবার মেখে খান। একটু ভাত নিন।

এক টুকরো মাংস আর ঝোল মুখে দিয়ে—ভাল হয়েছে বেশ মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ। আমি বলছি, এর মধ্যে কী কী আছে—নারকেলের দুধ, আদা, লঙ্কা, ধনেপাতা, গোলমরিচ বাটা।

ভাসনা প্রশংসাসূচক ভাবে আমার দিকে তাকাল। ঠিক বলেছেন। একটা শুধু বাদ পড়ে গেছে, সেটা হলো ছোট চিংড়ি মাছ বাটা।

'গ্যাঙ্গ পেট' খাওয়া হয়ে গেলে নেয়া এক ঠোঙ্গা 'হাও মক্' তুলে দিল আমার প্লেটে। দেখ তো কী রকম হয়েছে খেতে? এই প্রথম রাঁধলাম এটা।

পাতাটা খুলে এক চামচ মুখে দিয়ে বললাম, খুব সুস্বাদু হয়েছে। এতে আছে মাছের টুকরো, সবুজ তরকারি, পেঁয়াজ, আদা, শুকনো লঙ্কা, চিংড়ি মাছের পেস্ট, লেমন গ্রাস আর নারকেলের দুধ। ঠিক কিনা?

—একদম ঠিক। ঐ সব মিশিয়ে কলাপাতার ওপর রেখে ওপরে একটা কলাপাতা দিয়ে ওভেনে দিয়ে দিয়েছি। যাক বাবা ভাল হয়েছে—রাঁধবার আগে আমাদের যা ভয় করছিল।

—আরও একটা জিনিস বানিয়েছি। মধুরেণ সমাপয়েৎ না হলে খাওয়া অসম্পূর্ণ থাকে। বলে ভাসনা উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে একটা ট্রে নিয়ে এল। ট্রেতে নারকেলের আচিতে ভরা মিষ্টি। আমার হাতে একটা আচি আর চামচ এগিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন তো কেমন হয়েছে? এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার তৈরি।

মুখে দিতেই তা মিলিয়ে গেল। বললাম বাঃ। বেশ হয়েছে, অনেকটা পুডিং-এর মত কিন্তু মনে হচ্ছে এতে দুধ নেই।

—আপনি দেখছি খাঁটি ভোজনবিলাসী। এতে আছে নারকেলের দুধ, ডিম আর তালের গুড়।

—তোমরা গরুর দুধ ব্যবহার করো না বড় একটা, তাই না?

—আমরা বাচ্চাদেরও গরুর দুধ খাওয়াই না। প্রথমে মায়ের দুধ, তারপর ল্যাওয়া ভাত।

—তাই তোমাদের এখানে বড় একটা গরু দেখতে পাই না।

আজকাল দেখতে পাবেন। রাজার উৎসাহে সরকার এখন ডায়েরি ফার্মের উপর জোর দিয়েছে, বিশেষ করে বিফের জন্যে। জাপান গোমাংসের একটা বিরাট বাজার।

—মজার ব্যাপার জাপানে তিন চারশো বছর আগে যদি কেউ গোমাংস খেতো তাকে সমাজচ্যুত করা হতো। পর্তুগীজরা ওখানে গোমাংস আর খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার সুরু করলে, ওরা দুশো বছরের জন্যে বিদেশের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল।

নেয়া বললো, আমাদের দেশেও ঐ রকম। আয়োথিয়ার রাজা, নারাইর মৃত্যুর পর সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত বিদেশিদের সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এবার ওঠো।

—যা খেয়েছি, আর ওঠার শক্তি নেই।

ওরা দুজনে আমার হাত ধরে তুললো। আমাকে ওরা বাসন তুলতে দিল না। কিছুক্ষণ পর ভাসনা নেয়াকে পাঠিয়ে দিল আমার কাছে বসতে, আর ও বাসনগুলো মেজে রাখছিল।

—আজ খুব খাওয়া হলো। এ একেবারে ফাঁসির খাওয়া।

—সেটা আবার কী?

—ফাঁসির আগের দিন আসামিকে এমনি খাওয়ানো হয়। আর তো সে খেতে পারবে না, তাই।

আমার খুব কাছ ঘেসে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে নেত্রা ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, তুমি সামনের সপ্তাহে দু দিনের ছুটি নাও তা হলে তোমাকে আয়োখিয়া, সুখথাই, চিয়াংমাই দেখিয়ে আনবো। আমার ছুটি নেবার অসুবিধা নেই, কারণ আমার বস্‌ হংকং যাচ্ছে রোববার রাত্রে, ফিরবে বুধবার।

—ঠিক আছে। তুমি ফোন করো।

ভাসনা এসে বললো, কি রে, কানেকানে কী বলছিলি?

কিছুক্ষণ আরও গল্প করে, বাড়ি ফিরে এলাম।

॥ ৩৩ ॥

শুক্রবার সন্ধ্যায় নেত্রা এল। তা হলে আমরা কাল সকাল পাঁচটায় রওনা হচ্ছি? তোমার ড্রাইভারকে নিতে হবে না। আমরা দুজনে পালা করে চালাবো।

বললাম, ঠিক আছে। তাই হবে। তুমি থাকবে কোথায়? আমার সঙ্গে এক হোটেলে নিশ্চয় নয়?

খুব খানিকটা হেসে বললো, কেন গো, বীরপুরুষ, ভয় পাচ্ছো নাকি? আমি কি বাঘ, তোমায় খেয়ে ফেলবো?

—তা ঠিক নয়, তবে অঘটন তো ঘটে যেতে পারে?

—তুমি কোন্‌ যুগের মানুষ? যাই হোক তোমার ভয় নেই, আমি আমার বন্ধুর বাড়ি থাকবো, কাল ফোন করে ওকে বলে দিয়েছি।

—তোমার বাবা জানে যে তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছো?

—বাবা জানে, আমি চিয়াংমাই যাচ্ছি ভাসনার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে একা যাচ্ছি বললে, কী আর যেতে দেবে নাকি?

—ভাসনার ওখানে খোঁজ করলে কী হবে?

—ও ঠিক করেছে ঐ সময় হুয়াহীনে যাবে, ওর বন্ধুর সঙ্গে।

—বন্দোবস্ত তা হলে পাকা করেই রেখেছ।

—তা তো করতেই হয় মশাই, বলে আমার হাতটা চেপে ধরলো। আমায় টেনে তুলে বললো, চল তোমার জামা কাপড় গুছিয়ে দেই।

—পিয়ালীকে ডেকে নাও, কারণ আমি জানি না কোথায় কী আছে।

আমি খাটে বসলাম। ও একটা স্যুটকেস নিয়ে নীচে বসলো। পিয়ালী ওর কথামত সব জিনিস হাতের কাছে এগিয়ে দিতে লাগল।

—না, না এ স্যুটটা ভাল না, ঐ হাল্কা ব্রাউন টেরিউলেরটা দাও, আর ঐ গরম কালো স্ট্রাইপটা। একটা সোয়েটার বার কর। চারটে গেঞ্জি আর আণ্ডারওয়্যারে তো তোমার হয়ে যাবে? পিয়ালী, স্লিপিং স্যুটটা কোথায়? চারটে রুমাল চাই। ছোট একটা তোয়ালে।

নেত্রার সর্দারি করা পিয়ালীর পছন্দ হয়নি। ও সব জিনিস দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নেত্রা সব গোছানো হয়ে গেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পিয়ালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি রাগ করেছো?

পিয়ালী খুশি হয়ে হেসে ফেললো। ওভেন থেকে রোস্টটা বের করে বললো, মাস্টার এটা খুব ভালবাসে, তাই এটা, পাউরুটি আর কফি দিয়ে দেবো। ওর গালে একটা চুমু খেয়ে নেত্রা বললো, তুমি খুব ভাল।

নেত্রা আমার পাশে ধপ্ করে বসে বললো, কী যে মজা হবে না, তাই ভেবে আমার আজ আর ঘুমই হবে না। তোমাকে চিয়াংমাইর সব দেখিয়ে, আমরা আরও ওপরে উত্তরে চলে যাবো।

—চিয়াংমাইতে পাহাড় আছে?

—আছে বইকী। ওটাই তো আমাদের হিল্ স্টেশান। ওখানে গল্ফ কোর্স ও আছে।

—আর দেরী করো না। তোমারও তো গোছাতে হবে, তারপর আবার সকাল চারটের উঠতে হবে। আমি তোমাকে ওয়েক্ কল দিয়ে দেবো।

আমি সেই কাকভোরে উঠেছি, থুড়ি, কাকভোর এখানে বলা যাবে না, কারণ ব্যংককে কাক দেখেছি, শুধু চীরিয়াখানায়। চিনারা বোধহয় কাকগুলোকেও খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে। ওরা সব খায়—পঙ্গপাল ভাজা নাকি উপাদেয়, সমুদ্রের পাড়ে এক রকম পাখি আছে, তারা বাসা বানায় মুখের লালা দিয়ে। সেই বাসার স্যুপ্ নাকি ডেলিকেসি। হাঙরের পাখনার স্যুপের অনেক দাম। আর সাপের রক্ত ও মাংস খেতে তো চিনারা সিঙ্গাপুর থেকে এখানে আসে, তা আগেই দেখেছি। তাই ঠাট্টা করে অনেকে বলে, চিনারা উড়ন্ত সব কিছু খায়, এক এরোপ্লেন ছাড়া। ওরা সব কিছু খায় যারই চারটে পা আছে, এক চেয়ার ছাড়া। চড়ুই পাখিগুলোকে সাবাড় করতে পারেনি। এখানে রাস্তায় কুকুর দেখা যায় না, কারণ বোধহয় ওগুলোকেও চিনারা খেয়ে শেষ করে দিয়েছে।

পরের দিন সকালে স্যুটকেস হাতে নেত্রা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ঘড়িটা দেখে বললো, ঠিক পাঁচটা। তুমি রেডি তো?

—ইয়েস ম্যাডাম্। পিয়ালীর খাবার ঝুড়িও রেডি।

—দাঁড়াও, স্যুটকেসটা দেখি। খুলে বললো, সেভিং কিট, কোথায়? ভুলে গেছ তো? বাথরুম থেকে সেটা এনে ঢুকিয়ে আনন্দময়ী মায়ের ছবির কাছে প্রণাম করে বললো, চল।

—কাকে প্রণাম করলে?

—কেন? তোমার মাকে। তোমার মা কিন্তু খুব সুন্দর—শান্ত, স্নিগ্ধ ওনার চাহুনি।

—উনি আমার নিজের মা নয়, সবার মা, সন্ন্যাসিনী, আনন্দময়ী মা।

—তা হলে ভালই। ও'র আশীর্বাদ আমাদের সহায় হবে, বলে আর একবার হাত জোড় করে প্রণাম করলো।

গাড়ি চলতেই জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ লাগবে?

—পথ তো প্রায় সাতশো কিঃ মিটার। পথে আমরা তিন জায়গায় থামবো—তা হলে ধর বারো ঘণ্টা লাগবে।

শহরের রাস্তা এখনও ফাঁকাই, দুটো একটা টুক্‌টুক্‌ হোটেল থেকে মেয়েদের কুড়িয়ে বাড়িতে পেঁ'ছে দিচ্ছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই গাড়িগুলো বাম্পারের সঙ্গে লেগে লেগে চলবে। তাই এখানে কোনও ট্যাক্সি মিটারে চলে না, যার থেকে যা আদায় করতে পারে।

ডন্ মুয়াঙ্গ বিমান বন্দরের পথে গাড়ি ঘণ্টায় একশো কিঃ মিটার গতিতে চলেছে। নেন্না একটা ইংরেজি গান চালিয়ে শরীর এলিয়ে দিয়েছে চেয়ারটাকে কাত করে। এ পথে আমাকে প্রতি সপ্তাহেই যেতে হয়। আমার কারখানা এই রাস্তাতেই। বিমান বন্দরের নতুন টারমিন্যাল বিল্ডিং-এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, রাত দিন কাজ হচ্ছে।

এখানে বড় বড় বাড়ির কাজে নানান রকম যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। কংক্রিট মিশিয়ে আনা হয় কারখানা থেকে। মাটি কাটা হয় এক্সকাভেটারে। মাল মশলা উঠছে লিফটে। সাটারিং সব লোহার প্লেটের, স্ক্যাফল্ডিং লোহার পাইপের। আমার অফিসে একটা ঘর করতে এসে ছুতোর মিস্ত্রি বৈদ্যুতিক করাত লাগিয়ে নিয়েছিল। দোতালা বাড়ি করার সময়ও মাল ওঠায় পুলি দিয়ে, পুলিটা বানায় একটা সাইকেলের চাকার রিম্ দিয়ে।

একটা ফ্লাইওভার তৈরির জন্য এখানে রাস্তাটা বন্ধ রাখা হয়েছিল শুধু শুক্রবার থেকে রোববার, অন্যদিন ওরা কাজ করতো, রাত বারোটা থেকে ভোর ছটা অবধি। সোমবার যখন সেই উড়াল পুলের শুভ উদ্বোধন করল রাজকুমারি সিরিন্‌ধম (শ্রীধর্ম) তখন পুলের ধারে ঘাস গজিয়ে গেছে, রাতারাতি মুসাণ্ডা আর বেগুন-ভীলার গাছ নানান রঙের ফুলে ভরে উঠেছে।

—এই, তুমি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ো না। তাহলে আমারও ঘুম পাবে। ঐ দেখ আমার কারখানা।

নেন্না উঠে বসে, তোমার কারখানাটা বেশ সুন্দর।

—বৈশিষ্ট্য তো কিছু নেই, এখানকার সব কারখানাই তো এই রকম, এ্যাসবেসটসের সেড্, আধুনিক অফিস, ফাঁকা জায়গায় করা বাগান।

—আর কুড়ি মাইল গেলেই আয়োথীয়া।

—তা আমি জানি। একবার গিয়েছিলাম।

—তুমি যদি আয়োথীয়া দেখে থাকো, তা হলে আর এখন সেখানে থামবো না।

—আয়োথীয়া গিয়েছি ঠিকই, কিন্তু দেখা কিছুই হয়নি।

—কেন দেখনি ?

—গিয়েছিলাম, দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া একটি কর্ম্মীর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে। তার স্ত্রীকে কিন্তু খুব শোকাতুরা বলে মনে হলো না। দিব্যি সাজগোজ করে আমার কাছে এলো, আমাকে কোক দিল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কত বাট ক্ষতিপূরণ পাবে।

নেত্রা বললো—আমাদের দেশে মৃতের আত্মীয়েরা খুব একটা শোক প্রকাশ করে না, কারণ তাঁর আত্মার তো আবার পুনর্জ্জন্ম হবে। ওর স্ত্রীর দুঃখ হলেও তোমার কাছে তা প্রকাশ করবে না। আবার এও হতে পারে, যে ওদের মধ্যে কোনও ভালবাসা ছিল না। হয়তো ওর স্বামী মাতাল বা জুয়াড়ী ছিল।

এতক্ষণ রাস্তাটা দুভাগে ছিল এখন একই রাস্তা দিয়ে দুদিকের গাড়ি চলেছে। বেশীর ভাগই মালবোঝাই গাড়ি আর তেলের ট্যাঙ্কার। খালের জলে অসংখ্য খাকি ক্যাম্বেল হাঁস। এ সব হাঁস চালান যায় সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান। ডিসেম্বর মাস, কিন্তু শীত নেই একটুও।

পাঁচ ছয়জন মুণ্ডিত মস্তক ব্রহ্মচারী, জৈন সাধুদের মত সাদা ধুতি পরে লাঠি হাতে চলেছে পদব্রজে, হাতে তাদের ভিক্ষাপাত্র। নেত্রাকে জিজ্ঞাস করে জানলাম শ্রমণ সংঘম্ স্মরণং গচ্ছামি। সঙ্গ সেই চিয়াংমাই। সন্ধ্যা হলে পথের ধারের কোনও ওয়াটে আশ্রয় নেবে।

—নেত্রা, তোমাদের দেশে একটা ওয়াটও দেখিনি, যার কোনও সংস্কার করা হয়নি, সবই পরিচ্ছন্ন। এখানকার সন্ন্যাসীরাও বেশ ভালোভাবে থাকে। এদের প্রয়োজনীয় টাকা আসে কোথা থেকে ?

—ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্য আমাদের ডিপার্টমেণ্ট অফ রেলিজিয়ান আছে, শিক্ষাবিভাগের অধীন। ধর্ম্মীয় অর্থভাণ্ডারে অনেক টাকা। সরকারি অনুদান ছাড়াও, ব্যবসাদার ও শিল্পপতিরা প্রতিবছর এই ভাণ্ডারে প্রচুর টাকা দেয়। সাধারণ মানুষও সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা দেওয়াটাকে একটা পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। গ্রাম্য উন্নয়নে ওয়াটের সন্ন্যাসীদের অবদান অনেক।

—সেই অর্থভাণ্ডার থেকে কী মুসলমানদের মসজিদ আর খ্রীস্টানদের গীর্জারও সংস্কার করা হয় ?

—হ্যাঁ, তাও হয়। এবার আমরা আয়োথীয়ায় এসে পড়েছি। ডান দিকের রাস্তা নাও।

আয়োথীয়া এখন একটা ছোট্ট মফস্বল শহরের মত। ছোট ছোট একতলা দোতালা বাড়ি, বাড়ির সামনে ছোট বাগান। বাগানে বাঁশের বেড়া। ইন্ডাস্ট্রিয়েল এস্টেটের মাঝ দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে। মাঝে মাঝে জলের ট্যাংক মাথা উঁচু করে রয়েছে। একধারে ইলেকট্রিক সাবস্টেশান। রাস্তার দুধারে সব নতুন কারখানা হয়েছে আর্কিটেকটের পরিকল্পনানুসারে। বিড়লা একটা কাপড়ের কল করেছে এখানে। প্রাইভেট প্রোমোটার সরকারি পরিকল্পনানুসারে তৈরি করেছে এই এস্টেট।

আমরা টুরিস্ট স্পটে এসে গেলাম। অত সকালে টুরিস্ট বাস দু একটাই এসেছে। ওরিয়েন্টাল কুইনের যাত্রীরা এখনও পেঁছায়নি।

—চল, আগে আমরা একটা গাছের নীচে বসে ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নেই।

আমি গাড়ি থেকে খাবারের ঝুড়িটা নামিয়ে আনলাম। নেত্রা তোয়ালে বিছিয়ে সব খাবার বের করল। পিয়ালী প্লাস্টিকের প্লেট, চামচ, জলের বোতল, ফ্লাস্কে কফি, প্লাস্টিকের থলেতে রোস্ট, মাখন লাগানো পাউরুটি—সমস্ত পরিপাটী করে গুছিয়ে দিয়েছে।

খেতে খেতে নেত্রা আয়োথীয়ার ইতিহাস শোনালো।

—প্রায় দুশো বছর আগে পর্যন্ত এটা ছিল থাইদের রাজধানী। চাওপিয়ার উজান বেয়ে তখন কত দেশ থেকে আসতো সব সওদাগর-পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি, আর চিনা। লন্ডন শহরের সাঙ্গে এর তুলনা করতো ইংরেজরা, আর ফরাসিরা প্যারিসের সাঙ্গে। এই শহরটা বেঁচে ছিল চারশো বছর। চাওপিয়াও নদী এ শহরটার তিনদিক ঘিরে রেখেছিল। আর একদিকে খাল কেটে এর আর একদিকের সুরক্ষা করা হয়েছিল। বিরাট রাজপ্রাসাদ, ওয়াট সোনার বুদ্ধ, ছেদী ছিল অসংখ্য। হাতিশালে ছিল অসংখ্য যুদ্ধের হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। তখন কম্বোজ, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়ার অনেকটাই থাইদের অধীন ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, সুখথাই থেকে রাজধানী এখানে সরিয়ে আনা হলো কেন ?

—সুখথাই আরও উত্তরে, ঐ পর্যন্ত বড় বড় পাল তোলা জাহাজগুলো যেতে পারতো না। আঙ্কোর ও মালয়েশিয়া ছিল ওখান থেকে অনেকটা দূরে। আয়োথীয়ার চারিদিকের জমি ছিল খুবই উর্ব্বরা। প্রথম রাজা, রামাথিবোধি তাই এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। মাংসের রোস্টটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। সীতা, তুমি লাকি যে পিয়ালীর মত মেইড পেয়েছ।

—কে বললো মেইড, ও হচ্ছে চিনা হাউজ ওয়াইফ্।

—সে আবার কী ? ও কী তোমার জৈব প্রয়োজনও মেটায় ?

—ছিঃ ছিঃ কী যে বল ? আগে ছিনা জমিদারদের স্ত্রীদের বয়েস যখন চাল্লশ হয়ে যেতো তখন তারা স্বামীর সাথে শ্তো না। তারা তখন পরিবারের কর্তৃত্ব করতো। স্বামীর সুখের জন্য ছোট্ট একটি মেয়ের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দিয়ে দিত।

—বেশ ভালো ব্যবস্থা ছিল তো, কিন্তু তোমার ছোট বৌ কোথায় ?

ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে বললাম, এখনও হয়নি তবে হবার আশা রাখি।

সব গুছিয়ে ঝুড়িতে ভরে নেয়া বললো, এবার চল তোমায় একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেই।

পুরোনো দিনের কিছুই প্রায় নেই। শুধু কিছু ধ্বংসাবশেষ। রাজপ্রাসাদের আছে শুধু ইটের ভিত্তি আর কিছু থাম। একটা বিরাট বাঁধান পুকুর। পাথরের তৈরি কিছু ছেদী। সু কাও থঙ ছেদী সংস্কারের পর পূর্ব গৌরবে ফিরে এসেছে। তার উচ্চতা প্রায় দুশো বাট ফিট।

একটা মিউজিয়াম আছে তার নাম চাও শ্যামপ্রায়া। সেখানে অনেক বুদ্ধ মূর্তিও যেমন আছে, তেমনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রের, মূর্তি আছে। একটা বুদ্ধ মূর্তি আছে 'বুদ্ধ মঙ্গকোল' তার উচ্চতা প্রায় বেয়াল্লিশ ফিট্।

—জানো, এই মূর্তিটা প্রায় তিনশো কেজি সোনা দিয়ে মোড়া ছিল। বর্মিরা আগুনে পুড়িয়ে সব লুট করে নিয়ে গেছে।

সে সময়কার অস্ত্রশস্ত্রও রাখা আছে এই মিউজিয়ামে। এক ফরাসি চিত্রকরের ছবি আছে বর্মিদের সঙ্গে যুদ্ধের। সে যুদ্ধে থাইরা হাতি ব্যবহার করেছিল।

নেয়া হেসে বললো, যখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো তখন আব্রাহাম লিঙ্কনকে আমাদের রাজা সাহায্য করতে চেয়েছিল, হাতি দিয়ে।

—এতবড় শহরটার তো কিছুই অবশিষ্ট নেই ?

—কী করে থাকবে, তখন থাই রাজা ছিল দুর্বল। সিংহাসনের লড়াই চলছে, ঠিক সেই সময় বর্মিরা আক্রমণ করলো। চাউপিয়াও নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। তারপর বর্মিরা সব লুটপাট করে সমস্ত শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে সে আগুন জ্বলেছে। চল, অনেক বেলা হয়ে গেল।

—ঐ প্যাগোডাটা তো দেখা হলো না।

—ওটা হচ্ছে রানী শ্রীসুরিওথীর স্মৃতিসৌধ। রানী বর্মিদের বিরুদ্ধে রাজার পাশে হাতির পিঠে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান।

—তখন বুঝি মেয়েরাও যুদ্ধে যেতো ?

—যেতো বই কী। তখনকার দিনে সৈন্যসংখ্যাই ছিল যুদ্ধ জেতার প্রধান উপকরণ। সেই সংখ্যাপূরণের জন্য মেয়েদেরও নেওয়া হতো সৈন্যদলে।

—তোমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা তা হলে অনেক আগেই এসেছে। এ কারণেই বোধ হয় জারজ সন্তান তোমাদেরর সমাজে ঘৃণ্য নয়।

—হয়তো। এবার চল। আর নয়। অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে। এবার

একেবারে থামবো পিৎসানুলকে। আয়োধ্যীয়া শহর ছাড়লেই আবার সেই ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়বে। তারপর সে রাস্তা ধরে সোজা চল। আমি বব্ ডিলনের গানটা শুনি।

গ্রামের মাঝ দিয়ে পথ চলেছে। মাঝে মাঝে গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওয়াটের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। ছেলেমেয়ের দল পরিষ্কার পোশাক পরে বইএর ব্যাগ্ কাঁধে স্কুলে চলেছে। একই ধাঁচের সব গ্রামের বাড়ি—মাচার উপর কাঠ আর টিন দিয়ে তৈরি। মাচার নীচে শুয়োরের খোঁয়াড়। ফুল প্যাণ্ট, সার্ট আর টোকা মাথায় চাষা মোষের লাঙ্গল ঠেলছে। জলা জায়গায়ও এরা ঘর বানিয়েছে মাচা করে। রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত বাঁশের সাঁকো। বাঁশের ফ্রেমে জাল লাগিয়ে খাল থেকে মাছ ধরছে। এ রকম জাল দেখেছি কোচিনে। খাবার কোনও অভাব আছে বলে মনে হয় না এদের দেখে।

আমার মনে পড়লো, একবার মজিদ ভাইর সঙ্গে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। সারি সারি খড়ের ঘর। খড় সরে গিয়ে আলো এসে পড়েছে দাওয়ায়। দাওয়ায় বসে একটি ছোট্ট মেয়ে কেঁদে চলেছে, 'ও আম্মা খুদা লাগছে।' ওর দিদি উদাম গায়ে ছেঁড়া শাড়িটা দিয়ে কোনও রকমে ওর অপরিণত যৌবন ঢেকে, বোনটাকে কোলে তুলে সান্ত্বনা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। উঠানে বাঁধা হাড় জিরেজিরে বাছুরটা তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব্যা ব্যা করে মরছে এক ফোঁটা মায়ের দুধের জন্য। একটা মোরগ মাটি আঁচড়ে ঘাড় ফুলিয়ে কোঁক কোঁক করে ছুটছে একটা মুরগীর পেছনে। আম্মা গেছে খাল বিল থেকে শাক পাতা তুলে আনতে। আব্বা গেছে জন মজুর খেটে যদি দুটো পয়সা পায়, তবে ভাতের যোগাড় হবে।

সেই আমাদের গ্রাম আর এই হলো এখানকার গ্রাম। সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং যদি বলতে হয়, তা হলে সেটা আছে এখানেই।

নেত্রা আলতো করে কাঁধে হাত রাখলো, কী ব্যাপার, কথা নেই কেন?

—তোমাদের গ্রাম, তোমাদের গ্রামের লোকদের দেখছি আর আমাদের দেশের সাঙ্গে তুলনা করছি। এরা কত ভালভাবে আছে।

—অল দ্যাট গ্লিটারস ইজ নট্ গোল্ড। এদের মেয়েদের পাবে পতপঙ্গের বারে, বা ম্যাসাজ পার্লারে। ওরা ওদের নিজেদের শরীর বিকিয়ে টাকা রোজগার করে, পাঠায় এখানে তারপর একদিন রোগে আর পরিশ্রমে শেষ হয়ে যায়। দারিদ্র না থাকলে কী কেউ এ-ভাবে মরে?

—এই এই ব্রেক করো। সামনের লরিটা কিন্তু থেমে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না?

—দেখেছি বাবাঃ। হঠাৎ চীৎকার করলে কিন্তু আমার হাত কেঁপে যাবে, আর গাড়ি গড়িয়ে যাবে খালের জলে। নজর আমার ঠিকই আছে। নেত্রা, তুমি বললে আয়ুথীরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় ছশো বছর আগে কিন্তু রামের জন্মস্থান অযোধ্যা ছিল কত বছর আগেকার শহর, জানো?

—না, তা জানবো কী করে? অযোধ্যা যে রামের জন্মস্থান তাই জানি না।

নেত্রার স্নেব হজম হবার পর বললাম, সেটা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে।

এবার রাস্তার ধারে ধারে দ্ব'চারটে কারখানা দেখা যাচ্ছে। বাড়ি ঘরের আদল পাল্টে গেছে, অনেকটা শহুরে পরিবেশ।

নেত্রা আঙ্গুল দেখিয়ে বললো, ব্রহ্মদেশের সীমা এখান থেকে একশো মাইলের মত। এখানে খনিজ তেল পাওয়া গেছে। এই যে সব কারখানা দেখছ, এ সবই তেলের বাইপ্রডাক্টের কারখানা। আমরা পিৎসানুলুকে প্রায় এসে পড়েছি।

ছোট শহর হলেও বেশ বর্ধিষ্ণু। কিছু দূরে গিয়ে একটা নদী। জানতে পারলাম ওটা চাউপিয়াও। বড় বড় সাল সেগুনের গুঁড়ি ভাসিয়ে আনা হচ্ছে এই নদী দিয়ে। নদীর পাড়ে জেঠিতে বসানো আছে ক্রেন। সেই ক্রেন দিয়ে নদী থেকে কাঠের গুঁড়িগুলো লরিতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

--এই বাঁ দিকে ঘুরে কিছুটা গিয়ে, ডান দিকে গেলেই হোটেল পাবে। ঐ যে দেখা যাচ্ছে দোতলা বাড়িটা।

আমরা হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকতেই সবার দৃষ্টি কেড়ে নিল নেত্রা। যাদের সঙ্গে স্ত্রী ছিল, তারা আড়চোখে তাকাচ্ছিল। নেত্রার চেহারাটা তো দেখারই মত, তারপর জীনস্ আর টী সার্ট তা আরও ফুটে উঠেছে। রিসেপশানিস্টের কাছে যেতেই বললো, ব্রাইডেল স্যুইট্ খালি আছে। আপনাদের জন্যে স্পেশাল ডিসকাউন্ট।

নেত্রা আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বললো, আজ আমরা থাকছি না এখানে। চিয়াংমাই যাচ্ছি, ব্রাইডেল স্যুইটটা ওখানেই ভাল হবে, কী বলেন?

ও মুখটা কাঁচুমাচু করে বললো, তা অবশ্য ঠিকই। তবে একটা দিন এখানে বিশ্রাম করে, বেশ আরামে যেতে পারতেন। তাহলে আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য একটা ঘর চান? দু'ঘণ্টার জন্য তিন শো বাট দিতে হবে। একদিন থাকলে কিন্তু পাঁচশো বাটে দিতাম। ফেরার সময় তা হলে অবশ্যই একদিন থেকে যাবেন।

আমরা দুজনে বিয়ার খেয়ে ভাল করে স্নান করে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়, খাওয়ার অর্ডার দিয়ে। না, নষ্টামি বা দুষ্টুমি করিনি। একটু গায়ে গা লাগিয়ে শুয়েছি। বিয়ারের নেশায় আর ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছিল।

নেত্রা একটা ঠেলা দিয়ে বললো, ওঠো খাবার এসে গেছে।

নেত্রাই খাবারের অর্ডার দিয়েছিল। সব পরিদর্শন করে বললাম, এটা তো কুইতিও আর এটা তো মনে হচ্ছে মুরগী ভাজা, কী বলে একে? তুমি জানো কী করে রাঁধে?

—এটা হচ্ছে অনেকটা বারবিকিউ চিকেন। আস্ত মুরগীর গায়ে মাখন, মশলা লাগিয়ে পেটের ভেতর কিছুটা নারকেল কোরা দিয়ে কাঠকয়লায় পড়ানো হয়।

খুব নরম নরম আর সুস্বাদু, মুখের ভেতর গলে গেল যেন। নেত্রা, যথারীতি হুকুমনামা জারি করলো—খেয়ে কিন্তু আর বিশ্রাম নয়। পাশেই একটা খুব

পুরোনো ওয়াট আছে। সেখানে দর্শন করে আমরা যাবো সুখোথাই।

হোটেলের কাছে নদীর ধারেই ওয়াট। তার সামনে আজ মস্ত মেলা বসেছে। আমাদের দেশের মতই মেলা, জামা কাপড়, সংসারের টুকিটাকি জিনিস, খেলনা, খাবার, নাগরদোলনা, গ্রাম্য থিয়েটার।

ওয়াটের স্থাপত্যে কোথাও বৈচিত্র্য নেই। ভেতরে মস্ত হল তার শেষ প্রান্তে বেদীর ওপর বুদ্ধদেবের বরাভয় মূর্তি। মন্দিরের দেওয়ালে বৌদ্ধ জাতকের চিত্রাবলি। আমি আর নেত্রা ধূপ দীপ জেবলে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করলাম।

তারপর হলের মাঝখানে এসে নেত্রা বললো, বসো। সেখানে দুটো বাঁশের চোঙ্গায় কয়েকটা বাঁশের কাঠি রয়েছে। আর তার ডগায় এক টুকরো করে ভাঁজ করা কাগজ।

ও সেই চোঙ্গাটা ঝাঁকিয়ে বললো, একটা তোলো।

আমি তুললে কাঠিটা থেকে কাগজের টুকরোর ভাঁজ খুলে পড়ে বললো, এতে লেখা আছে তোমার আরও উন্নতি হবে। সামনে কিছু দুঃখ আছে, তবে তা কেটে যাবে।' এবার আমি তুলছি। চোখ বুজে বুদ্ধের নাম করতে করতে ওর কাঠির কাগজটা পড়ে একদম চুপ হয়ে গেল।

জিগ্যেস করলাম, কী হলো ? বল কী লেখা আছে ? তবে যাই লেখা থাক না কেন, আমি তা বিশ্বাস করি না। যাই হোক, বল কী লেখা আছে ?

নেত্রার মুখটা করুণ, খুব খারাপ। আমার সমূহ বিপদ। তোমার ভালো আর আমার বিপদ এটা কী করে হলো অতীশ। আমি তোমায় ছেড়ে নড়ছি না বলে, আমার হাত ধরে কেঁদে ফেললো।

আমি যত বলছি এসব বাজে। বিশ্বাস করো না। ও ততই বলছে, তুমি জানো না, এগুলো সব মন্ত্রঃপূত। সব ঠিকঠিক ফলে।

—আচ্ছা, তুমি আর একটা তোলো।

—দাঁড়াও, বুদ্ধকে আগে প্রণাম জানিয়ে নেই, তারপর তুলছি। তারপর তুললো আর একটা কাঠি। এতে লেখা আছে এবারের মত বিপদ কেটে যাবে। থাক্, তবু তো বিপদ কেটে যাবে। বিপদ কিন্তু হবেই, কিন্তু সে বিপদ কী ভাবে আসবে, কে জানে ?

—ছাড়ো তো, এসব ভেবে মন খারাপ করো না। এখন দেখছি এখানে না এলেই ভালো হতো।

মেলায় খুব ভিড়। সেই ভিড় কাটিয়ে আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে চলে এসেছি। নেত্রা কী একটা জিনিস কেনার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এলে জিজ্ঞেস করলাম, কী কিনলে ?

—হাঁ করো। মুখে দিয়ে বললো, বলতো এটা কী ?

—বললাম, এ তো তেঁতুল। তেঁতুল তো টক হয়। এযে মিষ্টি।

—নেত্রা হাসছে, আমাদের তেঁতুলও মিষ্টি।

সত্যি এ দেশের সব ফলই খুব মিষ্টি, যেমন আম, তেমনি পেয়ারা, লিচু, আনারস,

কমলা, আঙুর, রামভুটান। আর তেমনি মিষ্টি তুমি।

—গাড়িতে উঠে বসে বললো,—চল্লিশ কিঃ মিটার গেলেই সুখথাই (সুখোদয়) তোমার তো আবার ইতিহাস জানা চাই। সেটা গাড়িতেই সেরে নেওয়া যাক। খেমেরদের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন থাইদের প্রথম রাজধানী হলো সুখথাই, আর প্রথম রাজা শ্রীইন্দ্রাতীথ। সেটা ছিল আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে। থাইরা দক্ষিণ চিন থেকে এসে তখনও এই উত্তর ভাগেই বাস করতো। এখানকার রাজা রামাথায়েঙই থাই লিপির স্রষ্টা। বর্মী'মণ্, কম্বোজের হিন্দুধর্মা'ভিত্তিক খামেরদের কৃষ্টি, শ্রীলঙ্কার থেরাভেদা বৌদ্ধধর্মে'র দর্শন, চিনাদের ভাবধারা সব মিলেমিশে এক থাই কৃষ্টি, তৈরি হয়েছিল এই সুখথাইতে। চিনাদের থেকে থাইরা শিখেছিল সিল্ক আর রঙিন পর্সে'লিন তৈরি করতে। তাই এখানকার রাজা রামাথায়েঙকে ফাদার অফ থাইল্যান্ড বলা হয়।

আমরা চাওপিয়াও নদী ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে চলেছি বর্মী'সীমার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লাম সেই সুখথাই। প্রথম দর্শনে কিন্তু কোনও সুখের উদয় হলো না, যেমন হয়েছিল দুহাজার বছর আগের তৈরি কৈলাস মন্দির দেখে অথবা বেলুড়, হালেবিডু দেখে। সেই শহরের চিহ্ন বলতে, আছে কয়েকটা ইট পাথরের বাড়ি আর মন্দিরের ভিত্তিভূমি। সে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোথাও সূক্ষ্ম কারুকার্য বা বিশেষ স্থাপত্যের নিদর্শনও দেখা গেল না, যেমন দেখা যায় কোনার্কে'র মন্দিরে। একটা মন্দিরের কিছু নেই, আছে কয়েকটা ভাঙা থাম আর একটা বুদ্ধের বিশাল মূর্তি'। যাই থাক, সবটা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে সবুজ ঘাসে, ফুলের গাছে সুড়কি বেছানো বীথিতে। মিউজিয়ামের সংগ্রহও খুব সামান্যই, কিছু বৌদ্ধ মূর্তি', চিনামাটির বড় বড় কলসি, সেকালের যুদ্ধের কিছু উপকরণ।

নেত্রা খুব উৎসাহের সঙ্গেই ঐ সব দেখাচ্ছিল।

তুলনা করে ওর উৎসাহকে দমিয়ে দিতে মন চাইছিল না। ও একটা মস্ত পুকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, তুমি 'লয় ক্রাথঙ' দেখেছ?

—হ্যাঁ দেখেছি। তোমাদের সংক্রানের (নববর্ষে') সন্ধ্যায় একটা ছোট্ট কাগজের নৌকায় ধূপ দীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিতে দেখেছি লুম্পিনীর খালের জলে।

—এর প্রথম প্রচলন এখানেই হয়েছিল। তখন রাজা রানী ও নগরের গণ্যমান্যরা শোভাযাত্রা করে আসতো এখানে। তাদের আগে থাকতো নগরসুন্দরীরা রাজকুমারীদের সঙ্গে। নাচে গানে আবাহন করা হতো নববর্ষকে, আর ধূপ দীপ জ্বালিয়ে পূর্ব'পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হতো।

বললাম, ওহে সুন্দরী, আমাদের দেশেও এমনি প্রথা আছে। সেখানে প্রদীপ ভাসানো হয় গঙ্গার জলে। তারপর ওর হাত ধরে বললাম, আর দেরি নয়। এবার সোজা চিয়াংমাই।

নেত্রা বললো এবার তুমি বসো। আমি গাড়ি চালাই। তুমি এতদূর একা চালিয়ে নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।

—ক্লান্ত আমি হইনি। তা হলেও তুমিই চালাও। পাহাড়ি রাস্তায় চালানো অভ্যাস আছে তো?

—তা অবশ্য নেই, তবে চালাতে পারবো। খুব একটা উচু পাহাড়ে তো উঠতে হবে না, আর ধর দুশ মিটার।

—মোটে, তাহলে আবার এটা হিল স্টেশান কী?তার জন্য এত বাখানো কেন বাপু? আমাদের দেশে তো দুতিন হাজার মিটার উচু না হলে আমরা তাকে হিল স্টেশানই বলি না। মেঘের দল যদি ভাসতে ভাসতে ঘরে ঢুকে কিছুটা ভিজিয়ে না দেয়, তাহলে ওটা হিলস্টেশানই নয়। তোমাদের ঢাক ঢোলের আওয়াজটা খুব সোচ্চার। তবে তোমাদের দেশে দুটো জিনিসের প্রাচুর্য আছে টুরিস্টদের টেনে আনার জন্যে, ওয়েল ডেভালাপ্‌ড সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি আর দ্বিতীয়টা নাই বা বল্লাম।

—বেশ বাবা, বেশ, আনাদের কিছুই নেই, তোমাদের অনেক আছে। তা থাক, তবু আমাদের এখানেই বেশী লোক আসে দেখতে, তোমাদের চাইতে অনেক বেশী, তোমার কথা থেকেই জেনেছি।

—এই, সামনে একটা সার্প বেন্ড আছে। একদম বাঁ পাশ দিয়ে যাও। আবার বেশী কাটালে কিন্তু খাদে পড়বে।

—ভয় দেখিও না তো। আমি ঠিক নিয়ে যাবো। এই যাঃ। সেই যে ভাগ্যে আছে বিপদ, বলে ও গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো। না, তুমিই চালাও।

আমি গাড়ির একসিলারেটারটা টিপে বললাম, আমি চালালে বুঝি কিছু হবে না?

—না মশাই, তোমার কোনও বিপদের কথা তো লেখা ছিল না। অতএব তুমি চালালে, আমি বেঁচে যাবো।

ভাবলাম, থাক গিয়ে, ও নিয়ে আর তর্ক করে লাভ নেই। উৎরাই পথ সুরু হয়েছে। পথ সর্পিল হলেও প্রশস্ত। বাঁকগুলো তীর্যক নয়। পাহাড়টা পরেশনাথ পাহাড়ের মত। সবুজ গাছের ঠাসবুনুনি নেই পাহাড়ে। মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক ঝাঁক সিমুল ফুল রঙ মিলিয়েছে রাস্তার ধারের কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে।

—কী রকম লাগছে অতীশ?

—খু-উ-ব ভালো।

—তুমি তো বলেছো দেখার মত কিছু নেই, শূন্য কুম্ভের আওয়াজ বেশী, তাহলে ভালো লাগছে কেন?

—তার দুটো কারণ—এক নম্বর হলো, এক যাত্রায় প্রায় থাইল্যান্ডের অর্ধেকটা দেখা হয়ে যাচ্ছে আর দুই নম্বর হলো সবজান্তা সুন্দরী গাইড পেয়েছি একান্তভাবে। আগামী দিনের ফ্যান্টাসি, খুশির আমেজ এনে দিচ্ছে।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে বললো, সে গুড়ে বালি।

আরও কিছুটা যবার পর পাহাড়ের ঢাল পেরিয়ে আমারা সমান সরল রাস্তায় চলে এসেছি। সূর্য তখন তড়িঘড়ি পাহাড়ের পেছনে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। উড়ন্ত বলাকা, আগুনরাঙা টুকরো মেঘ, হিল্লোলিত কাশবন, দিগন্তের কালো পাহাড় এক স্বপ্নালু পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আমি গাড়িটা রাস্তা থেকে নামিয়ে দাঁড় করালাম। এসো নেত্রা, এখানে একটু বসি।

—তুমি কী করে বুঝলে আমার মনের কথা। আমারও একই ইচ্ছে হাচ্ছিল।

আমি ওকে হাত ধরে নামিয়ে বললাম, দেখলে তো, কী রকম ভাবনার মিল।

আমি পা ছড়িয়ে বসলে ও আমার কোলে মাথা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো, স্নিকার আর মোজাটা খুলে।

—দেখ দেখ, মেঘগুলো কত রকম ছবি আঁকছে নীল আকাশের বুকে?

– সত্যি অপূর্ব। এ ছবিগুলো অনেকটা মডার্ণ আর্টের মত। একই ছবি এক এক জনের কাছে এক এক রকমভাবে ধরা দেয়। তুমি এগনি এণ্ড এক্সটাসি ছবিটা দেখেছ, যেটা মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনের একটা অংশ।

নেত্রা বললো, না দেখিনি।

জিজ্ঞাস করলাম, তুমি রোম গিয়েছ?

—গিয়েছি।

—সিস্‌টাইন চ্যাপেল দেখেছ?

নেত্রা আমার ঠোঁটে হাত বুলিয়ে বললো, তুমি কি এমনি হাবা পেয়েছ আমাকে যে রোমে গিয়ে আমি ওটা দেখবো না। এঞ্জেলোর অপূর্ব সৃষ্টি, পিয়েতাও দেখেছি।

—সিলিং এ যে এঞ্জেলোর বিরাট ফ্রেসকো আঁকা আছে, সেটা তা হলে নিশ্চয় দেখেছ?

—দেখেছি বই কী? তবে খুব একটা মনে নেই। কেন, বলতো?

—ঐ ছবিটা আঁকবার সময় উনি একবার করে কাগজে খসড়া করছিলেন আর ছিঁড়ে ফেলছিলেন, কিছুতেই মনের মত হচ্ছিল না। পাগলপারা ব্যর্থতা নিয়ে উনি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন এমনি এক গোধূলি-রাঙা আকাশের দিকে। সেদিনও এমনি খণ্ড খণ্ড মেঘ ছিল। হঠাৎ উনি সক্রেটিসের মত চীৎকার করে উঠলেন—পেয়েছি, পেয়েছি। উনি পেয়ে গেলেন তার বাঞ্ছিত ছবির রূপরেখা।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে দিন রাত বসে তার রূপ দিলেন কাগজে, সৃষ্টি হলো সেই অপূর্ব ছবি।

—তা, তুমি কী দেখছো ?

আমি ওর মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে, গালটা টিপে বললাম, আমি দেখছি তোমার মুখখানা, ছোট থেকে বড় হয়ে উড়ে যেতে। ছেঁড়া ছেঁড়া চুলগুলোও উড়ছে তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে, আর ধরা পড়ছে এখানে।

—দারুন কাব্য করতে পারো তো তুমি। আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—তুমি প্রথমে আমার সম্বন্ধে এত ডিসইন্টারেসটেড ছিলে কেন ? কলেজ জীবনের কথা না হয় ছেড়েই দাও, এখনও তো সব ছেলেরা আমাকে দেখলে ছোঁক্ ছোঁক্ করে। আমার ভীষণ আত্মসম্মানে লেগেছিল।

—হেসে বললাম, স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কত গভীর, তা এখন বুঝতে পারছ তো।

আমার হাতের উপর নরম হাতটা রেখে হেসে বললো, বাব্বা, তোমার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না। দ্যাখো, কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এখান থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। অক্সফোর্ডে থাকতে গ্রীষ্মের দিনে চাঁদনি রাতে আমি আর অভিজিৎ এমনি করে মাঝে মাঝে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকতাম।

—আমি আর মনীষাও বসতাম, তবে পাহাড়ের ধারে নয়, গঙ্গার ধারে। ও আমার হাতটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে ওর বুকের ওপর। ওর বুকের স্পর্শে না-বলা কথা যেন শুনতে পাচ্ছি। চাঁদের মা বুড়ি ওপর থেকে দেখে ফোকলা দাঁতে হাসছে। কতক্ষণ ঐ ভাবে বসেছিলাম, খেয়াল নেই।

দূরে চিয়াংমাইর আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে নেত্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, চলো অতীশ এবার যেতে হবে।

এখন আবার নেত্রা চালাচ্ছে। আধঘন্টার মধ্যেই আমরা পেঁাছে গেলাম থাইল্যাণ্ডের দ্বিতীয় শহর চিয়াংমাই। নামটা শুনেই বোঝা যায় যে চিনা গন্ধটাই বেশী উগ্র এখানে। বড় শহরের দোষগুলো এখানে এখনও চোখে পড়েনি। রাস্তায় যানজট নেই, বহুতল বাড়ির বদলে ছোট ছোট বাড়িই বেশী, ব্যক্তিগত দোকান-পাটই দেখা যাচ্ছে। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী, নাম তার মেনাম্ পিঙ্গ। (মেনাম—অর্থাৎ মায়ের বারিধারা)। দেওয়ালে ঘেরা পরিখাপরিবৃত একটা জায়গা দেখিয়ে নেত্রা বললো, এটা চিয়াংমাইর রাজপ্রাসাদ ছিল। পাঁচশো বছর আগে পুরো শহরটা ঘিরেই ছিল উঁচু দেওয়াল, সেটা এখন ভেঙ্গে গেছে।

গাড়ি এসে থামলো হুয়ে-কিউ-রোডের উপর চিয়াংমাই অর্কিডে, বেশ বড় হোটেল, আড়াইশর উপর ঘর আছে।

আমি বললাম, তা হলে তুমি আর দেরী করো না। আমায় নামিয়ে দিয়েই চলে যাও তোমার বন্ধুর বাড়ি।

আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নেত্রা বললো, তুমি কী সত্যিই চাও, আমি চলে যাই ?

—আমার তো ইচ্ছে, তুমি থেকে যাও। একা কারই বা ইচ্ছে করে হোটেলে থাকতে। তুমি বলেছিলে বলেই বলছি।'

রিসেপশনিস্টের কাছে গিয়ে বললাম, দুটো পাশাপাশি সিঙ্গল রুম পাওয়া যাবে ?

সে বিস্ময়ে হতবাক। আমাদের দিকে ভালো করে দেখে সামলে উঠে জিজ্ঞেস করলো, স্যার ডাবল রুম চাইলেন, না পাশাপাশি ডাব্‌লবেডেড্ রুম চাইলেন ?

নেত্রা পাশে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছিলো। এগিয়ে এসে বললো, উনি বলতে একটু ভুল করেছেন। আসলে আমরা একটা ডাব্‌লবেডেড্ রুমই চাই।

মহিলা আমার নামধাম লিখে সই করিয়ে নিল, কিন্তু নেত্রাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। সঙ্গিনীর নাম ঠিকানা উহ্য রাখাই বোধহয় এখানকার রীতি। বেলবয়কে চাবিটা দিয়ে হেসে বললো, আপনাদের খুব ভালো ঘর দিয়েছি, উইস ইউ হ্যাপি স্টে উইথ আস্।

আটতলার উপর ঘরটা সত্যিই সুন্দর। ঘরে সব ভিক্টোরিয়ান আমলের কারুকার্য করা আসবাবপত্র। মাঝের টেবিলে এক্ গুচ্ছ লাল গোলাপ। বালিশের উপর দুটো বেলফুলের মালা। সেন্টার টেবিলে বরফের পাত্রে ডোবানো একটা স্যাম্পেনের বোতল, পাশেই একটা কার্ড—উইথ কম্‌প্লিমেন্টস্ ফ্রম ম্যানেজমেন্ট। কাঁচের দেওয়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে উঁচু পাহাড়ের ওপর আলোর আঁকা বাঁকা রেখা। সুন্দর দেখাচ্ছে রাতের চিয়াংমাই। আমি জুতো মোজা খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

নেত্রা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু ঠিক করে আমার পাশে বসে—হাই, ডার্লিং, হাউ আর ইউ ফিলিং ?

—গ্রেট। একটা নতুন জীবনের স্বাদ।

নেত্রা মুচকি হেসে, দেখে আবার স্বাদ পাওয়া যায় নাকি ?

আমি চেপে ধরতেই, এই ছাড়ো ছাড়ো আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

এবার কী প্রোগ্রাম ?

—গম্ভীর হয়ে বললাম, আগে চা, তারপর স্নান, পান, খানা।

তারপর...... ?

—নেত্রা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললো, তারপর ঘুম। নো ডিস্টারবেন্স।

চা-এর অর্ডার দিয়ে ও স্যুটকেস খুলে সব জামাকাপড় গুছিয়ে রাখতে লাগলো ওয়ার্ডরোবে। চা খেয়ে, ও স্নানের ঘরে ঢুকলো।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবছিলাম, কী ছিলাম আর কী হয়েছি। অজানা এক ছোট্ট গ্রামের ছেলে, খালে বিলে বনে বাদাড়ে দাপিয়ে বেড়াতাম। সমীহ করতো সবাই কারণ আমি ছিলাম জমিদার দর্পনারায়ণের পৌত্র। সব ছেড়ে, শুধু দর্পটুকু

সম্বল করে, সব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে এতটা পথ এগিয়ে এসেছি, একটা জায়গায়ই রয়েছে শূন্যতা।

'আমি এসে গেছি', ডাকে সে শূন্যতা যেন ভরে গেল।

বেরিয়ে এল এক সদ্যস্নাত অপরূপ সুন্দরী। আমার চোখ আটকে গেল। স্মৃতিচারণ বন্ধ হয়ে গেল।

—কী দেখছো হাঁ করে অসভ্যের মত, বলে হেসে দিল।

—দেখছি তোমাকে।

—পাতলা গোলাপী নাইলনের নাইটিতে তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে, যেন ইন্দ্রের সভা থেকে নেমে এল এক উর্ব্বশী।

—উর্ব্বশী বুঝি খুব সুন্দরী ছিল ?

—কবি-কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছিল উর্ব্বশী, কিন্তু কল্পনা দিয়ে গড়তে হচ্ছে না তোমাকে।

—তুমি কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছো। যাও এবার স্নান করতে। আমি খাবার অর্ডার দিচ্ছি। আমরা আজ ইংলিস ডিনার খাবো—সুপ, ফিস এণ্ড চিপস্ তার সঙ্গে পুডিং।

—না, না পুডিং নয় চকলেট আইসক্রিম্।

আমি স্নানে ঢুকলাম। বাথটাবে সাবানজলের ফেনা করে রেখেছে নেত্রা। আমি সেই জলে গা ডুবিয়ে গুন্ গুন্ করে গান করছিলাম। ওটা আমার অনেক দিনের অভ্যাস।

'আমি চিনি গো চিনি ওগো বিদেশিনী
তুমি থাকো সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী
তোমায়.......
আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি তোমারি গান
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে।'

দরজার কাছে হাততালি শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, দরজার ফাঁকে নেত্রার মুখ।

—দারুণ সুর। বেরিয়ে এসে আমায় মানে বলে দেবে। তোমার গলায় তো সুন্দর সুর আছে।

—এই যাঃ! দরজাটাই বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

শিগ্‌গির ভাগো। আমি উঠতে পারছি না।

আমি তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে আসতেই, কী ব্যাপার তুমিও মডেলিং করছো নাকি ?

—তোমায় দেখতে দেখতে সব গোলমাল হয়ে গেছে। জামাকাপড়ই তো বের করিনি।

—দাও, চাবি দাও, আমি বের করে দিচ্ছি। এই শোনো, তোমার জন্য স্কচ আনিয়েছি। আমার জন্য ছোট্ট জিন্। খাবার সঙ্গে স্যাম্পেন খাবো।

গ্লাস ঠোকাঠুকি করে চিয়ারস বলতেই ও আমার ঠোঁটটা আঙুল দিয়ে বন্ধ করে বললো, উই সে গড্ ব্লেস আস।

—আমি বললাম, 'আমেন্'।

নেত্রা গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললো, আমেন্।

—একি! তুমি বুদ্ধকে স্মরণ করলে না?

—বুদ্ধকে স্মরণ করলে আর তোমাকে স্পর্শ করা যাবে না। তাই ইংরেজদের মত যিশুকে স্মরণ করাই ভালো।

— কাল আমাদের প্রোগ্রাম কী?

—প্রথমে ফুলপরিদের শোভাযাত্রা, তারপর একটা কণ্ডাক্টেড্ ট্যুর তারপর নাইট বাজার। ও যাঃ, কনডাক্টেড্ ট্যুর তো বুক্ করা হয়নি।

—হ্যালো, হস্পিটালিটি, কাল সকালের কণ্ডাক্টেড্ ট্যুরের দুটো টিকেট বুক করুন আটশো কুড়ি নং ঘর।

—অত ঘোরাঘুরির দরকার কী, বাপু? বেশ খাও, দাও, স্ফূর্তি করো। এ দিনগুলো তো আর ফিরে আসবে না।

সার্ভিস বয় ট্রলি ঠেলে ঘরে ঢুকলো।

স্যাম্পেন সহযোগে খাওয়াটা ভালই হলো। নেত্রার একটু নেশা লেগেছিল।

আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে বলে, আমায় একটা গুডনাইট্ কিস্ করে শুয়ে পড়লো।

আমি একটা সিগারেট খেয়ে গল্পের বইটা নিয়ে শুলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুম এসে গেল। বাতিটা নেভাবার আগে পাশের খাটের দিকে একবার তাকালাম। নেত্রা নিষ্পাপ শিশুর মত ঘুমোচ্ছে, হাটুদুটো পেটের কাছে ভাঁজ করে। পা-ও যে চাঁপা ফুলের কুঁড়ির মত হয়, আর তা দেখে শরীরে বিদ্যুত খেলে যায় তার অভিজ্ঞতা এই প্রথম হলো।

ওর বুকের ওঠানামা আমার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওর নাইটিটা আলতো করে নামিয়ে, কম্বলটা গায়ে ঢাকা দিয়ে, বাতিটা নিভিয়ে, শুয়ে পড়লাম।

সকালে সার্ভিস্ বয় যখন বেড টি নিয়ে দরজায় টোকা মেরে ঘুম ভাঙ্গালো তখন দেখি আমার পাশে একই কম্বলের নীচে আমাকে জড়িয়ে ও শুয়ে আছে।

—আরে! আমি এখানে এলাম কী করে? এক গাল হেসে বললো, তা হলে নিশির ডাকে নিশ্চয় উঠে এসেছি। সুপ্রভাত সন্ন্যাসী মশাই।

॥ ৩৫ ॥

নেত্রার তাড়ায় তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম ফুলপরিদের শোভাযাত্রা দেখতে।

পাতায়ার মতই সব ফ্লোট। নানান রঙের ফুল দিয়ে এমন ভাবে সাজিয়েছে যে বোঝাই যায় না যে ওগুলো লরি। বোতাম ফুলই কত রকম রঙের, আর আছে মোরগ ফুল, এস্টার, জিনিয়া, ডালিয়া, গোলাপ আর অর্কিড। সেই ফ্লোটে রয়েছে সব গ্রাম্য দৃশ্য—চাষা লাঙ্গল চালাচ্ছে, মাছ ধরছে, কাপড় বুনছে, কাঠের কাজ করছে, কোনওটায় নৃত্যরতা সুন্দরীর দল। মানুষরাও পরেছে ফুলের পোশাক আর গয়না।

পাশেই বসেছে মেলা। মেলায় গাছগাছালির দোকানই বেশী। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আছে এখানকার বিখ্যাত সেলাডন্ চিনামাটির তৈজসপত্র, নীল আর সবুজ রঙের সেই পুরোনো ডিজাইন যা থাইরা শিখেছিল কয়েক শ' বছর আগে চিনাদের থেকে। সেই মৃত শিল্পকে এরা আবার বাঁচিয়ে তুলেছে। বিদেশের বাজারে এর খুব চাহিদা।

নেত্রা বললো, উৎসবের নাম উবন্ আসল্-বুচ্চা' (বুচ্চা নিশ্চয় পুজার অপভ্রংশ)।

হোটেলে ফিরে আসতেই দেখলাম, টুরিস্ট বাস অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

সুন্দর এয়ারকণ্ডিশানড্ বাস, প্লেনের মত এডজাস্টেবল চেয়ার। গাইড একটি মেয়ে কখনও ইংরেজিতে বর্ণনা দিচ্ছে, কখনও জাপানি ভাষায়, বেশ সুন্দরী, গলার স্বর মিষ্ট।

বাসের যাত্রী বেশীর ভাগই জাপানি। প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে স্থানীয় সুন্দরী যুবতী, এরা হলো এসকর্ট। এখানকার মেয়েদের সৌন্দর্য বিখ্যাত। চিনাদের রঙ ও মোলায়েম শরীর কিন্তু মুখের আদল ওদের মত চ্যাপ্টা আর চোখ চেরা নয়, সুন্দর মুখশ্রী। সব দেশের পর্যটকদের কাছেই এদের প্রচুর চাহিদা।

—কী দেখছো। ভাবছো, আমি না থাকলে এরকম একজন সঙ্গিনী পেতে।

ওর হাতটা একটু টিপে বললাম, আমার এসকর্ট তুলনাহীন।

শহর ছাড়িয়ে বাস একটা পাহাড়ে উঠছে। চারিদিকে পাইন গাছের জঙ্গল। এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে বাস উপরে উঠছে।

গাইড বললো, এটা হচ্ছে ডয় (পাহাড়) সুতেপ্। আমরা চলেছি ওয়াট্-প্রা-টাট্-ডয়-সুতেপ্ মন্দির দেখতে। এ মন্দিরের দেবতা খুবই জাগ্রত। মন্দিরের বুদ্ধ মূর্তি পড়ে ছিল অবহেলাভরে এক গুহায়। চিয়াংমাইর রাজা একদিন স্বপ্নাদিষ্ট হলেন, তাঁকে নিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পুজো দেবার জন্যে। রাজা শ্বেত হস্তি

নিয়ে এলেন সেই আদিষ্ট জায়গায়। গুহামুখ পরিষ্কার করে সত্যিই পাওয়া গেল বুদ্ধদেবের সোনার মূর্তি। সেই মূর্তি নিয়ে রাজা চললেন পাহাড়ের পথে। হাতি এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। কোনও মতেই তাকে নড়ানো গেলো না। রাজা তখন সেইখানেই মন্দির স্থাপন করে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। সেটাই হলো টাটু ডয় সুতেপু।

বাসটা যে চত্বরে এসে থামলো, সেখানে কিছু দোকানপাট আছে—পুজোসামগ্রির, সভেনেয়ারের আর খাবারের।

জিজ্ঞেস করলাম, মন্দির কোথায়?

নেত্রা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ঐ পাহাড়ের চূড়ায়।

খাড়া উঠে গেছে সেই চূড়া। অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে তবে দর্শন মিলবে ঠাকুরের। মাথায় থাকুক আমার ঠাকুর।' আমি অতগুলো সিঁড়ি ভাঙ্গতে নারাজ।

নেত্রা জেদ ধরলো, তোমাকে যেতেই হবে। আমি যদি যেতে পারি তবে তুমিও যেতে পারবে। চল।

আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়িতে বসিয়ে বললো, বেঁচে গেলে, তোমায় আর সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে না। ইলেকট্রিক উইঞ্চ দিয়ে তোমাকে টেনে তোলা হবে।

পাহাড়ের গায়ে দুটো রেল বসানো আছে মাঝে আছে, দাঁত কাটা র‍্যাক, ওপরে আছে উইঞ্চ। এক সারি গাড়ি যখন ওঠে তখন পাশের লাইন দিয়ে আর এক সারি গাড়ি নামে।

পাহাড়ের চূড়াটা সমান্তরাল করে কেটে তৈরি করা হয়েছে এই মন্দিরের চত্বর। মন্দিরের এক পাশে আছে সন্ন্যাসীদের আবাসন। মূল মন্দিরের চারিদিকে খোলা বারান্দা। সব থাই ওয়াট যে রকম হয় এ মন্দিরও প্রায় একই ধাঁচে তৈরি, কিছুটা বৈচিত্র্য আছে বার্মা স্থাপত্যের প্রভাবে অর্থাৎ প্যাগোডার ঢং কিছুটা রয়েছে, মন্দিরের বহুলাংশই পাইন কাঠের। দেওয়ালে বৌদ্ধ জাতকের ছবি।

পদ্মাসনে বসা ধ্যানস্থ বুদ্ধের সামনে যথারীতি ধূপ দীপ দিয়ে তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। বৌদ্ধ জাপানিরাও স্বধর্ম্মি সঙ্গিনীদের নিয়ে প্রদক্ষিণ করছিল।

নেত্রা নীচের দোকান থেকে পাঁচটা প্যাকেট কিনে এনেছিল। প্রত্যেক প্যাকেটে ছিল নিত্যব্যবহার্য্য সব জিনিস—টুথব্রাস, পেস্ট, তিনটে সাবান, তোয়ালে, মাথার তেল, এক প্যাকেট ব্লেড আর কিছু ফল। পাঁচজন সন্ন্যাসীকে ঐ প্যাকেট দিয়ে ও প্রণাম জানালো।

এ মন্দিরে একটা বোধি গাছ আছে, সেটা নাকি গয়ার মূল বোধিগাছের চারা থেকে হয়েছে। নেত্রা সেখানে গিয়ে আবার প্রণাম করলো।

প্রায় এক হাজার মিঃ উচুতে এ মন্দির, তাই এর চত্বর থেকে চিয়াংমাই শহরটা পুরো দেখা যায়। আমি বারান্দায় বসেছিলাম। নেত্রা তার সমস্ত পুণ্যার্জন শেষ করে এসে আমার পাশে বসলো।

আমি ওর পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এতো পুজো আর্চ্চা কেন করছো ?

ও আমার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে বললো, সেই ভাগ্যগণনার কথা মনে নেই তোমার ? আমার যা হয় হবে, তার জন্য চিন্তা নেই। না হয় মরবই, কিন্তু আমার সঙ্গে যে তোমারও অঘটন ঘটতে পারে।

—তুমি ভেবো না তো। কিছু হবে না।

গাইড মেয়েটির হুইসিল শুনে সবাই এসে উঠলো সেই পাহাড়ি ট্রেনটায়।

এরপর বাস এসে থামলো রাজার গ্রীষ্মাবাসে। সুন্দর বাগানের মধ্যে দোচালা রঙ্গিন টাইলে ছাওয়া বাংলো বাড়ি, মনেই হয় না যে এটা একটা রাজার বাড়ি। ভেতরে চিয়াংমাইর শিল্প সংগ্রহ রয়েছে, রুপার পাতের উপর এমবস্ করা কিছু গ্রাম্যদৃশ্য—সেলাডন্ পটারির হাতে তৈরি বিরাট বিবাট ঘট, মোষের চামড়ায় ফুটো করে করে নৃত্যরতা নারীমূর্তি, লতাপাতা করা ফার্নিচার, হাতির ছবি কার্পেটে। প্রজাপালক রাজা যে অতি সরল জীবনযাপন করেন, তা এই বাড়ি দেখলেই বোঝা যায়।

সেই সুতেপ্ পাহাড়ের উপর দিয়েই বাস চলেছে।

গাইড বলছে, এবার আমরা যাচ্ছি 'ম্যাওদের' গ্রাম দেখাতে। ম্যাওরা ভারতের নাগাল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মদেশের উত্তর ধরে আমাদের দেশ ছাড়িয়ে লাওসের উত্তরভাগ পর্যন্ত যে পাহাড় রয়েছে, সেই বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকায় বাস করে। এই অঞ্চলে আরও কুড়িটি পাহাড়ি জাত বাস করে তার মধ্যে আর প্রধান দুটি হলো ইয়াও ও একাও। এরা এখনও তীর ধনুক দিয়ে বন্য জন্তু শিকার করে। নিজেদের কাপড়-জামা নিজেরাই তাঁতে বানায়। এরা খুব সুন্দর তামার বাসন বানায়, আর নানান রকম রঙ্গিন পাথর দিয়ে বানায় গয়না। ওখানকার দোকানে আপনারা ওদের হাতের তৈরি জিনিস কিনতে পারেন। ঐখানেই আপনারা দেখতে পাবেন একটা জলপ্রপাত যার নাম 'ম্যাও ফ্লাঙ্গ'।

বাস এসে থামলো সেই ম্যাওদের গ্রামে। মাচার উপর সব খড়ের ঘর। বারান্দায় এক মহিলা কাপড় বুনছে, যেমন বানায় আমাদের নাগারা। এরা দেখতে তিব্বতীদের মত, লম্বায় একটু ছোট—খাঁটি মঙ্গোলিয়ান। মোটা সুতোর কাপড়, দুটো শুধু রংয়ের ব্যবহার, গাছের ছাল থেকে তৈরি খয়েরি আর কালো।

বিদেশিরা দোকান ঘুরে ঘুরে টুকিটাকি কিনছে। আমিও নেত্রাকে না জানিয়ে দুটো মালা কিনে ফেললাম, পাথরগুলো দেখে মনে হয় গোমেধ, নীলা, কষ্টিপাথর, রুবি, সুতো দিয়ে গাঁথা।

—এই, তুমি কোথায় পালিয়েছিলে ? চল ঝরণাটা দেখে আসি।

ছোট্ট ঝরণা, দার্জ্জিলিং যাবার পথে যে পাগলা ঝরা রয়েছে, তার মত।

আমার আর নেত্রার একসঙ্গে একটা ছবি তুললাম এখানে, তুলে দিল সেই গাইড মেয়েটি।

বাস এবার নেমে এলো একটা লেকের পাশে।

গাইড বললো, আপনারা সবাই এখানে খেয়ে নিন। আমরা ঠিক সাড়ে তিনটের সময় আবার বাস ছাড়বো।

চার পাঁচটা টুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে। রেস্টুরেন্টে বেশ ভিড়।

আমরা বার থেকে এক বোতল বিয়ার আর কোক নিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসলাম।

নেত্রা কোকে চুমুক দিয়ে বললো, কী রকম লাগছে?

—ভালই। পাহাড় আমার সবসময়ই ভালো লাগে। দেখনি শোয়ার ঘরে একটা বরফ ঢাকা পাহাড় আর ঝরণার মস্ত একটা ছবি দেওয়ালের খাঁজে লাগিয়েছি। দেশে থাকতে সুযোগ পেলেই আমি পাহাড়ে ট্রেকিং করতে চলে যেতাম কাঁধে হ্যাভারস্যাক্ নিয়ে।

বিয়ারের বোতল শেষ হতে হতেই খাবার এসে গেল—ভাত, সিলভার ট্রাউট্ ভাজা, আর মুরগীর মাংস। খাওয়া শেষ হলে একটা করে আইসক্রিমের কাপ নিয়ে আমরা লেকের ধারে লনে গিয়ে বসলাম।

লেকটা খুব একটা বড় নয়। ঝরণার জলটা বাঁধ দিয়ে আটকে এই লেক তৈরি হয়েছে। লেকের জলে পেডেল বোট, আর ছোট ছোট নৌকো রয়েছে। দুদিকে পাহাড়। একদিকে পাহাড়ের গায়ে কতগুলো 'লগ হাউজ'। তাতে সঙ্গিনী সহ কিছু টুরিস্ট রয়েছে।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

নেত্রা আমার হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মুখের দিকে তাকিয়ে, তুমি আর কতদিন আছো এখানে?

—তা তো জানি না। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।

—এরপর কোথায় যাবে?

—তাও জানি না। সারা পৃথিবী জুড়েই আমাদের কারখানা আছে। যেখানে বদলি করবে সেখানেই যেতে হবে।

—গলার স্বর আরও নামিয়ে বললো, না গেলে হয় না?

—তাহলে তো চাকরি চলে যাবে।

—একটু বিরক্ত হয়ে বললো, যাক না।

—তা হলে চলবে কী করে? শুধু তো আমি নয়, বাবা মাও তো আমার দিকে চেয়ে আছে।

—মুখটা আরও এগিয়ে এনে বললো, কেন, একটা ব্যবসা করবে। ছোট্ট একটা কারখানা করবে।

—আমার নামে তো ব্যবসা করতে পারবো না এখানে।

—সে কোনও ব্যাপার নয়, আমার নামে করবে।

—বিনা পয়সায় তো আর ব্যবসা হয় না। অনেক টাকার দরকার। সে টাকা তো আমার নেই।

—কত লাগবে? আমি দেবো।

—সে যে অনেক টাকা। তুমি কোথায় পাবে অত টাকা?

—আমি অনেক সম্পত্তি পেয়েছি, মার কাছ থেকে। মা পেয়েছিল, তার বাবার কাছ থেকে।

—ভাবতে হবে তাহলে। ব্যবসা তো কোনও দিন করিনি, ঠিক আটঘাট জানা নেই।

—ঠিক আছে, ভেবে দ্যাখো। এবার ফিরে গিয়ে একটু খোজ খবর নিয়ে একটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট করে ফেলো। এখানে ব্যবসা করলে তো আর তোমাকে অন্য জায়গায় থাকতে হবে না। তা হলে তোমার বাবা মাকেও নিয়ে আসবো। আমার বাবারও তাহলে আপত্তি হবে না তোমাকে জামাই করতে।

আমি ওকে আরও কাছে টেনে এনে বললাম, আমার বাবা মাকেও নিয়ে আসবে? ওদের সঙ্গে কথা বলবে কী করে? আমার মা তো ইংরেজি জানে না।

—আমি তোমাদের ভাষা শিখবো, যেমন তুমি শিখছো আমাদের ভাষা। এবার ফিরে গিয়েই কিন্তু তোমাকে শেখাতে হবে। কিছুটা শিখলেই আমাকে তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের দেশে।

—আমি বাংলায় বললাম, খুব ভালো কথা।

—কী বললে?

বললাম, 'বক্ ডী মাগ্'।

ও খুব সিরিয়াসলি বললো, এবার গিয়েই কিন্তু একটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট করে ফেলবে।

—বেশ তাই হবে। হাতে তো আরও দুটো বছর আছে।

—আমিও জোর পড়া আরম্ভ করবো বাংলা।

আমি খুশি হয়ে বললাম, তা হলে রোজ পড়তে হবে আমার কাছে, রোজ আসতে হবে।

—তা কেন? পড়া দিয়ে দেবে। পড়া করে সপ্তাহে দুদিন আসবো।

—তা হলে শিখতে অনেক দেরী হয়ে যাবে, যত আমার সঙ্গে কথা বলবে তত তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে।

—ঠিক আছে, তাই হবে। একটা কণ্ডিসান—ছাত্রী শিক্ষকের সম্পর্ক রাখতে হবে।

হেসে বললাম, ছাত্রী শিক্ষক কিন্তু পড়া ছেড়ে প্রেম করে।

—আমি কড়া ছাত্রী।

আমাদের গাইডের বাঁশি শুনতে পেলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ঠিক সাড়ে তিনটে।

এবার বাসটা পাহাড় থেকে নেমে শহরের রাস্তা ধরলো, গল্ফ কোর্স পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে, ক্ষেত খামারের মধ্যে দিয়ে, পিং নদীটার ধার দিয়ে বাসটা এসে থামলো একটা গয়নার দোকানে।

পাথর বসানো গয়না রাখা আছে সো-কেসে। দেওয়ালে রয়েছে অনেক এমবস্ করা ছবি, পেছনের ঘরে বসে কারিগরেরা বানাচ্ছে। আগে এগুলো বানানো হতো রুপো দিয়ে। রুপোর অনেক দাম হওয়ায় এখন এগুলো বানানো হচ্ছে এলুমিনিয়াম দিয়ে। এলুমিনিয়াম গালিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে আঁচড়া দিয়ে আঁচড়ে ছবি তৈরী হচ্ছে, অপূর্ব সৃষ্টি।

জাপানি ভদ্রলোকেরা প্রায় সবাই গয়না কিনছে তাদের স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে আর এখানে এরা খুশি হচ্ছে ভাড়াটে সঙ্গিনীদের নিয়ে।

হঠাৎ নেত্রা জিজ্ঞেস করলো, তোমার মার বয়স কত ?

—আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, ষাটের কাছাকাছি। কেন ?

—এমনি। একটু কৌতুহল হলো, তাই। তুমি এদিকটায় থাকো। আমি আসছি।

ও আমাকে রেখে অন্যপাশে চলে গেল। আমি দেখলাম ও কী একটা ব্যাগে ঢুকালো, কিন্তু টাকা বের করলো না। আমিও ঐ ফাঁকে রুবি বসানো এক জোড়া দুল কিনে ফেললাম।

বাসের মাইকে সেই মিষ্টি গলার আওয়াজ, এবার আমরা চিয়াংমাইর রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি। থাইরা প্রথম এখানেই এসেছিল চিনের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে। আর থাইদের রাজধানী ছিল এই চিয়াংমাই। কম্বোজের খামেররা ছিল তখন সবচাইতে শক্তিশালী। তারা রাজ্য বিস্তার করতে এতদূরে আসতে পারেনি। তাই আমরা এখানে বেশ শান্তিতেই ছিলাম। তারপর রাজা ইন্দ্রাতীর্থ যখন সুখথাইতে রাজধানী স্থাপন করলেন তখন এখানকার রাজা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। আমাদের কৃষ্টি, আমাদের শিল্প, আমাদের এখানকার কথ্য ভাষা থাইদের থেকে কিছুটা আলাদা। আমাদেয় কথায় চিনা শব্দের ব্যবহার বেশী, তবে আমাদের লেখার ভাষা একই। আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম এসেছিল চিন আর ব্রহ্মদেশের মনুদের থেকে। এই এসে গেছি আমরা। সেই প্রাচীন প্রাসাদ আর নেই। এখন যা দেখছেন, তার বয়স দুশো বছরও নয়।

এ প্রাসাদে দেখবার মত কিছু নেই। প্যাগোডার ঢংএর একটা মন্দির, যা একটু দেখার মত।

আধঘণ্টার মধ্যে একটা চক্কর মেরে, আমরা আর আধঘণ্টার মধ্যেই পেঁছে গেলাম হোটেলে।

নামবার সময় গাইড মেয়েটাকে যখন এক শ বাট দিলাম, খুব খুশি হয়ে নমস্কার করে বললো—'খাপ খুন খ্রাপ।' আজ আমার ভালই টিপ্স হলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রোজই গাইডের কাজ করো ?

ও বললো, না, শুধু শনিবার আর রবিবার। ঐ দুদিন আমার কলেজ ছুটি থাকে।

—তুমি কী পড়ো ?

—গ্র্যাজুয়েসান।

—কত পাও, এই কাজ করে ?

—মাসে টিপ্‌স নিয়ে ধরুন প্রায় দু হাজার বাটের মত। তাতে থাকা, খাওয়া, কলেজের মাইনে কোনও মতে চলে। আচ্ছা চলি বলে আর একবার নমস্কার জানালো।

ঘরে ঢুকে আমি কফির অর্ডার দিয়ে নেত্রার পাশে বসে ওর কানের চুলগুলো সরিয়ে দিতেই ও অবাক হয়ে বললো,—একি আমার কান ধরছো কেন ? আমি কী আজ থেকেই তোমার পড়ুয়া নাকি ?

আমি ওর মাথাটা ঘুরিয়ে বললাম, দাঁড়াও না। চুপ করে বসো। নড়ো না। যাও, এবার আয়না দিয়ে দেখো তো, কী রকম দেখাচ্ছে !

ও আয়নার কাছে ছুটে গেল, কানের দুলটা আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে।

—এ যে দেখছি ডিড়ির দুলের ডুপ্লিকেট্। ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল লাগিয়ে—'সুয়া-ই মাগ্ মাগ্ খাপ্ খুন খ্রাপ।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, সেদিন মনীষার দুলটা তোমার দারুণ পছন্দ হয়েছিল। এখানে ঠিক ঐ রকমটা দেখতে পেয়েই কিনে ফেললাম।

—তোমার ঠিক মনে আছে তো। থ্যাঙ্ক ইউ এগেইন। ওর ব্যাগ থেকে হীরার লকেট লাগানো একটা হার বের করে—দেখ তো এটা কেমন হয়েছে ?

—খুব সুন্দর। এটা তো অনেক দাম ? তোমায় খুব সুন্দর মানাবে ?

—আজ্ঞে, আমার জন্যে নয়। তোমাদের বাড়ি গেলে তোমার মাকে আমার তো কিছু একটা দিতে হবে। পছন্দ হয়ে গেল, কিনে ফেললাম।

—চেক ওরা নিল ?

—আমি তো চেক দেইনি। আমেরিকান এক্সপ্রেসের ক্রেডিট্ কার্ডে দিয়েছি। ওরা ব্যাংককে ফোন করে আমার ক্রেডিট্ ওয়ার্দিনেস্ জেনে নিয়ে তারপর দিল। তোমার মা খুশি হবেন ?

—নিশ্চয়। দারুণ খুশি হবে। জানো, আমার মা খুব বড়লোকের মেয়ে ছিল। আমাদেরও অবস্থা খুবই ভালো ছিল। আমার মার বাক্সভর্তি গয়না ছিল। হিরার পুরো সেট্ ছিল। আমায় একদিন দেখিয়ে বলেছিল, এগুলো সব তোর বৌকে দিয়ে যাবো। হায় কপাল, আজ তার কিছুই নেই।

অবাক হয়ে নেত্রা জিজ্ঞেস করলো, কী হলো ওগুলো ?

—দেশ ভাগ হবার পর একদিন ডাকাত এসে সব নিয়ে গেল। এখন শুধু মার পোড়া সোনার রূপ আর গলার একটা সোনার মালা।

নেত্রা বললো, তা হলে তো এটা দিলে উনি দারুণ খুশি হবেন।

—তা হবেন। তুমি যে আমার মার কথা ভেবে এটা কিনেছো তার জন্য ধন্যবাদ।

—কথায় কথায় ইংরেজদের মত ধন্যবাদ দিও না তো। আমরা ইংরেজ নই।

কফি এসে গেছে। ওর স্নান হলে আমি স্নান করতে গেলাম। স্নান করে বেরিয়ে এসে দেখি ও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনীষার দেওয়া শাড়িটা একবার কোমরে জড়াচ্ছে আবার খুলে ফেলছে। কিছুতেই বাগাতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে, 'দূর ছাই, হচ্ছে না', কাপড়টা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

পরনে শুধু কালো একটা প্যান্টি, গায়ে নীল একটা ব্লাউজ।

—এসো না, আমায় একটু পরিয়ে দাও।

—আমি কী করে পরাবো ? আমি কী শাড়ি পরি ?

—এসো না, তুমি তো দেখেছো, ঠিক পারবে।

—আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, তোমার সায়া কোথায় ?

—সায়া কী ?

—ঐ যে শাড়ির নীচে পরে।

—সে তো প্যান্টি না থাকলে পরে। আমার তো প্যান্টি আছে। আমাকে অবশ্য দিয়েছিল ডিডি, কিন্তু ওটা তো আনিনি।

—ওটা ছাড়া পরানো যাবে না।

ও হতাশ হয়ে বললো, তা হলে কী হবে ?

—তা হলে পরবে না শাড়ি।

ও জিদ ধরে বললো, না আমি পরবই।

আমি তখন অগত্যা আমার পায়জামা থেকে টেপটা খুলে ওর কোমরে বেঁধে দিলাম। ওর নিম্নাঙ্গের রূপ ক্ষণিকের জন্য আমাকে নিথর করে দিল।

—কী করছো ? তাড়াতাড়ি কর।

—আঃ, ভাবছি কী করে পরাবো।

শাড়ীর একটা দিক গিট দিয়ে ওর কোমরে বাঁধলাম তারপর আঁচলের অংশটা কাঁধের ওপর ফেলে একটা ফেট্টা দিয়ে কোমরে গুজে কুচি দিয়ে গুজে দিলাম। বেশ ভালই হলো শেষ পর্যন্ত।

—বাঃ ! এই তো পেরেছো। ঠিকই তো হয়েছে, বলে, ও আয়নার সামনে একটা ঘুরপাক খেয়ে নিল। থ্যাংক ইউ।

—বিউটিসিয়ানকে থ্যাংক ইউ দিলেই হয় ?

—ঠিক আছে, এই নাও। হলো তো? ভাগ্যিস লিপস্টিকটা আগে লাগাইনি।

আমরা বের হলাম নাইট বাজার দেখতে।

নাইট বাজার প্রতিদিন সন্ধ্যের পর বসে খোলা চত্বরে।

এটাও বিদেশিদের কাছে একটা দ্রষ্টব্য কারণ ওদের দেশে এ রকম বাজার তো আর দেখা যায় না। অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় রোববার পার্কে বা কোনও ছোট রাস্তার উপর ফার্মারস মার্কেট বসে। সেটা এত বড় বাজার নয় আর তাতে এত বিচিত্র জিনিস বিকোয় না।

হাতে তৈরি কত রকম যে জিনিস এসেছে—এমব্রয়ডারি করা ফ্রক, নানা রকম চিনামাটির তৈজসপত্র, ব্রোঞ্জের মূর্তি—বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণু পর্যন্ত, কাঠের তৈরি ঘর সাজাবার জিনিস—বাঁককাঁধে ফলওয়ালি, মোষের লাঙ্গল নিয়ে চাষা, জাল কাঁধে জেলে, কাঁচের বিড দিয়ে তৈরি ডিঙ্গি নৌকো, সিল্কের কাপড়, ম্যাওদের তৈরি কাপড়ের ফ্রক, চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ, ছোট্ট কাঠের প্যাগোডা, ওয়াট ও ছেদী, হাতির দাঁতের জিনিস, রঙ্গিন পাথরের গহনা, কাপড়ের পুতুল নৃত্যরতা থাই। বিদেশিরা খুব কিনছে, দরাদরি করে দিচ্ছে তাদের এসকর্টরা। বিক্রি করছে সব মেয়েরা।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে একটা চামড়ার দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। আমি একটা সুন্দর চামড়ার ব্যাগ পছন্দ করে নেত্রাকে বললাম, এটা দ্যাখো তো পছন্দ হয় কিনা?

—পছন্দ তো হয়েছে, কিন্তু তুমি এখানে কিনতে পারবে না। একদম ঠকিয়ে দেবে। আমি কিনে দিচ্ছি।

– তুমি দ্যাখ, আমি কিনছি।

সেই প্রাতুনামে জিনিস কেনারই মত করে আরম্ভ হলো পাঁচশো বাট থেকে, দুবার ফ্যাঙ্গ ফ্যাঙ্গ বলে বেরিয়ে এলাম।

দুবারই মহিলা হাত ধরে টেনে আনলো, তারপর মাই ডাই, মাই ডাই, (পারবো না) করতে করতে সঙ্গ লয় (দুশো) বাটে দিয়ে, মাই পেন রাই, (কিছু মনে করো না) খাপ খুন খ্রাপ বলে দিয়ে দিল।

—বাঃ। তুমি তো বেশ থাইদের মত জিনিস কিনতে শিখে গেছো।

নেত্রা আমার জন্য একটা থাই হাফ হাতা গলাবন্ধ টেরিকটের জামা কিনলো, তাতে খুব সুন্দর কাটা কাপড়ের কাজ করা আছে সামনেটা।

নেত্রা আমার হাত ধরে বললো, এবার চল কোথাও খেয়ে হোটেলে ফিরবো।

—কোথায় খাবে?

—তুমি তো আজ ইন্ডিয়ান সেজেছো' ইন্ডিয়ান দোকানেই খাবো। কাছেই একটা ইন্ডিয়ান / পাকিস্থানি রেস্তোরাঁ দেখেছি।

ভেতরে বসতেই একজন সেবিকা বরফ জল দিয়ে, নমস্কার করে, মেনু কার্ড এগিয়ে দিল।

দোকানের মালিক উঠে এসে—সেলাম সাহাব। ফরমাইয়ে। আপি কো সেবামে এ্যাজার কর রহে। সেলাম ভাবিজি। আপ হিন্দুস্থানি?

—সেলাম ভাইয়া। হাঁ, হাম হিন্দুস্থানি, হামারা বিবি থাই। আপ কাঁহাকে?

—হাম পেশোয়ারকে, লেকিন হামারা বিবিভি থাই, জিনোনে কাউণ্টারমে বৈঠি হায়। থাই বিবি বহুৎ আচ্ছি হোতি হ্যাই, সব কামকে লিয়ে মজবুৎ, আউর সব কামকে লিয়ে মজবুত, পেয়ারকে লিয়ে ভি বহুৎই খুব। ঠিক বোলা কি নেই, বলে খানিকটা হা হা করে হেসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, আপকো বিবি তো বহুৎ খুবসুরত্‌।

নেত্রা জিজ্ঞেস করলো, কী বলে এত হাসলো ভদ্রলোক?

ভদ্রলোক এবার ইংরেজিতে বললো, সার ম্যাডাম্‌, উই স্পোক ইন আওয়ার ওন্‌ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা এক দেশের লোক। কী খাবেন?

অর্ডার দিলাম তন্দুরি খাবার।

কিছুক্ষণ পর থাই বিবিজান এসে থাই ভাষায় নেত্রাকে জিজ্ঞেস করলো, খাবার মন্‌পসন্দ্‌ হয়েছে কিনা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কিছু যদি মনে না করেন, হানিমুন করতে এসেছেন বুঝি?

নেত্রা হেসে বললো, আমি ওর ফুয়িঙ্গ (বান্ধবী) ফানাইয়া (বৌ) নই।

বিবিজান হেসে বললো, ফুয়িঙ্গ থেকেই তো ফানাইয়া হয়।

যখন ফিরলাম তখন অনেক রাত।

—আর গল্প নয়। এসো শুয়ে পড়ি।

আজ আর নিশির ডাকের অপেক্ষা করছি না, বলে বালিশটা নিয়ে আমার খাটেই শুয়ে পড়লো।

আমি বইটা হাতে নিতেই সেটা কেড়ে রেখে দিয়ে আমাকে ওর দিকে ফিরিয়ে বললো, অনেক রাত হয়েছে আর বই পড়তে হবে না।

ওর নরম শরীরের উষ্ণ স্পর্শে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

সকালে চোখের উপর আলো পড়তেই সুন্দর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ওর কালো চুল ছড়িয়ে আছে বালিশের ওপর। ওর প্রশ্বাস আমার মুখে লাগছে—মহা শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ঘড়িতে দেখলাম সাতটা বেজে গেছে। আমাদের বের হবার কথা নটায়। উঠতে গিয়ে উঠতে পারলাম না, ওর কোমল হাত পায়ে আমি বাঁধা। নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি।

ওর কানের কাছে মুখটা নিয়ে—গুড মর্নিং মাই ফেয়ার লেডি।

চোখটা না খুলে—'উঁ', হুঁ, সুন্দর ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলে তো। আর একটু শক্ত করে আমাকে ধরে শোও না।'

—যাবে না? তা হলে আজ চিয়াং রাই বাদ দাও

—না, না তা হয় না বলে একটু উঠে বসে লজ্জায় দুই হাত দিয়ে বুকটা ঢেকে আবার কম্বলটা টেনে শুয়ে পড়লো। একটু হেসে বললো, চোখটা একটু বন্ধ করুন তো সন্ন্যাসী মশাই, আমি ড্রেসিং গাউনটা পরে আসি। তুমি চায়ের অর্ডার দাও।

॥ ৩৬ ॥

ও উঠে গেছে। ওর বালিশটা বুকের কাছে চেপে রাতের আমেজটা উপভোগ করছিলাম চোখ বুজে। বেশ লাগছিল। এ এক জীবনের নতুন স্বাদ, নতুন ভাবনা। ভাবনা, এর পর কী হবে? মস্ত বড় একটা প্রশ্ন চোখের সামনে ভাসছে।

এতদিন চিন্তা ছিল নিজেকে নিয়ে। এখন জড়িয়ে পড়লাম আর একজনের জীবনের সঙ্গে। আশা নিরাশার মাঝে দুলছে আমাদের ভবিষ্যত—ঘর বাঁধার একটা ক্ষীণ আশা আর নিরাশা, যদি ভবিতব্য সে ঘর ভেঙ্গে দেয়।

নেত্রাকে আমার ভালো লাগে কারণ দুজনের ইন্টারেস্ট মোটামুটি এক। আমার মতই ও ভালোবাসে খেলতে, গান শুনতে, ঘুরে বেড়াতে, প্রকৃতির রূপ বদলানো দেখতে, জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করতে, অজানাকে জয় করতে। ওর শিক্ষা আছে কিন্তু গর্ব নেই, ছেলেদের মত শক্তি আছে দৃঢ়তা আছে কিন্তু তার প্রকাশে উৎকট কাঠিন্য নেই, আছে একটা কমনীয়তা। পাশ্চাত্য পরিবেশে মানুষ হয়ে যেমন আধুনিকতা আছে, তেমনি আছে প্রাচ্যের রক্ষণশীলতার প্রতি সম্মানবোধ। আত্মবিশ্বাস আছে কিন্তু ভয় পায় ভাগ্যগণনায়। ও আমার অর্ধাঙ্গিনী হবার সত্যিই উপযুক্ত কিন্তু, সেই কিন্তুর জবাব ভাগ্যের লিখনে। সেটা যে পড়তে পারি না।

এই রকম ভাবনায় যখন ডুবে আছি তখন ও বেরিয়ে বললো, এ কী, তুমি এখনও শুয়ে? তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। অনেক দূর যেতে হবে।

—না গেলেই নয়? বড় আলসেমি লাগছে। বেশ লাগছে চুপচাপ শুয়ে থাকতে। তুমিও এসো না।

—উঠে যখন পড়েছি তখন চল। ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে তোমারও ভালো লাগবে। আমিও দেখিনি। রাত্রিটা তা হলে ওখানেই থাকবো।

অগত্যা উঠতে হলো। তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুর্গা নাম নিয়ে। কানে এলো মিষ্টি স্বর, বুদ্ধের নাম।

শহর ছাড়িয়েই পাহাড়ি পথ। আমরা ক্রমশই উপরে উঠছি। ঘন ঘন বাঁক নিয়ে, পথ পাহাড়ের গা বেয়ে কখনও উঠছে, কখনও নামছে, কখনও চলেছে উপত্যকা পথে। সারথী নেত্রা। পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে সব ছবির মত বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান। এ. সি. বন্ধ করে জানালা খুলে দিয়েছি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় নেত্রার চুল

উড়ছে। ম্যা পিং (মা পিং নদী) নদীর পাশ দিয়ে পথটা কিছুদূর এগিয়ে গেছে। নদী বেশ খরস্রোতা এখানে। নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সব মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি।

নেত্রা বললো, আর একটু এগিয়ে গেলে আমরা পাবো আর একটা নদী তার নাম ম্যা ইয়াইন। এই নদীগুলো গিয়ে পড়েছে চাউপিয়াও নদীতে। আর একটু পশ্চিমে ম্যা কঙ্গা (মা গঙ্গা-ম্যাকং) যেটা আমাদের সীমা রেখা নির্দেশ করছে লাওস, কামপুচিয়ার সঙ্গে। কামপুচিয়ারই আগে নাম ছিল কম্বোজ আর রাজধানী ছিল আংকোর। তারপর থাইদের ভয়ে সরিয়ে নিয়ে যায় আরও পশ্চিমে ফম্‌পেনে।

আমরা অনেকটা উপরে উঠে এসেছি। মাঝে মাঝে মেঘের দল এসে গাড়ির কাঁচ ভিজিয়ে দিচ্ছে, নেত্রার চুলে জলবিন্দু হয়ে আটকে যাচ্ছে। পথ অস্পষ্ট হচ্ছে।

নেত্রার হাতে একটু চাপ দিয়ে বললাম, একটু সাবধানে চালাও।

পাহাড় এখানে সবুজ, বড় বড় গাছের ঠাস বুনুনিতে সূর্যের আলো আটকে গেছে। গাছের গায়ে নানান রকম অর্কিড্ ফুল, কোথাও বা লতানো ফুল। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে এক গুচ্ছ বাড়ি। তার সামনে জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদি জমি, পাহাড়িদের গ্রাম।

—নেত্রা, এবার মনে হচ্ছে আমরা একটা হিল্ স্টেসানে এসেছি। দারুণ ভালো লাগছে।

—তা হলে বলো, আমাদের রোমান্সের পরিবেশটা আমি ভালই বেছেছি।

—মনে হচ্ছে কী জানো, যদি এমনি করে দিন যায়, যাক না। আমার যদি অনেক টাকা থাকতো তা হলে এমনি করেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতাম।

—আমি কিন্তু রাজি। থাকবে ? বেশ হয় তাহলে।

আমি বললাম, কয়েকদিনই ভালো লাগবে। তারপর কাজ ছাড়া দুজনেই হাঁফিয়ে উঠবো।

ও বললো, ঠিকই বলেছো। তার চাইতে ছুটিতে মাঝে মাঝে এলেই হবে।

আজকের রাতটা তো এখানেই থাকছি। কাল ঠিক করা যাবে ভবিষ্যতের কথা।

ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বেজেছে দেখে বললাম, কোথাও খেয়ে নিলে হয় না ?

সামনেই একটা বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড দেখে নেত্রা গাড়িটা থামিয়ে বললো, চল এখানে খাবার পাওয়া যাবে।

খড় ছাওয়া একটা কাঠের বাড়ি। বাঁশের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম, ছোট্ট এক ফালি ফুলের বাগান পেরিয়ে। বেশ পরিচ্ছন্ন ঘর। দুটো টেবিল তার চারদিকে চারটে করে সস্তার চেয়ার। একটা খালি টেবিলে কয়েকটা কোক আর সিংহ বিয়ারের বোতল। পাশে দুটো গামলায় খাবার, ওপরে এলকাথিনের চাদর দিয়ে ঢাকা। টেবিলে একটা শিশিতে দুটো করে অর্কিড ফুল।

এক বুড়ি ঘর পরিষ্কার করছিল। আমাদের বসতে বলে, চীৎকার করে ডাকলো —'ফ্যাঙ্গ, ফ্যাঙ্গ মা রেও রেও।

ও উত্তর দিল—থর। মা লেক্ লেক্ (অপেক্ষার কর আস্তে আস্তে আসছি)।

মা কথাটা শুনে আমি নেত্রাকে বললাম, জানো একদিন আমার লেখাকে (সেক্রেটারি) নতুন শেখা থাই ভাষায় ডেকেছিলাম। ও আমার সামনে খুব মুখ গোমড়া করে এসে সব কাজের কথা শুনে বললো, আমি কী এতই বুড়ি ?

আমি বললাম, সে কী, তোমার আর বয়েস কতো, এখনও তিরিশ বলে মনে হয়।

'তা হলে আপনি আমায় ম্যা বলে ডাকলেন কেন ?

আমি বললাম. আমি তোমায় আসতে বললাম।

নেত্রা হেসে বললো, মাএর উচ্চারণ ভেদে তিন রকম মানে হয়, তুমি শেখোনি ? ক্যান্টনিস্ ভাষায় পাঁচ রকম মানে হয় উচ্চারণ ভেদে। এটা হচ্ছে ক্যান্টনিস ভাষার প্রভাব।

আমি হেঁসে বললাম, আর একবার লজ্জায় পড়েছিলাম। আমার একটু গ্যাসট্রিকের সমস্যা আছে, তাই খালি পেটে থাকি না। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে থনরথকে (ড্রাইভার) বললাম, 'ক্রাই ক্রুয়া'।

ও গম্ভীর হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, থাম মাই মাস্টার (হোয়াট মাস্টার)।

আমি তখন বললাম, বাই বানানা ফর মি।

নেত্রা মুচকি হেসে বললো, তারপর ঐ শব্দটার মানে জানলে কী করে ?

—আর বল কেন ? বোকার মত আমার সুন্দরী থাই ভাষার টিচারকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম।

খুব খানিকটা হেসে নেত্রা জিজ্ঞেস করলো, টিচার কী বললো ? নিশ্চয় বললো তুমি একটা অসভ্য, ইতর।

—তা বললো না। মুখটা লাল করে গম্ভীর হয়ে বললো, ছেলেদের কাছ থেকে জেনে নেবেন ওটার মানে তবে অন্যভাবে উচ্চারণ করলে বোঝায় কলা।

—ছিঃ ছিঃ তুমি এত বোকা ? এই তোমার ফ্লাইটা লাগাও, 'ক্রুয়া' বেরিয়ে যাবে।

ফ্যাঙ্গ, এসে আমাদের দেখে একটু লজ্জা পেয়ে হাতের ঝুড়িটা কোনায় রেখে স্বয়াদিখ্রাপ বলে নমস্কার করলো। থাম্ মাই তঙ্গকান ? (কী চাই)।

নেত্রা ওকে বুঝিয়ে বললো খাবারের কথা।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললো, ওয়াণ্ট বিয়ার স্যার ?

—আরে তুমি ইংরেজি জানো, দেখছি।

—নিড নয় (অল্পস্বল্প)

—শিখলে কী করে ?

—কনভেন্টে একজন আমেরিকানের কাছে। আপনাদের বিয়ারটা দিয়ে মাকে বলছি খাবার তৈরি করতে!

মেয়েটিকে দেখলে মনে হবে খাঁটি চিনা, নাকটা অতটা থ্যাবড়া নয়, চোখটাও অতটা ছোট নয়। বিয়ার শেষ হতে হতেই ফ্যাঙ্গ খাবার নিয়ে এলো, পরিষ্কার প্লেটে আর বাটিতে সঙ্গে চামচ। খাবার—নুড়ল, ভাত মাছের ঝোল আর স্টিমে সেদ্ধ মুরগী।

এদের পরিচ্ছন্নতা দেখে মনে পড়লো—একবার দার্জিলিংএ জলাপাহাড় দিয়ে হেঁটে টাইগার হিল গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ঘুমে একটা এমনি বাড়িতে ঢুকেছিলাম চা খেতে। দোকানদারের মেয়েও ছিল এমনি দেখতে আর এই বয়সি। ও সামনে দাঁড়াতেই নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়েছিল। ঘরে ছিল না একটাও জানালা, দমবন্ধ হওয়া অবস্থা, কাঁচা কাঠের আগুনের ধোঁয়ায়। কানকো ভাঙ্গা মোটা কাঁচের গ্লাসে চায়ের বদলে ছিল একটা দুর্গন্ধ যুক্ত তরল পদার্থ।

—আচ্ছা নেত্রা, এখানে এতো চিনা এলো কোথা থেকে?

নেত্রা বললো, মনে নেই গাইড মেয়েটির কথা—দক্ষিণচিনের ইউনান্ প্রদেশ থেকে থাইরা প্রথম এসেছিল। তারপরও এসেছে এরা। চিয়াংকাইশেক হেরে যাবার পরে, তার এক সেনাপতি তার সৈন্যদল নিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এখানে চলে এসেছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তারা থাকে আরও উত্তরে। এখনও চিনা ভাষায় পড়াশোনা করে। তাইওয়ান সরকার ওদের বইপত্র জোগায়। ওরা স্টেনগানের জোরে এখনও মোটামুটি স্বাধীনভাবে বাস করে।

—আর কোথাও চিনা ভাষায় পড়বার স্কুল নেই?

—না। প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন জেনারেল থানারাথ প্রধানমন্ত্রী তখন থেকে চিনা ভাষার স্কুল সব বন্ধ করে দেওয়া হয়।

—আমি তো অনেক চিনাকে তাদের ভাষায় কাগজ পড়তে দেখেছি।

—তারা নিশ্চয় বুড়োর দল। আজকালকার ছেলেমেয়েরা আর তা পড়তে পারে না।

—কয়েক বছর আগে আমি একবার তোমাদের দেশে এসেছিলাম, তখন চিনা পাড়ায় অনেক চিনা ভাষার ব্যানার দেখেছিলাম। আজকাল অবশ্য দেখতে পাই না। ওদের মন্দিরগুলো দেখেছি অন্য রকম, সন্ন্যাসীরা সব হলদে পায়জামা আর গলাবন্ধ জামা পরে।

—ঠিকই দেখেছ। ওরা তো থেরাবেদা বৌদ্ধ নয়।

আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে ফ্যাঙ্গ এসে জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু চাই? ফুড্ গুড্?

আমি বললাম, ভেরি গুড্।

—খুন্ প্রথেথ্ থাম মাই (তোমার দেশ কোথায়?)

—ইণ্ডিয়া।

—ইণ্ডিয়া ভেরি গুড্।

নেত্রার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চুক্ চুক্ করে একটা শব্দ করে বললো, ইয়োর ফ্রেইণ্ড ভেরি বিউটিফুল।

আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলে, ও জানলার কাছে মুখ বাড়িয়ে বললো, কাম এগেইন। স্টে, হ্যাভ রুম।

—আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা চিয়াংরাই শহরে পেঁছে গেলাম। ছোট্ট পাহাড়ি শহর। আমি বললাম, বেশ লাগছে—রাতটা যখন থাকাই ঠিক হলো তা হলে চল কোনও হোটেলে চেক-ইন করেনি।

নেত্রা বললো, চল আর একটু উপরটা ঘুরে আসি এখনও তো অনেক বেলা আছে।

শহর অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছি। দুদিকে গভীর জঙ্গল। কাঠুরেরা কাঠ কাটছে—কুড়াল নয় ইলেকট্রিক করাত দিয়ে। পোষা হাতি দিয়ে সেগুলি লরিতে ওঠানো হচ্ছে। সামনেই একটা জেড্ বেন্ডের চিহ্ন দেখে আমি নেত্রাকে সাবধান করে দিলাম। ঠিক পিরমুহূর্তেই এক দল মেঘ এসে বাঁকটাকে ঢেকে ফেললো। নেত্রাকে হেডলাইট জ্বালাতে বললাম।

ও হর্ণ দিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে বাঁক ঘোরার সময় দেখলো ওদিক থেকে একটা জীপ্ ওর সামনে এসে পড়েছে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, ব্রেক লাগাও। বাঁদিকে কাটাও।

একটা জোর শব্দ করে গাড়িটা থেমে গেল বাঁ দিকে পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে। আর উল্টো দিক থেকে আসা গাড়িটা ডান দিকে ঘুরে পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে গেল।

আমরা দুজনেই সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, নেহাৎ সেফ্‌টি বেল্ট লাগানো ছিল বলে বেঁচে গেলাম। নেত্রার ঠোঁটটা একটু কেটে রক্ত পড়ছিল। আমি রুমাল দিয়ে চেপে ধরলাম। খুব জোর বেঁচে গেছি।

—তোমার লাগেনি তো, অতীশ? আমার কি দোষ বল তো? আমি তো ঠিকই যাচ্ছিলাম। ঐ গাড়ীটাই আমার গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়ে দিত যদি আমি বাঁ দিকে না কাটাতাম। এই, ওদের কী হলো দেখ তো? ওদের গাড়িটা তো দেখতে পাচ্ছি না।

আমরা বেরিয়ে এসে কাছেই ওদের কথা শুনতে পেলাম।

—তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি দেখছি।'

—তুমি কিন্তু বলো না যে তুমি চালাচ্ছিলে। বিদেশিদের দোষটাই পুলিশ বড় করে দেখবে আর ক্ষতিপূরণও আদাই করবে বেশী। আমি বলবো, আমিই চালাচ্ছিলাম। আমার কিছু হলে, বাবা ম্যানেজ করে নেবে।

আমরা দুজনেই এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ওদের গাড়িটা খুব জোর বেঁচে গেছে—

একটা গাছের গায়ে আটকে আছে। দুজনে মিলে আর একজনকে টেনে বার করার চেষ্টা করছে। সেই লোকটার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে।

আমার গাড়িতে সবসময়ই প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু ওষুধপত্র থাকে। আমি তাড়াতাড়ি সেগুলি বের করে ওদের কাছে গিয়ে ওর রক্ত তুলো দিয়ে মুছিয়ে ডেটল লাগিয়ে একটা ব্যান্ডেজ করে দিলাম। নেত্রা গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়েছিল। জখমি লোকটা আমায় ধন্যবাদ দিল কিন্তু ওর সঙ্গে বুড়ো মত লোকটা আমাকে গালাগালি দিতে লাগলো, কারণ ওর মতে আমার দোষেই এই এক্সিডেন্টটা হয়েছে। ওর কথা ভালো করে বুঝতে না পারায় নেত্রাকে কাছে ডাকলাম। নেত্রার সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হলো। ও শেষ পর্যন্ত বাবার কার্ডটা দিয়ে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে ছাড় পেলো।

ওর বাবার কার্ডটা দেখে ঐ বুড়োটা কিছুক্ষণ নেত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলো যে ও সত্যিই জেঃ ডামরঙ্গপানের মেয়ে কিনা। ওর চোখেমুখে একটা মতলব খেলছিল। বুড়ো বললো, তোমাদের গাড়ি দিয়ে টেনে আমাদের জীপটা তুলে দাও। আমাদের অনেক কাজ আছে।

আমার গাড়ীর সঙ্গে দড়ি বেঁধে জীপটাকে টেনে রাস্তায় তুললাম। ওরা নেত্রার দিকে আর একবার কটমট করে তাকিয়ে জীপটাকে ঘুরিয়ে পাহাড়ের উপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে দেখলাম, নেত্রার আঙুলটাও কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আঙুলটা আমি মুখ দিয়ে চুষে রক্ত বন্ধ করে একটা ব্যান্ড এইড লাগিয়ে দিলাম। আমার গাড়ির এক পাশটায় লম্বা আঁচড় পড়েছে আর জানলার ত্রিকোণ কাঁচটা ভেঙ্গে গেছে। ঐ ভাঙ্গা কাঁচেই নেত্রার আঙুলটা কেটে গিয়েছিল।

আমি বললাম, এবার ফিরে চল। অনেক হয়েছে। বুড়োটাকে দেখে আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না।

—না, না, বিপদ তো কেটে গেল। আর ভয় কী? সামনেই ম্যা ইয়াইন নদী। সেখানে একটা ঝরণা আছে আর তার জলে বড় লেক সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে একটু বসে তারপর ফিরবো।

আবার আমরা আরও উত্তরের দিকে এগোতে লাগলাম। এদিকটায় লোকবসতি প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে পাহাড়গুলো মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। এ সব চাষ করা ফুল। জিজ্ঞেস করলাম, এখানে এত ফুলের চাষ কেন?

—এগুলি পপি ফুল। এ থেকে আফিম হয়। আর তার থেকে ব্রাউন সুগার। ঐ চিনারা এর চাষ করে। এটাই হচ্ছে গোল্ডেন ট্রাঙ্গল—বর্মা—থাইল্যান্ড আর লাওস নিয়ে এই ত্রিভুজ। এখানকার ব্রাউন সুগার আমেরিকা আর ইউরোপে কয়েক বিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়।

পাশ্চাত্যদেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করছে এই ড্রাগ। ভাবছিলাম কি ভাবে ইতিহাসের চাকা ঘুরে যায়। এক সময় পাশ্চাত্যের দেশগুলো চিনাদের আফিম খাইয়ে ওদের সোনা-দানা লুঠ করেছে। আফিম বিক্রির জন্যে লড়াই করেছে আজ সেই চিনারা তার প্রতিশোধ নিচ্ছে ওদের দেশে ড্রাগ চালান দিয়ে।

—তোমার বাবার কাজ তো এ সব ড্রাগ তৈরি বন্ধ করা অর্থাৎ পপি চাষ বন্ধ করা ?

—বাবার ওটাই কাজ, কিন্তু সে কাজ অবাধে করার উপায় নেই।

—কেন ?

—এই ড্রাগ ব্যবসার চোরাপথে যে অনেকের অনেক টাকা আসে। তারাই তো সব রাজনৈতিক দলের নেতা। তারাই হলো সব মন্ত্রী।

—শুনেছি; আমেরিকান সরকার তোমাদের প্রচুর অর্থ দেয় পপি চাষাদের ক্ষতি-পূরণের জন্যে ?

—তা দেয়। সেই জন্যেই মাঝে মাঝে পপি ক্ষেত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

আমি বললাম, তাই কয়েকদিন আগে দেখেছিলাম, হেলিকপ্টার থেকে ওষুধ দিয়ে অনেক পপি ক্ষেত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—খুন্ সান্ হচ্ছে এখানকার ড্রাগ্ কিং। সে হচ্ছে বর্মি-সান্। জান তো সান্ প্রদেশ বর্মি সরকারের অধীনতা স্বীকার করে না।

—কিছুদিন আগে কাগজে উঠেছিল বর্মি সরকার বিরাট সৈন্যদল নিয়ে সান্দের আক্রমণ করেছে।

—তারা শুধু কিছু গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিল। সান্রা সব গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করেছে তাদের সঙ্গে। অনেক সান্ এসে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে। খুন্ সান কিন্তু ঐ সান্দেরই নেতা। সান্রা বেঁচে আছে এই ড্রাগের দৌলতে। ঝরণার আওয়াজ পাচ্ছো ?

ও ডানদিকের রাঙ্গামাটির পথ ধরলো। এসে গেলাম আমরা লেকের ধারে।

এ যেন পাকা চিত্রকরের আঁকা একটা বিরাট ক্যান্ভাস্। আমরা নির্বাক দর্শক।

তিনদিকে উঁচু পাহাড়ের সবুজ দেওয়াল, গভীর বনানীতে ঢাকা। তারই একটা অংশ দিয়ে স্বচ্ছ জলরাশি দুরন্ত বেগে নেমে আসছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। পথ এবার রুদ্ধ। যৌবনমত্ত, উচ্ছল, উন্মাদ স্রোতস্বিনী সে পথের বাধা অতিক্রম করে লাফিয়ে পড়ছে নীচে, এক অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে আর বনানীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে যৌবনের গান গেয়ে।

সেই উচ্ছল, হাস্যময়ী, লাস্যময়ী জলধারা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে শান্ত লেকের নীল জলে আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। আবার চলার সুরু, চলেছে দিগন্তের পানে।

চই তো জীবন। কালকের অপরিণামদর্শি যৌবনের উচ্ছলতার পর আমরাও শান্ত, কিন্তু স্তব্ধ নই, গতিহীন নই। জীবন থেমে নেই। এগিয়ে চলেছে অজানা উদ্দেশ্যে এই স্রোতস্বিনীর মত।

লেকের ধারে অনেকটা জায়গা সমান্তরাল, গাঢ় সবুজ ঘাসে ঢাকা, তার মাঝে মাঝে ফুটে আছে গোলাপি আর হলুদ ঘাস ফুল, ডেইজী, ক্যালেন্ডুলা, কোথাও বা গুচ্ছে গুচ্ছে গাঢ় নীল লিলি। এ যেন ভ্যান্ সগের আঁকা একটা বিরাট ছবি আর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার অনুপ্রেরণা।

আমরা একটা পাথরের উপর বসলাম। এই অপূর্ব সৌন্দর্য আমাদের বাকরহিত করে দিয়েছে। শুধুই দেখছি, আর দেখছি, মন ভরে দেখছি।

নেত্রা আমার গলা জড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে আকাশের দিকে ওর আঙুল দেখিয়ে বললো, দেখ দেখ, কত পাখি উত্তর দিক থেকে পাহাড় পার হয়ে উড়ে আসছে, যেন সব রঙিন ফুলের ছেঁড়া মালা, যেমন মালা দেখা যায় সুন্দর বাজি পোড়ালে।

আমি বললাম, ঐ জলে যে ভাসছে নানান রংয়ের হাঁস, ওদেরই মত ঐ পাখিগুলো। এরাও এসেছে এমনি করে সেই সুদূর সাইবেরিয়া আর মঙ্গোলিয়া থেকে, বরফ-জমা ঠাণ্ডা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এতদূরে।

—এতদূরে এরা পথ চিনে এলো কি করে?

—তা জানা নেই মানুষের। বছরের পর বছর পুরুষানুক্রমে এই হাজার হাজার মাইল উড়ে, বছরের ঠিক একই সময় একই জায়গায় এসে এরা আশ্রয় নেয়। মানুষের হাতে যতই এই বনানী আর জলা জায়গা সংকুচিত হচ্ছে, ততই এদের বাসস্থানও হারিয়ে যাচ্ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে এ বনজ প্রাণীরা।

—অতীশ, এ সৌন্দর্য হারিয়ে গেলে যে আমাদের সৌন্দর্যবোধও হারিয়ে যাবে, আমরাও যে যান্ত্রিক হয়ে উঠবো।

—তা হবো কি, হয়েই তো যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক দেশে। দেখ না উন্নতশীল দেশগুলো থেকে প্রেম বলে বস্তুটি উবে যাচ্ছে। নরনারীর মিলনের কমনীয়তা, নমনীয়তা, মানসিকতার মূল্য দেবার সময় অনেক দেশের লোকের নেই। তাদের কাছে সময়ের মূল্যই বেশী। সবাই কেবল আমি, আমি করে বেড়াচ্ছে। আমরা কথাটা ভুলে যাচ্ছে।

এমন সময় এক টুকরো মেঘ এসে আমাদের ঢেকে ফেললো। মেঘের জলকণাগুলো নেত্রার চুলে আটকে গেছে। জোলো হাওয়ায় আমাদের শরীর শিরশিরিয়ে উঠলো। মেঘের আবরণে আমাদের লজ্জা ঢাকা পড়ে গেল। ওর বাহুডোরে আমি বাঁধা।

সেই অবস্থায় নেত্রা আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, আমরা কিন্তু আমরাই থাকবো।

পাহাড়ের গা বেয়ে মেঘের দল উপরে উঠে গেল। এ চলমান ছবির মাঝে আমরাও এক ছবি।

লেকের ওপারে আর একটা ছবি দেখা গেল। ছোট ছোট গাছগুলো ভেঙ্গেচুরে এগিয়ে এলো এক কালোপাহাড়, একটা দাঁতালো হাতি। হাতিটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে কানের ঝাড়ার দুটো নাড়াচাড়া করে, চারিদিক একটা পাক খেয়ে শুঁড়টা উঁচু করে একটা বিরাট গর্জন—পাহাড়ে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো।

সেই আওয়াজ শুনে একদল হাতি বন থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের মাঝখানে দুটো বাচ্চা হাতি তাদের মায়েদের গায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে।

দাঁতালো হাতিটা এবার ধীরে ধীরে জলে নামলো খুব সন্তর্পণে, তার পেছনে পেছনে হস্তিযূথ।

বাচ্চাগুলোও নেমে এসেছে অল্প জলে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। নামবার সময় মায়ের পা জড়িয়ে রেখেছে শুঁড় দিয়ে, যেমন করে ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ের হাত ধরে নামে।

মা হাতি এবার শুঁড় দিয়ে জল তুলে ওদের গায়ে ছিটিয়ে শুঁড় দিয়েই গা ডলে দিচ্ছে।

ওদিকে একান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নেত্রা বললো, দেখ পশুদের মাতৃস্নেহ, বোধহয় মানুষের চাইতেও বেশী, কী সুন্দর স্নান করিয়ে দিচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে—আমিও পারবো না আমার ছোট্ট সন্তানকে এমনি করে চান করাতে।

আমি অভয় দিয়ে বললাম, তোমার না করলেও চলবে। আমাদের বাড়ি গেলে আমার মা আছেন আর এখানে থাকলে, আয়া করবে।

—না, আয়া আমি রাখবো না। হয় আমি, না হলে তোমার মা।

—হেসে বললাম, তাই হবে। তোমার চিন্তাধারা বড্ড তাড়াতাড়ি চলছে। অতদূর পর্যন্ত ভাববার দরকার নেই। আজকাল ফ্যামিলি প্ল্যানিংএর যুগ।

—আমি অত প্ল্যানিং করবো না।

—ঠিক আছে, তুমি যা বলবে, তাই হবে।

হাতিগুলো তখনও স্নান করছে। দলনেতা অল্প জলে শুয়ে পড়েছে আর ওর হারেমের রূপসীরা ওর সঙ্গে জলকেলীতে মত্ত।

নেত্রা হঠাৎ বললো, চল, আমরাও স্নান করে নেই।

—আমি অবাক হয়ে বললাম স্নান করবো কেন? তাছাড়া স্নানের জামা কাপড়ও তো নেই।

—স্নান করবো কেন? কারণ, আজ চান করা হয়নি, সূর্য মাথার ওপর, সামনে সুন্দর পরিষ্কার জল, আর কোথাও মানুষজন নেই—শুধু আমি আর তুমি।

আর স্নানের পোশাক, কিসে লাগবে? কেউ তো দেখছি নেই।

—কেন, আমি ?

—তুমি তো আর আলাদা মানুষ নও ; শিশিরই তো আমার অর্ধাঙ্গ হচ্ছো।

—তা বলে এটা তো নুডিস্ট্ পার্ক নয়।

—আরে বাব্বা, আমাদের আণ্ডার গ্যারমেণ্ট্ তো আছে। তাই পরে স্নান করবো।

—চান করে কি পরবো ?

—সব ঠিক আছে। তোমায় শুকনো জাঙ্গিয়াই দেবো, আমারও শুকনো প্যাণ্ট আছে। তোমার খেয়াল নেই, আমরা স্যুটকেস্ নিয়ে এসেছি।

—ঠিক আছে। আমার সে কথা মনেই ছিল না।

—আমি জামা কাপড় খুলে ফেললাম। ও চুপ করে বসে ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো, তুমি ছাড়লে না, প্যাণ্ট, সার্ট ?

—তুমি ওদিকে ঘুরে বসো। জলে না নামা পর্যন্ত এদিকে তাকাবে না।

—এই যে বললে, আমি তোমারই অঙ্গের একাংশ।

—সে মশাই, যখন হবো তখন। এখনও নয়। ঘোরো। ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ পর ওর জলে নামার শব্দ হলো। নেত্রা জলে দাঁড়িয়ে বললো, এবার এসো। জল কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু খুব পরিষ্কার, তলায় জলজ গাছ বা কাদাও নেই।

ও গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও নামলাম। দুজনে পাশাপাশি সাঁতার দিতে দিতে বললাম, চল ঐ দ্বীপটার দিকে। দেখেছ কত হাঁস ঐ দ্বীপটার চারিদিকে আর ওখানকার গাছগুলোতেও বসেছে অনেক পাখি।

আমরা দ্বীপটার কাছে যেতেই কতগুলো গাড়ো নীল আর খয়েরি রঙের বড় হাঁস জল থেকে উড়ে গিয়ে আবার জলে গিয়ে ভাসলো। আমি দ্বীপটার উপর উঠে এলাম। নেত্রা গলা জলে দাঁড়ানো। আমি বললাম, এসো।

—কি করে আসি। ঠিক আছে, তুমি হাতির স্নান দেখ। তাকাবে না।

ও উঠে আমার পাশে পেছন ফিরে বসলো।

এ ভাবে তো কথা বলা যায় না বলে, আমি ওর দিকে ফিরলাম।

ওর দুটো হাত বুকটাকে ঢেকে রয়েছে। চুল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। গলা থেকে জলের রেখা হাতের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে এসে একটা বিন্দু হয়ে স্থির হয়ে আছে নাভির কাছে।

দীপের ওপর কয়েক শো হাঁস ভীড় করে প্যাঁক প্যাঁক করছে। হাঁসগুলো আমাদের দেখেও উড়ে যায়নি। মানুষ নামক প্রাণী যে হিংস্র, তা এদের জানা নেই। বেশ কিছু হাঁস গাছের নীচে ঘাস পাতা জড়ো করে তার উপর ডিম রেখে তা দিচ্ছে। বড় গাছটার উপর একটা শঙ্খ চিল বসে নীচে তাকিয়ে রয়েছে এক দৃষ্টিতে।

হঠাৎ নেত্রা চেঁচিয়ে উঠলো, এই যাঃ! দেখেছ চিলটার কাণ্ড, একটা ডিম নিয়ে পালিয়ে গেল।

দেখাতে গিয়ে ওর বুকটা আবরণহীন।

আমি সে দিকে তাকিয়ে বললাম, এই যাঃ, দেখে ফেললাম।

—যাক গে। কী আর করবো।

—এখন তোমাকে কি রকম দেখাচ্ছে জানো ?

—কী রকম ?

—ঠিক যেন একটা মৎস্যকন্যা, রংটা যদিও মেলেনি। কোপেনহাগেনে সমুদ্রের জলে রকের উপর কালো একটা মারমেইডের মূর্তি আছে। সেই রকের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে, আর জল ছিটকে ভিজিয়ে দেয় সেই মূর্তিটাকে। তোমাকে সেই মূর্তিটার মত দেখাচ্ছে। বেশ লাগছে এখানে বন্য প্রাণীদের মাঝে, আমরাও ওদের মতই প্রকৃতির প্রাণী, আদম আর ইভ্।

—নেত্রা আমার পাশে শুয়ে পড়ে বললো, তুমিও শুয়ে পড়ো। হিমেল হাওয়ায় রোদ পোয়াতে বেশ আরাম লাগছে।

ঘন্টাখানেক সারা শরীরে রোদ লাগিয়ে আমরা ফিরে এলাম। গাড়িতে উঠে আবার সেই রাঙামাটির পথে এসে গেলাম।

কিছুটা যেতেই পেছনে একটা গাড়ির শব্দ পেয়ে তাকিয়ে দেখলাম সেই জীপটা। জীপটা হর্ন বাজিয়ে চলেছে।

পথ সংকীর্ণ, দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে না। আমি তাই পথের এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

জীপটা আমাদের গাড়ির সামনে এসে থেমে গেল। তিনজন লোক নেমে এল। চিনতে দেরি হলো না, ওদের একজন সেই বুড়ো।

বুড়ো দরজার কাছে এসে বললো, ইঞ্জিন বন্ধ করুন। দরজা খুলে নেমে আসুন।

নেত্রা এর মধ্যে ওর ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে, একটা রিভলভার বার করে শক্ত করে চেপে ধরল।

বুড়োর নজর এড়ায়নি, ওটা রেখে দিন। আমাদের সবাইর কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র আছে। তাড়াতাড়ি নামুন। বাধা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই।

আমরা নেমে এলাম। নেত্রা আমার হাত ধরে রয়েছে। ও জিজ্ঞেস করলো, কী চাই আপনাদের? আপনারা কি আবার ক্ষতিপূরণ চাইছেন? আমাদের কাছে বিশেষ টাকা পয়সা নেই।

বুড়ো হেঁসে বললো, আমরা টাকা পয়সা নিতে আসিনি।

—তবে কী জন্যে এসেছেন ?

—আপনাকে নিয়ে যেতে।

আমার হাতটা জোরে চেপে ধরে নেত্রা জিজ্ঞেস করলো, আমাকে নিয়ে যাবেন কোথায় ? কেন ? আমি আপনাদের কি ক্ষতি করেছি ?

—আপনি আমানের কোনই ক্ষতি করেন নি। আমাদের উপর হুকুম হয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে।

—কার হুকুম ?

—খুন্ সান্, আমাদের নেতা।

—আমি তার কি ক্ষতি করেছি ? উনি তো আমাকে কখনও দেখেননি।

—ঠিকই বলেছেন, আপনি তার কোনও ক্ষতিও করেন নি আর উনি আপনার সৌন্দর্য্যেরও খোঁজ রাখেন না।

—তা হলে আমাকে নিয়ে উনি কি করবেন ?

—কি করবেন, তা আমার জানা নেই। আপনি জেঃ ডামরঙ্গপানের মেয়ে বলেই বোধহয় আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—আমাকে নিয়ে গেলে আপনাদের দেশ ছাড়া করবে আমাদের সরকার, তা জানেন ? আমি যে ডামরঙ্গপানের মেয়ে তা জানলেন কি করে ?

—হেসে বুড়ো বললো, সেটা আপনার ভুলের জন্যেই আমরা জানতে পেরেছি। আপনি, আপনার বাবার কার্ডটা আমাদের দিয়েছিলেন।

এবার নেত্রা ভেঙে পড়লো। আমায় জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। অতীশ, এখন আমার কী হবে ? আর হয়তো তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হবে না। আমি জানতাম, এ রকম একটা বিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। অতীশ, আমায় বাঁচাও।

আমি বুড়োকে বললাম, ঠিক আছে, চলুন, আমিও যাবো ওর সঙ্গে।

বুড়ো বললো, আপনাকে নেওয়া চলবে না। আপনি ফিরে যান। শুধু ওকেই নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।

—আমাকে নেবেন না কেন ?

—কারণ, আপনি বিদেশি। তাছাড়া, আপনাকে দিয়ে আমাদের কোনও উপকার হবে না। নেত্রার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার কোনও জিনিস থাকলে নিতে পারেন। রিভলভারটা আমার হাতে দিন আগে।

—নেত্রা তখন মাটিতে বসে পড়েছে। আমি স্যুটকেসটা বুড়োর হাতে তুলে দিলাম, নিজের কাপড় জামা বের করে নিয়ে।

নেত্রাকে উঠিয়ে কাছে টেনে বললাম, ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে ছাড়িয়ে আনবো, যেমন করেই হোক, প্রাণ যায় যদি যাবে।

ও ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। আমিও হতচকিত।

আমি নেত্রাকে বললাম, তোমার বাবার কার্ডটা দাও।

নেত্রা কার্ডটা দিয়ে কেঁদে কেঁদে বললো, অতীশ আমি কি পাপ করেছি, যে এ রকম শাস্তি হলো। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম, অতীশ, তোমাকে নিয়ে, সব চুরমার হয়ে গেল।

বুড়ো এবার তাড়া লাগালো। আর দেরী নয়। চলুন। ভয় পাবেন না। খুনু সানু লোক খারাপ নয়।

নেত্রা আমাকে শেষ চুম্বন দিয়ে ওদের জীপের দিকে পেছন ফিরে চলতে লাগলো। চোখ ভরা জল। আমার চোখও জলে ভেসে যাচ্ছে।

অতীশ বিদায়, বলে জীপে উঠে বসলো। অতীশ ভালো থেকো। আমার চিন্তা করো না। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

জীপটা ঘুরিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই ফিরে গেল। নেত্রা আমার দিকেই তাকিয়েছিল। লাল ধুলোর পর্দার মাঝে ও হারিয়ে গেল, জানি না চিরতরে কি না?

আমি রাস্তার পাশে বসে পড়লাম।

একটা পাখি তখন নিজের মনে ডেকে চলেছে পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা।

আমার প্রিয়াও কী হারিয়ে গেল? যদি হারিয়েই যাবে, তা হলে দেখা হলো কেন? এটা কী আমার ভাগ্যেরই লিখন? অসহায় আমি, নির্জন বনের মাঝে একা, শুধু আমি একা। ঝরণার কল্‌কল্‌ শব্দ, যা কিছুক্ষণ আগেও গানের সুর নিয়ে কানে বাজছিল, তা যেন এখন অসহনীয় মনে হচ্ছে। যন্ত্রচালিতের মত গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম।

॥ ৩৭ ॥

আমি নিজের ভাবনা নিয়ে চলেছি. পথ আমাকে নিয়ে চলেছে, কোথায় জানি না। শুধু একটা ভাবনাই মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে—নেত্রার কী হবে? ওরা ওকে নিয়ে কী করবে? ওর সৌন্দর্যই কী ওর কাল হলো, না ওদের অন্য কোনও মতলব আছে? কী মতলব থাকতে পারে? ডামরঙ্গপানের মেয়ে বলেই কী ওরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে? ওর উপর কী শারীরীক অত্যাচার করবে, না বন্দী করেই রাখবে? সৌন্দর্যের জন্যে নিশ্চয়ই নয়? সুন্দরী তো এখানে কতই আছে।

তা হলে পপি ক্ষেত পোড়াবার প্রতিশোধ হতে পারে। ঐ একসিডান্টটা না হলে তো ওরা হদিস পেতো না। ভাগ্যের কী পরিহাস? তা যদি হয় তা হলে ওকে উদ্ধার নিশ্চয় করা যাবে; তা হলে তো ওর বাবাকেই তা করতে হবে। এতটা

ভাববার পর মনটা অনেকটা শান্ত হলো, কারণ তা হলে ওরা ওকে ভালো ভাবেই রাখবে, আশা করা যায়।

সম্মোহিতের মত গাড়ি চালিয়ে যেখানে এসে দাঁড়ালাম, সেটা ফ্যাঙ্গদের বাড়ি।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ফ্যাঙ্গ ছুটে এলো গাড়ির কাছে। আমাকে দেখে, ইউ লুক ব্যাড্। হোয়াট হ্যাপেন্ড ? ফুরিঙ্গ থী নাই ?

আমার মুখ দিয়ে একটাও উত্তর বের হলো না। উদভ্রান্তের মত ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দরজাটা খুলে আমার হাত ধরে নামিয়ে আনলো। আমাকে বসিয়ে একটা কোকের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে আমার পাশে বসলো।

ঘোরটা কেটে কিছুটা স্বচ্ছ চিন্তাধারা ফিরে এলে বললাম, ওকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।

—কারা ?

—খুন সানের লোকেরা বোধ হয়।

—কেন ?

—তা জানি না।

—এখন কী করবেন ?

—থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করবো, তারপর ওর বাবাকে জানাবো।

—থানার ওরা কিছুই করতে পারবে না। ওর বাবা কী করে ?

—ওর বাবা নারকটির কন্ট্রোল বোর্ডের প্রধান।

—সেটা কি ?

সেটা ওকে বোঝাতেই ও বললো, তা হলে ঠিক আছে।

—আপনি একটু বসুন, আমি আসছি আপনাকে নিয়ে যাবো থানায়।

ও পনেরো মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে এসে বললো চলুন। রাস্তায় জিজ্ঞেস করলো আপনি নিশ্চয় ব্যাংককে থাকেন। আজ রাতটা তাহলে আপনাকে এদিকে কোথাও থাকতে হবে ?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—আপনার অসুবিধা না হলে, আমাদের ওখানে থাকতে পারেন।

—তাই থাকবো।

—কাল আমি আপনার বান্ধবীর খবর যোগাড় করে আনবো।

খুব উত্তেজিত হয়ে বললাম, কী করে ?

—আমার ভাই ওর ওখানে কাজ করে।

—তোমার ভাইকে তো দেখিনি। কোথায় থাকে ?

—ওখানেই থাকে। মাঝে মাঝে আসে মাকে টাকা দিতে। মনে হয় না,

আপনার কখ্খনো কোনও ক্ষতি করবে। খুব সানু এমনি খুব ভালো লোক শুনেছি।

সন্ধ্যা হয়েছে, রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। আমরা আবার চিরাংরোই শহরের দিকেই চলেছি। ফ্যাঙ্গদের বাড়ি শহরতলিতে। থানায় যখন পেঁছিলাম তখন দারোগাবাবু চেয়ারে ছিলেন না। এক কনস্টেবল একটা বেঞ্চে বসেছিল; আর এক বুড়ি মাটিতে বসে কাঁদছিল।

কনস্টেবল জিজ্ঞেস করলো ফ্যাঙ্গকে, কি ব্যাপার? এই ফারাঙ্গ তোমাকে পয়সা দেয়নি বুঝি? এদের সঙ্গে যে কেন যাও? যাই হোক, বলো কি হয়েছে?

ফ্যাঙ্গ বললো, তোমাকে আমি কিছু বলবো না। দারোগাবাবু কোথায়?

—উনি ব্যস্ত। চীৎকার, হুঙ্কার আর বেতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো না? বল তো এই ফারাঙ্গকেও কয়েক ঘা দিয়ে দেই।

—বলছো কি তুমি? জানো উনি কে? ব্যাংককে একটা কোম্পানির ফু চাট্কান (প্রধান অধিকর্তা)। আমরা ওসব কোনও ব্যাপারে আসিনি!

আমাকে নমস্কার জানিয়ে কন্স্টেবল বললো, খাও যোট। মাই সাপ (দুঃখিত) বুঝতে পারি নি।

চীৎকার শুনে বুড়ি আরও জোরে কেঁদে উঠছে। আমার ছেলেটাকে ওরা মেরে ফেললো গো। মেরে ফেললো।

ফ্যাঙ্গ বুড়িব থেকে জানতে পারলো যে ওর ছেলেকে খুনের দায়ে ধরেছে সন্দেহ করে। দারোগাবাবু ওর উপর থার্ড ডিগ্রি এপ্লাই করছেন।

দারোগাবাবু আসতেই বুড়ি তার পা জড়িয়ে ধরলো।

তিনি বললেন, এখন যাও, কাল দেখা যাবে। বুড়িকে কনস্টেবল ধরে বের করে দিল।

ফ্যাঙ্গের মাধ্যমে আমার আরজি শুনে দারোগাবাবু বললেন যে তার দ্বারা কিছু করা সম্ভব হবে না, তবে তিনি হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং তারাই খুন ডামরঙ্গপানকে জানিয়ে দেবেন।

আমাকে বসতে বলে উনি ব্যাংককে ফোন করলেন। দারোগাবাবুর চাবুকের মত চেহারা, বাড়তি মেদ কোথাও নেই, পরিষ্কার টেরিউলের পোশাক। ঘরের আসবাবপত্র পরিচ্ছন্ন। টেবিল গোছানো।

দারোগাবাবু ফোন রেখে বললেন, তার ওপর হুকুম হয়েছে এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ না নিতে; আর জেনারেল সাহেবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাত্রে আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হবে এবং পেলে ওনাকে জানাবে। আমাকে সকাল সাতটায় আসতে বললেন খবর নিতে।

আমরা দারোগাবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে ফিরে এলাম। ফ্যাঙ্গ আমার হাতে হাত রেখে বললো, আপনি অযথা চিন্তা করবেন না। কাল সকালে আপনি ওর

বাবাকে সরাসরি ফোন করে জানুন, উনি কি করতে চান। তারপর আমি খুনে সানের আস্তানায় গিয়ে আপনার বন্ধুর খোঁজ নিয়ে আসবো। আপনার বন্ধুর নামটা তো জানা হয়নি ?

—ওর নাম নেল্লা।

—এখন আর কিছু করার নেই। চলুন আমাদের বাড়ি।

॥ ৩৮ ॥

ওদের গেস্ট রুমে গিয়ে বসলাম। ফ্যাক্স ধোয়ানো চাদর বালিশের ওয়াড় এনে ধবধবে বিছানা করে বললো, আপনি স্নান করে নিন আগে। জামা কাপড় আছে তো ? দিন গাড়ির চাবিটা।

ও বুট থেকে জামা কাপড়গুলো এনে বললো, প্যান্ট সার্ট আছে, স্লিপিং সুট্ তো নেই।

—ঐ প্যান্ট সার্ট পরেই শুয়ে পড়বো। কি আর করা যাবে ?

—দাঁড়ান, আমি দেখছি।

ভেতর থেকে একটা স্লিপিং সুট্ এনে বললো, দেখুন তো এটা আপনার হয় কিনা ? গায়ের উপর ওটা রেখে—একটু বড় হবে, তাহলেও চলবে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি অতিথিদের জন্য স্লিপিং সুট্ও রাখো নাকি ?

—তা, রাখি না। এটা একজন ফেলে গিয়েছিল। আপনি একটু বসুন, আমি দেখছি, বাথরুমে জল আছে কিনা।

ও চলে গেলে ভাল করে ঘরটা দেখলাম—

বেশ বড় ঘর। একটা চৌকিতে বিছানা, একটা টেবিল আর চেয়ার। দেওয়ালে ব্র্যাকেট আর একদিকে একটা আয়না, ছোট থাকে একটা চিরুনি আর ব্রাস। দেওয়ালে বিশুর একটা ছবি আর তার পাশে আর একটা ছবি তাতে ফ্যাক্স, এক সাহেব আর সাহেবের কোলে বছর দুএকের একটি গাবদাগুবদো ছেলে।

—জল দিয়ে দিয়েছি, একট্টা বালতিতে গরম জল, আর একটাতে ঠাণ্ডা। যান, স্নান করে নিন।

বারান্দার একটা অংশকে ঢেকে বাথরুম করা হয়েছে। ট্যাপ্ নেই। পরিস্কার তোয়ালে আর নতুন এক টুকরো সাবান রাখা আছে। একটা জলচৌকি। একপাশে জাবজিক্ট সি।

স্নান করে শরীরটা অনেক ঝরঝরে লাগছে। সারাদিনের ধকল অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। ঐ ঢলঢলে স্লিপিং স্যুট্টা পরেই বেরিয়ে এলাম। দরজার বাইরে একটা খড়ম রাখা ছিল।

এই ফাঁকে ও-ও স্নান করে এসেছে। পাসীন্ আর ব্লাউজ পরেছে। ঠোঁটে একটু লিপস্টিক্ লাগাতেও ভোলেনি।

হেসে বললো, চলুন বারান্দায় বসবেন।

বারান্দায় বেশ ঠান্ডা। ফ্যাজ দৌড়ে গিয়ে আমার সোয়েটারটা নিয়ে এলো, নিজেও জড়িয়ে এসেছে একটা গরম চাদর। ওর হাতে ছিল একটা ট্রে, ট্রেতে দুটো গ্লাস, একটা কোক, আর একটা বিয়ারের বোতল। ও, দুটো গ্লাসে পানীয় ঢেলে বিয়ারের গ্লাসটা আমার হাতে দিয়ে বললো, গড্ ব্লেস্ ইউ।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি খৃষ্টান?

—হ্যাঁ, আমরা ক্যাথলিক্।

ঢোলা জামার হাতাটা গোটাতে গোটাতে জিজ্ঞেস করলাম, এটা যার জামা, সে নিশ্চয় খুব লম্বা চওড়া, তাই না?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর চেহারা, বলে কিছুক্ষণ থমকে রইল।

কৌতূহলের শেষ নেই। আবার জিজ্ঞেস করলাম, এক সাহেব আর ছোট্ট ফুটফুটে একটা ছেলের সঙ্গে তোমার একটা ছবি দেখলাম ঘরে, ওরা কে?

—ঐ সাহেবেরই এই স্লিপিং স্যুট্টা। আর ঐ ছেলেটি আমার।

—ঐ সাহেবটি বুঝি ওর বাবা?

—মাথাটা নীচু করে বললো, হ্যাঁ।

—তোমার ছেলেটিকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

—ও হোস্টেলে থেকে পড়ে।

—এখন বয়স কত?

—ন বছর।

ওর বাবা কোথায় জিজ্ঞেস করতে—লজ্জা পেলো। এ সব প্রশ্ন না করলেই ভালো ছিল। ফ্যাজ চাঁদের দিকে দৃষ্টি মেলে স্থবির হয়ে বসেছিল। দুদিন আগেও এমনি চাঁদের আলোতে দুজন বসেছিলাম, তখন মনের অবস্থা ছিল অন্য রকম—পাওয়ার আনন্দে মন ভরে ছিল আর এখন হারাবার দুঃখে ভারাক্রান্ত।

নেত্রা এখন কি করছে, কে জানে?

—ফ্যাজ, তুমি কখন যাবে নেত্রার খোঁজ করতে?

—বিকেলের দিকে যেতে হবে, না হলে তো ভাইর সঙ্গে দেখা হবে না।

—আচ্ছা, শুনুন্ সানু্ কখনও এখানকার মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে, এ রকম খবর তোমার জানা আছে?

—কখনও শুনিনি। যারা গেছে তারা স্বেচ্ছায় গেছে আর উনি তাদ

লোকদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। নেহাকে নিশ্চয় যত্ন করেই রেখেছে।

এরপর আমাদের কথা যেন ফুরিয়ে গেল। চুপচাপ বিয়ারের বোতলটা শেষ হয়ে গেল।

ও জিজ্ঞেস করলো, আর একটা আনবো?

—তুমি যদি খাও তবে আনতে পার।

—ও যখন ছিল তখন আমরা রোজ সন্ধ্যায় এখানে বসতাম। ও বিয়ার খেতো, আমাকেও খেতে হতো। ও চলে যাবার পর আর কখনও এখানে বসিনি, বিয়ারও খাইনি। দেখতে দেখতে সাতটা বছর পার হয়ে গেল। সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে গেল। নিয়ে এলো আর একটা বিয়ারের বোতল। দুটো গ্লাসে ঢেলে, একটা আমার দিকে নিজে আর একটা নিল।

আমরা দুজনেই 'গড্ ব্লেস্ আস' বলে গ্লাসে চুমুক দিলাম। যে যার চিন্তায় মগ্ন। দুজনের মনেই সংশয়—আসবে তো, ফিরে পাবো তো? দুজনেই ফেলে আসা সুন্দর দিনগুলোর কথা ভাবছি। কারও মুখেই কথা নেই। দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই সুদূরের পানে।

ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, খুব মন খারাপ লাগছে বুঝি?

—তা তো লাগছেই। তিনটে বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছি, কম কথা তো নয়।

—ও তোমার চিঠি লেখে?

—তা লেখে, টাকাও পাঠায়।

—টাকাও পাঠায়?

—টাকা না পাঠালে ছেলেকে হস্টেলে পড়াতাম কি করে।

—তা হলে ও ঠিকই আসবে। এখন কি করছে? কোথায় আছে?

—থাকে সিকাগোতে। দু বছর ধরে কাজ করছে। তার আগে পাঁচ বছর পড়েছে।

—এখানে কতদিন ছিল?

—তিন বছর আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। ওকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, অত মন খারাপ করো না। ঠিক চলে আসবে।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। শত হলেও আমেরিকান তো! না আসা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। আমার কথা বলে আপনার মনটা ভারাক্রান্ত করার মানে হয় না। চলুন, আপনাকে খাইয়ে শুইয়ে দেই।

আমাকে শুইয়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে গুড্ নাইট্ বলে ও শুতে চলে গেল।

অনেক রাত অবধি আমার ঘুম এলো না। শুধু একই ভাবনা, একই চিন্তা। চোখের সামনে একই দৃশ্য।

বারবার করে দেখা দিচ্ছে—মাটিতে বসে পড়ে জলভরা চোখের করুণ চাহনি আর সেই হতাশার আবেদন, অতীশ, অতীশ, অতীশ এখন কী করবে? সব শেষ হয়ে গেল। সারাটা রাত ছটফট করতে করতে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম শেষ রাতের দিকে।

॥ ৩৯ ॥

হঠাৎ কানে এলো, গুড মর্ণিং। আপনার বেড্-টী।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসে, ফ্যাঙ্গের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিলাম।

ও সামনের চেয়ারটায় বসে আমার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কাল বোধহয় আপনার ঘুম হয়নি? আজ বিকেলেই তো খবর নিয়ে আসবো। ও ভালই আছে। চা খেয়ে তৈরি হয়ে নিন। থানায় গিয়ে খবর নিতে হবে, মনে আছে তো?

—তা আছে। আমি জানি, ওখানে কোনও খবরই পাওয়া যাবে না।

থানায় যখন গিয়ে পৌঁছলাম, দারোগাবাবু তখনও বাড়িতে। থানার কাছেই বাড়ি। একজন পুলিশ গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো।

দারোগাবাবু বসতে বললেন। এটা ওটা জিজ্ঞেস করে আমার মনটাকে একটু স্থির করে বললেন, আমি দুঃখিত, যে কোনও খবরই নেই। কি করা হচ্ছে, তাও আমাকে জানানো হয়নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা আবার কি রকম ব্যাপার? আপনার এলাকায় এত বড় একটা বেআইনি কাজ হলো, অথচ আপনাকে কিছুই করতে দেওয়া হচ্ছে না।

—ফিস্ফিস্ করে এবার দারোগাবাবু বললেন, ড্রাগ ব্যবসার সুতোয় খুন সানের সঙ্গে বাঁধা আছে অনেক অনেক নাম করা লোক, তার মধ্যে মন্ত্রী, সেনাপতি কেউই বাদ যায় না। আরও অনেক ব্যাপার আছে, যা আপনাকে বলা যাবে না। আমার হাত পা বাঁধা। আমি দুঃখিত যে সেজন্য কিছুই করতে পারলাম না। ফ্যাঙকে জিজ্ঞেস করে ওর ঠিকানা নিয়ে বললেন, যদি কোনও খবর পাই, আপনাকে জানিয়ে দেবো।

গাড়িতে উঠে ফ্যাঙ বললো, ওর বাবাকে একটা ফোন করলে হয় না?

আমি বললাম, ওনার সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই।

—নাই বা থাকলো। ফোন নম্বর আছে?

—তা আছে।

—তা হলে, চলুন কোথাও থেকে ওঁকে ফোন করা যাক। ফোনে তো আর আপনাকে গুলি করতে পারবে না।

—তা অবশ্য পারবে না। ঠিক আছে, চল। আমরা একটা দোকানে গেলাম। ফ্যাঙ্গ আমার কাছ থেকে কার্ডটা নিয়ে ফোন করলো।

এক সিকিউরিটি অফিসার ফোনটা ধরে পরিচয় জিজ্ঞেস করলো।

ফ্যাঙ্গ ফোনটা আমার হাতে তুলে দিল। আমি সব ব্যাপারটা খুলে বলতে আর আমার পরিচয় দিতেই বললো, একটু ধরুন।

অনেকক্ষণ পর ভাঙা গলায় বুলডগের মত আওয়াজ হলো, ব্লাস্টার্ড ইণ্ডিয়ান, তুমি আমার মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে এই বিপদে ফেলেছ। লজ্জা করে না তোমার ফোন করতে?

আমি মিউ মিউ করে বললাম, গালাগালিটা এখন তোলা থাক না। ওর জন্য অনেক সময় পাবেন। আগে শুনুন, কোথায়, কী ভাবে ওকে কিডন্যাপ্ করলো?

কিছুক্ষণ ওদিক থেকে কোনও আওয়াজ নেই। তারপর বললেন, হ্যাঁ বলো।

বলা হলে জিজ্ঞেস করলাম, এবার কি করবেন?

—তা তোমাকে বলা যাবে না।

খুব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কাল সকালে কী আপনাকে একটা ফোন করতে পারি?

ঠিক আছে। তবে কাল সকালে আমি এখানে থাকবো কিনা জানি না।

—কোথায় যাবেন? আপনি চলে গেলে, আপনার মেয়ের কী হবে?

—আমার মেয়ের কি হবে, সেটা আমি বুঝবো। সেটা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। মায়ের চাইতে মাসীর দরদ দেখছি বেশী।

ফোন কেটে গেল।

বেরিয়ে এসে ফ্যাঙ্গকে বললাম, চল না একবার, ওর খোজ নিয়ে আসি।

ফ্যাঙ্গ বললো, সে তো বিকেলে যাবো।

—এখন গেলে হয় না?

—এখন তো আমার ভাইকে পাবো না, ও বোধহয় কাজে বেরিয়ে গেছে।

—কোথায় গেছে? সেখানে গিয়ে ওকে ধরা যায় না?

—কোথায় গেছে, তা আমি কি করে জানবো? সাধারণতঃ ওর কাজ হলো, এজেন্টকে মাল পেঁছে দেওয়া।

আমি ওর হাতটা ধরে অনুনয়ের সুরে বললাম, চলই না, একবার চেষ্টা করা যাক। না হলে তো ফিরেই আসবো।

—না হলে ফিরতে পারবো কিনা, তা জানি না।

—ঠিক আছে, তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে, আমি একাই যাবো।

—আপনাকে তো ওরা ঢুকতেই দেবে না।

—না দিক। আটকে রাখবে তো? রাখুক। তাহলে হয়তো ওকে রোজ

দেখতে পাবো। না হলে, খবর তো পাবো।

—আপনাকে ওরা ঢুকতেও দেবে না, আটকেও রাখবে না। মেরে ধরে এখানে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

—তা হলে? কী করবো?

—চলুন। দেখা যাক, কী করা যায়।

একই সময়। একই পথ দিয়ে চলেছি। পাহাড়ের গা বেয়ে একই ভাবে মেঘগুলো গড়িয়ে পড়ছে পথের রেখা অস্পষ্ট করে, পাশেও বসে আছে একই বয়সি একটি মেয়ে, তবুও একটা দিনের তফাতে কতই না পার্থক্য—কাল ছিল নতুন কিছু পাওয়ার আনন্দ, আজ হারিয়ে যাওয়ার বিষাদে ভরে গেছে। যাচ্ছি, যেতে হবে তাই। আশার ক্ষীণ আলোও দেখতে পাচ্ছি না। জীবনটাই আমার শুধু হারাবার—হারালাম দেশ, হারালাম প্রথম জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, হারালাম মনীষাকে, হারালাম দেশের মাটি আর এখন হারালাম নেত্রাকে।

কতক্ষণ চলেছি তারও খেয়াল নেই। ঘড়ির কাঁটা থেমে রয়েছে সেই কালকের দুর্ঘটনার সময়।

ফ্যাঙ্গ বললো, এবার বাঁ দিকের পথ নিন।

সেই রাঙ্গামাটির পথ, গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে ওপরে হারিয়ে গেছে। ঐ পথে গাড়ি চালাতে গিয়ে হাত কাঁপছিল, বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছিল, চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। তবু চলেছি ধীরে ধীরে, পেছনে লাল মাটি উড়িয়ে।

ফ্যাঙ্গ বললো, থামুন। গাড়িটা ঐ জঙ্গলের ভেতর নিয়ে চলুন।

আমি ওর কথা মত জঙ্গলের মধ্যে গাড়িটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল্যম. আমরা কি এখান থেকে হেঁটে যাবো?

—হ্যা। আমি যাবো। আপনি এখানে থাকবেন।

—আমি থাকবো কেন? আমিও যাবো।

—আপনাকে ওরা কিছুতেই যেতে দেবে না।

—তোমায় যেতে দেবে?

—দিলেও দিতে পারে। আমি ভাইর সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে আসি বলে, কেউ কেউ আমাকে চেনে। আজ গেলেও কোনও রকম সন্দেহ নাও করতে পারে। বলবো ভাইর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনি গাড়িটা আরও ভেতরে নিয়ে, গাড়িতেই বসে থাকুন। কেউ যেন দেখে না।

ও নেমে গেল। আমি ওর গতিপথে তাকিয়ে রইলাম। চুপচাপ বসে থাকলেই তো ওর কথা মনে হয়। তাই গাড়ি থেকে নেমে একটু হাঁটতে লাগলাম।

জঙ্গলে শুধু বড় বড় গাছ আকাশের দিকে উঠে গেছে। বড় বড় কাঠবেড়ালি আমাকে দেখে লেজ নাড়িয়ে গাছের উপর উঠে যাচ্ছে। সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে একদল হরিণ ঘাস খাচ্ছে মনের সুখে। একটা শিংওয়ালা

হরিণ মাথা উঁচু করে এদিক ওদিক দেখছে। গন্ধ পেয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছে, দল নিয়ে পালাবে কিনা। আমি গাছের আড়ালে বসে পড়লাম। হরিণটা একটু এগিয়ে এলো আমার দিকে—দেখতে পেয়েছে। এবার সবাইকে নিয়ে ছুট দিল।

আমি উঠে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কিছু জমিতে চাষ হয়েছে ভুট্টা। ভুট্টা ক্ষেতে একদল টিয়া পাখি খুটে খুটে ভুট্টা খাচ্ছে আর কিচির মিচির করছে। একটি বছর সতেরো আঠারোর মেয়ে টিন্ বাজাতে বাজাতে দৌড়ে এলো, টিয়ার ঝাককে তাড়ানোর জন্যে। ও আমাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ালো। আমি হাতের ইসারায় ওকে ডাকলাম। বললাম. একটু জল দেবে।

ও থাই ভাষা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। ও পাহাড়ি মেয়ে, ম্যাওদের মত পোশাক, চেহারা মঙ্গলীয়।

আমি তখন ইসারায় বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

ও বুঝতে পেরে হেঁসে, ইসারায় অপেক্ষা করতে বলে, দৌড়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর একটা বাঁশের চোঙায় জল নিয়ে দৌড়ে এসে আমার হাতে তুলে দিয়ে পাহাড়ি ঝরণার মত খিল্-খিল্ করে হাঁসছে। আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে অনেক কথা বলে গেল। বুঝলাম না কিছুই।

আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করছে আন্দাজ করে, বললাম, ইন্ডিয়া। হাত ঘুরিয়ে মুখের আওয়াজ করে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, গাড়ি আছে।

ও লাফিয়ে এসে হাত ধরে আমার গাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ইসারায় জানালো ও গাড়ি চড়বে ফিরতে। অগত্যা ফিরতে হলো। যখন গাড়ির কাছাকাছি এসেছি তখন দেখলাম, আমার গাড়ির সামনে কয়েকজন লোক হৈ হৈ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

আমাকে দেখে ওরা দৌড়ে এলো।

থাই ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, আমি এখানে কি করছি, কেন এসেছি?

আমি বললাম, এমনি এসেছি। জঙ্গল আমার ভালো লাগে, তাই।

ঐ পাহাড়ি মেয়েটা তখন ওর ভাষায় কি সব বললো। ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিল, হাত মুখ নেরে।

ঐ লোকগুলো তখন থাই ভাষায় আমাকে বললো, তুমি যা বলেছ, ঐ মেয়েটাও তাই বলছে। যাই হোক, আর এখানে থেকো না। জঙ্গল তো দেখা হয়ে গেছে, এবার চলে যাও।

আমি বললাম, ওকে যে একটু গাড়ি চড়াতে হবে। ওকে একটু ঘুরিয়ে আনছি, তারপরই চলে যাব।

—বেশী দেরি করো না, তা হলে কিন্তু আমরা তোমার গাড়িটা রেখে দিয়ে তোমাকে শহরে ছেড়ে দিয়ে আসবো।

—ঠিক আছে, বলে আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম। মেয়েটিও উঠে বসলো।

—ওরা নেমে গেল ওদের গাড়িতে।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই ও সিটের উপর লাফাতে লাফাতে এটা টানছে, ওটা ধরে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

আমি টেপটা চালিয়ে দিয়ে জানলা বন্ধ করে এ সি. টা. অন করে দিলাম।

ওর মহা আনন্দ। ও কখনও এ রকম গাড়িতে চড়েনি। কৃতজ্ঞতা জানাবার অন্য কোনও উপায় না পেয়ে ও হাঁসতে হাঁসতে আমার গালে একটা চুমু দিয়ে দিল। তারপর ভেজা গলাটা ওর হাত দিয়ে মুছে দিয়ে, জীব বের করে ভেঙচি দিয়ে কি সব বললো।

ওর দিকে তাকিয়ে না হেসে পারলাম না। ও শিশুর মতই সরল, তাই সুন্দর। ওকে দেখে মনে হলো, সমাজের বাঁধন না থাকলে মানুষ তার স্বাভাবিক আবেগ কত সহজে প্রকাশ করে।

আমি ওর ইসারার সারা না দিয়ে গাড়ি চালাতে মন দিলাম। ও চুপ করে গম্ভীর হয়ে বসে রইলো। আমি ওপরের দিকে উঠছি। মনে মনে ভয় করছে। দূরে দেখলাম একটা গেট। সেখানে অস্ত্রধারি সব সেনা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার গাড়িটা দেখে, একজন বন্দুক উঠালো। আমি গাড়ি ঘোরালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা জীপ এসে আমার পথ আটকে দাঁড়ালো।

জীপ থেকে নেমে আবার সেই একই প্রশ্ন, আমি কে, কেন ওদিকে যাচ্ছিলাম?

এবারও ঐ পাহাড়ি মেয়েটিই ওর ভাষায় নানান কথা বলে ওদের কী বোঝালো জানি না। ওরা ছেড়ে দিল পথ। শুধু বললো, তাড়াতাড়ি ভাগো।

আমি আবার আগের জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ওকে পাঁচ শো বাট হাতে দিয়ে ওর গালে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, এবার নামো।

ও নেমে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ করুণ চোখে তাকিয়ে থাই ভাষায় বললো, আবার এসো। ধন্যবাদ।

দূরে দেখতে পেলাম, ফ্যাঙ্গ দৌড়ে নেমে আসছে।

মেয়েটা তখনও গাড়িটা ধরে দাঁড়িয়েছিল। আমি চলে যেতে বলারও নড়লো না।

ফ্যাঙ্গ ওকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ আবার কে?

ওকে সব বললাম। এও বললাম, ভাগ্য-ভালো যে ও আমার সঙ্গে ছিল, না হলে আজ আমি হাড়-গোড় ভেঙ্গে এখানে পড়ে থাকতাম। শুনে খুশি হয়ে ফ্যাঙ্গ ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেই ও আবার খিল খিল্ করে হেসে উঠলো।

গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। মেয়েটা তখনও দাঁড়িয়ে।

হাঁসফাঁস করে ফ্যাঙ্গকে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খবর পেলে? তোমার দেরী দেখে তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, হয়তো তোমাকে আটকে রেখেছে।

—অনেক কষ্টে খবর জোগাড় করেছি। প্রথমে তো ঢুকতেই দিচ্ছিল না। তারপর……

আমি বাধা দিয়ে বললাম, সে সব কথা পরে শুনবো। আগে বল, নেত্রা কেমন আছে?

—ও ভালো আছে।

মন থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেল। ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে, অল্পক্ষণের জন্য।

—এবার বল, কি ভাবে ঢুকলে, কি ভাবে ওর সঙ্গে দেখা করলে, আর নিরাপদে ফিরে এল।

—আমাকে গেটে ঢুকতেই, আটকালো। আমি বললাম, আমার ভাই আছে এখানে, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ওরা লোক পাঠিয়ে খবর নিল, আমার ভাই আছে কিনা। আমাকে সার্চ করা হলে, ঐ লোকটার সঙ্গে ভেতরে গেলাম। আমাকে একটা গাছের তলায় বসিয়ে, লোকটা ভাইকে খবর দিতে গেল কারখানায়'

—ওখানে আবার কিসের কারখানা?

—ব্রাউন সুগারের। আফিমের রস থেকে তৈরি হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। লোকটা বেরিয়ে আমার কাছেই বসে রইলো। ভাই এলে, আমি ওকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলাম, আর মাঝে মাঝে ম্যা ম্যা করলাম। আমার ভাই খুব ব্যস্ত হয়ে ঐ লোকটাকে বললো চলে যেতে আর আমাকে নিয়ে গেল ওর ঘরে।

আমি হেঁসে বললাম, তুমি তো বেশ নাটক করতে পারো।

—না হলে তো লোকটা আমাকে ছেড়ে যেতই না। ওর ঘরে গিয়ে সব বললাম কেন এসেছি।

ভাই বললো, খবর ও জোগাড় করতে পারবে কোনও মতে, কিন্তু দেখা করানো বোধহয় সম্ভব হবে না।

আমি নাছোড়বান্দা। জানি, দেখা না করে গেলে আপনি শান্ত হবেন না।

ভাই আমাকে বসিয়ে দরজাটা তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এলো একটা মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটা ওখানে বাগানে কাজ করে। ওদের বিশেষ ধরনের পোশাক, হাতে একটা নম্বর লাগানো ব্যাণ্ড। আমার জামা-কাপড় পরিয়ে মেয়েটাকে বসিয়ে, ওর জামা-কাপড় পরিয়ে ভাই আমাকে বললো, বাগানে গিয়ে কাজ করতে।

আমি বাগানে গিয়ে কাজ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, নেত্রা আমার দিকে আসছে। আমার কাছাকাছি এসে ও কয়েকটা ফুল তুলছিল। আমি গাছের গোরা খুঁড়তে খুঁড়তে ওকে সব জিজ্ঞেস করলাম।

—ও আমার কথা জিজ্ঞেস করেনি?

—কেন করবে না। নিজের চাইতে তো দেখলাম, আপনার চিন্তাই বেশী করছে।

—এবার বল, ওর কথা।

—ওকে খুব যত্ন করেই রেখেছে ওরা। অত্যাচার তো দূরের কথা, কোনও প্রশ্নই করেনি ওকে। ওদের আস্তানায় ও ইচ্ছেমত ঘুরতে পারে। ওর সঙ্গী হলো খুন্ সানের তৃতীয় স্ত্রী, একটি থাই মেয়ে, বয়স ওর চাইতে বছর পাচেক বেশী।

—ছাড়া পাবে কবে, তা কিছু বললো?

—তা ও জানে না। খুন্ সান্ এখন এখানে নেই। বর্মামুলুকে গেছে সানদের হয়ে লড়াই করতে। খুন্ সান্ নাকি বলেছে, কোনও চিন্তা না করতে, তবুও ও অস্থির হয়ে রয়েছে আপনার জন্যে। এবার খবর তো পেলেন, নিশ্চিন্ত হলেন তো?

—তা হলাম বইকি কিছুটা। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি যে এত চালাক, তা বোঝাই যায় না।

ঘাড়টা কাত করে সুর টেনে ফ্যাঙ্গ বললো, কি আর করি, আপনার অবস্থা দেখে করতে হলো।

—তোমার ভয় করেনি?

—তা কি আর করেনি। সব সময়ই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। ধরা পড়লে আর নিস্তার ছিল না। তা হলে আপনাকে এখানেই বসে থাকতে হতো।

গাড়ির শব্দ শুনে ওর মা দৌড়ে এলো। ফ্যাঙ্গকে ফিরে আসতে দেখে খুব খুশি। নেত্রার খবর জেনে বুকের কাছে একটা ক্রস চিহ্ন এঁকে, যিশু ওকে বাঁচিয়ে রাখুন বলে, সেই মানব সন্তানকে একটা প্রণাম জানালো।

এখন কি খাবেন বলুন, জিজ্ঞেস করলো ফ্যাঙ্গ, বিয়ার না কফি?

—কফি।

ঠিক আছে, আপনি ঘরে গিয়ে বসুন। আমি নিয়ে আসছি।

৪০ ॥

আমার মনটা একটু প্রসন্ন, নেত্রার ভালো থাকার খবর শুনে। আগে কখনও শুনিনি যে ড্রাগ কিংবা এত ভদ্র ব্যবহার করে কোনও সুন্দরী বন্দিনীর সঙ্গে। বোঝা যাচ্ছে এবার, মুক্তিপণ পেলেই ও ছাড়া পাবে।

কফিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফ্যাঙ্গ চলে গেল তার কাজে। কফি খেতে খেতে জানলা দিয়ে দেখছিলাম ওর কাজ। ও উঠোন পেরিয়ে চলেছে কাঁধে একটা ঝুড়ি আর হাতে একটা বালতি। মুরগীগুলো ওকে দেখে কোঁক কোঁক করছে আর খোঁয়াড়ের সাদা শুয়োরগুলো ঘ্যোৎ ঘ্যোৎ করছে। ওকে দেখে একটা শুয়োর উঠে দাঁড়ালো আর তার আটটা বাচ্চা মায়ের পেটে দুটো পা রেখে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে মনের সুখে দুধ খাচ্ছে। কিছুদিন পরই হয়তো এই সাকলিং পিগ্‌গুলো পরিবেশিত হবে কোনও চিনা রেস্তোরাঁয়।

ফ্যাঙ্গ আমাকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে বললো, স্নান করতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে, স্নানের ঘরে জল দেওয়া হয়নি, জল গরম বসিয়ে এসেছি?

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। শীতের রোদে বেশ আরাম লাগছে। অনেক বছর পর এই শীতের রোদের উম্‌টা খুব ভালো লাগছিল। নীল আকাশ, সবুজ পাহাড়ের বুকে চিয়াংরাই শহরে ছোট ছোট বাড়িগুলো পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর মিলেমিশে আছে। সাদা মেঘগুলো পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। এক দিনের বদ্ধ মন আজ কিছুটা মুক্ত হয়েছে। উপভোগ করতে পারা যে মনেরই একটা অবস্থা, তা আজ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম। নেত্রা যদি পাশে থাকতো তা হলে এই দৃশ্যটা আরও উপভোগ করতে পারতাম।

এর মধ্যে ফ্যাঙ্গের পশুপাখির সেবা শেষ হয়েছে। ও ঝুড়ি আর বালতি রেখে এবার কুয়োর ধারে এসেছে আমার স্নানের জল তুলতে। আমি ওর হাত থেকে দড়িটা কেঁড়ে নিতে গেলে ও কিছুতেই ছাড়লো না। বালতিটা কুঁয়োয় নামাতে নামাতে বললো, দেখুন, আপনি কোনও হোটেলে থাকলে কি নিজের কাজ নিজে করেন? আমরা তো সার্ভিস দিয়ে আপনার থেকে দাম নেবো। ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বসুন।

আমি বাধ্য হয়েই গিয়ে চেয়ারটা রোদে টেনে এনে বসলাম। এক হাতে ফ্রকটা হাটুর উপর তুলে জলভর্তি বালতিটা নিতে নিতে বললো, এবার আসুন।

ওর কথা মত স্নানের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম ও বাধা দিয়ে বললো, আমাদের স্নানের ঘর তো আপনি আগে দেখেছেন। ঐ ভেজা ঘরে জামা-কাপড় ছাড়বেন কি করে? জামা-কাপড় ছেড়ে এই তোয়ালেটা জড়িয়ে আসুন। বিছানার ওপর স্লিপিং সুটটা রেখেছি। আমি ও স্নান করে আসি। মার রান্না হয়ে গেছে।

কাল ভালো ঘুম হয়নি। সেটা দিবানিদ্রায় পুষিয়ে নিলাম। সন্ধ্যায় থানায় গিয়ে নেত্রার বাবাকে ওর খবর জানাতে খুশি হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, কি করবো বুঝতে পারছি না। আমেরিকার টাকার লোভে ওরা আমার মেয়েটাকে বলি দিতে চায়। আমি রিজাইন করতে চাইলাম, তাও রাজি হচ্ছে না। দেখা যাক, কি করা যায়? আমি খুন্‌ সানের সঙ্গে যোগাযোগ করবো গোপনে। তুমি আর ওখানে থেকো না।

আমার মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল।

ফ্যাঙ্গ শুনে বললো, সান্‌ তো শুনেছি দুদিন পরে ফিরবে।

ডামরঙ্গপানকে আবার ফোন করে সে কথা জানিয়ে দিলাম। ঠিক করলাম কাল ব্যাংকক ফিরে যাবো।

ফিরে যাবার কথা শুনে ফ্যাঙ্গ বললো, অতটা পথ আপনার একা ড্রাইভ করে

যাওয়া ঠিক হবে না। চলুন, দেখি একজন ড্রাইভার ঠিক করে দিতে পারি কি না।

ও একজন ড্রাইভার ঠিক করে দিল, তিনশো বাট ওর মজুরি আর তিনশো বাট ফেরার বাস ভাড়া।

বাড়ি ফিরে ও আমাকে নিয়ে আবার সেই বারান্দায় বসলো। নিয়ে এলো বিয়ারের বোতল আর দুটো গ্লাস।

ঘুরে ফিরেই নেত্রার কথা মনে হচ্ছিল। ওর মুক্তির কি হবে সেই ভাবনাই চেপে বসেছে।

—দেখুন, অত ভাববেন না। নেত্রাকে মেরে খুন, সানের কোনও লাভ হবে না। ডামরঙ্গপান তার মেয়েকে কিছুতেই হারাতে দেবে না, যেমন করেই হোক উদ্ধার করবেই, লড়াই করেই হোক আর পায়ে ধরেই হোক। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। নিন বিয়ার খান। আমিও আপনার সঙ্গে খাবো, অদ্য শেষ রজনী।

বিয়ার খেয়ে মনটা দুজনেরই কিছুটা হাল্কা হয়েছে। আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। তারাগুলো টিপ্ টিপ্ করছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে জোনাকির দল আলোর টুকরো হয়ে উড়ে আসছে নীচ থেকে। মাঝে মাঝে গাড়ির আলো এসে চোখ ঝলসে দিচ্ছে।

আমার হাতটা ধরে ফ্যাঙ্গ বললো, থাকুন না আর একটা দিন। নেত্রাকে নিয়েই একসঙ্গে ফিরে যাবেন। আপনার সঙ্গে এখানে বসতে বেশ ভালো লাগছে। জনের সঙ্গে রোজ সন্ধ্যায় এখানে এসে বসতাম। চাঁদের আলোতে ওর মনটা কি রকম উদাস হয়ে যেতো।

ফ্যাঙ্গ এক ফালি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে উদাস দৃষ্টি মেলে, স্বপ্ন দেখছে। মনটা ওর চলে গেছে কয়েক বছর পেছনে। আমি ওর ঘারে হাত রেখে বললাম, খুব মনে পড়ছে বুঝি ওর কথা? এ পরিবেশটাই যে স্বপ্নালু।

হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কি মনে হয় ও আসবে? আমাদের কি নিয়ে যাবে?

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, নিশ্চয় আসবে। আমার হাতের ওপর দু'ফোঁটা জল পড়লো।

আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে কোলের উপর হাতটা রেখে সুদূরের পানে তাকিয়ে বললো, জানেন, ও কিন্তু খুব ভালো। আমাকে দারুণ ভালোবাসতো। বাসবেই বা না কেন, আমার সেবা যত্নেই তো ও ভালো হয়ে উঠেছিল। আমার কাঁধে ভর দিয়েই তো ও প্রথম হাঁটতে আরম্ভ করলো।

—ওর কি হয়েছিল?

—ওর পা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল।

—ও বুঝি ভায়েট্‌নামের যুদ্ধে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—তোমার সঙ্গে দেখা হলো কি করে ?

—এমনি এক রাতে ওকে নিয়ে এসেছিল আমার বাবা, আধমরা অবস্থায় নদীর পাড় থেকে।

—তোমার বাবা কি করে দেখলো ওকে ?

—আমার বাবা মাছ ধরতে গিয়ে ওকে দেখতে পায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। ওর একটা পা বুলেছে। সেখান থেকে তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ডাক্তার ইঞ্জেকশান দেবার অনেকক্ষণ পর জ্ঞান হলো। জ্ঞান হয়েই এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাকে দেখে আবার চোখ বুজলো। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, ডোণ্ট ফিয়ার, ফ্রেণ্ড। নট এনিমি।

ও তখন চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, হোয়ার এ্যাম্ আই ? থাইল্যাণ্ড ? একটা জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, থ্যাংক গড্। দেন আই এ্যাম গোইঙ্গ টু লিভ। আমার পা, আমার পা ? নেই, না ?

আমি মিথ্যে সান্ত্বনা দিলাম। ওর সঙ্গে আমি হাসপাতালে ছিলাম দুমাস।

—জন্ এখন তাহলে ক্রাচ ভর্ দিয়ে হাঁটে ?

—না, না, আরটিফিসিয়াল লিম্ব লাগিয়ে সুন্দর হাঁটতে পারে। আপনি নিশ্চয় জনের মত নেতাকে ছেড়ে চলে যাবেন না ? প্লিজ, যাবেন না। মেয়েদের কষ্ট আপনারা ঠিক বুঝতে পরেবেন না। আর একটা কথা, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলুন। দেখুন না, জন্ আমাকে বিয়ে না করেই চলে গেল। এলোও না, বিয়েও হলো না।

আমি বললাম, না, ওকে ফেলে চলে যাবো না। ফিরে আসুক, তারপর তো, ম্লান হেসে, সে সব হবে।

—আমাকে কিন্তু বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে ভুলবেন না।

—কখনও না, যদি তুমি তখনও থাকো। বিয়ের আগে যে তোমার ছেলে হলো, তার জন্য কেউ ছিঃ ছিঃ করেনি ?

—না তো। আমাদের দেশে এ'রকম আকছাড় হচ্ছে। আপনি দেখেননি, গ্রামে শহরে কত ছেলে মেয়েদের চুল কোঁকড়া, আর কারও বা চোখ নীল, চুল সোনালী। বোতলটা তো শেষ হয়ে গেল, আর একটা নিয়ে আসি।

ও চলে গেলে ভাবছিলাম, এদের সমাজের কথা। এদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক, যেমন খাসিয়াদের বা বর্মিদের। এখানকার মেয়েরা যুদ্ধ করেছে ছেলেদের সঙ্গে পা মিলিয়ে, গা মিলিয়ে, জন্মানিয়েছে কতশত পিতৃপরিচয়হীন সন্তান। তাই এদেশে আগের দিনে নামের সঙ্গে ছিল না কোনও পদবী, যার থেকে পাওয়া যাবে বংশ পরিচয় বা পিতৃপরিচয়। এদের জাতিভেদ কোনও দিনই ছিল না। অস্পৃশ্য বলে কেউ নেই। এদের আছে শুধু অর্থনৈতিক ভেদাভেদ। রক্ষিতার সন্তানরাও সম্পত্তির অধিকারী। সৈন্যবিদ্রোহের পরই এদের পদবী ধারণ করার রীতি প্রচলিত

হয়েছে। মেয়েরা এখানে ছেলেদের চাইতে কর্মঠ।

ফ্যাঙ্গ আর এক গ্লাস বিয়ার নিয়ে বসলো।

—ফ্যাঙ্গ, তোমার ভালো নাম কী?

—পীয়া পকাপন্। আমাদের ডাক নাম হয় কোনও রং, যেমন ড্যাম্ (কালো) ফ্যাঙ্গ (লাল) অথবা কোনও পশু, পাখির নাম।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করতে করতে ঐ বোতলটাও শেষ হয়ে গেল, ততক্ষণে ফ্যাঙ্গের মনেও বুদবুদ উঠে এসেছে, কথায় জড়তা, হাবভাব বাঁধনছেড়া আর মনোভাবে অবচেতনার বিস্মৃতি।

—জন্ ডার্লিং, তুমি আজ চুপচাপ বসে আছ কেন? এসো আমার কাছে বলে, আমার গলা জড়িয়ে মুখটা চেপে ধরলো। জন্ সাড়া দিচ্ছ না কেন? জন্ আমাদের বিয়ে হবে কবে? তোমার সন্তান যে এসে গেল। বিয়ে না হলে তোমাকে বাবা ডাকবে কী করে? এ কি জন্! আজ তোমার কী হয়েছে? কথা বলছো না কেন? কথা বল।

আমি ও চুপ করে বসেছিলাম। ওর স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে মায়া হচ্ছিল। কেন যে জন্ বিয়ে করেনি ওকে, তাই ভাবছিলাম। উদ্দেশ্য কী তা হলে, ওকে ফাঁসিয়ে পালিয়ে যাওয়া? আবার বিয়ার ঢালতে গেলে, ওর হাতটা ধরে ফেললাম।

একটা গাড়ির লাইট এসে পড়লো আমাদের গায়ের উপর।

ঝাপসা চোখে সেই আলোতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, থুথনিটা ধরে কাঁপা গলায় বললো, ও গড্! ই-উ ন-ট্ জ-ন্। আ-ও-য়া-র গে-স্ট্ থাও থো-ট্। পে-ন্ রাখ-ই (দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না।

আমি ওর হাত ধরে উঠিয়ে বললাম্, চল ঘরে চল।

ঘরে গিয়ে কী হবে, বলে একটা পা ফেলতেই পরে গেল। ওঠবার চেষ্টা করে পারলো না।

আমি কোলে করে আমার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিলাম। ওর মা ততক্ষণে এসে পড়েছে। ওকে বললাম, এক কাপ কালো কফি করে আনতে। ভেজা তোয়ালে দিয়ে ওর মুখ চোখ মুছিয়ে দিলাম। কফিটা খাবার পর অনেকটা সম্বিত ফিরে পেল।

লজ্জা বিনম্রস্বরে বললো, খুব অসভ্যতা করেছি, না? কী করেছি? আমি কিন্তু জ্ঞানত কিছুই করিনি। যাই হোক, ক্ষমা করবেন।

—এখন কেমন লাগছে?

—ভালো। আপনাকে খুব জ্বালাতন করলাম তো? আর তো দেখা হবে না।

—দেখা হবে না কেন? ব্যাংকক গেলেই দেখা হবে।

—নেত্রার খবর জানতে আর জানাতে আপনাকে ফোন করবো। আপনার একটা কার্ড দিন। কাল তো আবার খুব ভোরে উঠতে হবে। খেয়ে এবার শুয়ে পড়ুন। আর দুটো দিন থাকলে বেশ হতো। থেকে গেলে পারতেন। বেশ লাগছিল,

অনেকদিন পর।

—আমার অফিস আছে যে, যেতে তো হবেই।

—আপনি চিন্তা করবেন না। আমার ভাইকে বলেছি, রোজ নেহার খবর আমাকে জানাতে। কিছু নতুন খবর থাকলেই আপনাকে জানিয়ে দেবো।

পাখিদের ঘুম ভাঙানি গান শুরু হতেই, ফ্যাজ আমাকে তুলে দিল, চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে। নিজে বসে থেকে পুরো ব্রেকফাস্ট খাওয়ালো।

গাড়িতে ওঠবার সময় হাতটা ধরে বললো, গুড্ লাক্।

আমিও বললাম, গুড্ লাক্। থ্যাঙ্ক ইউ। সি ইউ এগেইন্ উইথ্ জন্। বিদায়।

॥ ৪১ ॥

একটানা চলে এসেছি। যখন এসে পেঁছিলাম, তখন চারটে বেজেছে। আমার গাড়ি ইউলাজ এপার্টমেন্টের গেট দিয়ে ঢুকতেই পিয়ালী দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলো। আমাকে খুব ভাল করে কিছুক্ষণ দেখে, হাত ধরে নিয়ে গেল বাস্তুঠাকুরের ছোট্ট মন্দিরের সামনে। সেখানে ভালো করে প্রণাম করা হয়ে গেলে —ভগবানের অশেষ কৃপা যে আমার মাস্টার ফিরে এসেছে। ওকে তুমি রক্ষা করো। আমি সব মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে মানত করে এসেছি। এ রোববার আমি পাঁচজন সন্ন্যাসীকে ডেকে আনবো, তুমি তাদের নিজের হাতে ভিক্ষে দেবে। তোমার থেকে টাকা নিয়ে আমিই জিনিস কিনে সব প্যাকেট করে রাখবো। তুমি এখন ঘরে যাও। আমি জিনিসগুলো নিয়ে আসছি।

ও আমার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিল। আমার মা থাকলেও তো এই রকমই করতো। আমি ঘরে ঢুকে সোজা শোয়ার ঘরে চলে গেলাম।

পিয়ালী এক কাপ চা দিয়ে মেঝেতে বেশ শান্তিতে বসে নেহা আসেনি জেনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, ও বড় ভালো মেয়ে। এখন ওর কপালে কি আছে, কে জানে?

আমি অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওর মন্দ কপালের কথা জানলে কি করে?

—তোমার 'লেখা' কাগজে পড়ে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল। তুমি এবার স্নান করে এসো, আমি তোমার জন্য লুচি তরকারি বানিয়ে দেই। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।

খিদের মুখে ওর লুচি তরকারি অমৃত-সমান মনে হচ্ছিল। নেহার বাবাকে ফোন করলাম।

ওর বাবা বললো, তুমি তা হলে এসে গেছ। আমার মেয়ের আর কোনও খবর নেই? আর কোনও কথা না বলে, ফোনটা রেখে দিল।

আমি এসেছি শুনে সন্ধ্যায় ভাসনা এলো। দুজনের একই কথা, শুধু নেত্রা আর নেত্রা। ও আমার মন ভোলাবার অনেক চেষ্টা করলো, অনেক আশ্বাস দিল, গায়ে গা লাগিয়ে বসলো, কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। তবুও ঘণ্টা দুএক সঙ্গ দিয়ে এক সঙ্গে খেয়ে অন্ততপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক করে রেখেছিল।

নেত্রার ভূত আমার মাথায় আর বুকে চেপে বসেছে, কোনও কাজে মন বসছে না। গল্ফ্ খেলতে গেলে বল কেবল জলে পড়ে যায়। লাইব্রেরি থেকে বই আনি, না পড়েই আবার ফেরৎ দিই। সিনেমার ক্যাসেট আনি, কিছুই দেখা হয় না। হুইস্কির মাত্রা বেড়ে গেছে। ঘুমের ওষুধ রোজই লাগছে।

এর মধ্যে একদিন হীরক আর লাবনী এসে উপস্থিত হলো।

লাবণী তার স্বাভাবিক উচ্ছ্বলতা নিয়ে বললো, কি করছেন অতীশদা? কিছু জিনিস কিনতে শহরে এসেছিলাম, আপনাকে দেখতে চলে এলাম। আপনি আজ এত গম্ভীর কেন? মনে হচ্ছে, আমাদের দেখে খুশি হননি?

—তা কেন?

—বাঃ! আমাদের বসতেও তো বলছেন না।

—তোমাদের আবার বসতে বলতে হবে নাকি?

পাশে বসে আমার গাটা ঝাকুনি দিয়ে লাবণী আবার বললো, কি হয়েছে আপনার, বলুন তো?

—কিছু হয়নি তো।

—মেয়েদের চোখ এড়াতে পারবেন না। আপনি প্রেমে পড়েছেন। প্রেমে পড়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয় তবে জানতে কৌতুহল, কার সঙ্গে? এখানে, না দেশে? দেশে তো মাস দুয়েক ধরে যান না। একমাস আগেও তো আপনি এরকম ছিলেন না? তা হলে এখানেই, তাই না?

—হীরক ওর প্রগলভতা থামাবার জন্য বললো, তোমার অত জানবার দরকার কী? ওটা ওর নিজস্ব ব্যাপার!

—কি যে বলো? ওঁর এখানে কেই বা আছে, আমরা ছাড়া। সুখ দুঃখের সাথী হবার জন্যই তো বন্ধু। বলুন অতীশদা, কি হয়েছে? বলবেন না তো? তবে আমিই বলছি, আপনি কয়েকদিন আগে গাড়ি করে চিয়াংমাই গিয়েছিলেন। তাই না?

—কে বললো?

—আমি ফোন করেছিলাম, পিয়ালী বলেছে। আমাদের জানালে তো আমরাও আপনার সঙ্গী হতে পারতাম।

—হঠাৎ চলে গেলাম, তাই তোমাদের জানাতে পারি নি।

—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়? আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল, তাই না? ধরা পড়ে যাওয়ায়, স্বিকার করতেই হলো।

—ঐ মেয়েটি কে ? এসকর্ট ?

হীরক আবার ওর বৌকে সামলাবার চেষ্টা করলো ? কিন্তু মেয়েদের কৌতুহল তার্থ না হওয়া পর্যন্ত থামবার নয় ।

—ওকে নিয়েই নিশ্চয় কোনও লট্‌ঘট্‌ হয়েছে ?

—লট্‌ঘট্‌ হবার কি আছে ?

আমার মুখটা ওর দিকে ঘুরিয়ে বললো, তাকান তো আমার দিকে সোজা বে ।

—তাকাতেই হলো । ওর সুন্দর মুখের হাবভাব দেখে, না হেসে থাকতে রলাম না ।

—এই তো হেঁসেছেন । দ্যাটস্‌ লাইক অতীশদা ।

হীরক এবার বললো, তুই কি চিয়াংরাই গিয়েছিলি ?

—বললাম, হ্যাঁ । চিয়াংমাই গাড়ি নিয়ে গেলে তো সবাই যায় ওখানে ।

—ওখানে তোর বান্ধবীকে কী সানের লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ ।

লাবণী এবার বললো, দেখলেন তো, আমরা সব জানি । কাগজেই তো উঠেছিল, ম অবশ্য ছিল না ।

হীরক বললো, ঐ মেয়েটি জেনারেল ডামরঙ্গপানের মেয়ে, তাই না ?

—হ্যাঁ ।

—আমার ভয়, তোর না কিছু হয়ে যায় ?

—কেন ?

—এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে দাঁড়াতে পারে । এটা নিয়ে আমেরিকা ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে মতবিরোধ ঘটাও অসম্ভব নয় ।

—কারণ ?

—আমেরিকানরা চাইবে খুন্‌ সানুকে শেষ করে আফিমের চাষ বন্ধ করতে আর ডামরঙ্গপান চাইবে সানের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে তার মেয়েকে বাঁচাতে । তাছাড়া এই ড্রাগের পয়সা তো সবাই পায়, সব রাজনৈতিক দলই । অতএব দুইএর উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী । খুব সাবধানে থাকিস ।

লাবণী বললো, আমার খুব ভয় করছে অতীশদা আপনার জন্যে । কয়েকদিনের অন্য দেশে ঘুরে আসুন ।

—সে কি করে হয় ? এর শেষ না দেখে আমি নড়ছি না ।

—দেখুন ভেবে । কাল আমাদের ওখানে আসুন । একটু গল্প করে, মুখ বদলে, মনটাকে চাঙ্গা করে আসবেন ।

—দেখি ।

আমার হাত ধরে লাবণী বললো, দেখি নয় । আসতেই হবে । আমি আপনার

জন্যে বিশেষ রকম পদ রাঁধবো, যা এখানে খেতে পান না, অথচ আপনি ভালবাসেন। যাবেন তো ? বলুন যাবেন।

—ঠিক আছে, যাবো।

ওরা চলে গেল।

এই হীরকই হলো প্রথম বাঙ্গালী পরিবার, যার সঙ্গে আমার এখানে প্রথম পরিচয়। যখন প্রথম আসছিলাম তখন প্লেনে হঠাৎ দেখা উৎপলের সঙ্গে। ও যাচ্ছিল জাকার্তার কাজে, সঙ্গে নিয়েছিল আরও একজন বাঙ্গালী, উদ্দেশ্য জাকার্তার ব্রিজ প্রতিযোগীতায় যোগ দেওয়া। ও হীরকের একটা কার্ড দিয়ে বলেছিল, একটু খবর দিতে যে ওরা ফেরার পথে ওর ওখানে উঠবে।

হীরক পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল পরিবারের ছেলে। ওর বাবা শেকড় গাড়বার চেষ্টা করেছিল চন্দননগরে। ও টেকসটাইল টেকনলজি পাশ করেছে বহরমপুর থেকে। কাজ করতো জয়শ্রী টেকসটাইলে। বিড়লা যখন এখানে কারখানা করলো তখন থেকে ও এখানে।

লাবণী চন্দননগরের বনেদী বেনে বাড়ির সুন্দরী মেয়ে। এক পাড়ায়ই ওরা থাকতো। পথে যেতে যেতে আলাপ, তারপর ঘনিষ্ঠতা, তারপর বাড়ির বাধ কাটিয়ে পালিয়ে এসে এখানে বিয়ে আর্য্যসমাজে। এরা খুব মিশুকি ও আড্ডাবাজ ও থাকে ব্যাংকক থেকে অনেকটা দূরে, চাউ-পিয়াও নদীর ওপারে সুখসাওর সমুত প্রকারণে।

পরের দিন ইচ্ছা না থাকলেও গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে। ঢুকতেই লাবণী বললো, যাক আপনি এসেছেন তাহলে। না এলে ভীষণ রাগ করতাম। আপনার সঙ্গে আর কথাই বলতাম না।

হীরক হুইস্কির বোতল নিয়ে এলো।

ওর মেয়েটা আমার কোলে উঠে—কাকু আ মা লে কী দেবে ?

ওর পাওনা ক্যাডবেরি দিয়ে একটু আদর করে দিলাম।

লাবণী হাত মুছতে মুছতে এসে আমার পাশে বসে বললো, আপনার জন্যে সেই সকাল থেকে রান্না করছি।

—কি এতো রান্না করলে ?

—সে খেতে বসেই দেখবেন। ঘটির মেয়ে কি এত বাঙ্গাল রান্না পারে ?

—কোথায় শিখলে, তা হলে ?

—ওর মা যখন আসেন, তখন ওনার কাছ থেকে।

আপনার বাঙ্গালীদের বৈঠক তো ভালই চলছে। প্রায় পাঁচটা বৈঠক তো হয়ে গেল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, যারা একটু উঁচু স্তরে থাকে তারা কিন্তু এখনও বৈঠক বসায়নি তাদের বাড়িতে।

—উঁচুতে উঠলে উঁচুদের সঙ্গেই তারা মিশতে চায়, তখন ভুলে যেতে চায়।

তাদের পুরোনো গোষ্ঠীর কথা। ওটা ভাঙবার জন্যেই তো এই বৈঠকের আয়োজন। একটু সময় লাগবে।

হীরক বললো, দুই বাঙলা থেকে দুজন খ্যাতিমান গায়ক/গায়িকা আনলে কেমন হয়?

আমি বললাম, তা হলে তো দুই বাঙলার লোকদের একত্র করতে হবে। তাতে তো অনেকেরই আপত্তি। তুই দেখনা প্রস্তাবটা রেখে পরের বৈঠকে। আমাদের সবাই রাজি হলে আমি বাঙলাদেশীদের রাজি করাবো।

—ঠিক আছে। চেষ্টা করা যাবে। আমার সঙ্গে মান্না দে-র আলাপ আছে। ওরা যদি লায়লা-কে আনতে পারে। তোর বান্ধবীর কোনও খোঁজ পেলি?

—না পাইনি। জানি না, ও কি রকম আছে? বেশীক্ষণ বসবো না রে। ভালো লাগছে না।

এর মধ্যে পাশের ফ্ল্যাট থেকে সুকান্ত এসে ঘরে ঢুকলো।

—কি অতীশ, ভালো আছ তো?

—তুমি কেমন?

—আমি তো আর এক মাস আছি।

—সে কী? কোথায় যাবে?

—দেশে।

—কেন?

—অনেক তো হলো। এবার মেয়ের ভবিষ্যতটা দেখতে হবে তো?

—মেয়ের আবার কি হলো?

—মেয়ের ছ' বছর হলো। এরপর গেলে ওখানকার আর কোনও স্কুলে নেবে না।

—কেন, ওর স্কুলটা তো এখানে শেষ করে যেতে পারতে, তা হলে আরও কিছু পয়সা জমতো।

—এখানে স্কুলে পড়ালে দেশের কলেজে ভর্তি হওয়া মুসকিল। আমেরিকা/ অস্ট্রেলিয়ায় আমি মেয়েকে পড়াবো না। আর কি হবে জমিয়ে? বাড়ি হয়েছে, ব্যাঙ্কে কিছু জমেছে, মেয়ের বিয়ের গয়না হয়ে গেছে, আর দরকার নেই।

হীরককে জিজ্ঞেস করলাম, তোদের ব্যবসা চলছে কি রকম?

—বেশ ভালো। এখানে এক একটা মেয়ে তিনটে করে তাঁত চালায়। তাঁতগুলি সব অটোমেটিক। মাইনে পায় টাকায় ধর হাজার। আমাদের দেশে এক একজন এক একটা তাঁত চালায়। ইউনিয়ানের দৌরাত্মে অটোমেটিক মেশিন বসিয়ে লোক কমানো যায় না। অথচ তাদের এক একজনের মাইনে দু হাজার টাকা করে।

একটাই অসুবিধা হয়েছে—সেলস্ ডাইরেক্টার আমাদের এক মাড়োয়ারি, সে প্রচুর টাকা মেরেছে এক্সপোর্টের ব্যবসায়। তাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে।

আমি হাঁক মেরে বললাম, লাবণী, এবার খাবারের যোগাড় করো।

খেতে বসে অবাক হয়ে গেলাম, চিংড়িমাছ দিয়ে মোচার তরকারি পেয়ে। বললাম, মোচা পেলে কোথায়, লাবণী?

—হীরক আনিয়েছে বাগান থেকে। একটু মুচকি হেঁসে—যে এনেছে, সেই মেয়েটি, আমি না থাকলে হীরকের দেখাশোনা করে। দেখতেও সুন্দর। ঐ ভয়েই তো সহজে একা দেশে যাই না ওকে রেখে।

হীরক বললো, বাজে কথা বলো না। ও আমার কারখানায় কাজ করে। ওদের বাগানে কলাগাছ আছে। মোচা তো চিনারাও খায়।

খেয়ে আর বসলাম না। লাবণীর রান্নার উচ্ছসিত প্রশংসা করে চলে এলাম।

॥ ৪২ ॥

নেত্রার অপহরনের পর চারদিন হয়ে গেল। ভাসনার থেকে জেনেছি, ওর বাবা ব্যাংককে নেই। কোথায় গেছে কেউই জানে না। ফ্যাঙের কাছ থেকেও কোনও খবর আসেনি। কাজ করতে হয়, তাই কাজে যাই।

এর মধ্যে মা বাবা কলকাতায় এসে একটা ফোন করেছিল। আমি বলেছি টিকেট পাঠিয়ে দেবো সুকান্তের সঙ্গে। ওর সঙ্গেই আসতে বললাম। সুকান্ত যাচ্ছে একটা কাজের জোগাড়ে আর মেয়ের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে। মা, বাবা অবশ্য আগেও একবার ঘুরে গেছে। এবার আসতে বললাম নিজের তাগিদে। একা একা মনটা হাঁপিয়ে উঠছিল।

সন্ধ্যায় একটা খবর পেলাম ফ্যাঙের কাছ থেকে। খবরটা পেয়ে আরও ভয় পেয়ে গেলাম। নেত্রা ওখান থেকে রাতের অন্ধকারে পালিয়েছে। খুন্ সানের লোকেরা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে চারদিক। ওরা বুঝতেই পারছে না কোথা দিয়ে, কেমন করে পালালো, লুকিয়েই বা আছে কোথায়? খুন্ সান্ এসে খুব হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। রাতের পাহারাদারদের শাস্তি দিয়েছে।

পরের দিন কাগজে সেই খবর উঠলো। কাগজে লিখেছে, জেঃ ডামরঙ্গপান একদল কমাণ্ডো ফোর্স নিয়ে হেলিকপ্টারে করে ওর মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি ওর মেয়েকে। কমাণ্ডোদের সঙ্গে খুন্ সানের সৈন্যদলের লড়াই হয়েছে। সান্ বর্ম্মামুলুকে পালিয়ে গেছে। নেত্রার কোনও খবর নেই কাগজে।

সন্ধ্যার সময় আবার খবর এল ফ্যাঙের কাছ থেকে। নেত্রাকে সানের লোকেরা খুঁজে পেয়েছে এক পাহাড়ি বস্তিতে। সান্ ওকে নিয়ে পালিয়েছে। ডামরঙ্গপান

সানের ডেরা দখল করে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে। ওর দলের অনেক লোক ধরা পড়েছে, তার মধ্যে ফ্যাঙের ভাইও আছে।

ওর ভাই ধরা পড়া মানে আর কোনও খবর পাওয়া যাবে না ফ্যাঙের কাছ থেকে।

দুদিন পর ভাসনা জানালো যে নেত্রার বাবা খুব হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। নেত্রাকে পাওয়া যায়নি। উনি এবার খুব ভয় পেয়েছেন। ভাবছেন এবার ওর মেয়ের উপর নিশ্চয় খুব অত্যাচার করা হবে।

আবার দুদিন কেটে গেল। কোনও খবর নেই নেত্রার। ডামরঙ্গপানকে ফোন করার সাহস নেই।

সন্ধ্যায় ভাসনা এসেছে। ও রোজই যায় নেত্রাদের বাড়িতে। ডামরঙ্গপান নাকি আজকাল কারও সঙ্গে কথা বলেন না। অফিস থেকে এসেই নাকি মদের বোতল নিয়ে বসেন। ওর মার তো ভীষণ চিন্তা। উনি নাকি প্রায় সারারাতই জেগে থাকেন আর ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন।

ভাসনা বললো, নেত্রার পালাবার খবর পেয়েই গিয়েছিল ওর বাবা ওকে উদ্ধার করতে। ওকে কোথাও না পেয়ে আমেরিকানদের চাপে সানের আস্তানায় হানা দিয়েছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমেরিকানদের চাপে কেন?

—ওর আস্তানা উঠিয়ে দিতে পারলে ড্রাগের একটা বিরাট উৎস নষ্ট হয়ে যাবে।

আমি হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ভাসনা, এবার কী হবে, তোমার মনে হয়?

—কিছুই বলতে পারছি না। আমারও এখন খুব ভয় করছে। নেত্রার কিছু হলে, আপনিও যেমন একা হয়ে পড়বেন, তেমনি আমিও। আপনি তা হলে কি করবেন?

—জানি না। এখানে আর থাকবো না। আর ভাবতে পারছি না। কিছুদিনের জন্যে বাবা মাকে আসতে বলেছি। জানি না, আসবে কিনা।

—জানেন, নেত্রা এক অদ্ভুত মেয়ে। কত ভাল ভাল থাই ছেলে—ওর প্রেমে পড়ার জন্যে পাগল হয়ে ঘুরতো, ও কোনও পাত্তা দিত না। আপনাকে একদিন দেখেই কি যে মজে গেল, সেটা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগে।

—আমিও প্রায়ই সে কথা ভাবি। বলছিল ওর টাকা দিয়ে এখানে একটা ব্যবসা করতে। ইচ্ছে ছিল যে আমি এখানেই থেকে যাই।

—তা, ওর অনেক সম্পত্তি আছে। ফিরে এলে তাই করবেন।

—ফিরে এলে? ও কী আর ফিরবে?

উঠে আমার পাশে বসে, পিঠে হাত দিয়ে বললো, অতটা হতাশ হবেন না। ভাগ্যে থাকলে ও আপনার কাছেই ফিরে আসবে।

আমি বললাম, ওটা আমার বড়ই অভাব। যখন মনে হয়, যা চাই পেয়ে গেছি, ঠিক তখনই তা ফসকে যায়।

ভাসনা আরও কিছুক্ষণ বসে আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে আজ চলি বলে, উঠে দাঁড়ালো।

আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে উঠতেই বললো, কই আমাকে তো বললেন না, আবার আসতে। তবুও কিন্তু আসবো।

—এখন আর অত কথা গুছিয়ে বলতে পারি না। তার জন্যে কিছু মনে করো না। তুমি এলে খুশি হবো।

পরের দিন কাগজে একটা ছবি দেখে শিউরে উঠলাম। ছবিতে একটা মেয়ে পেছন ফিরে বসে আছে। হাত দিয়ে মুখটা ওর ঢাকা, যেন হাপুস নয়নে কাঁদিছে। ব্লাউজ নেই গায়ে। পিঠে কালো লম্বা লম্বা চাবুকের দাগ। ছবির নীচে লেখা আছে—ডামরঙ্গপান, তোমার মেয়ে। চিয়াংমাইর সাংবাদিক লিখেছে, এই ছবিটা আর নীচের লেখাটা খুনুসানের কাছ থেকে পেয়েছি—'আমার সঙ্গে শত্রুতার ফল। যদি আপোষ না কর তিন দিনের মধ্যে, তাহলে তোমার মরা মেয়ের ছবি দেখতে পাবে।'

ছবিটা দেখে আমার চোখ জলে ভরে গেল। যেটুকু আশা ছিল তাও উবে গেল। হায় ভগবান! আমার নেত্রার কি অবস্থা করেছো তুমি, বিনা দোষে। কী কুক্ষণেই যে গিয়াছিলাম চিয়াংমাই।

ঘণ্টা দুই পরে ভাসনার ফোন এল—কাঁদতে কাঁদতে বললো, দেখেছেন আজকের কাগজটা? নেত্রার কী হাল করেছে, বদমায়েশটা? আর আশা নেই—বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

আমি বললাম, আজ সন্ধ্যায় ওদের বাড়ি গিয়ে একটু খোঁজ করে, জানো তো ওর বাবা এবার কী করবে?

—ঠিক আছে। ওখান থেকে কোনও খবর পেলে আমি সোজা আপনার ওখানে চলে আসবো। আপনি বাড়ি থাকবেন কিন্তু।

অধীর আগ্রহে ভাসনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম সন্ধ্যা থেকে। ও আসছে না দেখে অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। সাড়ে ন'টা বেজে গেল, তবুও ওর দেখা নেই, বাড়িতেও নেই। খেয়ে যখন শুতে যাবো, তখন বেলটা বেজে উঠলো।

ও ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলাম, এত দেরী কেন?

ও ধপ করে বসে পড়ে বললো, কী করবো, ওর বাবার অপেক্ষায় বসে ছিলাম এতক্ষণ। তাও দেখা হলো না। উনি কাউকে না বলে কোথায় চলে গেছেন। ভাবনা বেড়ে গেল। আর দুদিন হাতে সময়। এর মধ্যে ওর বাবা কোথায় চলে গেল। এবার ওর মৃত্যু অবধারিত। ওকে হারিয়ে আমার যা অবস্থা হবে, সে কথা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

—আর ভেবে লাভ নেই। তুমি কিছু খেয়েছো?

—কখন খাবো? বড্ড ক্লান্ত লাগছে।

—আমার তো খাওয়া হয়ে গেছে। আমি পিয়ালীকে ডেকে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করছি।

ও অনেকটা ফ্রেস্ হয়ে এসেছে। পিয়ালী এর মধ্যেই ওর খাবার জোগাড় করে ফেলেছে।

খেতে খেতে প্রায় রাত এগারোটা বেজে গেল।

আমি বললাম, চল তোমাকে পেঁছৈ দিয়ে আসছি।

—ভাসনা অনুনয় করে বললো, আজ আমি আমার বাড়িতে একা থাকতে পারবো না। আপনার এখানে থাকতে দেবেন, আজকের রাতটা?

আমি আর মুখের উপর না বলতে পারলাম না।

ঠিক আছে। পিয়ালীকে বললাম, গেস্ট রুমটায় বিছানা করে দিতে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার কোনও ভয় নেই, আমি দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়বো। একটু ব্র্যাণ্ডি দেবেন? এখনও বড্ড ক্লান্ত লাগছে।

ওকে অল্প একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে নিজে একটু নিলাম।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললো, আমি শোবো কী পরে?

আমার একটা স্লিপিং স্যুট্ বের করে বললাম, এটা পরো।

ব্র্যাণ্ডি শেষ হলে ওকে শুতে পাঠিয়ে আমি আমার ঘরে চলে গেলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, ও কি ইচ্ছে করেই দেরী করে এসেছে? ভাসনার চোখে-মুখে যেন একটা বাসনা লক্ষ্য করেছি বরাবরই। সে বাসনা যদি থাকেও, তাকে আমি উসকে দেবো না। দরজাটায় কুলুপ এঁটে দিলাম।

সকালে উঠে যখন জিজ্ঞেস করলাম, ঘুম কেমন হয়েছে, তখন উত্তর দিল, একদমই না। দুবার ভয় পেয়ে আপনার দরজার কাছে গিয়ে ফিরে এসেছি। আটসাঁট করে বন্ধ করে শুয়েছিলেন, দেখলাম।

॥ ৪৩ ॥

অফিস থেকে এসে আজও রোজকার মত চুপ করে বসে ছিলাম বসার ঘরে। পিয়ালী গেছে ওর রান্না করতে নীচে। ভি. সি. আর-এ একটা ইংরেজি বই চলছে। সাইড টেবিলে সিভাস্ রিগ্যালের বোতল, গ্লাস আর বাকেটে বরফ রেখে গেছে পিয়ালী। সেভাবেই পড়ে আছে। শোফার উপর শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে একই চিন্তায় ডুবে আছি। মাঝে মাঝে ঝিমুনি আসছে। গলা ছেড়ে কাঁদতে পারলে বুকটা একটু হাল্কা হতো।

টেলিফোনটা বেজে চলেছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। বাজতে বাজতে ফোনটা

থেমে গেল। আবার কিছুক্ষণ পর বেজে উঠলো। খুব অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠে গিয়ে ধরলাম। একি! কার গলা, এই আওয়াজটা শোনার জন্যেই তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

—নেত্রা, নেত্রা, মাইডিয়ার, মাই লাভ, কোথা থেকে বলছো?

—ব্যাংকক থেকে।

—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি সত্যিই এসেছো? কবে?

—ঘণ্টা তিনেক আগে।

—এসেই ফোন করোনি কেন? জানো না, আমি কান পেতে ছিলাম এতদিন অধীর আগ্রহে।

—জানি, উপায় ছিল না। তুমি ভালো আছ তো?

—তুমি কেমন আছ?

—শরীরটা ভালোই আছে।

—তা হলে সেই ছবিটা?

—কোন ছবি?

—কাগজে উঠেছিল, তুমি দেখনি?

—না তো।

—ঠিক আছে, গিয়ে সব শুনবো।

—কবে আসছো?

—কাল সন্ধ্যায়। গুড্ নাইট্। হ্যাভ গুড স্লিপ।

ছুটির দিন, তবু সাত সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। চারিদিকে খুশির আমেজ। জানালার ওপর বসে চড়াই দুটো যে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে কিচির মিচির করছে তা দেখতেও আজ ভাল লাগছে। এ কয়দিন বিরক্ত হয়ে ওদের তাড়িয়ে জাল দেওয়া জানালাটা বন্ধ করে দিতাম। এতদিনের গোমড়ামুখো দিনটা আজ মন খুলে হাসছে।

পিয়ালী চা দিতে এসে—মাস্টার, এত তাড়াতাড়ি আজ উঠে পড়েছো, কি ব্যাপার?

—বসো, বসো, নেত্রা ফিরে এসেছে। আজ সন্ধ্যায় আসবে। তুমি ভালো করে রাঁধো। ওকে খেতে বলবো।

পিয়ালী আনন্দময়ী মা'র ছবির সামনে একটা প্রণাম করলো। খুব ভালো খবর। আজ রান্না করবো আমার মেনু অনুসারে।

উঠে খাবার টেবিলের কাছের জানালাটার সামনে বসলাম। ওখান থেকে নীচের সব কিছু দেখা যায়। নেত্রার সুখবর পেয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবো, ভেবেছিলাম। এখন আর ইচ্ছে করছে না। চুপচাপ বসে থাকতেই ভাল লাগছে।

ওঁদিকে বলে দিলাম, আজ খেলতে যাবো না। জাপানিরা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে গল্ফ খেলতে। দুই ঘর চার পরিবারের লোকেরাও উঠতে আরম্ভ করেছে। বুড়ো বুড়ি তাদের বাঁশতলার ড্রইংরুমে বসে সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়োচ্ছে। ছেলে, ছেলের বৌ উঠে চলমান রেস্তোরাঁর সব কাঁচা খাবার গাড়িতে তুলছে। একটা অল্পবয়সি অচেনা মেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাদের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

খুন ক্রু আর তার বৌ ঝাড়ু লাগাচ্ছে সব কোর্ট-ইয়ার্ড। ওরা নীচেই থাকে। ওদের কেউ ঝাড়ুদার বলে না। ওরাই হচ্ছে কেয়ার-টেকার।

ইন্দোনেশিয়ান এক পরিবার থাকে এ বাড়িতে। তার মেয়েটি রকে বসে আছে। ওর বছর ষোলো বয়স। শ্যামলা রঙে লাবণ্য ঝরছে। ওর পরনে হট-প্যান্ট, পায়ে স্নিকার। ওর সমবয়সি একটি ছেলে গেটটা খুলে ঢুকতেই ও ছুটে বেরিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল কৃষ্ণনগরে কাটানো ছাত্রজীবনের কথা। তখন জ্যৈষ্ঠ মাসে রমার হাত ধরে আমিও যেতাম আম কুড়োতে। বয়েসটা অবশ্য আরও অনেক কম ছিল।

তোমোকো, বছর আটেকের। ও কোরিয়ান। ছেলেটি বল খেলছে ওর আয়ার সঙ্গে। ওর মা বেশ আলাপি। এ বাড়িতে বেশীর ভাগই জাপানি প্রতিবেশী। ওরা বড্ড ক্ল্যানিস্। টোমোকোর মা জাপানি মহিলাদের দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এত বড় বাড়িতে শুধু এই পরিবারের সঙ্গেই আমার একটু যাতায়াত আছে। টোমোকোর বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরা জাপানিদের দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় কেন? বলেছিল যে জাপানিদের অধীনে ওদের অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। তখন ওদের দেশের যা কিছু সম্পদ ছিল, সব নিয়ে গেছে ওরা, এমন কি যুদ্ধের সময়—যুবতীদের জোর করে নিয়ে কম্‌ফোর্ট গার্ল করেছিল—জাপানি সৈন্যদের কম্‌ফোর্ট দেবার জন্যে।

আমার ঘরের উল্টো দিকের বাসিন্দা আমেরিকান ভদ্রলোক তার রক্ষিতার সঙ্গে সাঁতার কাটতে চলেছে। দশাসই আমেরিকানের পাশে বিকিনি পরা শ্যামলা অঙ্গে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নির্বিকার চিত্তে সুইমিং পুলের দিকে চলেছে।

রাস্তার ধারে লাল হয়ে যাওয়া কৃষ্ণচূড়া গাছটা, সারি সারি ঝাউগাছ, বাঁশের ঝাড়, গেটের পাশে লাল-সাদা বগুনভিলা আজ মনে দোলা দিচ্ছে। কোনও দিন—জানালার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট এক ফালি পৃথিবীটার সৌন্দর্য এমন করে লক্ষ্য করিনি।

—মাস্টার, তোমার ব্রেকফাস্ট।

কফিটা হাতে নিয়ে আবার চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসলাম। কাগজওয়ালা মোটর সাইকেলে এসে সব ফ্ল্যাটের কাগজগুলো দিয়ে গেল দারোয়ানের ঘরে।

পিয়ালীকে বললাম, কাগজটা নিয়ে আসতে।

আজ আর কাগজ পড়তে ভাল লাগছে না। শুধু হেডলাইনগুলো দেখছিলাম। থাইল্যাণ্ডে ইলেকশান হয়ে গেছে। চল্লিশটা দল ভোটের লড়াইতে নেমেছিল। সব দলের দলপতিই অবসর নেওয়া সেনাপতি। কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তারা কোয়ালিসন করে তাদের দলপতি ঠিক করতে না পারায় আবার প্রেম তিনশুলানন্দকে প্রধানমন্ত্রী করেছে।

কাগজটা বন্ধ করে আবার নীচে তাকালাম। এখন সব জাপানি মহিলারা নেমে এসেছে তাদের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। এরা হয় ফুডল্যাণ্ডে যাবে, না হলে জাপানি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর 'সোগোতে'। এ দেশে অনেক জাপানি আছে। সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় বলে জাপানিরা অনেক কারখানা করেছে এখানে। এখানে টয়োটা আর নিশান মোটর গাড়ির কারখানা আছে, যে গাড়ির বেশীর ভাগ দামী যন্ত্রাংশ জাপান থেকে আসে। শুধু যে সুলভ শ্রমিকের জন্যই এরা কারখানা করেছে, তাই নয়, আর একটা কারণ হলো যে হেতু আমেরিকা ও ইউরোপে সব জাপানি গাড়ির কোটা করে দিচ্ছে সেই কোটাকে পাশ কাটিয়ে ওদেশে ওদের জিনিসের রপ্তানি বাড়াবার এ একটা ফন্দি। এ গাড়িগুলোতে তো লেখা থাকবে মেড্ ইন্ থাইল্যাণ্ড আর থাইল্যাণ্ডের জন্য কোনও কোটা নেই।

এরা এখানে থাকতে খুব ভালবাসে কারণ বড় বাড়ি, ভাল মেইড, সস্তা জিনিসপত্র, গল্ফ খেলার সুবিধা আর প্রায় দশমাংশ মূল্যে হোস্টেস্ পাওয়া যায়, যারা গাইসাদের চাইতে অনেক বেশী কমফোর্ট দেয়। এদের স্ত্রীদের প্রায় কখনই দেখিনি স্বামীদের সঙ্গে বের হতে।

॥ ৪৪ ॥

আজ খুব জোর দিবানিদ্রা হয়েছে। উঠে চা খেয়ে পায়জামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বসবার ঘরে নেত্রার অপেক্ষায় একটা বই নিয়ে বসেছিলাম।

বইতে মন নেই। মন নেত্রার অপেক্ষায় স্থির হয়ে গেছে। আবার জানলাটার কাছে গেলাম। একটা গাড়ির হর্ন। আমি উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি। দারোয়ান গেট খুললো। না, ওর গাড়ি নয়। আবার হর্ন, আবার উৎকণ্ঠা, আবার হতাশা, এরপর রাগ—এত দেরী করছে কেন? কি এমন রাজকার্যে ব্যস্ত, দুপুরেও তো আসতে পারতো। আর আধঘণ্টার মধ্যে না এলে বেরিয়ে যাবো। তা হলেই ওর উচিত শিক্ষা হবে। শোফায় শুয়ে পড়লাম।

দরজায় বেল বাজলো—খুলে দেখলাম ড্রাইভার চাবি রাখতে এসেছে।

আবার কিছুক্ষণ পর বেল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এবার লম্বা বেল। উঠতে বাধ্য হলাম। দরজা খুলতেই ও আমায় জড়িয়ে ধরলো। খেয়াল নেই দরজাটা তখনও খোলা। আমার মুখটা দুহাতে চেপে একবার ওর মুখের কাছে আনছে আর একবার সরিয়ে দিয়ে এক দৃষ্টিতে দেখছে, অতীশ, অতীশ, আমি এসেছি।

আমিও ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি।

খুঁজছি ক্ষতচিহ্ন। সে চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না।

—অমন করে কী দেখছ ?

—তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না ?

—কষ্ট হবে কেন ? ফিরে এসেছি সুস্থ শরীরে আর কেন কষ্ট থাকবে ?

আমি ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ওর জামার বোতামে হাত দিতেই ও বললো, এ কী! দাঁড়াও দরজাটা বন্ধ করে আসি।

দরজাটা বন্ধ করে আসতেই ওর জামাটা তুলে ওর পিঠে কোনও চিহ্ন না দেখতে পেয়ে বিশ্বাস হলো না। পিঠে হাত বুলিয়ে দেখলাম, আগের মতই মসৃন কোমল ও আকর্ষণীয়।

—এ কী। আমার পিঠে হাত বোলাচ্ছ কেন ?

—দেখছি তোমার পিঠের দাগগুলো কী হলো ?

—কিসের দাগ ?

—চাবুকের দাগ।

—চাবুক আবার মারলো কে ? ওখানে তো আমার গায়ে কেউ হাত দেয়নি।

আমি দৌড়ে গিয়ে সেই কাগজের কাটিংটা নিয়ে এলাম। এটা তোমার ছবি তো ?

ও খুব ভালোভাবে ছবিটা দেখে হেসে বললো, তোমার চোখে কী ছানি পড়েছে ? এ কয়দিনেই আমাকে ভুলে গেলে ? ভালো করে মেলাও।

আমি একবার ছবিটা দেখছি আর একবার ওকে। এ রকম কয়েকবার দেখবার পর বললাম, পেছন থেকে প্রায় বোঝাই যায় না। দারুণ মিল। খুব লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সামান্য পার্থক্য। তোমার বাবা, ভাসনা, কেউই তো বুঝতে পারেনি ফারাকটা। খুব চালাকি করেছে তো।

—এ ছবিটা খুন্‌ সানের তৃতীয় স্ত্রীর, আর দাগগুলো রঙ দিয়ে করা।

এবার আমরা দুজনেই কিছুটা শান্ত হয়েছি।

ও জুতোটা রেখে বললো, চল একটু আরাম করে গল্প করা যাক।

আমরা খাটের ওপর গা এলিয়ে দিলাম।

আমি ওর মুখটা তুলে ধরে বললাম, তোমার সঙ্গে যে আর কোনও দিন দেখা হবে, তা আমার মনেই হয়নি, বিশেষ করে ঐ সংবাদটা পড়ার পর। কাল তোমার

ফোনটা পেয়ে কী যে আনন্দ হয়েছিল, তা তোমার বলতে পারছি না। ভালই হলো বাবা মাকে আসতে বলেছি।

—বলেছ! খুব ভাল করেছ। কবে আসবে? কাল থেকেই তাহলে বাংলা শিখতে হবে।

—ঠিক আছে। আজকেই কয়েকটা কথা শিখিয়ে দেবো। এবার বল, ওখানে কী রকম ছিলে?

—এমনি ভালই ছিলাম। তুমি তো খোঁজ পেয়েইছ।

—তা পেয়েছি। খুন্ সান্ লোক কি রকম?

—লোক ভালই। ষাট বছরের বুড়ো কিন্তু সব সময়ই কাজে ব্যস্ত। ড্রাগের ব্যবসা করে, নিজে ছোঁয় না, ওর লোকদেরও ছুঁতে দেয় না। সানুরা ওর এক কথায় প্রাণ দিয়ে দেয়।

—তুমি তো পালিয়েছিলে, কী করে পালালে?

—খাবার পর রোজই রাত্রে একটু বাগানে হাঁটতাম। প্রথম প্রথম সানের বৌ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। ওর জ্বর হওয়ায় কয়েকদিন আমার সঙ্গে যেতে পারেনি। আমি একাই ঘুরতাম। তখন পালাবার ফন্দি আঁটতে লাগলাম। খুন্ সান্ তখন সান্ মুলুকে। পাহারায় তখন ঢিলে পড়েছে। একদিন দেখলাম, পেছনের গেটটা খোলা। পাহারাদার বসে বসে ঘুমোচ্ছে। সেই ফাঁকে পালালাম।

—পালিয়ে কোথায় ছিলে?

—অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নেমে আসছিলাম। অনেক দূরে একটা বাড়ি লক্ষ্য করে সে দিকে যখন যাচ্ছি তখন শুনলাম, দু তিনটে গুলির আওয়াজ। বুঝলাম, ওরা এবার টের পেয়েছে, আমার খোঁজে বেরিয়েছে। ঐ বাড়িটায় দরজা ধাক্কাতে, এক বুড়ো পাহাড়ি দরজা খুললো। আমি ভেতরে ঢুকে কেঁদে আশ্রয় চাইলাম। বুড়ো আমাকে আশ্রয় দিতে নারাজ হলে বুড়ির অনুরোধে রাজি হলো। ওরা বুঝতে পেরেছিল, আমি খুন সানের খপ্পর থেকে পালিয়েছি। আমি ইসারায় বললাম, কাল চলে যাবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সানের সৈন্যরা এসে উপস্থিত। বুড়ি বেরিয়ে এসে বললো, এখানে কেউ আসেনি। ওরা কাউকে দেখেওনি। কিছুক্ষণ এ নিয়ে তর্কাতর্কি হলো। ওরা বুড়িকে ঠেলে ফেলে দিয়ে জোর করে ঘরে ঢুকে পড়লো। বুড়ো ততক্ষণে আমাকে পেছন দিক দিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছে। আমি একটা গাছের পেছনে চুপ করে বসে ছিলাম, প্রায় অর্দ্ধমৃত হয়ে। বাইরের থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম, ঘরের মধ্যে চেঁচামেচি, জিনিসপত্র ছুড়োছুড়ি, বুড়ো বুড়ির চীৎকার। ভেতরে আমাকে না পেয়ে একজন পেছনের দরজাটা খুলে টর্চ দিয়ে দেখতে লাগলো। ঘরের লাগোয়াই ওদের শুয়োরের খোঁয়াড়। শুয়োরগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, আর আমার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি নিশ্বাস

বন্ধ করে বসে আছি। কিছুক্ষণ পর ওরা চলে গেল, বুড়ো বুড়িকে শাসিয়ে।

—ধরা পড়লে কী করে?

—সকালে যখন জঙ্গলা পথ দিয়ে হাঁটছিলাম, তখন এক পাপি চাষা আমার দেখতে পায়। ও গিয়ে ওদের খবর দিলে ধরা পড়ে গেলাম।

—তারপর তোমাকে কী ওরা তালাবন্ধ করে রেখেছিল?

—তা রেখেছিল। তারপর যখন কমাণ্ডোদের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হলো, তখন আমাকে ওরা বর্ডারের ওপারে নিয়ে রেখেছিল। আর ইচ্ছামত ঘুরতে পারতাম না। সান্ আমাকে অনেক বুঝিয়েছিল, আশ্বস্ত করেছিল যে ওর ওখানে প্রাণের ভয় নেই। আমাকে কিছুদিন পর ছেড়ে দেওয়া হবে, এই আশ্বাস ও দিয়েছিল।

—তুমি হঠাৎ ছাড়া পেলে কী করে?

—তা ঠিক জানি না। শুনেছি সানের সঙ্গে বাবার একটা সমঝোতা হয়েছে। বাবাই আমাকে ওখান থেকে নিয়ে এসেছে।

—যাক এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

নেত্রা আমার ঠোঁটে আঙুলটা ছুইয়ে বললো, অনেক কথা হয়েছে। এবার থামো। একটু সোরে শোও তো।

ওর নরম নিষ্পেষণে আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল, ওর হাতের বাঁধনে আমি বন্দী। এ বন্দী জীবন, সকলেরই কাম্য।

পিয়ালী দূর থেকে আড় চোখে দেখে গলা খাখারি দিল। আমরা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে শুলাম।

পিয়ালী ঘরে ঢুকে, নেত্রাকে বললো, উঠে এসো। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে—যাক বাঁচা গেল। আমার মাস্টার তো তোমার কথা ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে ফেলেছে। তুমিও রোগা হয়ে গেছ। খিদে পায়নি? চল, সবাই খেতে।

—খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি সকালে এলে না কেন?

—তখন বাবা ছিল।

—বাবা ছিল তো কি হয়েছে?

—আমাকে নিয়ে আসবার পর থেকে, বাবার চিন্তা যেন আরও বেড়ে গেছে। আমাদের বাড়ির সিকিউরিটি আরও কড়াকড়ি হয়েছে। বাবা, আমার এপার্টমেণ্টে থাকতে দিচ্ছে না। কাজ করতেও দিচ্ছে না। বাবার মদ খাওয়ার মাত্রা বেড়ে গেছে। জানি না, কি হয়েছে?

—জিজ্ঞেস করোনি?

—কিছু বলছে না। শুধু বলছে, সাবধানে থাকিস। আমাকে বলছে. আবার বাইরে গিয়ে পড়তে।

—আজ তা হলে এলে কি করে?

—আমেরিকান এমবেসিতে বাবার আজ ডিনার আছে। ফিরতে অনেক রাত হবে বলে গেছে। সেই সুযোগে আমি চলে এসেছি।

ও পিয়ালীকে জিজ্ঞেস করলো, আজ থাই রান্না করেছো কেন? ইণ্ডিয়ান কিছু নেই?

—আছে, আছে, গরম করে দিচ্ছি। পিয়ালী তাড়াতাড়ি গিয়ে রুই মাছের ঝোল আর বাঁধাকপির তরকারি এনে দিল।

—ও মাছের মাথাটা তুলে নিল। আগে চোখটা কুরে খেয়ে বললো, ফার্স্ট ক্লাস।

খাওয়া শেষ হলে, নেত্রা বললো, একটা বড় ডাইরি থাকলে দাও তো আর একটা কলম।

—ডাইরি আর কলম কি হবে?

—বারে! বাংলা শিখতে হবে না? না শিখলে তোমার মার সঙ্গে কথা বলবো কী করে?

—এত তাড়ার কী আছে?

—এই যে তুমি বললে, তোমার বাবা মা আসবেন শিগ্গিরই।

—তা আসবেন।

—দাও, দাও, তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা লিখে দাও।

—আমি একটা ডাইরি এনে বললাম, কি লিখবো, বল।

—মম্, মাই নেম ইজ নেত্রা। আই এম গার্ল ফ্রেণ্ড অফ ইয়োর সান্। হাউ আর ইউ?

—উঁ, হুঁ গার্ল ফ্রেণ্ড বলা চলবে না। সেদিন তোমাকে শাড়ি পরে আসতে হবে। তারপর এসে, একটা প্রণাম করতে হবে।

—প্রণাম আবার কী করে করে?

—তুমি দাঁড়াও। ধর তুমি আমার মা, আর আমি নেত্রা। এই ভাবে প্রণাম করতে হবে, বলে আমি ওকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। এবার তুমি নেত্রা আর আমি মা—প্রণাম কর।

—প্রণাম করে বলবে, আমি নেত্রা।

ও প্রণাম করলে ওকে ধরে দাঁড় করিয়ে, ওর থুথনি ধরে চুমু দিয়ে বললাম, তুমি কী সুন্দর। (হাউ বিউটিফুল ইউ আর)।

—তোমার মা বুঝি এইভাবে সত্যিই বলবেন?

—হ্যাঁ, বলবেন।

—কী করে বুঝবেন আমাদের সম্পর্ক?

—মারা ঠিক বুঝতে পারে।

—তারপর?

—তারপর, তোমার কেনা সেই হীরার লকেট লাগানো হারটা মার গলায় পরিয়ে দিয়ে আবার একটা প্রণাম করবে।

—মা কী বলবেন?

—'একী। এটা কেন দিলে? এর যে অনেক দাম।'

—ইংরেজিতে এর মানে লিখে দাও।

—ইংরেজি অনুবাদটা পড়ে ও খুব খুশি। তারপর কি হবে?

—তারপর, মা হয়তো আমাকে বলবে, তোমার জন্যে কিছু একটা কিনে আনতে।

—হাউ আর ইউ, জিজ্ঞেস করবো না?

—মা, আপনি কেমন আছেন?

এই নাটকের অভিনয় দিয়ে আরম্ভ হলো ওর বাংলা শেখা।

হঠাৎ ও লাফিয়ে উঠে বললো, এই যা, দশটা বেজে গেল। বাবার আসার সময় হয়ে গেল। আমি এবার যাই। আমার সিকিউরিটির লোকগুলো এখনও গাড়িতে বসে আছে।

—ওরা তোমার বাবাকে যদি বলে দেয়?

—ওদের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছি।

—মা তো বলে দেবে। তখন?

—মাকে পটিয়ে এসেছি। মার সঙ্গে এখন খুব ভাল সম্পর্ক।

ওকে নীচে নামিয়ে দিয়ে এলাম।

গাড়িতে বসে, আমাকে কাছে ডেকে বললো, তুমি কিন্তু আমাকে ফোন করো না। আমাদের ফোন সব টেপ্ হয়।

—তা হলে যোগাযোগ হবে কি করে?

—আমিই করবো বাইরে থেকে। হ্যাভ গুড্ ড্রিম্। গুড নাইট।

॥ ৪৫ ॥

আবার আমার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছি। অনেক কাজ জমে গিয়েছিল, সেগুলো শেষ করতে করতেই কয়েকটা দিন কেটে গেল।

আজকাল আবার রেগুলার গল্ফ খেলছি। নেত্রার সঙ্গে খেলার খুব একটা সুযোগ হচ্ছে না। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া অনেক রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে, সিকিউরিটির ভীষণ কড়াকড়ি। ও মাঝে মাঝে ফোন করে, ফাঁক পেলে চলে আসে অল্পক্ষণের জন্যে। যেটুকু সময় থাকে, হাসি খুশিতে মন ভরিয়ে দেয়। ওর

বাবার কেন যে এত ভয়, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেই আমেরিকান এমবেসিতে ডিনার খেয়ে আসার পর ওর বাবার প্রায় কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

ওকে কাছে না পেয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেই চেষ্টা করি। অফিসে বেশীক্ষণ কাজ করি। সকালে প্রায়ই গল্ফ খেলতে যাই, সন্ধ্যায় কখনও কখনও টেনিস খেলি বা কারও বাড়িতে আড্ডা মারি।

অফিসে এত বেশী কাজ করতে দেখে আমার সেক্রেটারি তাথং তো একদিন জিজ্ঞেসই করে ফেললো—স্যার, আপনি আজকাল বড্ড বেশী কাজ করেন। আমি তো এই প্রতিষ্ঠানে অনেকদিন আছি, কাউকেই তো এত খাটতে দেখিনি। মিলার সাহেব তো রোজ তিনটায় গল্ফ খেলতে চলে যেতো। বাড়িতে বুঝি ভালো লাগে না? এখানে তো রিক্রিয়েসানের অভাব নেই?'

তাথং খুব ভালো মহিলা। ও চিনা। ওর ছেলে আমেরিকায় পড়তে গেছে। মেয়ে স্কুলে পড়ে। স্বামী একটা ট্রাভেল এজেন্টে কাজ করে। ওর শ্বশুরের অনেকটা জমি আছে। তার একটা অংশে ওরা একটা বাড়ি করে থাকে, কিন্তু খায় শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে। সংসারের কর্ত্রী ওর শাশুড়ী। সংসার খরচের টাকা ওরা শাশুড়ীকেই দেয়।

আমার অফিসে কুড়িজন কর্মি'র মধ্যে আটজন মহিলা এবং তারা প্রায় সবই চিনা। চিনারাই খুব উদ্যোগী।

আমার সেলস্ ম্যানেজারের নাম 'সুখ'। ওর সঙ্গে একটা কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলাম অত্যাধুনিক প্যাকেজিং-এর কারখানায়।

কারখানার মালিক চিনা। যে আমাকে কমপ্লেইন্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিল, সে মালিকের স্ত্রী, পার্চেজের চার্জে। সমস্ত পরীক্ষা করে যখন সমস্যার সমাধান করে দিলাম, মহিলা দারুণ খুশি। আমাকে নিয়ে গেলেন ম্যানেজিং ডাইরেকটারের ঘরে অর্থাৎ ওর স্বামীর কাছে। মিটিং-এ এলো ওর ছেলে, যে প্রোডাক্সান দেখে। ম্যানেজিং ডাইরেকটার তখন ঘরে ছিলেন না। মেশিনের কিছু রদবদলের কথা যখন বললাম, ওর ছেলে শুনে বললো—আপনি একটু বসুন, বাবা আসুক—অর্থাৎ বাবার হুকুম ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না, অথচ এই ছেলেটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, আর ওর বাবার পেটে পুঁথিগত বিশেষ কোনও বিদ্যাই নেই। ওর বাবা গেছে ওদের লোহার রড় রোলিং এর কারখানায়। চিনি দুধ ছাড়া চা খেতে খেতে ছেলেটি বলছিল ওদের পরিবারের ইতিহাস—

চিন যখন লাল হয়ে গেল, তখন ওর বাবা দেশ ছেড়ে এখানে চলে আসে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাঁসার বাসন সারাই করতো। তারপর সুরু করে ব্রোঞ্জের বিয়ারিং ঢালাই করতে। একটা পুরোনো লেদ্ মেশিন কিনে তাকে নিজেই সারাই করে, সেগুলো মেশিনিং করে বিক্রি করতো। ওর বাবা আর মা—এই দুজন হলো সেই

কারখানার কর্মী। তাই থেকে আজ ওরা দুটো কারখানার মালিক। মেশিনপত্র খারাপ হলে ওর বাবার অভিমত অনুসারেই তা সারাই হয়।

এখানকার কল-কারখানা ব্যবসা প্রায় সবই চিনাদের হাতে। মাড়োয়ারিদের মত, পরিবারের লোকরাই সেগুলি পরিচালনা করে। যুবরাজ রোডের ওপর যে চায়না টাউন আছে, সেখানে অনেক গয়নার দোকান। সে সব দোকানে গেলে দেখা যাবে—মা বসে আছে ক্যাশ আগলে, বাবা দেখে কেনা কাটার কাজ আর তদারকি করে গয়না তৈরি, আর তার সুন্দরী মেয়েরা হচ্ছে সেলস্ গার্ল। বিদেশিদের সঙ্গে দু-চারটে ইংরেজি বা জাপানি ভাষায় কথা যতটুকু বলে তার চাইতে সুন্দর হাঁসিটুকু দিয়েই আটকে ফেলে খরিদ্দারকে।

থাই মেয়েরা ছেলেদের চাইতে কর্মঠ, তার চাইতেও বেশী কর্মঠ চিনা মেয়েরা। অর্থ আরও অর্থ এটাই যেন ওদের জীবনের মূল লক্ষ্য। নন্দদুলালের স্ত্রী সারাদিন কাজ করে আবার সন্ধ্যার পর ভাইয়ের সঙ্গে তার ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা দেখে। প্রসার্ট, ম্যানেজিং ডাইরেকটার, তার স্ত্রী ইম্পিরিয়াল হোটেলে গিয়ে বসে।

মেয়েদের কাজের কোনও শ্বোরাকি দরকার হয় না। আমার কারখানার একটি মেয়ে কর্মী আছে, তার কাজ হচ্ছে রেস্টরুমে যে চার-পাঁচটা শোবার জায়গা রয়েছে, সেগুলো পরিষ্কার রাখা আর অফিস ঘরের সব সাফাই করা। ও একদিন পর পর সব বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় কেচে ইস্ত্রি করে বদলে দেয়, অফিস বাড়ি ঝকঝকে রাখে, আবার সময়মত কারখানার জামাকাপড় ছেড়ে বাসে সবাইর সঙ্গে হুল্লোর করতে করতে বাড়ি ফেরে। তখন মনেই হয় না যে ও কারখানার ধোপানী আর জমাদারণীর কাজ করে ফিরছে।

মোহন বলছিল ক্লিওপেট্রা ম্যাসাজ পার্লারের অনেক মেয়েরাই নিজেদের গাড়ি করে আসে বা বাড়ির লোক কেউ নামিয়ে দিয়ে যায়।

॥ ৪৬ ॥

একদিন সকাল বেলা ঘরের বেলটা বাজতে লাগলো, তখনও পিয়াজী এসে বেড-টী দেয়নি। ঘুম চোখে বিরক্ত হয়ে আমাকেই উঠতে হলো। দরজা খুলে আশ্চর্য হলাম নেত্রাকে দেখে। তুমি এত সকালে কি করে এলে ?

হেসে বললো—পালিয়ে এলাম। বাবা কাল রাত্রে বাইরে গেছে। চল আজ গল্ফ খেলে আসি রোজ্ গার্ডেনে।

—কি করে যাবো ? আজ তো অফিস আছে।

—অফিস তো রোজই থাকে। এরকম সুযোগ তো রোজ পাওয়া যাবে না। আজ ক্যেশু লিভ্ নিয়ে নাও।

—বসো তো আগে। পিয়ালীকে ডাকি। চা খেয়ে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তোমার পাহারাদাররা সঙ্গে আছে নাকি ?

—তাদের অনেক ঘুষ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।

আমরা কিন্তু এখুনি রওনা হবো না। চা খেয়ে, চল তোমার কাছে একটু বাংলা শিখবো।

—গুরু দক্ষিণা দিতে হবে কিন্তু।

—আগে চল তো তোমার ঘরে। দরজাটা বন্ধ করে ও এ. সি. টা আবার চালিয়ে দিল। তারপর খাটে উঠে আসনপীড়ি হয়ে বসলো একটা নোটবুক আর পেন নিয়ে। পড়াবার সময় কিন্তু গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ, মনে রেখো যেন, খুব গম্ভীর গলায় বললো।

—আমিও খুব গম্ভীর হয়ে ওর পাশটিতে গিয়ে বসলাম। তারপর লিখে দিলাম কতগুলো সাধারণ বাক্য—কেমন আছ ? ভালো আছি। খিদে পেয়েছে। এ হারটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো ইত্যাদি ? সবই রোম্যান স্ক্রিফটে লিখে দিলাম।

—বড্ড কঠিন, বাপু। আজ আর মন বসছে না, বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। উঃ, কতদিন পর আবার তোমাকে কাছে পেলাম।

—গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের কী হলো ?

নেহা হেঁসে বললো—গুরু দক্ষিণা না দিলে পাঠ সহজ হবে না।

আমি বললাম—তাহলে রোজ গার্ডেনে গিয়ে আর কি হবে ? এখানেই তো বেশ।

—না, এবার চল।

আমরা যখন রোজ্ গার্ডেনে পৌছলাম, তখন এগারোটো বেজেছে। ক্যাডি মাস্টারকে বললাম—দুজন ক্যাডি চাই, তার মধ্যে একজন আনঙ্গ, যদি ও থাকে।

—ও, লাইনে পাঁচজনের পরে আছে। তা হলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

—ওর হাতে পঞ্চাশ বাট দিয়ে বললাম—আমরা ক্লাবে যাচ্ছি। বুটটা খোলা রইলো। ওর টার্ণ এলে ওকে দিয়ে ব্যাগটা পাঠিয়ে দিও।

ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হাটতে হাটতে আনঙ্গ বললো—মাস্টার, তুমি অনেকদিন পরে এলে।

আমি ওকে ভালো করে দেখে—তোমাকে আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

ও লজ্জা পেয়ে মুক্তো ঝরানো হাঁসি ঝরিয়ে বললো—বিয়ে করেছি।

—খুব ভালো করেছো। কবে বিয়ে হলো ?

—বলটা আগে মারো, তারপর বলছি। খুব ভালো মেরেছো। তোমার বল গ্রীনে। বিয়ে আমার ছ'মাস হলো হয়েছে।

—বিয়ে করলেই কি মেয়েদের চেহারা ভালো হয় নাকি ?

মাথা নিচু করে বললো—আমার খোকা হবে যে !

নেত্রা কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলো—কি অতো কথা হচ্ছিল ?

—বলছিল, ওর বিয়ে হয়েছে এবার খোকা হবে।

—ওরাই বেশ ভালো আছে। বিয়ে করবো ঠিক করলো, বিয়ে হয়ে গেল। মা হতে চাই, খোকা এসে গেল। আর আমাদের জীবনটা বড্ড জটিল। যা চাই, তা পাই না—কত রকম বিঘ্ন। এসো না অতীশ, আমরা দুজনে কোথাও চলে যাই।

—তুমি তো এখানে থাকতে চেয়েছিল।

—তা চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন এখানে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

—এত তাড়াতাড়ি হবে না, সময় লাগবে।

বলটা গর্তে না ফেলতে পেরে নেত্রা বললো—ধ্যাৎ, এত চিন্তা মাথায় নিয়ে কি আর গল্ফ খেলা যায় ?

—ঠিক আছে, আর কথা নয়। এবার পুরো মন খেলায়। খেলা যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন আনন্দ নেত্রাকে বললো—আজ খেলার পর, আপনারা আমাদের বাড়ি চলুন না ? গেলে, খুব খুশি হবো।

—বেশ যাবো।

—তা হলে ওখানেই খাবেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে।

—ঠিক আছে, তাই হবে। আমরা ক্লাবে থাকবো, তুমি এসে নিয়ে যাবে।

ও খুশি হয়ে ব্যাগ গাড়িতে রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমরা ড্রিংক করে, স্নান করে, জামাকাপড় ছেড়ে ওর অপেক্ষায় রইলাম।

—আচ্ছা ডিডির কোনও খবর পেয়েছো ?

—পেয়েছি ? তিনটে চিঠি।

—কি লিখেছে ? আমার কথা কিছু লেখেনি ?

—তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল, সেটা তোমাকে দিতেই ভুলে গেছি। তোমাকে ওর খুব ভালো লেগেছে। এখান থেকে গিয়ে ওর খুব মন খারাপ লাগছিল।

—তা তো লাগবারই কথা, তার ওপর পুরোনো প্রেমিককে অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া।

—এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, মনোজ খুব খুশি। শিগগিরই ও বাবা হচ্ছে।

—খুব ভালো খবর।

—সেদিন তুমি জ্যাকের কথা বলছিলে। বেচারার খুব কষ্ট।

তোমার কি মনে হয়—জন্ আসবে ওকে নিতে ?

—জানি না। মনে তো হয় আসবে।

—জানো অতীশ, আমাদের একটা পৈত্রিক বাড়ি আছে ব্যাংককে, বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে। সে বাড়িটা মনে হয় বিক্রি করে দেবে বাবা।

—কেন? তোমরা যে বাড়িতে আছ, সেটা তোমাদের বাড়ি নয়?

—আমরা যে বাড়িতে থাকি, সেটা সরকারি বাড়ি। ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে—আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে বাবাকে অনেক টাকা ধার করতে হয়েছে। সে টাকা শোধ দেওয়ার জন্যেই বোধ হয় বাড়িটা বিক্রি করার দরকার পড়েছে।

—তুমি জানলে কি করে?

—বাবা ফিস্‌ফিস্‌ করে আমার মাকে বলছিল। সে কথা শুনে, মা খুব চেঁচামেচি করছিল। তাই থেকেই বুঝলাম।

—তোমার তো অনেক টাকা আছে। আমিও না হয় কিছু দেবো—দুটো মিলিয়ে বাবাকে দিয়ে দাও।

—সে প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম, বাবা তা নেবে না।

—তা হলে ঐ বাড়িটা তুমি কিনে নাও।

—বলে দেখবো।

আনন্দ জামা কাপড় বদলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের ডাকছে। ওর হাতের ইসারা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাতানুকূল বন্ধ কাঁচের ঘরে বসে ওর কথা কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

আমরা ওকে নিয়ে গাড়িতে বসলাম।

ইট পাথরের রাস্তা গ্রামের ওয়াট পর্যন্ত গেছে। গাড়িও ঐ পর্যন্তই গেল। ওয়াটের সামনে হাট বসেছে। আমাদের গ্রাম্য হাটের মতই—সাংসারিক সব জিনিসই বিক্রি হচ্ছে। গ্রামের সব লোক জড়ো হয়েছে কেনাবেচা করতে। অনেক দোকানি এসেছে ভ্যান্‌ নিয়ে, যেমন পূর্ববঙ্গে আসে নৌকোয়। ঝুড়ি ঝুড়ি ফল বিক্রি হচ্ছে—কমলালেবু, রামভুটান আর ডোরিয়ান। এগুলো এসেছে আশেপাশের গ্রাম থেকে। পাইকাররা এগুলো কিনে ব্যাংককে বিক্রি করবে। রামভুটান লিচুর মত সিরাপে ডুবিয়ে টিনে ভরে চালান দেওয়া হয়, বিশেষ করে সিঙ্গাপুরে। ডোরিয়ান দেখতে কাঁঠালের মত। কাঁঠালের চাইতেও কড়া গন্ধ, তাই এগুলো প্লেনে নিতে দেওয়া হয় না। চিনারা এগুলো খেতে খুব ভালবাসে, সিঙ্গাপুরে এর খুব চাহিদা।

এক কোণায় একটা স্টেজ বাঁধা হয়েছে। জেনারেটার থেকে আলো দেওয়া হচ্ছে। ওর পাশেই একটা সামিয়ানা, সেখানে কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বসে আছে।

আনন্দ বললো—আজ হলো 'টড্‌ কাথীন' উৎসব। এই দিন সবাই যে যা পারে সংযম্‌ রক্ষার্থে নানান জিনিস দেয় সন্ন্যাসীদের, কেউ দেয় অর্থ, কেউ দেয়

সন্ন্যাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, এমনকি মন্দির সংস্কারের জন্য ইট, বালি, সিমেন্টও।

সন্ন্যাসীদের চারদিকে অনেকে বসে বুদ্ধের উপদেশাবলি শুনছে। তাদের পাশে স্তূপীকৃত জিনিস।

—ঐ স্টেজে কি হবে?

আনন্দ বললো—ওখানে আজ লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য আর নাটক হবে। আপনারা যদি থেকে যান, তা হলে দেখতে পাবেন। আজ রাত্রে গ্রামে কেউ বাড়িতে থাকবে না, এমনকি বুড়োরাও না। তারা অবশ্য এক জায়গায় বসে তাড়ি গিলে বক্‌বক্‌ করবে। চলুন, এখান থেকে আপনাদের একটু কষ্ট করতে হবে—হেঁটে যেতে হবে, অবশ্য আর বেশী দূরে নয়।

—নেয়া, এটা তোমাদের কি মাস?

—বিশথা, ধনু, কন্যা, বৃশ্চিক, কার্ত্তিকের—এটা কার্ত্তিকের তারপর হলো মকরমু, কুম্ভমু, মিনমু তারপর ভুলে গেছি।

—আমাদের দেশে এগুলো রাশির নাম। কেরালা প্রদেশে অবশ্য এগুলো মাসের নাম।

আমরা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেছি। দেশে যেমন আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়—দুদিকে ধানের ক্ষেত। কোথাও কমলালেবুর বাগান। চারদিকে সবুজের মেলা। ধানক্ষেতের সোঁদা সোঁদা গন্ধের সঙ্গে লেবু ফুলের গন্ধ মিলে মিশে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের দেশের ফলবাগানটার কথা। নেয়ার নরম হাত ধরে মেঠো পথে হাটতে দারুণ ভালো লাগছিল। আনন্দ পথ দেখিয়ে আগে আগে হাটছিল। দিক্‌বলয়ের কাছে সূর্য নেমে এসেছে। বাড়ির মেয়েরা বেলা শেষের কাজ সারছে। পুকুর পাড়ে অল্প বয়সি মেয়েরা স্নান করতে করতে হাঁসি মস্করা করছে। আমাদের দেখে, ওদের কলকলানি থেমে গেল। শাড়ি নেই যে টেনে দেবে। সবাইরই জামা খোলা। লজ্জা ঢাকতে কেউ জলে ঝাঁপ দিল, কেউ হাঁটু ভাঁজ করে বসলো আর কেউ বেপরোয়া হয়ে আনন্দের দিকে বাঁকা ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিল।

আনন্দ রেগে বললো—তোরা কি চোখের মাথা খেয়েছিস। সঙ্গে ফুরিঙ্গকে দেখতে পাচ্ছিস না?

হেঁসে আর একজন বললো—আজ ফুরিঙ্গ আছে কাল থাকবি তুই। গ্রামের সেরা সুন্দরী, তোর চাহিদা অনেক। তোর মতো যদি সুন্দরী হতাম, তা হলে দেখতি।

—তোদের হিংসে হচ্ছে, না?

—তা তো হচ্ছেই।

—আমার স্বামী আছে হারামজাদি, জানিস না?

—স্বামী আছে তো কি হয়েছে? তাতে তো আরও সুবিধা।

—দেখো অতীশ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে ?

পাহাড়ের সান্ধ্যরূপ দেখেছিলাম একদিন নেত্রার, সঙ্গে আজ দেখলাম তার গ্রাম্যরূপ। এ রূপ মনে করিয়ে দেয়—বেলা যে যায়।

—ও বাবা গো, বলে নেত্রা আমায় জড়িয়ে ধরলো।

আনঙ্গ কি হলো, কি হলো, বলে ঘুরে দাঁড়ালো।

দেখলাম, একটা সাপ তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে কলমি লতার মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

আনঙ্গ বললো—ওটা বিষাক্ত নয়, ওটা জল ঢোঁরা, ওর বিষ নেই।

—থামো তো, তুমি। কামড়ালে তো বোঝা যেতো। সব সাপের বিষ থাকে। তুমি আমার সামনে সামনে চল। আর অতীশ, তুমি আমার হাত ছেড়ো না, বাপু।

—ভয় নেই। আর একটু গেলেই আমাদের বাড়ি। ঐ তো দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির সামনেই ওর স্বামী দাঁড়িয়েছিল। আমাদের স্বাগত জানালো। বারান্দায় মাদুর পেতে বসালো। ওর মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ওর মার বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। শরীরের বাঁধন বেশ আঁটসাঁট, রঙ ফর্সা হলেও আনঙ্গের মত সোনালী নয়। মুখের আদল মঙ্গোলদের মত, মনেই হয় না ওর মেয়ে আনঙ্গ।

ওর মা চলে গেলে আনঙ্গকে জিজ্ঞেস করলাম—ওর বাবা কোথায় ?

তার জবাবে বললো যে, ওর বাবাকে ওর মনেই নেই। ওর যখন এক বছর বয়স, তখন নাকি মারা গেছে।

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, আনঙ্গের চোখটা সামান্য নীল, মুখের আদল সরস্বতী প্রতিমার মত। ও কোন্ বিশ্বামিত্রের সন্তান—কে জানে ?

ওদের বাড়ি খড়ের দোচালা, কাঠের পাটাতনের মেঝে আর বাঁশের বেড়া। দুটো ঘর, একটা ঘরে রান্না হচ্ছে, সেখানে সারি সারি জালা রয়েছে জলের, এক কোণায় একটা মিট্ সেফ্। অন্য ঘরেও খাট, টেবিল, চেয়ার নেই। তিন চারজন প্রতিবেশীর বাড়ি পাশাপাশি।

আনঙ্গের স্বামী কাছেই এক সিল্ক কারখানায় তাঁত বোনে। ওর ইচ্ছে—ও ব্যবসা করে, ফার্মারস্ ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে।

আনঙ্গ বললো—জানেন মাস্টার, ও আসলে ভীষণ অলস। রোজ কারখানায় যাওয়া ওর ধাতে সইছে না। আমার আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে চায় বলে একটু বাঁকা চোখে চাইল ওর স্বামীর দিকে।

—মোটেই না। আমি বলছি কি, একটা টিলার মেশিন কিনে লোকের জমি চষে জমির মাপে পয়সা নেবো। তাতে তো বেশ লাভ হবে, তাই না ?

আনঙ্গ বললো—যখন চাষ থাকবে না, ধরো বছরে ছয় মাস, তখন কী করবে ?

—তখন বসে বসে খাবো।

—দেখেছেন তো, আমি ঠিক বলেছি কিনা ? ওসব হবে না।

তুমি কাজ ছাড়তে পারবে না। ছেলে হলে আরও তো পয়সা লাগবে, তা ভেবেছো ? আমি একটু আসছি ? আপনাদের খাবারের যোগাড় করি।

মাদুরের উপরই খাবার দিল। মাঝখানে রেখেছে ভাত, নুডুল, সোল মাছ সেদ্ধ, তাতে অবশ্য নানা রকম গন্ধ পাতা দেওয়া আছে। আর একটা প্লেটে আছে রামভুটান। আমাদের সামনে একটা করে চিনা মাটির বাটি আর চামচ। মা, মেয়েও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

খাওয়া হয়ে গেলে আনন্দের মা আমাকে আর নেত্রাকে বললো,—আশীর্বাদ করতে, যেন আনন্দের ছেলে হয়।

আনন্দ আর ওর স্বামী টর্চ দিয়ে আমাদের গাড়ি পর্যন্ত পেঁছে দিল। স্টেজের সামনে তখন অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছে। বাজনা সুরু হয়ে গেছে। পেছন দিকে অভিনেতা অভিনেত্রীরা মেক্‌আপ্‌ করছে।

আনন্দ বললো—আজকের রাতটা এখানকার হোটেলে থেকে যান না, তা হলে বেশ নাটকটা দেখতে পারেন।

ওদের ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

নেত্রা গাড়িতে উঠে বললো—খুব ভালো লাগলো ওদের দেখে। ছোট হোক, যাই হোক—ওদের তো বাসা। অতীশ, আমরা কবে এ রকম বাসা বাঁধতে পারবো ?

—তোমার আসার অপেক্ষায় ছিলাম। এবার মা বাবা এলে পাকাপাকি করে ফেলবো। জানো, আমার মা খুব সুন্দরী, তাই সব সময়ই বলতেন—তার ছেলের বৌ যেন সুন্দরী হয়।

—আমি অন্য দেশি বলে তিনি যদি মত না দেন ?

—আমার মনে হয় না, তা করবেন—দেখাই যাক।

—যদি না বলেন, তা হলেও কি তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

—আগের থেকেই নেতিবাচক চিন্তা করে মন খারাপ করার দরকার কী ! না করলে, একটা ব্যবস্থা হবেই। তোমাকে আমি ছাড়ছি না, কিন্তু তোমার বাবার মতের কি হবে ? সে তো মত দেবেই না।

—না দিলেও, আমি তোমাকেই বিয়ে করবো। তখন তোমাকে অন্য দেশে বদলি হবার চেষ্টা করতে হবে।

থনবুড়ির কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁ দেখে আমাকে গাড়ি থামাতে বললো।

—কি হলো ?

—অনেক দিন তোমার সঙ্গে বসে জিন খাইনি। চল, একটু জিন খাই।

—বাড়ি গিয়ে খেলেই তো হয়।

—ঐ পাহারাদাররা থাকবে তখন।

—গাড়ি চালাবে কে, আমার বাড়ি থেকে ?

—ওয়াই একজন চালাবে।

জিন খেয়ে গাড়িতে এসে ও আমার মুখটা টেনে নিল। বেশ কিছুক্ষণ পর গাড়িতে স্টার্ট দিলাম।

পাহারাদাররা অপেক্ষা করছিল। ও আমার হাতটা জোরে টিপে দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

॥ ৪৭ ॥

কয়েকদিন ধরে রোজ সন্ধ্যায় দুঃসহ ব্যথা হচ্ছে—নাভির কাছ থেকে ব্যথাটা ওঠে, তারপর বুকে গিয়ে চাপ দেয়। পিয়ালী হাত বুলিয়ে দেয়, ব্যথা সহজে কমে না। দুধ খেলে কিছুটা সোয়াস্তি পাই।

ব্যাংকক নার্সিংহোমের ডাক্তার আইরিনকে দেখাতে গেলাম। অসুখ-বিসুখ হলে আইরিনই আমাকে দেখে। ও চিনা থাই খৃষ্টান। ডাক্তারি পাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। মঙ্গোলিয় মুখশ্রী হলেও দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী, মিষ্টভাষী ও সপ্রতীভ। সুন্দর ইংরেজি বলে। ডাক্তার হিসাবেও সুনাম আছে।

আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললো—গ্যাসট্রিকের ব্যাথা। কোনও কারণে সাম্প্রতিক খুব কী চিন্তা করছিলেন? ডিপ্রেসড্ ফিল্ করছিলেন?

—তা করছিলাম।

—সে জন্যেই হয়েছে। একটা ওষুধ দিচ্ছি, দুদিন পর আবার আসবেন এন্ডোস্কোপ্ করিয়ে দেখবো—কোনও ঘা হয়েছে কিনা ডিওডনালে।

—জিনট্যাক্ খেয়ে ব্যথাটা কিছু কমেছে।

দুদিন পর এন্ডোস্কোপ্ করাতে গেলাম।

স্পেসালিস্ট ডাক্তারটিও মহিলা, চিনা থাই। আমাকে দুটো ভ্যালিয়াম্ খাইয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে বললো। তারপর একটা তরল ওষুধ গলায় রেখে আস্তে আস্তে গিলতে বললো। ওটা নাকি লোকাল এনায়েস্থেটিক।

এবার স্পেসালিস্ট বললো, হাঁ করুন। এই ছোট টিউবটা আপনার গলা দিয়ে ডিউডনাল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেখবো, ঘা হয়েছে কিনা। একটু ব্যথা লাগবে।

ভেতরে ওটা ঢুকিয়ে দিল। ঐ নলের শীর্ষবিন্দুতে আছে একটা ছোট্ট আলো আর প্রিজম্। তাই দিয়ে ভেতরের সব কিছু দেখা যায়।

দুজনে মিলে দেখে বললো—আপনার ছোট্ট একটা ঘা হয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই, জিনট্যাক্ বেশ কিছুদিন খেতে হবে। ঝাল-মশলা খাবেন না। তিন ঘণ্টা পর পর কিছু খাবেন, দুধ খেতে পারলেই ভালো।

কয়েকদিন হলো অনিবার বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি আর থামছেই না, সূর্যের দেখা নেই—ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা। সেই মেঘ গলে গলে পড়ছে। রাস্তা ঘাট অনেক জায়গায় ডুবে গেছে। বাড়ির সামনের নালার জল উপচে পড়ছে, অনেক রাস্তায় নৌকো চলছে। এত বৃষ্টি হওয়ায়ও কিন্তু রাস্তায় খানাখন্দ হয়নি, কারণ বেশীর ভাগ রাস্তাই কংক্রিটের। এত বৃষ্টিতেও কিন্তু কেউই অফিস কামাই করেনি, দোকান-পাট সবই ঠিকঠাক চলছে।

খেলাধূলো সব বন্ধ। শরীরটা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে, বৃষ্টিটা একটু ধরতেই একদিন হেঁটে লুম্বিনী পার্কে গেলাম। ফেরার পথে আবার বৃষ্টি নামলো, কুকুর-ভেজা হয়ে বাড়ি ফিরেছি। তারপরই ধূম জ্বর। গলা বসে গেছে, বুকে ব্যথা, মাথা ধরা। নিজের ডাক্তারিতে আর না কমায়আইরিনকে ডাকলাম।

আইরিন সব দেখে বললো—আপনার ব্রোংকো-নিউমোনিয়ার মত হয়েছে, বাড়িতে একা থাকা ঠিক হবে না। আপনার তো দেখার লোক নেই কেউ বাড়িতে, আপনি আমাদের নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে যান।

এর মধ্যে নেত্রা এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে বললো—আমাকে খবর দাওনি কেন ? তোমার গায়ে তো অনেক জ্বর !

—তোমাকে খবর দিলে, তোমার তো অস্থিরতাই বাড়তো। তুমি তো আসতে পারতে না। তা ছাড়া তুমি তো আমাকে ফোন করতে বারণ করেছো।

—তা করেছি ঠিকই, কিন্তু এর মধ্যে আমি তো ফোন করেছিলাম। আমার মনে কিন্তু ডাক দিয়েছিল, কারণ তোমার গলার স্বর স্বাভাবিক ছিল না, উচ্ছ্বাসও ছিল না তাতে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না—কী হয়েছে! ডাক্তার ডেকেছিলে ?

—ডেকেছিলাম।

—কী বলেছে ডাক্তার ?

—ডাক্তার বলেছে নিউমোনিয়া।

ও অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলো—কি কষ্ট হচ্ছে এখন ?

—ভীষণ মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা, ব্যথায় ব্যথায় শরীর ভরে গেছে। ডাক্তার তাই নার্সিংহোমে ভর্তি হতে বলেছে।

—ঠিক আছে, সেটা দেখা যাবে। আজ রাতটা তো আমি আছি।

—তুমি কি করে থাকবে ?

—কয়েকদিন হলো কড়াকড়ি কিছুটা কমে গেছে। বাবা বাড়িটা বন্ধক দিয়েছে। তারপর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। আমি কাজে যাচ্ছি। কাল থেকে আবার ভাসনার সঙ্গে থাকছি।

ওষুধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া, জ্বর দেখে চার্টে লিখে রাখা—সবই করছে ও।

নরম হাতে মাথা টিপে দিচ্ছে, বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—আমার কাছ থেকে নড়ছেই না। পিয়ালী জোর করে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। কখন ক্লান্ত হয়ে আমারই পাশটিতে শুয়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙে একটু নড়াচড়া করলেই ও গায়ে হাত দিয়ে দেখছে—আমার জ্বর কত।

অনেক রাত্রে ভাসনা একবার ফোন করেছিল। ও সকাল বেলা এসে উপস্থিত। নেহা তখন ঘুমিয়ে আছে, আমার বুকের উপর একটা হাত রেখে।

ভাসনা জিজ্ঞেস করলো—এখন কেমন লাগছে? মিচকি হেসে—ভালো নার্স পেয়েছেন, এখন তো ভালো থাকার কথা।

—ভালো নার্সিং হলেই কী অসুখ সেরে যায়?

—তা সারে বই কী?

—নেহা ওর কথায় উঠে পড়লো। ও যেভাবে এসেছিল, সেই পোশাকেই শুয়ে পড়েছে।

উঠে বললো—ভাসনা, তুই এক ঘণ্টা একটু ওর কাছে বোস, আমি কয়েকটা জামা-কাপড় নিয়ে আসি। আর শোন, বাড়ির থেকে ফোন করলে, বলিস না যে আমি এখানে ছিলাম।

—তুই আজ অফিস যাবি না?

—ওকে ফেলে কি করে যাই, তুই-ই বল না?

আমি বললাম—যাও না। পিয়ালীই তো আছে। তুমি আবার বিকেলে এসো।

আমি জোর করাতে, নেহা বললো—তা হলে এখানে স্নান করে, খেয়ে বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড় বদলে অফিস যাবো, তাড়াতাড়ি চলে আসবো। শরীর খারাপ লাগলে ফোন করো।

—ওরা চলে গেল। আমার জ্বরটা একটু কম, বাথাটাও কমের দিকে।

আইরিন এসে বললো—আপনি আজ অনেক ভালো। নার্সিং হোমে ভর্তি হলেন না, এটা কিন্তু ঠিক হয়নি—এমনিভাবে একা থাকা।

—আমি তো একা ছিলাম না।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এত ভালো নার্স পেলেন কোথায়? সুন্দর টেম্পারেচার চার্ট করে রেখেছে, ওষুধও তো দেখছি ঠিক সময় মত খাইয়েছে। এ রকম নার্স থাকলে আর আপনাকে নার্সিংহোমে যেতে হবে না। আমি রাত্রে আবার একবার দেখে যাবো।

তিনটের মধ্যে নেহা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলো। হাতে একটা কিট্‌স ব্যাগে জামা-কাপড়।

ব্যাগটা চেস্ট অফ ড্রয়ারের উপর রেখেই কপালে হাত দিয়ে বললো—যাক, জ্বরটা অনেক কম। কেমন আছ এখন?

—ভালোই তো মনে হচ্ছে।

—গলার স্বরটা তো ছেড়েছে। বুকের ব্যথাটা কি রকম ?

—সামান্যই। নেই বললেই চলে।

—যাক্ বাবা, কমেছে। আমি তো অফিসে আজ কাজই করতে পারছিলাম না। সব ভুল-ভাল টাইপ করছিলাম। আমার বস্ জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছে আমার।

ওর হাতটা ধরে—তুমি কি বললে ?

—যা বলার তাই বললাম—আমার এক প্রিয়জনের খুব অসুখ। তাকে দেখার কেউ নেই, একা ফেলে রেখে এসেছি। আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন। দেখি, জ্বরটা কত ? থার্মোমিটারটা দেখে বললো—যাক, ভালই আছ। এখন জ্বর একশো পয়েন্ট দুই।

—তুমি যাও, মুখ হাত ধুয়ে, কাপড়-জামা ছেড়ে এসে বসো। পিয়ালীকে ডেকে আমি চা দিতে বললাম।

চা খেতে খেতে নেগ্রা বললো—ব্রোংকো-নিউমোনিয়া খুব খারাপ রোগ। অক্সফোর্ডে আমার বাড়িউলির স্বামী তো এই রোগেই মারা গিয়েছিল। আমার কাল খুব ভয় করছিল। কয়েকদিন পরই তো তোমার মা বাবা আসছেন, তখন তোমাকে অসুস্থ দেখলে, কি অসুবিধায় পড়তেন, তখন তো আর আমি এসে দেখতে পারতাম না। জলে ভেজার কি দরকার ছিল ?

—বেশ লাগছিল ভিজতে। ছোট্ট বেলায় তো জলে ভিজে কত ফুটবল খেলেছি। কখনও তো কিছু হয়নি।

—ভুলে যাও কেন, তুমি ঐ বয়সটা অনেকদিন ছেড়ে এসেছ। ও—যাঃ, তোমার কেউ আজ মাথা ধুইয়ে, গা মুছিয়ে দিয়েছে ?

—কে দেবে ?

—দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি। ও পিয়ালীর কাছ থেকে একটা বালতি এনে বাথরুম থেকে জল নিয়ে এলো। দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। আমাকে ঘুরিয়ে শুইয়ে ঘাড়ে তোয়ালেটা দিয়ে কেতলি দিয়ে মাথায় জল ঢেলে মাথা ধুইয়ে, জামা খুলে গা মুছিয়ে, পরিষ্কার রাত্রিবাস পরিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় আইরিন এলো। দেখে বললো—খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠছেন। আর চিন্তা নেই। নেগ্রাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো—আপনিই কী নার্সিং করছেন ?

নেগ্রা ঘাড় নাড়লো।

খুব ভালো নার্সিং হয়েছে, তাই এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠছেন। জানেন তো, কয়েকদিন আগে ওঁর ডিউডনাল আলসার ধরা পড়েছে।

নেগ্রা জিজ্ঞেস করলো—ওটা কি সেরে গেছে ? হলোই বা কেন ?

—মনে হয় সেরে যাচ্ছে, ব্যথা যখন নেই। ওটা হয়েছে অত্যধিক চিন্তায়। জানেন কি, চিন্তার কোন কারণ ঘটেছিল কিনা!

—জানি। আমার জন্যেই।

—দেখবেন, যেন ওরকম চিন্তা আর না হয়। তা হলে কিন্তু সারবে না, বেড়েই চলবে।

রাত্রে ভালোই ছিলাম, তাই ও খুব নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ও চলে গেল কাজে। অসুস্থতার কষ্টের মাঝেও একটা আনন্দঘন পরিতৃপ্তি। ওর একনিষ্ঠ আন্তরিক সেবা আমাদের আরও কাছে টেনে নিল।

॥ ৪৮ ॥

আজ মা-বাবা আসছে। প্লেন আধ ঘণ্টা দেরীতে পৌঁছবে। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট, সময় মেনে চলে না। এক ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। বসে বসে যাত্রীদের আনাগোনা দেখছি।

খুবই ব্যস্ত এয়ারপোর্ট। পূব থেকে পশ্চিম আর পশ্চিম থেকে পূবের যাত্রীরা সব এই পথ দিয়েই যায়, আর আসা যাওয়ার পথে দুদিন দেশটাকে দেখে নেয়। ব্যস্ত হলেও বিশৃঙ্খলা নেই কোথাও। চেকিং-এর দুটো করে কাউন্টার, পাসপোর্ট চেকের লাইন করে অনেকগুলো কাউন্টার। আসবার পথ নীচে, যাবার পথ দোতালায়।

নেল্লা আসতে চেয়েছিল, আমি আসতে দেইনি। বলেছি—প্রথম পরিচয় ফলপ্রসু হতে হলে একটা শান্ত পরিবেশ দরকার। তাছাড়া মা-বাবার মনকে কিছুটা প্রস্তুতির সময়ও দিতে হবে। সুযোগ বুঝে আগে মাকে বোঝাতে হবে। তারপর সাক্ষাৎ পরিচয় পর্ব। ওর তর সইছিল না। বলেছি খবর না দিলে, আমার বাড়িতে না আসতে।

খুব জোর বাংলা শিখছে। ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের অনেক শব্দই শিখে ফেলেছে, কালের গোলমাল হয়ে যায়। ভাষা রপ্ত করার জন্যে আজকাল প্রায়ই আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলাতে চেষ্টা করে। ফোন করেই বলে—কে অতীশ কেমন আছ? কাল আমি যাইছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় গিয়েছিলে?

—ও মাই গড, টুমরো স্যাল গো টু ইয়োর প্লেস।

আমি আবার শুদ্ধ করে বলি—কাল তোমার ওখানে যাবো।

বসে বসে এ সব ভাবছি, আর নিজের মনে হাঁসছি।

এমন সময় কানে এলো—'এক্সকিউজ মি'।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, একটি মেমসাহেব কাঁধে একটা ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বয়স হবে বছর তিরিশেক।

মেয়েটি এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, এই ব্যাগটা একটু দেখবেন দয়া করে. আমি টয়লেট্ থেকে আসছি।

—আমি আর আধঘণ্টা আছি।

—আমি তার মধ্যেই ফিরে আসবো—ধন্যবাদ। ব্যাগটা আমার পায়ের কাছে রেখে ও চলে গেল দ্রুত পায়ে।

ওদের প্লেন নামার সময় দিয়ে দিয়েছে টি. ভির পর্দায়। মেয়েটা তখনও আসছে না। আমি চিন্তিত হয়ে পড়ছি।

এমন সময় দুজন পুলিশ অফিসার আমার কাছে এসে থাই ভাষায় জিজ্ঞেস করলো—ঐ ব্যাগটা আমার কিনা। আমার নয় জেনে একজন ওটা খুলে কিছু একটা খুঁজতে লাগলো, আর দ্বিতীয় জন ছুটলো টয়লেটের দিকে। ব্যাগে পাওয়া গেল ড্রাগ। আমি তো হতভম্ব।

অফিসারটি এবার আমাকে জেরা আরম্ভ করলো। আমার ভিজিটিং কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট্ দেখার পর সাবধান করে ছেড়ে দিল। ওরা মেয়েটিকে অনেকক্ষণ ধরেই ফলো করছিল। মেয়েটি নাকি ড্রাগ ক্যারিয়ার।

ওদের প্লেন নামার সময় ঘোষণা করা হয়েছে। বের হয়ে আসতে কমপক্ষে আরও আধঘণ্টা। আমি ঐ চেয়ারেই বসে রইলাম।

ঐ মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওরা ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে, আমার সামনে এসে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরনে দামি স্যুট্, চোখে রে-ব্যানের কালো চশমা, হাতে চামড়ার দামি ব্রিফ্‌কেস্।

আমার পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বললো, বসতে পারি? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সেটায় বসে পড়লো। ব্রিফ্‌কেসটা খুলে কিছুক্ষণ কি কাগজপত্র দেখে সেটা বন্ধ করে, আমাকে জিজ্ঞেস করলো, একটা মেয়ে কি তোমার কাছে ব্যাগ রেখেছিল?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

—ওটা কোথায় গেল? মেয়েটাই বা কোথায়?

আমি বললাম—ব্যাগটা তো পুলিশ নিয়ে নিয়েছে। মেয়েটা কোথায় গেছে, জানি না।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—অনেক লোকসান হয়ে গেল এবার, বলে উঠে গেল।

কাঁচের ঘেড়ার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ওরা তিনজন আসছে। মা আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে বাবাকে। আমি হাত নাড়লাম, বাবাও হাত নাড়লো।

বাবাকে প্রণাম করলে—মাথায় হাত দিয়ে, শ্রীহরির কৃপায় সব মঙ্গল তো ?

আমি বললাম—আপনি কেমন আছেন বাবা ? কোনও কষ্ট হয়নি তো ?

—এইটুকু পথ আসতে আবার কষ্ট কী ? তা ছাড়া প্লেনে আসা।

মাকে প্রণাম করতেই, মা আমার থুথনি ছুঁয়ে আঙুলটা মুখে লাগিয়ে—অতু, তুই তো অনেক রোগা হইয়া গেছস্। অসুখ-বিসুখ হইছিল নাকি ?

—তা একটু হয়েছিল মা।

—এখন ভালো আছস্ তো ? একা থাকস্, তাই সব সময়ই তরে লইয়া চিন্তা।

—ভালো আছি মা. কোনও চিন্তা নেই।

মা আরাম করে গাড়িতে বসে—ভারি সুন্দর গাড়িটা তো! এইটা বুঝি নতুন কিনছস্ ?

—হ্যাঁ, মা।

বাবা পথ চলতে চলতে বললেন—কি সুন্দর রাস্তা। আমাগো দ্যাশে এই রকম রাস্তাঘাট কবে যে হইবো, তা ভগবানই জানেন।

বাড়িতে ঢুকতেই পিয়ালী ওঁদের নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলো ম্যা', ফ অল ওকে ?

বাবাও ওর কুশল সংবাদ নিল।

মা এদিক-ওদিক ঘুরে দেখে খুব খুশি। পিয়ালীর গালটা টিপে বললো—তুমি খুব সুন্দর গুছাইয়া রাখছো পিয়ালী, গুড্ গার্ল।

সে কথার অনুবাদ করে বোঝালে, পিয়ালী বললো থাপ্ খুন থ্রাপ্।

পিয়ালী জিনিসপত্র সব নিয়ে চলে গেল গেস্ট রুমে। সুটকেসের চাবি নিয়ে খুলে, জামা কাপড় সব চেস্ট অফ ড্রয়ারে গুছিয়ে রাখলো।

ভাষার ব্যবধান থাকলেও অনুভূতির ব্যবধান নেই, তাই ভাবের আদান-প্রদানের বিশেষ কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না মার আর পিয়ালীর মধ্যে।

মা-বাবা পিয়ালীর রান্না খেয়ে আর একবার উচ্ছসিত প্রশংসা।

আমরা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম, বাবা খাটে শুয়ে আর আমরা দুজন বেতের চেয়ারে। গল্প আর শেষ হয় না—আত্মীয় স্বজনের কথা, বন্ধু বান্ধবের কথা, এমনকি বাড়ির কেলো কুকুরটা, হিমসাগর আমগাছটা, গন্ধরাজ ফুল কিছুই বাদ গেল না। সেই গল্প শুনে মনে হচ্ছিল—আমি যেন নিজের চোখে দেখছি, আর নিজের কানে শুনছি ওদের কথা।

পরের দিন থেকে রান্নার পাট মা হাতে তুলে নিলে, পিয়ালী হলো জোগানদার। নতুন কিছু রান্না দেখলেই ওর নোট বুকে লিখে নেয় রন্ধন প্রণালী। মা বড়ি, আমসত্ব আর কুলের আচার নিয়ে এসেছে, খুব মজা করে খাচ্ছি। দুঃখ, যে নেত্রাকে খাওয়ানো যাচ্ছে না।

ঘুরিয়ে এনেছি দু-এক ঘর বাঙালীর বাড়ি। কেউ কেউ এসে দেখা করে গেছে। দু-এক বাড়ি নেমন্তন্ন খাওয়াও হয়েছে।

মা-বাবার খুব ভালো লাগে সাজানো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে। একটাই অসুবিধা—মা এসকালেটারে উঠতে ভয় পায়। আমি হাত ধরলে বলে—হাত ছাড় শিগগির, পইড়া যামু। পেছনে দাঁড়ালে বলে—তুই সর। তারপর এক সময় এক লাফে উঠে পড়ে আবার এক লাফ দিয়ে নামে। একদিন তো পড়েই গিয়েছিল। বাবার কোন অসুবিধা হয় না।

বাবা শেষ রাতে উঠে জপ করেন, তাই খুব তাড়াতাড়ি শুতে যান। মা তখন আমার ঘরে চলে আসে, আমরা দুজনে গল্প করি। একালের গল্প ফুরিয়ে গেলে, সেকালের গল্প বলে মা, আর আমি শুনি। শুনতে শুনতে মনে হয় আমি যেন কবোষ্ণ সোনালী রোদে ভরা মাঠঘাট পেরিয়ে চলেছি।

গল্পের শেষ হয় একটা কথাতেই—অতু এবার তুই বিয়া কর। তর ইচ্ছামতই না হয় কর।

আমি হেসে বলি—আমার ইচ্ছামত করলে তো বিশ্বকর্মাও হার মানবে।

—কি রকম বৌ চাস্ তুই?

—তুমি চাও রূপসী, তোমার মত, বাবা চায় বিদুষী, আমি চাই স্মার্ট, আধুনিকা অথচ শ্রদ্ধাশীলা, সেবাপরায়ণা। এত গুণের সমন্বয় কোথায় পাবো?

—আগে তর ইচ্ছা হওন চাই, তারপর মন দিয়া খুঁজলে ঠিকই পাওয়া যাইবো। যা যা চাস্, সব তো পাইবি না, কিছু ছাড়তে হইবই। অতশত দেখনের দরকার নাই। কত মাইয়ার বাপে তো আমাগো চিঠি লেখে, পিড়াপিড়ি করে। দুই একটা মাইয়া দেইখ্যাও রাখছি, তুই মত করলেই হয়।

—আচ্ছা মা, এবার তোমরা ফিরে যাবার আগে একটা মতামত দেবো, বলে পাশ কাটিয়ে যাই।

মা একদিন বললো—তগো এইখানে মন্দির নাই?

—আছে বই কী—কৃষ্ণ মন্দির, দুর্গাবাড়ি, শিব মন্দির, হরেকৃষ্ণ আশ্রম, বৌদ্ধ মন্দির তো আছেই।

—কাইল শনিবার, তর তো ছুটি। চল সকালে মন্দিরে, তর নামে একটা পূজা দিয়া আসি।

আমরা তিনজন মন্দির দর্শনে বের হলাম। বাড়ির কাছে ইরাবান্ হোটেলের সুন্দর ত্রিমূর্তির সামনে গাড়ি থামালাম। সেখানে থাই ছেলে মেয়েরা পুজো দিচ্ছে, ভক্তিভরে প্রণাম করছে। কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে ফুলপরি সেজে মূর্তির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচছে।

অবাক হয়ে বাবা বলে—হ্যাঁ রে অতু, আমি তো জানি থাইরা বৌদ্ধ। এরা তা হইলে হিন্দু দেবতার মূর্তি পূজা করে ক্যান্? আমি একবার শ্রীলংকায়

১৯

গেছিলাম, সেইখানেও তো এই রকম দেখি নাই। মা বললো—ঠিকই কইছো। আমরা যখন গয়ায় গেছিলাম, দেখি নাই তো কোনও তিব্বতি, বা জাপানিগো হিন্দু মন্দির দর্শন করতে।

আমি বললাম—এটাই এখানকার বৈশিষ্ট হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মই এখানে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

দুর্গাবাড়ি ঢোকার মুখে রাস্তা থেকে কিছু ফল, ধূপকাঠি আর মোমবাতি কিনে নিলাম।

মা বললো—একটু মিস্টি লইয়া ল।

আমি হেঁসে বললাম—মিস্টি এখানে পাওয়া যায় না মা।

মন্দিরে ঢুকে আমরা ভেতরটা প্রদক্ষিণ করে সব মূর্তিকে প্রণাম করলাম, বুদ্ধও বাদ গেল না। তারপর একটি মেয়ের হাতে ফল, ফুল আর এক শো বাট দক্ষিণা দিয়ে বললাম—পুজো দিতে।

মেয়েটি থাই। ঐ মেয়েটিই পুরোহিতের সহকারি। কুচকুচে কালো তামিল পুরোহিত তখন ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গাঠাকুরের (চামুণ্ডি) জাগরণ মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, ঐ মেয়েটি আমাদের উপাচার পুরোহিতের সামনে রেখে বললো বসতে।

পরিষ্কার শ্বেতপাথরের মেঝেতে আমরা বসলাল। পরপর থাই ছেলে মেয়েরা পরিচ্ছন্ন পোশাকে শুদ্ধ মনে প্রণাম করে নিঃশব্দে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছে। পুজো শেষ হলে কলা পাতায় সবাইকে প্রসাদম্ দেওয়া হলো।

বাবা মা খুব খুশি। ভালো লেগেছে এখানকার শান্ত পরিবেশ আর থাইদের হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি গগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা দেখে। এ দেখে নেত্রাকে গ্রহণ করার বাধা কিছুটা দূর হবে বলে আমার মনে হলো।

বৌদ্ধ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে রামায়ণের চিত্রাংকন দেখেও বাবা মা বুঝতে পারলো দুই ধর্ম্মমতের মহামিলনক্ষেত্র হলো থাইল্যাণ্ড।

বাড়িতে এসে মা বাবা দুজনেই বললো, খুব ভালো লাগলো আইজ সব মন্দিরগুলি দেইখ্যা।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলেও ঐ একই কথা উঠলে বাবা বললেন, বুদ্ধদেব তো রামেরই অবতার। সমাজের কলুসতা দূর করার জন্য কৃষ্ণ ক্ষত্রকুল ধ্বংস করছিল। তার আগে প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনার্যগো সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। তারপর যখন ব্রাহ্মণ ও রাজাগো অত্যাচারে জনগণ নিপীড়িত হইতে লাগলো, তখন আইলেন বুদ্ধদেব—নতুন মতবাদ লইয়া, যার সঙ্গে মিল রইছে ব্রহ্মবাদের।

আমি বললাম, চৈতন্যদেবের মতবাদের সঙ্গে তো বৌদ্ধ মতবাদের বিশেষ কোনও ফারাক নেই।

বাবা বললেন, তা তো নাইই। চৈতন্যদেবও জাতপাত মানতেন না।

অহিংসা এ প্রেমই আছিল তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র।

আমি বললাম, একটা তফাৎ আছে, সেটা হচ্ছে, চৈতন্যদেব ছিলেন ভক্তিবাদি।

—বৌদ্ধরাও শক্তিবাদি না। আমরা বৈষ্ণবরা জপ করি কৃষ্ণনাম, আর অরা জপ করে বুদ্ধের নাম। আমরা মাধুগিরি করি অরা ভিক্ষা করে তাই অগো কয় ভিক্ষু।

॥ ৪৯ ॥

নোরা আজকাল অফিসে ফোন করে। আমাদের মাঝে মাঝে দেখা হয় খেলার মাঠে। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে, আমাকে কবে নিয়ে যাবে ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে ?

আমি বলি, অত তাড়াহুড়ো করলে, সুতো ছিড়ে মাছ পালিয়ে যাবে। ধৈর্য ধর।

—আমার আর ধৈর্য থাকছে না, বাপু। আর দেরী করো না। আমার বড্ড টেনসান হচ্ছে।

—আমার দিকটা আমি অনেকটা সামলে এনেছি। তোমার দিকটার কি হলো ?

—বাবাকে বলতে আমার বড্ড ভয় করে। আগে তোমার বাবা মা রাজি হোক, তারপর বলবো। না হলে 'ফেইট একমপ্লি' করে দেবো।

তুমি অন্য জায়গায় বদলি হবার চেষ্টা করছো তো ?

—আমি বলেছি, ডোনাল্ডকে।

—ও কি বলছে ?

—বলছে হংকং-এ একটা কাজের সম্ভাবনা আছে। ওখান থেকে চিনের বাজারটা যাচাই করতে হতে পারে। চিন এখন ওদের দরজা আস্তে আস্তে খুলে দিচ্ছে।

—তা হলে খুব ভালো হয়। আমি তোমার দোভাষি হতে পারবো। আমি তো ক্যান্টনিজ বেশ কিছুটা জানি। ওটাকে একটু ঝালিয়ে নিলেই হবে।

মার সঙ্গে রাতের আড্ডায় রোজকার মত আজও সেই এক কথায় এসে পেঁছে, আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তর লগে কোনও মাইয়ার ঘনিষ্ঠতা হইছে নাকি এইখানে ? সত্যি কথা ক। আমার কাছে লুকাইছ না।

—তোমার সন্দেহ হলো কেন ?

—আমারে সেদিন পিয়ালী হাত মুখ নাইড়া কইছিল, ফুইজ, মাস্টার গার্ল ফ্রেন্ড, সু-আই-বিউটিফুল। মাস্টার লাভ। গুড গার্ল। ম্যারি।

আমি প্রায় ধরা পড়ে গেছি, তাই আমতা আমতা করে বললাম, না সে রকম কিছু নয়, তবে হ্যাঁ বন্ধুত্ব আছে, ঘনিষ্ঠতা নয়।

—তুই লুকাইতাছছ। মায়ের কাছে কি লুকাইতে আছে? তুই তো আমার একটাই পোলা, সোনার টুকরা পোলা। তর যদি কারও ভালোও লাগে, তা হইলে কইয়া ফালা, মাইয়াটা কে—সেই বিউটিফুল গার্ল, মাস্টার লাভস্। ম্যারি।

—তখন সব বলেই ফেললাম।

—দেখতে কেমন?

—সুন্দর। মার গালটা একটু টিপে বললাম, তবে আমার মার মত নয়।

—তর মা কি খুব সুন্দরী নাকি?

—আমার এখনও মনে আছে, কুড়ি বছর আগে আমার মাকে সবাই চোখ ভরে দেখতো আর বলতো, আ-হা! এ যেন সোনার প্রতিমা, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।

একটু লজ্জা পেয়ে—থো ফালাইয়া, আমি তর কাছেই সুন্দর। সব পোলার কাছেই তার মা খুব সুন্দর। লুকাইয়া আর করবি কী, ও খুবই সুন্দরী। আমি ওর ছবি দেখছি।

—কোথায় দেখলে?

—তর ড্রয়ারে। পড়াশুনা কতদূর?

—বিলাতে পড়েছে—অক্সফোর্ডে।

—কোন দেশী? দেখতে তো মেমসাহেবর মত।

—না মা, ও থাই।

—তবুও ভালো। মেমসাহেব হইলে বড় মুসকিল হইতো, অগো লগে আমাগো একেবারেই বনে না। অর বাবায় করে কী?

—মস্ত বড় অফিসার—জেনারেল।

—তর লগে বিয়া দিতে রাজি হইবো?

—তা জানি না। আগে তুমি বাবার মত করাও, তারপর দেখা যাবে।

—যা ছবিটা লইয়া আয় তো, আর একবার দেখি।

আমি ছবিটা এনে মার হাতে দিলাম। এ ছবিটা পাত্তায়ায় তোলা হয়েছিল—শাড়ি পরে।

—বাঃ! কী সুন্দর দেখাইতে আছে, শাড়ি পইরা। শাড়ি পরতে শিখলো কইথ থিকা?

—মনীষা শিখিয়েছে।

মার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলো—ও আইছিল ক্যান? কার লগে আইছিল?

—মনোজের সঙ্গে। এসেছিল আমার সঙ্গে থাকতে।

—মনোজরে না ও বিয়া করছে ?

—হ্যাঁ, মা।

—তারে ছাইড়া, আবার তরে। দিনকাল কি হইল ?

—না মা, ওর কথা শুনলে তুমি কেঁদে ভাসাবে। আর একদিন শুনো।

—ছবিটা আমারে দেখাইয়া রাখ।

—মা, তোমার মত আছে তো ?

—সবুর কর। আগে চামড়ার চোকে দেখি। আলাপ করি, তবে তো মত। আর মতের কী দরকার আছে ?

—আছে মা। তোমাদের মত না পেলে, আমি ওকে বিয়ে করবো না।

বাবা শেষ রাতে জপ করেন, ভোর বেলা স্নান করে পুজোয় বসেন। নটা নাগাদ পুজো শেষ হয়। তারপর কাগজ পড়তে পড়তে সকালের জলখাবার খেয়ে নেন।

জল খাবার করাটা এখনও পিয়ালীর দখলে আছে, আমি ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসলে মা ও কাছে এসে বসে, আমার সঙ্গে বসে এক কাপ চা খায়। আমি অফিস চলে গেলে রান্না, স্নান আর তারপর পুজো, জলখাবার।

হঠাৎ দেখছি মার রুটিন বদলে গেছে। বাবার স্নান হলেই স্নান করে নেয়। আমার ব্রেকফাস্ট টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এক কাপ চা খায়—সেখানে বসে না। তারপর বাবার পাশে পুজোয় বসে।

প্রথম প্রথম এটাকে নিয়মের ব্যতিক্রম ভেবে বাবা কিছু বলেন নি। দুদিন পর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার ? তুমি এত সকাল সকাল পুজোয় বসতে আছ। কোনও দিন তো এই রকমটা দেখি নাই।

মা বলে, তোমার পাশে বইয়া পুজো করলে মনটা একটু স্থির থাকে। না হইলে পুজো করতে করতেও যত সংসারের কথা মাথায় আসে।

দুদিন পর, রাত্রের অন্ডায় মা বললো, তর বাবারে নিমরাজি করাইছি।

—তুমি কি তাই আজকাল বাবার পাশে বসে পুজো কর ?

হেঁসে বললো, কওনের লেইগ্যা একটা পরিবেশ চাই তো। আমি দেখছি, তর বাবার থিকা কিছু আদাই করতে হইলে, পুজা করনের সময় সেই ভিক্ষা চাইতে হয়।

বাবা একদিন গম্ভীর গলায় ডাকলেম, অতু, এদিকে আয়। বয়। তুই এক থাই মাইয়ারে বিয়া করতে চাস ?

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

বাবা এবার তুই থেকে তুমিতে উঠে এসে বললেন, বিয়াটা তুমি করবা। সেটা তোমার ইচ্ছায়ই হওয়া উচিত। তবে ইচ্ছা আছিল পুত্রবধূরে লইয়া কয়টা দিন আনন্দ কইরা কাটামু, তা আর হইবো না।

আমি এবার মাথা তুলে বললাম, তোমাদের অমতে আমি বিয়ে করবো না, বাবা।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, একদিন লইয়া আয়।

আলাপ কইরা দেখি।

মা ও পাশে এসে বসেছিল, উদগ্রীব হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে। বাবার শেষ রায় শুনে, মিচকি হেসে আমার মুখের দিকে তাকালো।

তারপর বললো, তাইলে শুভস্য শিঘ্রম্।

শনিবার দিন সকালে লইয়া আয়, এইখানেই খাইবো আমাগো লগে, কিন্তু আমি অর লগে কথা কমু কেমনে ?

—আমি বুঝাইয়া দিমু। তুমি তো আমার কাছে কিছু ইংরাজি শিখছিলা, ওইতেই চইল্লা যাইবো, বাবা বললেন।

॥ ৫০ ॥

অফিস থেকে নেত্রাকে ফোন করে শুভ সংবাদটা জানালাম।

ও খুশি হয়ে বললো, দারুন খবর। এ খবরটার জন্যে কতদিন হলো অপেক্ষা করছিলাম। তারপর বললো, অতীশ আমার খুব ভয় করছে। তোমার বাবা মা কি বললেন, তা পুরোপুরি শুনতে ইচ্ছে করছে।

—ঠিক আছে। তুমি লাঞ্চ্ টাইমে নীচে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি তোমাকে নিয়ে এক সঙ্গে খাবো।

মাকে জানিয়ে দিলাম যে আজ আর বাড়ি যাবো না লাঞ্চ খেতে।

খেতে খেতে আদ্যান্ত সব কথা ওকে জানিয়ে বললাম, কাল সকালে তুমি শাড়ি পরে রেডি হয়ে থেকো। আমি গিয়ে নিয়ে আসবো।

আগের দিন রাত্রের আড্ডায় মা জিজ্ঞেস করলো, ও আমাগো রান্না খাইবো তো, না, তুই অগো দেশী খাবার আনাবি, বাইরে থিকা ?

আমি বললাম, ও আমাদের রান্না ভালোবাসে।

মা হেসে বললো, তা হইলে ও এইখানে খাইছে ? কি খাইতে ভালবাসে, তাও তুই নিশ্চয় জানস্। কি রাঁধুমু ?

—ও খেতে খুব ভালোবাসে। তুমি যা রাঁধবে তাই ভালোবেসে খাবে।

আমি ওঠবার আগেই মার আজ স্নান, পুজো সব শেষ। বাবাও আজ তাড়াতাড়ি পুজোয় বসেছেন। আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছি, মা পিয়ালীকে বলছে—গার্ল ফ্রেন্ড্ কাম। ইট্। আই কুক্।

আলি ও ঠিক বুঝে বলছে—ভেরি গুড। চিংড়ি মাছ আর মাগুর মাছের প্যাকেটটা ফ্রিজ থেকে বের করে বললো, দিস্ ফিস লাইক। তলার ড্রয়ার থেকে কপি আর কলাই সুটির প্যাকেট বের করে—দিস কারি লাইক ভেরি মাচ্। হাত নেড়ে আবার বললো, খাউ চাই।

মা হেঁসে বললো, খাউ চাই। মা এবার ঠিক করে ফেলেছে কি রাঁধবে।

মা ব্যস্ত হয়ে আমাকে তাড়া দিতে লাগলো, অতু, অনেক বেলা হইল, এইবার ওঠ। জলখাবার খাইয়া তাড়াতাড়ি অরে লইয়া আয়।

—মা, এত তাড়া কিসের, মোটে তো সাড়ে সাতটা। ওকে একটা ফোন করলাম। ও অত সকালেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

দুই তরফের তাড়ায় ওর এপার্টমেন্টে পেঁছে গেলাম নটার মধ্যে। ও তখন আয়নার সামনে বসে আছে। শাড়ি পরেছে, কপালে টিপ, ঠোঁটে হাল্কা রঙ, চোখে কাজল, মাথায় ঘোমটা।

আমি বললাম, ঘোমটা দিয়েছো কেন?

—তোমার এলবামে দেখেছি, তোমার বোন বিয়ের সময় এমনি করে মাথা ঢেকেছিল। দাঁড়িয়ে উঠে বললো, কি রকম দেখাচ্ছে গো? আমি ওর গালে ঠোঁট্‌টা ছুঁইয়ে বললাম, পছন্দ না হয়ে যায় না।

—আমার বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে।

ভাসনা বললো, ও তো সারারাত ঘুমোয়নি, দারুন উত্তেজিত। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

নেত্রা আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, একবার রিয়ার্সেল দিয়ে নেই, তুমি দাঁড়াও।

আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো, আমি নেত্রা। মা ভাল আছে?

—দাঁড়াও, বাঁ হাতে ঘোমটার আচলটা ধরে ডান হাতে পা ছোঁবে। বাঁ হাতে নয়। বাবাকে ও ঐভাবে প্রণাম করে বলবে, ভালো আছেন?

—ঠিক আছে, চল। যা হবার তাই হবে।

আমি দরজার ঘন্টা বাজাতেই পিয়ালী দৌড়ে এসে দরজাটা খুলে, মা বাবাকে বাইরের ঘরে ডেকে আনলো।

ও জুতোটা খুলে, খুব ধীর পায়ে এগিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালো। মা বাবার মুখের দিকে তাকালো, করুণ চোখে।

মা বাবা নিস্পলক চোখে ওকে দেখছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, প্রথম দর্শনেই নেত্রা জিতে গেছে।

তারপর মাকে প্রণাম করে সেই শেখানো বুলি ধীরে ধীরে আওড়ালো।

মা হেঁসে বললো, ওমা, এ যে বাংলাও কয়। থুথুনিটা ধরে চুমু খেয়ে বললো, খুব সুন্দর। মাথায় আবার ঘুমটা দিছে।

বাবাকে প্রণাম করে বললো, আমি নেত্রা। মা, নো নো বাবা, ভাল আছেন?

বাবা ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

মা ওকে হাত ধরে বসিয়ে দিল বাবার সামনে আর নিজে বসলো উল্টো দিকে। ও বেচারা একবার মা বাবার দিকে তাকাচ্ছে আর একবার করে আমার মুখের দিকে।

আমি চোখ টিপে বোঝালাম, এভ্রিথিঙ্ ইজ্ ফাইন্।

ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। মাথার ঘোমটা পড়ে গেল। এক হাতে শাড়িটা পায়ের ওপর উঠিয়ে দৌড়ে গেল দরজার কাছে। সেল্ফের ওপর রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে একটা গয়নার বাক্স নিয়ে ফিরে এলো মায়ের কাছে। সেটা খুলে সেই হীরার লকেট লাগানো হারটা খুলে মার গলায় পরিয়ে বললো, মা, টোমার লাইক···আমার দিকে তাকিয়ে, গট্ ইট্, পছন্দ?

মা খুব লজ্জা পেয়ে—দারুন পছন্দ। আমারে লজ্জা দিলা, এত দামি জিনিসটা দিয়া। ওকে আদর করে, হারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মার চোখ জলে ভরে গেল।

নেত্রা একটু হকচকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো? মা কাঁদছে কেন, অতীশ? আমি কি করলাম?

মা বুঝতে পেরে ওকে আবার আদর করে বললো, ওটা আমার আনন্দাশ্রু। নে পইরা গেলু, আমার তো এই রকম কত গয়নাই আছিল। সবই তো গেছে।

নেত্রা অর্থ বুঝতে না পেরে আবার আমার মুখের দিকে তাকাতে, আমি বোঝালাম কি ব্যাপার। নেত্রা তখন চোখ মুছিয়ে, মার পাশে বসলো।

—অতু, আমি অরে অখন কি দেই? আমার তো কিছুই নাই। আমি এই হার পইরা কোই যামু?

নেত্রা তখন কিছু না বুঝেই বললো, মা, মাই মাদার ইজ ডেড্। আই লাইক উ। ইউ আর মাই মাদার। দিস্ ইজ্ এ প্রেজেন্ট ফ্রম্ এ ডটার টু হার মাদার।

—আহারে! তোমার মা নাই। মাইয়ার প্রেজেন্ট। তা হইলে আমার লজ্জা নাই। আমার অখন গর্বই হইতাছে।

বাবা অবাক হয়ে সব দেখছিলেন।

মা এবার উঠে একটা প্লেটে দুটো পাটিসাপ্টা দিয়ে বললো, খাও মা।

আমি হৈ হৈ করে বললাম, এ কি আমার ভাগ কোথায়?

—অখন তুমি দুই ভাগের এক ভাগ পাইবা।

বাবা ওকে ওদের বাড়ির কথা সব জিজ্ঞেস করলো, ওর বাবার মত আছে কিনা, এটা জিজ্ঞেস করতেই, ও চুপ করে রইলো। আমার সঙ্গে পরিচয় নেই জেনে, একটু দুঃখ হলো।

নেত্রা মাথা নীচু করে এবার বাবাকে বললো, বাবা এখন বাইরে।

বাবা যে এত রাসভারি লোক, সেও ওর সঙ্গে অনর্গল গল্প করে চলেছে।

মা এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলো, নট্ গো আওয়ার হোম?

—অতীশ, সিস্তরের বাংলা কী, জেনে বললো, নিশ্চয়।

মা আবার বললো, নো এঃ সিঃ, নো বাথরুম্? ট্যাঙ্ক্ বাথ।

—নো প্রবলেম। আমি ট্যাঙ্কে বাথ ভালবাসি। সুইম ভেরি গুড্। অতীশ

পারে না উইথ মি। গল্ফে ও পারে না।

—হ্যাঁরে অতীশ, সত্যি নাকি, তুই অর লগে সাতারে পারস্‌ না ?

—না মা। ও এই দেশের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান ছিল।

ওর পিঠে হাত দিয়ে, তুমি গল্ফ ও খেলতে জানো ?

—হ্যাঁ মা, ও দারুন খেলে।

মা ওকে খাইয়ে খুব খুশি। সব চেটে পুটে খেয়েছে।

খাবার পর আমরা চারজন আবার বসেছি। কথা বলছে বাবা আর নেত্রাই।

মার আর নেত্রার মধ্যে ভাবের বিনিময় হচ্ছে চোখের মাধ্যমে আর মনের তরঙ্গের হিল্লোলে।

ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো মায়ের হাত ধরে, ইউ লাইক মি মা ?

মা ওকে আর একবার আদর করে—খুব লাইক করি।

বাবার দিকে তাকিয়ে, হোয়াট্‌ এবাউট্‌ ইউ বাবা ?

বাবা ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, গড্‌ হ্যাজ অরডেইনড্‌ ইট।

ও এবার উঠে আমার শোয়ার ঘরে ঢুকলো। মা ও পেছনে পেছনে গেল।

মা দেখে, বাবাকে টেনে আনলো—নেত্রা তখন আনন্দময়ী মার ছবির সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসে চোখ বুজে নমস্কার করছে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কার ছবি তুমি জানো ?

—হ্যাঁ, সকলের 'মা' আনন্দময়ী।

এবার ওর উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে, স্নায়ুগুলো শিথিল হয়েছে, চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে।

মাকে জড়িয়ে ও শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো, ছোট্ট শিশুর মত। আমি একবার উঁকি মেরে দেখলাম, বুকের কাপড় সরে গেছে, পায়ের কাপড় হাটু পর্যন্ত উঠে আছে। মাও শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। বাবা আমার ঘরে। আমি বসবার ঘরে সোফায় শোয়া।

সন্ধ্যায় ওকে দিয়ে এলাম।

ও শুধু একটা কথাই বললো, তোমার বাবা মা খু-উ-ব ভালো।

রাত্রের আড্ডায় আজ বাবাও বসেছে।

মা জিজ্ঞেস করলো, কি রকম দেখলা ?

—তুমি আগে কও, কেমন লাগলো তোমার ?

—আমার ? দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী মিলাইয়া এক জীবন্ত প্রতিমা।

—দুর্গার লগে কি মিল দেখলা ?

—ক্যান, গল্ফ খেলে, সাঁতার কাটে, অতীশরে হারাইয়া দেয়, এইটা কি কম কথা ? আমার অতুর তো সাঁতারে আর খেলায় অনেক নাম আছিল, তারে হারানো

কি কম কথা নাকি ? দ্গার শক্তি না থাকলে কি পারে ? এইবার তোমার কথাটা কও।

—আমি তোমার লগে এক মত। আমার তো মনেই হইলো না যে ও বিদেশি, ও যেন প্রবাসী বাঙ্গালী, বাংলা জানে না। অতুর যোগ্য পাত্রী।

বাবার একটা কৌতূহলী প্রশ্ন—এ কয়দিন তো অনেক থাই মাইয়া দেখলাম, কিন্তু অর মত সুন্দরী তো কাউকে দেখি নাই—কী সুন্দর টিকোল নাক, সুন্দর চোখ। থাইগো তো নাকটা একটু বসা, চোখও ছোট।

—ওর দিদিমা ছিল ইংরেজ, তাই ও এত সুন্দর। এখানে পর্তুগীজ, ফরাসি, ইংরেজ যারা থাই মেয়েদের নিয়ে ঘর করেছে, তাদের ছেলে মেয়েরাও সমাজে মিশে গেছে একইভাবে—কোনও ভেদাভেদ নেই।

মা বাবা খুশি মনে শুতে গেল।

॥ ৫১ ॥

নেত্রা একদিন না এলেই মার মন খারাপ হয়ে যায়, কোথাও গেলে ওকে সঙ্গী করতে চায়।

আমাকে নিয়ে অনেক বাট্ দিয়ে একটা রুবি আর এমারেল্ড বসানো নেকলেস কিনে ওকে পরিয়ে দিয়ে তবে শান্তি পেয়েছে।

মা, বাবাকে গতবার সব দেখানো সম্ভব হয়নি। তাই এবার বাকি দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। নেত্রার সঙ্গে পরামর্শ করে এক এক সপ্তাহে এক এক জায়গায় নিয়ে যাই। নেত্রাই আমাদের গাইড্।

আজকাল রাতের খাবার টেবিলে প্রায়ই নেত্রা থাকে। মার রান্না ওর খুব পছন্দ।

মা একদিন ওকে খুব বিপদে ফেললো, থাই রান্না করে খাওয়াতে বলে।

ওর এপার্টমেন্টে এই নিয়ে জোর বৈঠক বসলো।

আমি বললাম, কোন চিন্তা নেই—থাউ ভাত কুঙ্গ করবে, মাছের ঝোল শিং মাছ দিয়ে, তাতে নারকেলের দুধ আর তুলসি পাতা দেবে, তোমরা যে রকম করে রাঁধো। পাপড় ভাজবে, বাস্ বাস্।

—কিন্তু বাবার জন্যে ভেজিটারিয়ান কি রাঁধবো ? আমাদেরতো কোনও ভেজিটারিয়ান খাবার আছে বলে, আমি জানি না।

ভাসনা রেসিপির বইটা নিয়ে এলো, তাতে পাওয়া গেল একটা পাঁচ মিশালি তরকারির রেসিপি। ভাসনা বললো, এটা দুদিন আমরা দেখে দেখে রাঁধবো, তা হলেই তোর রপ্ত হয়ে যাবে।

আমাদের বাড়িতে এসেও পিয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ হলো, বাজারের ফর্দ তৈরি হলো। সেই অনুসারে পিয়ালী বাজার করে আনলো। পিয়ালী ওকে খুব ভরসা দিয়েছে।

রাঁধুনি খুব সকালে চলে এসেছে, নিজেই ড্রাইভ করে। আজ ও থাই পোশাক পরে এসেছে।

পিয়ালীর কথা মত দুজনে মিলে সব জোগাড় করলো।

মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। পিয়ালীই সব মশলাপাতি, নুন চিনি, জল ঠিক করে দিচ্ছে. ও শুধু হাতা খুন্তি নাড়ছে, আর ঘাম মুছছে ঘন ঘন।

মা ব্যস্ত হয়ে বলছে, এবার তুমি একটু ঠাণ্ডায় বসো। পিয়ালী বাকিটা করুক।

রান্না হয়ে গেলে সুন্দর করে টেবিল সাজালো নিজেই, মাঝখানে একটা অর্কিডের ইকাবানা রাখতেও ভোলেনি।

আমি বললাম, আজ তোমাদের খাওয়া মাটি।

ও রেগে গিয়ে বললো, আগে খাও, তারপর বলো। কেবল ঠাট্টা।

ও সবাইর পেলটে পেলটে খাবার তুলে দিল।

মা বাবা দুজনেই খেয়ে বললেন, খুব ভালো হয়েছে।

—ও দারুন খুশি। আমার দিকে ভেঙচে বললো, দেখলে তো, কি রকম রেঁধেছি? তুমি একটা নিন্দুক।

বাবা তাগাদা দিচ্ছে নেয়াকে, ওর বাবার মতামত নেবার জন্যে।

একদিন ও বাবাকে বললো।

ওর বাবা শুনে রাগে ফেটে পড়লো, আমাদের দেশে কি ছেলে নেই? ও ভিখিরির দেশে গিয়ে তুই থাকতে পারবি, তোকে এত ভালোভাবে মানুষ করেছিলাম কি এ জন্যে? আমি কোন মতেই রাজি হবো না।

ভয়ে ভয়ে নেয়া বলেছিল' ভিখিরির দেশ বলছো কেন?

—শুনেছি, ও দেশে ভিখিরির জ্বালায় রাস্তা দিয়ে হাটা যায় না।

—বাবা, আমাদের দেশে ভিখিরি না থাকতে পারে, কিন্তু পয়সার জন্য এত মেয়ের সর্বনাশ কি আর কোনও দেশে হয়?

—তা হোক, তবুও আমরা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। আমাদের একটা শিক্ষা আছে, কৃষ্টি আছে।

—বাবা, ও কথা বলো না। আমাদের কৃষ্টি, ধর্ম্ম, ভাষার সমৃদ্ধি, লিখন প্রণালী সবই তো ঐ দেশ থেকে এসেছে। শিক্ষার কথা বলছো—জানো অতীশ একজন ইঞ্জিনিয়ার, তার উপর ম্যানেজমেন্ট পাশ। এত অল্প বয়সে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। তুমি ওর সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পারবে, কি রকম ভদ্র, মার্জ্জিত আর নম্র।

—তোকে দেখছি ব্রেইন্-ওয়াশ্ করে ফেলেছে। আমি ওর সঙ্গে দেখা কিছুতেই করবো না। আজকে আমদের পরিবারের দুরবস্থার কারণ তো ও, ওই তোকে নিয়ে গিয়েছিল ভুলিয়ে।

—ভুল কথা। আমিই ওকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—তা হলে তুইই এর জন্য দায়ি। তুই তো এখন সাবালিকা, নিজের ইচ্ছানুসারে যা হোক কর। আমার মতের তো প্রয়োজন নেই।

—তা হলে তাই হবে বলে, ও কেঁদে ফেললো।

ওর মা, বাবার চীৎকার শুনে ও ঘরে দৌড়ে এসেছিল। নেত্রার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে ওর বাবাকে বললো, একদিন আলাপ করে দেখই না। ও যদি একজন আমেরিকান বিয়ে করতো, তাহলে কি তুমি এ রকম করতে? তাহলে এক কথায় রাজি হয়ে যেতে।

নেত্রার কান্না দেখে ওর বাবার রাগ জল হয়ে গেল। মেয়েকে কাছে টেনে বললো, ঠিক আছে, একদিন ডাক ওকে।

ওর মা বললো নেত্রাকে, ওকে একদিন খেতে ডাক রাত্রে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে—তাহলে পরশুদিনই বলা যাক?

—ঠিক আছে। বাড়িতে নয়—মিলিওনেয়ার ক্লাবে।

পরদিনই সব খবর পেঁছে গেল আমার কাছে।

মিলিওনেয়ার ক্লাবে যখন পেঁছিলাম, তখনও ওর বাবা মা এসে পেঁছয়নি। নেত্রা গেটের কাছে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে আমাদের নির্দ্দিষ্ট টেবিলে বসলাম।

এখানকার বিত্তশালী ব্যবসাদারদের ক্লাব এটা। এখানে কনফারেন্স রুম, ডাইনিং রুম, আলাদা সব মিটিং রুম, প্রভৃতি রয়েছে।

নেত্রা খুব টেন্সড্। ও আমার হাত ধরে বললো, বাবা রাগ করে তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করলেও কিন্তু তুমি অভদ্র হয়ো না। বাবা বড্ড দুশ্চিন্তায় আছে, তাই অস্থির। বাবার এ অবস্থা দেখে ভুল বুঝো না। মা কিন্তু আমার হয়ে ওকালতি করছে।

ওর বাবা, মা এলো। নেত্রা আলাপ করিয়ে দিতেই আমি ওর বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, নাইস্ মিটিং ইউ। ওর মা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সে হাতটা আলতো করে ধরে নমস্কার করলাম। উনিও করলেন। ওর বাবা কিন্তু আমার কথার উত্তরে বললেন, ইট ইজ গুড্ টু মিট ইউ। ওর মা-ই আমাকে বসতে বললেন।

ওর বাবা চুপ করে বসে রইলেন। নেত্রা একবার ওর বাবার দিকে তাকাচ্ছে, একবার আমার দিকে। ওর মা বিশেষ ইংরেজি বলতে পারে না।

নেত্রা মাকে বললো, অতীশ থাই বলতে পারে, তুমি থাই ভাষায়ই কথা বল ওর সঙ্গে।

ওর মা খ্‌টিয়ে খ্‌টিয়ে আমাদের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছিল।

ওর বাবা কিছ্‌ক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শ্‌নে বললো, ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ ড্রিংক ?

আমি লক্ষ্য করেছি ওর শব্দের ব্যবহার—বীতরাগ প্রকাশের একটা প্রচেষ্টা ছিল সে শব্দচয়নে। আমিও তাই ইচ্ছে করেই বললাম, নো, থ্যাংকস্‌।

—তুমি ড্রিংক করো না ?

—করি, পরিবেশ ব্‌ঝে।

নেত্রা ভয় পেয়ে আমার দিকে তাকালো।

ওর বাবা ভুর্‌ কুচকে বললো, পরিবেশ তোমার মতে মনোমত নয়।

—না।

—কেন ?

—কারণ, বোঝাই যাচ্ছে, আপনাকে এখানে জোর করে যেন কেউ ধরে নিয়ে এসেছে। আমার উপস্থিতি আপনাকে অশান্ত করে তুলেছে। তাই যদি মনে হয়, তা হলে আমি উঠে যাচ্ছি। আপনাদের সুন্দর বিকেলটা আমি নষ্ট করতে চাই না, বলে উঠে দাঁড়ালাম।

—ওর মা আমার হাত ধরে বসিয়ে বললেন কাইন্ডলি একটা ড্রিংক নাও। ওকে একট্‌ সামলাবার সময় দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, হ্‌ইস্কি সোডা প্লিজ।

এক গ্লাস শেষ হয়ে যাবার পর ওর বাবার অস্থিরতা সত্যিই কমলো। —এক্সকিউজ মি। আই ডিড্‌ নট্‌ মিন্‌ ইট্‌। আমি বড্ড বিক্ষ্‌ব্ধ। আমাদের বিপদ এখনও কাটেনি। সব সময় ঐ বিপদের ভ্‌ত আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তোমার বাবা মাকে দেখাবে না, আমার মেয়েকে ?

—ওঁরা দেখেছেন।

—কোথায় দেখলেন ? ওঁরা কি বললেন ?

—খ্‌ব পছন্দ হয়েছে। ওঁরা রাজি। আপনাদের মত জানতে চেয়েছেন।

এরপর স্বাভাবিক ভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার সম্বন্ধে যা জানবার, সবই জানলেন। এর মধ্যে তিন গ্লাস হ্‌ইস্কি ও শেষ হয়ে গেছে। ওর মা জিন খেতে খেতে কথা বলছিলেন। নেত্রা চুপচাপ বসে ছিল, কিছ্‌টা আশ্বস্ত হয়ে।

খাওয়া শেষ হলে আমি বললাম, যদি আপনাদের আমাকে পছন্দ হয়ে থাকে তা হলে একদিন আসুন আমাদের বাড়ি, আমার বাবা মার সঙ্গে আলাপ করতে।

ওর বাবা বললেন, তার আবার কী প্রয়োজন আছে ?

আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে। এটাই আমাদের রীতি।

ওরা এসেছিলেন। প্রথমে নেত্রার বাবা বেশ শক্ত হয়ে বসে অল্প কথা বলছিলেন ভারি গলার জেনারেলের সুরে। আমার বাবাও তখন জমিদারি সুরে কথা বলছিলেন, নিজের আত্মসম্মান সচেতন হয়ে। তারপর খোলাখ্‌লি কথা হলো।

মা ওদের পায়েস খাইয়ে দিল। খেয়ে খুব খুশি, নেত্রা নিজের বাড়ির মত এখানে ঘুরছিল, মাকে সাহায্য করছিল খাবার দিতে।

শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই সব মিটলো।

ওরা সব চলে গেলে বাবা বললেন, প্রথমে ভদ্রলোক জেনারিলিজম্ দেখাচ্ছিল আমিও তাই জমিদারি চালে কথা বলছিলাম। আসলে লোক খারাপ নয়। মনে হলো কি একটা দুশ্চিন্তা ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। আমার একমাত্র সন্তান বিদেশি বিয়ে করলে আমারও এই অবস্থাই হতো।

রাত্রেই খবর পেলাম, নেত্রার বাবা মার ভালো লেগেছে আমাদের। নেত্রা টেলিফোন মারফৎ একটা চুমুর আওয়াজ করে বললো, তা হলে অতীশ, শীঘ্রই আমরা স্বামী স্ত্রী হচ্ছি। হুররা, গড ব্লেস, আস্।

॥ ৫২ ॥

চিঠি এসেছে, বোনের গলব্লাডার অপারেশান হবে। মা অস্থির হয়ে উঠেছে ফিরে যাবার জন্যে। টিকেট হয়ে গেছে। বাবা চাইছেন যাবার আগে বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে যেতে। নেত্রার বাবা কিছুটা সময় চেয়েছে। বিপদের মেঘ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত মনঃস্থির করতে পারছেন না। বিপদের কারণ খোলাখুলিই সব বলেছেন।

বাবা সে কথা আর মাকে জানাননি।

মা বাবা চলে যাবে বলে আমার মনও যেমন খারাপ, নেত্রারও খুব খারাপ লাগছে, ওর খুঁজে পাওয়া মা চলে যাবে বলে।

ও এখন অনেক বাংলা কথা শিখে গেছে, একে তো কথা শুনে, তার ওপর আমার কাছ থেকে পাঠ লিখে নিয়ে। ওর একাগ্রতার তুলনা হয় না।

এলেই ও মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা, টুমি যাবে না। থাকো। আমি টোমার মেয়ে না?

—পাগলি মাইয়া, আমি আবার আসুম। এইবার যাই। মাইয়াটা একা আছে। এত বড় একটা অপারেশান হইবো।

—ও তো তোমার কাছে পঁচিশ বছর ছিল এখন ওর স্বামী আছে।

—ও থাকলে তো হইতই। ও বিলাতে গেছে।

যাবার আগের দিন নেত্রা অফিস থেকে সোজা চলে এসেছে। মা আমাদের দুজনকে জলখাবার দিয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে বোধ হয় আমরা 'মেড্ ফর ইচ্ আদার।'

বাবার পাশে বসে বললো, দেখছোনি অগো দুই জনরে কী সুন্দর মানাইছে—য্যান লক্ষ্মীনারায়ন। আমার অতুও তো কম সুন্দর না—সুপুরুষ।

বাবা হেসে বললেন, ঠিক আমার মত।

—হঃ, লম্বা চওড়ায় তোমার মত, কিন্তু রঙটা তোমার পাইলে কী আর এত সুন্দর লাগতো। অগো ছাইড়া যাইতেও মনটা চায় না, আবার মাইয়াটাও টানতাছে।

নেত্রা তারপর বসলো, ওদের স্যুটকেশটা গোছাতে।

মা দারুন খুশি। বাবাকে বলছে কি সুন্দর সব জিনিস ভাজ কইরা কইরা গুছাইতাছে, আমি তো এই রকম পারতাম না।

—তা পারবা কি কইরা ; তুমি কি কোনও দিন সার্ট প্যান্ট ইস্ত্রি করছো ? ও, করছে, সেইটা বোঝাই যায়।

গোছানো হয়ে গেলে, মা বললো, নেত্রা তুই আমার মায়া বাড়াইয়া দিলি।

নেত্রা বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মায়া' কী ?

বাবা ফাফরে পড়লেন, মায়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ বের করতে, বললেন এটাচমেন্ট।

তখন নেত্রা—আমারও খু-উ-ব মায়া হয়েছে মা।

খেতে খেতে অনেক রাত হয়ে গেল।

মা বললো, নেত্রা, আইজ তুই থাইক্যা মা। সিলপ হিয়ার।

নেত্রা বললো, আমি ড্রেস আনি নাই। পরবো কী ?

—আমার শাড়ি পরবি।

—কানট স্লিপ উইথ শাড়ি।

—তা হইলে কী আর করবি। বাড়ি দিয়া আসুক অতীশ।

ঠিক আছে বলে, ও উঠে আমার ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো আমার একটা রাত্রিবাস পরে। মা, ঠিক আছে ?

মা দেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে বললো, ভালই তো দেখাইতে আছে।

নেত্রা খুটে খুটে জিজ্ঞেস করছে মা বাবার বিয়ের কথা, আমার ছোট বেলার কথা, নিজের মার কথা, ওদের বাড়ির কথা—রাত বারোটা প্রায় বাজে তবুও বাবার চোখে আজ ঘুম নেই।

আমি এক সময় উঠে এসেছি আমার ঘরে, সিগারেট খেতে। ও এক ফাঁকে চলে এসেছে আমার ঘরে।

আমাকে মুখ ভেঙচে বললো, আজ আঙুল চোষো, আমি মার কাছে শুচ্ছি।

আমি বললাম, বসো না একটু।

আজ আর বসা চলবে না। আমার গালটা একটু ছুঁয়ে বললো, গুড নাইট। বাবা তোমার পাশে শোবে। সাবধানে শুয়ো। মাঝখানে কোলবালিশটা রেখো।

এয়ার পোর্টে নেত্রাও আমার সঙ্গে এসেছে।

মাকে প্রণাম করতেই, মার চোখে জল। ওর চোখও শুকনো নয়।—মা, কাক্ষ কুইকলি এগেইন।

—হুঃ নিশ্চয় আসুম। তুই যাবি কবে?

—হোয়েন অতীশ নেবে। অতীশকে বল।

বাবা ওকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

ওকে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে ফিরে এলাম। বড্ড ফাঁকা লাগছিল।

মা বাবা এবার খুব খুশি মনে ফিরে গেছেন, তার ছেলের একটা হিল্লে হবার সম্ভাবনা দেখে। ঘর আলো করা বৌ আসবে, সবাই দেখে বলবে, কি অপরূপ সুন্দরী বৌ হয়েছে অতুর, শুনে মনটা ভরে উঠবে। আরও খুশির কারণ—ওর আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা ও প্রচেষ্টা দেখে।

কৃষ্টির ব্যবধান, ভাষার ব্যবধান, ধর্মের ব্যবধান সব সরিয়ে ফেলে ও কি সুন্দর মেয়ের জায়গা করে নিয়েছে একদিনেই। ওর কথা শুনে যে শঙ্কা ছিল তা ওকে দেখার কিছুক্ষণ পরই কেটে গিয়ে স্নেহ এসে তার জায়গা করে নিয়েছে।

গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ আমার মা, পুঁথিগত বিদ্যা সামান্যই, পোর খেয়ে খেয়ে কোমল মনটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল, নেত্রার মমতার স্পর্শে সে কাঠিন্য গলে গেল নিমেষে।

সারাটা পথ হয়তো মা, বাবা ওকে নিয়েই নানান কল্পনার জাল বুনেছে—প্রথমে ওর গুনপনা, তারপর নিশ্চয় বিয়ের বিশদ পরিকল্পনা, কৃষ্ণনগরের বাড়িতে ওর কয়েকদিন থাকার অসুবিধা, আত্মীয়-স্বজনদের মতামত, তারপর নাতির মুখ দেখার দিনক্ষণ, হয়তো সেই ফাঁকে নিজেদের বিয়ের স্মৃতিচারণ করতেও ভোলেনি। সেকালের জমিদার বাড়ির বিয়ের আনন্দ একালে যে কোন মতেই পরিবেশন করা সম্ভব নয় এ নিয়ে নিশ্চয় দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে তর্কাতর্কি হয়েছে। এ সব কথা একা একা ভাবতে বেশ ভালো লাগছিল।

॥ ৫৩ ॥

আজকাল নেত্রার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়—ওদের বাড়িতেও। ওর মার সঙ্গে খুব ভাবসাব হয়ে গেছে। ওর বাবা খুব একটা কথা বলেন না।

নেত্রা একদিন এসে একটা দুঃসংবাদ দিল—বাবা অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে একটা ট্রেইনিংএ, মাও যাচ্ছে সঙ্গে, ওকেও যেতে হবে। ওর বাবা ওকে একা এখানে রেখে যেতে সাহস পাচ্ছে না। ওর যাবার ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হলো।

ও না থাকাতে, শনিবার রবিবারটা বড় খারাপ লাগে। সময় আর কাটতে চায় না। বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না।

সামনের শনিবার কোথাও যাবো ঠিক করলাম। সমুৎ প্রাকন্ দেখা হয়নি—শুনেছি ওখানে পুরাকালের সম্পূর্ণ থাইল্যাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ রয়েছে আর আছে একটা কুম্ভির প্রকল্প, যা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড়।

দেখতে হলে একজন গাইড চাই। এখানে কনডাকেটড্ টুরেই গাইড থাকে, না হলে এসকর্ট নেওয়া যায়, তারা গাইড হিসাবে নিষ্কর্মা, একটা কাজেই ওরা নিপুণ।

উধমের কথা মনে হলো—কিন্তু ওর ঠিকানা? খুঁজতে খুঁজতে ড্রয়ারে পেয়ে গেলাম।

ওকে ফোন করলাম—তখন কলেজে। আমার ফোন নং দিয়ে দিলাম।

রাত দশটায় উধমের ফোন, হ্যালো, খুন অতীশ, কী খবর? এতদিন পর হঠাৎ মনে পড়লো কেন?

—শনিবার তুমি ফ্রি আছো?

—আপনার জন্যে রোজই ফ্রি। হুকুম করুন।

সকাল বেলা আসতে বলে দিলাম।

ও বললো 'ফুজনি পাই ল্যাও চেট্'। (কাল চলে যাবো)।

পরের দিন সকালে উধমকে দেখে, পিয়ালী ওকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে, আমাকে খুব গম্ভীর গলায় বললো, মাস্টার, একজন অচেনা মেয়ে এসেছে তোমার কাছে। এটা ঠিক নয় মাস্টার।

আমি বললাম, ভয় নেই তোমার। ও গাইড। আমাকে একটা জায়গা ঘুড়িয়ে দেখাবে। তুমি কাজে যাও।

—ও রেগে চলে গেল। আমি গিয়ে উধমকে ডেকে এনে বসালাম। পিয়ালী যখন ব্রেকফাস্ট দিতে এলো তখন উধম উঠে গিয়ে ওর হাত ধরে বললো, দিদি, আমি সেই মেয়ে নই। আমি মহাবিদ্যালয়ে পড়ি। আমি এক সময় গাইডের কাজ করতাম। তখন তোমার মাস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তোমার কোনও ভয় নেই।

এরপর ওর মনটা একটু প্রসন্ন হলো। দেখো বাপু, আমার মাস্টারকে পটাবার চেষ্টা করো না। তারপর কানে কানে কি যেন বললো।

সাকোন্ গাড়ি চালাচ্ছে। আমি আর উধম্ পেছনে বসেছি। সমুৎ প্রাকন্ ব্যাংকক থেকে প্রায় বত্রিশ কিঃ মিটার দূরে, চাউপিয়াও নদীর পাড়ে, একটা ছোট্ট শহর।

—উধম্, তোমার পড়াশোনা তা হলে ভালই চলছে?

—তা চলছে। কেসে আমরা জিতেছি। দোকানটার অর্ধেক আমরা

আমরা পেয়েছি, বাড়িটারও অর্ধেক। ভাগ হয়ে গেছে। আমি আর মা মিলে দোকানটা চালাচ্ছি, আর রাত্রে পড়ছি। ভালই চলে যাচ্ছে এখন। গাইডের কাজ আর করি না। আপনার কেমন কাটছে এখানে? অনেক দিন তো হলো।

—ভালই। তা হলো অনেকদিন।

—আপনার ফানাইয়া (স্ত্রী) তো দেখলাম না।

—ফানাইয়া এখনও হয়নি। তোমার স্বামী হয়েছে?

—আমার তো পড়াই শেষ হলো না।

—বন্ধু আছে তো?

—তা থাকবে না কেন? আপনার বান্ধবী নেই?

—কোথায় আর জুটলো?

কাল হঠাৎ এতদিন পর আমার কথা মনে পড়ল যে বড়?

—কিছু দেখতে গেলেই তোমার কথা মনে পড়ে। তুমিই প্রথম থাই মেয়ে, যার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, আর যাকে আমার ভালও লেগেছিল।

—তা হলে আগে ডাকেননি কেন?

—কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম।

—বাজে কথা একদমই বলবেন না। ক্যাট্ ইজ আউট অফদি ব্যাগ্।

—কি রকম ক্যাট্?

—সুন্দরী ক্যাট্। বড় ঘরের ক্যাট আপনার কাছে পালিয়ে এসেছে। ঠিক না?

—কি করে জানলে?

ও হেসে বললো, মুখ দেখেই বলতে পারি। এক 'প্রার' (সন্ন্যাসী)র কাছে শিখেছিলাম। কিছুক্ষণ পর হাতটা ধরে বললো, ঠিক বলেছি না?

আমি চুপ করে গেলাম। এই সব আজে বাজে গল্প করতে করতে আমরা ক্রোকোডাইল ফার্মে পৌঁছে গেলাম।

অনেক পুকুর, তার চারিদিকে জালের বেড়া। সব পুকুরে অগুনতি ছোট বড় কুমির কেউ পাড়ে রোদ পোয়াচ্ছে কেউ পোড়া কাঠের মত জলে ভাসছে। একটা বাঁধানো বড় চৌবাচ্চায় গোটা দশেক বিরাট বিরাট কুমির। তাদের হাতে করে মাংস খাওয়াচ্ছে এক বুড়ো। মাঝে মাঝে ওদের মুখ ফাঁক করে মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে ওপরের দর্শকদের মনরঞ্জনের জন্য।

—এত কুমিরের চাষ করা হচ্ছে কেন, তা জানো?

—না জানার কি আছে? কুমিরের চামড়ার মেয়েদের ব্যাগ অনেক দামে টুরিস্টদের কাছে বিক্রি হয়।

টুরিস্ট আকর্ষণের এও এক ধান্দা।

—চলুন এবার একটু নদীর ধারটা ঘুরে আসি।

নদী অর্থাৎ চাউ পিয়াও। জেঠিতে নৌকো—সবই মোটর বোট। তাতে আছে নাইলনের জাল, জাল গোটাবার যন্ত্র। জেঠির পাশে বরফের কল, কোল্ড স্টোরেজ। রেফ্রিজারেটেড ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে মাছ নিয়ে যাবার জন্যে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্যে রয়েছে বড় বড় জাহাজ। সমুদ্র কাছেই।

রাস্তার একধারে সুন্দর সুন্দর সব কারখানা।

উধম বললো, এগুলো হচ্ছে মাছ প্রসেসিংএর কারখানা। এ সব কারখানায় মাছ পরিষ্কার করে কেটে ফ্রিজ করে প্যাকিং করা হয়। সার্ডিন মাছ সেদ্ধ করে জলপাইয়ের তেলে বা টমেটো সস্ দিয়ে টিনে ভরা হয়, তারপর ওগুলো চালান যায় জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং অস্ট্রেলিয়া।

—তুমি এতো জানলে কি করে?

—আমি কয়েকমাস এই রকম এক কারখানায় কাজ করেছিলাম। এখান থেকে স্কুইড, অক্টোপাস, ঝিনুক, কাঁকড়ার মাংস, হাঙরের পাখনাও চালান দেওয়া হয়। যে মাছ খাওয়া যায় না সেগুলো শুকিয়ে গুড়ো করে মুরগীদের খাওয়ানো হয়।

এদের ফিসিং ইণ্ডাস্ট্রি অত্যন্ত উন্নত। এরা অসীম সমুদ্রের গভীর থেকে মাছ তুলে আনে। মাছ ধরতে ধরতে চলে আসে ভারতের জলসীমার মধ্যে বিশেষ করে আন্দামানের কাছাকাছি, অনেক সময় ভারতীয় উপকূলরক্ষি বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে। স্মাগলারদের নৌকোর উপর অনেক সময় হামলা করে লুটপাঠ করে নেয়। এ সব মাছের নৌকো বড় বড় কোম্পানির।

কাছেই থাইল্যাণ্ডের গভীর সমুদ্রের বন্দর তৈরি হচ্ছে, সেখানে শুধু কনটেইনারে মাল যাবে আসবে। এখন চাউ পিয়াও নদীর ওপর যে বন্দর আছে, তাতে বড় জাহাজ আসতে পারে না, যেমন কলকাতা বন্দর। বড় জাহাজ মাল নিয়ে সিঙ্গাপুর বন্দরে নোঙর ফেলে। সেখানে থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম আর ইন্দোনেশিয়ার কনটেইনার নামিয়ে ছোট ছোট জাহাজে তুলে দেওয়া হয়। তেমনি আবার ওদেশের মাল বড় জাহাজে নিয়ে নেয়। নতুন বন্দর তৈরি হলে বড় বড় জাহাজগুলো এখানে সোজা চলে আসতে পারবে।

—নদীর ওপারে যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার নাম হলো 'ছেদী ক্লঙ নামু, (নদী বন্দরের চৈত্য)। যাবেন নাকি দেখতে?

—না, সেখানে আর যাবো না। খিদে পেয়ে গেছে। তোমারও নিশ্চয় পেয়েছে। কোথায় যাবে?

—এখানে একটা ছোট সি ফুড রেস্তোরাঁ আছে, যার খুব সুনাম। চলুন আপনাকে সেখানেই নিয়ে যাবো।

খালের জলে মাচার ওপর রেস্তোরাঁ, বাঁশের বাঁখারির বেড়া আর খড়ের চাল।

যেমন শুধু মাছের তৈরি খাবার। সি ফুড নাম হলেও, মিষ্টি জলের মাছও পাওয়া যায়। রান্না মানে প্রায় সবই সেদ্ধ, তার মধ্যে কিছু গন্ধ পাতা ফেলে দেওয়া হয়েছে।

উধম, সেদ্ধ মাছ খেতে আমার ভালো লাগে না। এক প্লেট কড়া ভাজা মাছের অর্ডার দাও।

মাখন, প্রিক (মরীচ) নুন দিয়ে ভাত মেখে মাছ ভাজা দিয়ে খেয়ে বেশ তৃপ্তি হলো।

—আপনার সঙ্গে ঘুরলে খাওয়াটা দারুন হয়। ভুসিথ থানিতে আপনি যে খাইয়েছিলেন, তা এখনও মুখে লেগে আছে। এবার চলুন, আপনাকে আমাদের পুরো দেশটা দেখিয়ে আনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

—সে কি পুতুলের দেশ ?

—পুতুল নয় তবে মিনিয়েচার বলতে পারেন। অনেক জিনিস আবার আছে যা পুরো মাপের। যে সমস্ত মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে সেগুলো এখানে একই রকম ভাবে তৈরি করা হয়েছে, মাপে একটু ছোট। দুশো একর জমির ওপর প্রায় পঁচিশ মিলিয়ান ডলার খরচ করে এটা তৈরি।

—এটা কি সরকার করেছে ?

—না, এক ব্যবসাদার, যেমন আছে আমেরিকায় ডিসনিওয়ার্লড, বা সিঙ্গাপুরের টাইগার বাম গার্ডেন।

—ওসব নাম তুমি জানলে কী করে ?

—গাইড হতে হলে তো একটু জানতেই হয়।

—চল তাহলে।

সামান্যই টিকিটের দাম। গেটের পাশে বিরাট দ্বাররক্ষির মূর্তি, তার ওপরে পীনোন্নত ক্ষীণ কটী নারীমূর্তি। আর একটু ভেতরে গিয়ে আমাদের চোখ আটকে গেল অপূর্ব ভাস্কর্যে—পূর্ণাবয়ব সাতটা ঘোড়া, দুর্গম পাহাড়, স্রোতাস্বিনী পার করে নিয়ে চলেছে রথারূঢ় দেবরাজকে।

আমি বললাম এ হচ্ছে সূর্যদেব, তোমরা যাকে বল অরুণ, যার মন্দির তুমি দেখিয়েছিলে চউপিয়াও নদীর ধারে, ওয়াট অরুণ।

উধম বললো, আপনি ভুল করছেন, এ হচ্ছে ইন্দ্রের মূর্তি।

এরপর একটা গ্রামের বাড়ি—খড়ে ছাওয়া, তার পাশে একটা গরুর গাড়ি রাখা আছে, একটি মেয়ে ধান ঝাড়ছে। পাশ দিয়ে একটা খাল বয়ে চলেছে, তাতে এক জেলে জাল দিয়ে মাছ ধরছে। একটু দূরে একটা মোষের লাঙ্গল দিয়ে চাষ করছে এক চাষা। মূর্তিগুলো মনে হল কংক্রিটের।

এরপর যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেটা একটা মন্দির, এ যেন ভুবনেশ্বরের কোনও একটা ছোট মন্দিরকে এনে বসিয়ে দিয়েছে এখানে।

ভাবলাম, এদের ভাস্কর্য কি তাহলে কলিঙ্গ থেকে এসেছিল ? ভারতীয় সভ্যতার

বিস্তার প্রথম হয়েছিল জাভা দ্বীপে যার নাম ছিল সুবর্ণ দ্বীপ, যেখান থেকে তার বিস্তৃতি ঘটে কম্বোজে আর যেই দরজা দিয়েই ঢোকে তা শ্যামদেশে।

সুরকি ঢালা রাস্তার দুদিকে প্রচুর গাছ। উধম বললো, এ সব গাছ সাধারণত পাওয়া যায় আমাদের বনাঞ্চলে। কত গাছ আছে জানেন—প্রায় দুই লক্ষ।

এখানে আরও রয়েছে ছোট্ট ওয়াট ও ছেদী থাই স্থাপত্যের নিদর্শন, মনদের (ব্রহ্মদেশের এক গোষ্ঠী) মন্দিরের ঢংএ তৈরী একটা বৌদ্ধ মন্দির।

অগ্নিদগ্ধ আয়োথিয়া ও সুখথাই রাজপ্রাসাদের অনুকৃতিও আছে। আছে নানান ঢংএর বুদ্ধমূর্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও বাদ যায়নি।

একবার এখানে চক্কর মারলে সমস্ত থাইল্যাণ্ডের স্থাপত্য সম্বন্ধে একটা বেশ ভালো ধারণা হয়ে যায়। বানডুঙ যাবার পথে ও এইরকম একটা মিনিয়েচার ইন্দো-নেশিয়া আছে।

উধম্, বেশ মজা—চারঘণ্টা এখানে ঘুরলে, থাইল্যাণ্ডের স্থাপত্য দর্শন হয়ে যায় আর তিন ঘণ্টা রোজ গার্ডেনে প্রোগ্রাম দেখলে থাই কৃষ্টির মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যায়। তার মানে হচ্ছে—এই সাতঘণ্টা, তার সঙ্গে যদি পাঁচঘণ্টা যাতা-য়াতের জন্য ধরি, ম্যাসাজ পার্লারে এক ঘন্টা মোট হলো তেরো ঘণ্টা আর বাকি এগারো ঘণ্টা যদি এক সুন্দরী এসকর্ট গার্লের সঙ্গে কাটানো যায় তা হলে তো একদিনে তোমাদের দেশ দেখা ও মেয়েদের চুটিয়ে ভোগ করা হয়ে গেল।

মুচকি হেঁসে বললো, তা অবশ্য ঠিকই। অনেক আমেরিকান তাই করে, অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে। দেখা তো হলো, এবার চলুন।

—চল।

গাড়িতে যেতে যেতে ভাবছিলাম, আমেরিকানদের তো সবই ফাস্ট—ফাস্ট লাইফ, ফাস্ট ড্রাইভ, ফাস্ট সেক্স, ফাস্ট ফুড্ সবই 'কুইক'। এ রকম বন্দোবস্ত থাকলে একদিনেই দেশ দেখা হয়ে যাবে ওদের। সব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করলে কি জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়—কি খাওয়ায়, কি পর্যটনে, কি রমণে? সব কাজই রমনীয় হয় যদি তা দীর্ঘসময় ধরে মনন্ করা যায়। হয়তো আমেরিকানরা বলবে, এই জন্যেই তো এতদিনেও ভারতের বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। আমি বলি, তাহলে জাপানিরা কি করে এত উন্নতি করলো। ওরা উৎপাদন করে তাড়াতাড়ি কিন্তু তার গুণগত মান থাকে সকলের উঁচুতে। খাবার স্বাদ সম্পূর্ণরূপে পাবার জন্যে চাই পরিবেশ, যেখানে সময় বাঁধা পড়বে না ঘড়ির কাটায়, তার জন্যে ওরা যায় গাইসাদের ঘরে। পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে হাতে সাকে নিয়ে, পাশে থাকে সৌন্দর্য পিপাসী একদল নির্বাক বন্ধু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে চা বানানো দেখা ও চা খাওয়া জাপানিরাই উপভোগ করে। কিমনো পরা যে সুন্দরী মেয়েটি চা বানায়, তার কাছে ওটা একটা আর্ট, যা শিখতে ও অন্তত পক্ষে ছটি বছর কাটিয়েছে। যখন ওরা বাগান করে, তখন আমেরিকানদের মত ফুলশুদ্ধ টব কিনে আনে না নার্সারি থেকে, যত্ন নিয়ে, ধৈর্য ধরে কয়েক বছরের

চেষ্টায় বানায় বনসাই। জাপানিরাই আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ।

—কী চুপ হয়ে গেলেন কেন? ভালো লাগলো না?

তোমাদের পুরনো স্থাপত্যে ভারতীয় প্রভাব দেখে খুব ভালো লাগলো। এ সব তো সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে না দেখলে কল্পনাই করতে পারতাম না কি রকম ছিল সেকালের মন্দিরের গঠন আর জীবন যাপন প্রণালী। ভাবছিলাম —আমেরিকানদের সব ব্যাপারে যে ফাস্টনেস, তাতে কি ওরা আনন্দ পায়, না ওরাও একটা যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে?

—মুচকি হেঁসে বললো, ওরা যান্ত্রিক।

—তুমি জানলে কি করে?

—আমি এক সময় তো আমেরিকান টুরিস্টদের সঙ্গে ঘুরেছি। আপনার মত এই রকম সংযত টুরিস্ট বড় একটা দেখিনি। আপনার সঙ্গে ঘোরার একটা আনন্দ আছে। মাঝে মাঝে ডাকলে খুশি হবো। ডাকবেন তো? বলে হাতটা চেপে ধরে রইলো।

নরম হাতের স্পর্শ ভালোই লাগছিল, তবুও ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, নিশ্চয়।

—কি করে ডাকবেন? আপনার বান্ধবী জানলে ভীষণ রাগ করবে।

—তাকে জানাবো না, তা হলেই তো হবে।

—যাক গে।

ব্যাংকক শহরে গাড়ি ঢুকছে, নিউ রোড দিয়ে চলেছে। গম্ভীর হয়ে উধম বললো, তা হলে এখানে আমাকে নামিয়ে দিন।

—না, তোমায় বাড়িতেই পৌঁছে দেবো।

বাড়ির কাছে পৌঁছে ওকে ধন্যবাদ দিয়ে ওর হাতে জোর করে পাঁচশো বাট গুজে দিলাম।

—এ-পয়সাটা না দিলেও পারতেন। থ্যাঙস্ এ লট্। খাপ্ খুন্ খ্রাপ।

হাত ঝাকুনি দিয়ে বললাম, আবার দেখা হবে।

॥ ৫৪ ॥

প্রসার্টের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। ওর সঙ্গে একটু কাজও ছিল। অফিসে যাওয়ার পথে ওর অফিসে গেলাম।

ওর রিসেপশনিস্ট্ হেঁসে স্বাগত জানিয়ে বললো, অনেকদিন পর আপনাকে দেখছি। আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি এখান থেকে চলে গেছেন। ভালো আছেন তো?

—ভালোই আছি। তোমার মেয়ে কেমন আছে?

—ও তো আমেরিকায় পড়ছে।

—কি করে পড়াচ্ছো? অনেক টাকার ব্যাপার তো।

—এলিমনির টাকায় পড়াচ্ছি।

—তোমার ডাইভোর্স হয়ে গেছে শুনে খুব দুঃখিত।

—দুঃখিত হবার কি আছে। বড্ড সন্দেহবাতিক ছিল ওর।

—তা তো থাকতেই পারে। এরকম সুন্দরী বৌ থাকলে আমারও সন্দেহবাতিক হতো।

—খুব হয়েছে। আমার খুব ইণ্ডিয়ান খাবার খেতে ইচ্ছে করে। খাওয়াবেন?

—যেদিন বলবে। ফোন করে একদিন চলে এসো।

—আপনার একা বাড়িতে কি করে যাই? অফিসে সবাই তা হলে ঢাক ঢোল নিয়ে রাস্তায় নামবে।

—তা হলে একদিন এসো রেস্তোরাঁয়ই খাইয়ে দেবো। তুমি ফোন করো যেদিন যাবে। প্রসার্ট আছে?

—এক্ষুনি এসে পড়বে। আমি কফি এনে দিচ্ছি। তা হলে যাবো, বলে হাসলো। প্রসার্ট এসেই আমাকে হৈ হৈ করে টেনে নিয়ে গেল ওর ঘরে।

—আমার চিঠি পেয়েছো।

—কিসের চিঠি?

—আসছে শনিবার আমার বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ। অফিসের অনেককে বলেছি, বাইরেরও দু-একজন থাকবে। চিঠি পেয়ে যাবে। এসো কিন্তু।

—নিশ্চয় যাবো। চিঠি না পেলেও যাবো।

—তারপর বল কি খবর? কি রকম এনজয় করছো? কাজ যে ভালো করছো তা তো জানি, সে জন্য তোমায় কনগ্রাচুলেসান।

—থ্যাংক ইউ। খবর আর কি। এনজয় করছি খুবই, তবে এক একজন এক একরকম জিনিস এনজয় করে কেউ খাওয়া, কেউ খেলা, কেউ দেশ দেখা, কেউ বই পড়া।

—আরে আসল জিনিসটাই তো বাদ দিলে। ওটা যদি কেউ এনজয় না করে তা হলে সামথিং রঙ উইথ হিম। ফ্রয়েড তো বলেছে সব জিনিসের উৎস হচ্ছে একটাই। যাক ওসব কথা পরে হবে। কি জন্য এসেছো বল?

—আপনাদের এ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুসান ব্যবসা নাকি ভালো চলছে না?

—ঠিকই শুনেছো।

—এত বহুতল বাড়ি হচ্ছে, কণ্ডোমিনিয়াম হচ্ছে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর হচ্ছে, এস্টেট হচ্ছে সব আমেরিকান প্যাটার্নে, সবটাতেই তো এক্সট্রুডেড্ সেক্সানের জানলা দরজা, তা হলে তো চাহিদা বেড়েই যাওয়া উচিত।

—তা বাড়ছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচারারও অনেক বেড়ে গেছে। আমার ব্যবসার সঙ্গে তোমার ব্যবসায় তো কোনও সম্পর্ক নেই।

—তা নেই। শুনলাম, আপনি বেশ কিছু লোক ছাটাই করবেন।

—করতে বাধ্য হবো। করার আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু না করে উপায় নেই।

—ছাটাই করলে কারখানায় স্ট্রাইক হবে না? ইউনিয়ান ঝামেলা করবে না?

—স্ট্রাইক করবে না। লেবার ডিপার্টমেণ্টে আমাদের অবস্থা বিশদভাবে জানাতে হবে। ওরা ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সামনে আমাদের জেরা করবে। প্রমাণ করতে হবে কেন আমরা ছাটাই করছি, ছাটাই করলে কি করে প্রতিষ্ঠানটা বাঁচবে। তাতে ওরা রাজি হবেই। তখন তিন মাসের মাইনে ও অন্যান্য বেনিফিটের টাকা দিয়ে বেচারাদের বিদায় করতে হবে। এতদিন কারখানা চালাচ্ছি, শুধু লোক নিয়েই গিয়েছি। কখনও ছাটাই করিনি, এই প্রথম করতে যাচ্ছি। খুব মনটা খারাপ। তোমাকেও ছাটাই করতে হবে নাকি?

—না, না, আমি কাউকে ছাটাই করবো না। তবে প্রথাটা জানা থাকা ভালো।

ব্যাংকক থেকে প্রায় মাইল আণ্টেক দূরে প্রসার্টের বাড়ি, সমুথ প্রাকনের পথে। সমুথ প্রাকনের কাছেই ওদের কারখানা। অনেকটা জায়গা নিয়ে প্রাসাদোপম দ্বিতল বাড়ি, সুন্দর সবুজ লন, ধারে ধারে বিলিতি ফুলের কেয়ারি। অফিসের ও কারখানার সুপারভাইজার লেভেল অবধি সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে, স্ত্রী অথবা স্বামীসহ।

ওর কারখানার ম্যানেজার সুতীপন এসে ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সুতীপন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। থাকতো হস্টেলে, মুখ বদলাতে প্রায়ই পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় যেতো, আর বিকেল বেলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, না হলে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকতো।

আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সে, বি. কম পাশ করেছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভদ্রলোক কমার্স নিয়ে পাশ করেছে অথচ বিলাতি মেশিনের ছবি দেখে দেখে নিজে মেশিন বানিয়ে রঙিন ভেনিসিয়ান ব্লাইণ্ড তৈরি করে খুব ভালো ব্যবসা করছে এক চিনা-থাই-পার্টনারের সঙ্গে। প্রসার্টের দুই ছেলেই অস্ট্রেলিয়া থেকে ছুটিতে বাড়ি এসেছে। ওদের কলেজ এখন বন্ধ।

প্রসার্টের স্ত্রী ইংরেজি বলতে পারে না। মহিলা সুন্দরী না হলেও বেশ গ্রেসফুল। উনি তদারকি করে সবাইকে ড্রিংক দেওয়ালেন।

এরপর যার সঙ্গে আলাপ হলো তার নাম হলো ডাঃ মিচাই বিদ্যাভদ্র। উনি হলেন স্বাস্থমন্ত্রী। দেখতে একদম সাহেবের মত। পরে জেনেছিলাম ওঁর বাবা থাই, ইংরেজ ওর মা। উনি দেশের জন্ম নিয়ন্ত্রণে কৃতকার্যতার জন্যে ওয়ার্লেড হেলথ অরগানাইজেসান থেকে বিশেষ সম্মান পেয়েছেন, যেমন পেয়েছেন আমাদের দেশে ক্যুরিয়ান, হোয়াইট রিভলিউসনে (দুগ্ধ পরিকল্পনায়)। এখানে কনডমের নামই হয়ে গেছে মিচাই। ভদ্রলোক বিশেষ বিশেষ দিনে পতপঙের রাস্তায়, বারে, ম্যাসাজ পার্লারে গিয়ে বেলুনের মত কনডোম ফোলান আর বোঝান এর প্রয়োজনীয়তা। বারের টেবিলে টেবিলে সাজিয়ে দেন নানান রঙের কনডমের ফুল।

প্রসার্ট বললেন, জানো অতীশ, এখানে যে ভালো ভালো ডাক্তার তৈরি হয়েছে, ভালো ভালো অত্যাধুনিক হাসপাতাল হয়েছে যে সবই এই ডাঃ মিচাইর জন্যে।

আমি বললাম, আপনার নাম তো দেশের বাইরের লোকেরাও জানে, জন্ম-নিয়ন্ত্রনে আপনার প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্যে। জনসংখ্যার হার এখন কত ?

ডাঃ মিচাই বললেন—বছরে শতকরা দুই। আগে ছিল তিন। এটাকে একে নামিয়ে আনতে হবে। আপনাদের দেশের সবচাইতে বড় সমস্যা তো এটাই, অথচ এ সমস্যাটাকে আপনারা সেরকম একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

—দেওয়া হচ্ছে না বললে, ভুল বলা হবে। আমাদের সমস্যা হলো—প্রথমত অশিক্ষিতের হার শতকরা পঞ্চাশের বেশী, আর আপনাদের দেশে প্রায় সবাইই লিখতে পড়তে জানে। দ্বিতীয়ত আমাদের দেশের ক্যাথলিক ও মুসলমানেরা ধর্মের নামে জন্ম নিয়ন্ত্রন করে না। আপনাদের এ বাধাটাও নেই। তৃতীয়ত আমাদের দেশটা তো একটা মহাদেশ, ওখানে দেশজুড়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে গণ আন্দোলন দরকার। সে তুলনায় আপনাদের দেশটা খুবই ছোট।

—তা হলে দুধের ব্যাপারে ক্যুরিয়ান কি করে সাফল্য লাভ করলো ?

—উনি কয়েকটা কো-ওপারেটিভ সুচারুভাবে চালিয়ে তার প্রসার ঘটিয়েছেন। তার ফলে সভ্যদের যে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, সেটা তো চোখে দেখা যায়। খুব ভালোভাব মার্কেটিংটা সংগঠিত করেছেন। জন্ম নিয়ন্ত্রনের উপকারিতা সাধারণকে বোঝানো বড় মুসকিল, বিশেষ করে যেখানে শিশু শ্রমিক রয়েছে।

—তা অবশ্য ঠিক।

প্রসার্ট বললেন, উনি আর একটা জিনিস করেছেন—বারের এবং ম্যাসাজ পার্লারের প্রত্যেক মেয়েদের হেল্থকার্ড করে দিয়েছেন। প্রতি মাসে ডাক্তাররা তাদের পরীক্ষা করে। রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করানো হয় এবং তা যতদিন না সারে ততদিন কার্ড নিয়ে নেওয়া হয়। জানো তো আমাদের দেশে প্রত্যেকের আইডেনটিটি কার্ড রয়েছে। হেল্থ কার্ড মোটামুটি সেফ্ কার্ড।

পকেটের বিফারটা বিপ্ বিপ করতেই মিচাই বেতার টেলিফোনটা তুলে কথা বললেন। তারপর প্রসার্টকে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাকে এখুনি যেতে হবে। এক বিদেশি ডাক্তারদের ডেলিগেসান এসেছে, তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি তোমাকে আগে বলিনি বলেই অল্পক্ষণের জন্য দেখা করে নিলাম। মিঃ রায় আর একদিন গল্প করা যাবে। আজ আমাকে উঠতে হচ্ছে।

মিসেস প্রসার্ট ও তার দুই ছেলে বারবার ককটেল স্ন্যাকস্ দেখিয়ে যাচ্ছে—স্ন্যাকেক রয়েছে ফিস ফিঙ্গার, ফ্রেঞ্চফ্রাই, সাথে (সিক কাবাব-বাঁশের কাঠিতে গাঁথা) ক্যাসু নাট্। প্রসার্ট মাঝে মাঝে উঠে তার প্রতিষ্ঠানের লোকদের সঙ্গে খেজুরে আলাপ করে আসছেন। মিচাই উঠে যাবার পর আমিও একবার ওদের মাঝে চক্কর মেরে এলাম।

জেসমিন অতিলক্ষণ এসে বসলো আমার পাশে।

আমি জেসমিনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামীকে তো দেখলাম না।

—না, উনি আসেননি। উনি নতুন একটা প্রজেক্ট নিয়ে খুবই ব্যস্ত।

—কিসের প্রোজেক্ট?

—ব্যাংকক জলপ্রকল্প।

—সে কি? এটা তো ওর কাজের মধ্যে পড়ে না। উনি তো শুনেছিলাম ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক সাপ্লাই বোর্ডের চেয়ারম্যান।

—সেটাই তো মুসকিল হয়েছে। যেহেতু ওনার প্রচেষ্টায় দেশের বিদ্যুত ঘাটতি ঘুচেছে, তাই প্রধানমন্ত্রী ওয়াটার বোর্ডেরও চেয়ারম্যান করেছে ওনাকে।

—সমস্যাটা কি?

—বিরাট সমস্যা। ব্যাংককের জল সরবরাহ হয় আর্টিসিয়ান ওয়েল থেকে, যেখান থেকে অফুরন্ত জল তোলা হচ্ছে আর এদিকে সব বহুতল বাড়ি হচ্ছে নরম মাটির ওপর। জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় ও ওপরে বেশী চাপ পড়ায় মাটি বসে যাচ্ছে। ব্যাংকক শহর প্রায় প্রতি বছর তিন ইঞ্চি করে বসছে। তাই উত্তরাঞ্চল থেকে জল সরবরাহ করে এই ওয়েলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে।

—এখানকার সরবরাহ করা জল তো দূষণহীন নয়; তাই তো দেখি সবাই বোতলের জল কিনে খায়। আমার তো দিনে প্রায় তিরিশ বাট খরচ হয় জল কিনতে। অফিসেও প্রায় দুশো বাট করে লাগে দৈনিক। (অফিসে অফিসে বাড়িতে বাড়িতে বোতলে পরিশুদ্ধ জল দিয়ে যায় ক্রেটে করে। খালি ক্রেট ফিরিয়ে নিয়ে যায়।)

—হ্যাঁ, এই পরিকল্পনায় পরিশুদ্ধ জল নাকি দেওয়া হবে।

—তোমাদের এখানে তো স্যুয়ারেজও নেই। সবার বাড়িতেই তো দেখি স্যানি-টারি ট্যাঙ্ক।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

প্রসার্ট বসতে বসতে স্যুয়ারেজের কথা শুনে বললেন, তোমার বাড়ির সামনের রাস্তা কি বর্ষায় ডুবে যায়?

—ও রাস্তাটা ডোবে না।

প্রসার্ট বললেন, এই আমাদের আর একটা বিরাট সমস্যা। গ্রামের লোক শহরের দিকে ছুটে আসছে, বিদেশিদের ভিড় বাড়ছে, অথচ পরিশুদ্ধ জল নেই, নিষ্কাসনের ব্যবস্থা নেই, কুইক্ ট্র্যানজিটের বন্দোবস্ত নেই, গাড়ির চাপে আধঘন্টার পথ পাড়ি দিতে এক ঘন্টা লাগে। রাস্তা প্রশস্ত করার উপায় নেই—এই নিয়েই আমরা বেঁচে আছি।

আমি বললাম, সব পুরোনো শহরেরই তো একই অবস্থা, সিঙ্গাপুর, হংকং, টোকিও, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক—সমাধান হলো টিউব ট্রেন, আর কমিউটিং চক্ররেল। আমাদের কলকাতারও এই একই অবস্থা।

মিসেস্ প্রসার্ট এসে আমাদের তাড়া দিয়ে নিয়ে গেলেন খাওয়ার জন্যে।

খাওয়ার দেওয়া হয়েছে বাগানের লনে। লম্বা টেবিলে সব খাবার সাজানো রয়েছে। ইম্‌পিরিয়াল হোটেলের তখ্‌মা আঁটা ওয়েইটাররা প্লেটে, বাটিতে তুলে দিচ্ছে।

প্রসার্ট বললেন, আমি প্রতি বছরই একবার এ রকম সবাইকে ডাকি। এতে একটা পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তোমারও করা উচিত।

আমার তো এত বড় বাড়ি নেই। আমরা তাই পিকনিক করি বছরে একবার। সেখানে কারখানার কর্মীরাও যোগ দেয় তাদের স্ত্রী/স্বামী নিয়ে। সকালে স্পোর্টস্‌ হয়, তারপর দুপুরে খাওয়া।

—তা হলে, তুমি তো আমার চাইতে এক কাঠি ওপরে। সামনের বছর থেকে তোমার আইডিয়াটাই নেবো।

মিসেস্‌ প্রসার্ট এসে জিজ্ঞেস করে গেলেন, খাবার কেমন হয়েছে। ভালো হয়েছে শুনে খুশি হয়ে চলে গেলেন অন্যদের তদারকি করতে।

বাড়িতে যখন ফিরলাম তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

॥ ৫৫ ॥

অফিস থেকে এসে অনিরুদ্ধের একটা চিঠি পেলাম। ও লিখেছে যে সরকারের আমন্ত্রণে এক ভারতীয় ডেলিগেসান যাচ্ছে চিনে। ওর বাবা, সেই ডেলিগেসানের একজন সভ্য মনোনীত হয়েছেন। যাবার পথে উনি থাইল্যাণ্ডে তিন দিন থাকবেন, এখানকার উন্নয়ণ পরিকল্পনা ও তার ফলাফল দেখার জন্যে। ইম্পিরিয়াল হোটেলে উঠবেন। ওর অনুরোধ, আমি যেন সেই তিনদিন ওনার খোঁজখবর নেই, কারণ উনি একটু অসুস্থ।

অনিরুদ্ধ কলেজে আমার সহপাঠি ছিল। ওর বাবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। সুপণ্ডিত হিসাবে যেমন সুনাম আছে, শিক্ষক হিসাবেও তেমনি। উনি প্ল্যাণ্ড ইকনমিতে বিশ্বাসী, তাই একটু বাম ঘেঁষা, পশ্চিমবঙ্গ প্ল্যানিং বোর্ডের সভ্য।

ওদের বাড়িতে প্রায়ই আড্ডা মারতে যেতাম ছাত্রাবস্থায়ই নয়, কাজে যোগ দেবার পরও। ওর বাবা বাড়ি থাকলে প্রায়ই আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতেন। এই অসম আলোচনায় ওঁর উৎসাহ দেখে, আমি আশ্চর্য হয়ে একদিন ওনাকে জিজ্ঞেস করতে উনি উত্তর দিয়েছিলেন, এই প্রজন্মের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে মনটা যে বুড়িয়ে যাবে। গেলেই মাসীমা কিছু না কিছু, না খাইয়ে ছাড়তেন না। মা কলকাতায় না থাকলে ওখানে ডিনার না সেরে আসার উপায়ই ছিল না।

পত্রপাঠ অনিরুদ্ধের বাড়িতে ফোন করলাম। মেসোমশায়কে আমার এখানেই উঠতে বললাম। মাসীমা শুনে খুব খুশি আর নিশ্চিতবোধ করলেন। কয়েকদিন

পরই মেসোমশায় এলেন। আমি গিয়েছিলাম ওনাকে আনতে।

গাড়িতে আসতে আসতেই বললেন, কত বদলে গেছে। চেনাই যায় না। কুড়ি বছর আগের ছোট্ট টারমিনাল বিল্ডিং এর জায়গায় কী সুন্দর বিরাট টারমিনাল বিল্ডিং। কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্সে বেশিক্ষণ তো দাঁড়াতেই হলো না লাইনে। এ যে দেখছি আমেরিকান হাইওয়ে হয়ে গেছে। কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে নিউ ইয়র্কে ঢুকতেও তো এত সুন্দর রাস্তা দেখা যায় না। তা, তোমার কেমন লাগছে বলো?

—খুব ভালো। অভাব দুটোর, একটা হচ্ছে আড্ডা আর মা বাবার অনুপস্থিতি।

—মা বাবাকে আনিয়ে নাও।

—ওঁরা এসেছিলেন। এক মাস থেকেই চলে গেলেন, বোনের অপারেশান হবে বলে।

—তোমার বাড়িতে যে উঠবো, তাতে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না তো?

—আপনার একটু অসুবিধা হতে পারে, আমার নয়।

—আমার কী অসুবিধা আবার? সন্ধ্যার পর বরং তোমার সঙ্গে গল্প করা যাবে। হোটেলে থাকলে তো সন্ধ্যার পর সময় কাটতে চায় না।

—আমার সঙ্গে গল্প করলে কিন্তু আপনার মতামত পাল্টে যাবে।

—তা কেন?

—পরেই জানতে পারবেন।

—অনিরুদ্ধ, ওর ছেলে, মাসীমা সব কেমন আছেন?

—সব ভালো আছে।

—আপনার শরীর নাকি সুস্থ নয়?

—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। কয়েকমাস আগে একটু হার্টের ব্যথা হয়েছিল, তা নিয়ে সবাই চিন্তিত।

—আপনার প্রোগ্রাম কী?

—কাল আর পরশু সকালে বের হবো আর ফিরবো সন্ধ্যায়।

আমার বাড়ি দেখে খুব খুশি। পিয়ালীর সেবায় মুগ্ধ।

—এ যে তুমি সেবাদাসি পেয়ে গেছ এ দেশে। এত সুন্দর ফুলকো লুচি বানিয়েছে। চা খেয়ে চল একটা চক্কর লাগিয়ে আসি।

—আপনি না অসুস্থ! আজই এলেন, আবার এখন বের হবেন?

—অসুস্থ, অসুস্থ করো না তো। মানুষ একবারই মরে। ভীরুরা অনেকবার মরে। চল তো।

—চলুন।

প্রথমে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে নিয়ে গেলাম। ওনার জন্য একটা সার্ট কিনলাম।

সব দেখেশুনে মন্তব্য করলেন, আরে বাব্বা! এ যে আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে

গেছে হে।

তারপর ফুডল্যাণ্ডে গেলাম, আমার ডিম, সসেজ আর চা কেনার ছিল।

—দেশটার তো দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে। লুম্পিনী পার্কে ঘুরিয়ে রাজ ডামরি রোড দিয়ে গিয়ে ইন্দ্র হোটেলের পাশ দিয়ে রেল লাইন পার হয়ে, বাঁদিকে ঘুরে রাজার বর্তমান প্রাসাদ, সুয়ান পাককার্ড প্যালেস ছাড়িয়ে, পিয়া থাই রোড দিয়ে ভিকটরি মনুমেণ্ট দেখিয়ে, বাঁদিকে ঘুরে চিত্রালাদা প্যালেসের পাশ দিয়ে পার্লিয়ামেণ্ট হাউজ, সরকারি দপ্তর দেখিয়ে রাজা ডামরান এ্যাভেনিউ, রামা ফোর রোড, সিলম্ রোড দিয়ে পতপঙ্গকে ডান দিকে রেখে সাথর্ণ রোড, ওয়ারলেস রোড ঘুরে বাড়ি ফিরে এলাম।

—আমি এর আগে যখন এসেছিলাম এসব জায়গায় তো ধানক্ষেত ছিল। পথে তো ক্লঙ্গ (খাল) দেখলামই না। সব গেল কোথায় ?

—ও সব খাল বুজিয়েই তো রাস্তা হয়েছে।

—নতুন বাড়িগুলির আরকিটেকচারাল ফিচারও বেশ সুন্দর। রাস্তায় যানযট থাকলেও সবাই দেখলাম নিয়ম মেনে চলে। ধৈর্য ধরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে সবুজ আলো না জ্বালে পর্যন্ত। কেউ হর্ন দিয়ে নয়েজ পলিউসান করছে না। ভাবছি, আমরা কেন এ রকমটা পারছি না ?

—আমরা যে পুলিশকে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের পুতুল বানিয়ে রেখেছি আর আপনারা তো সব জায়গায় ইউনিয়ান করেছেন—কলেজে ইউনিয়ান, বাসের ইউনিয়ান, লরির ইউনিয়ান। তাদের শাস্তি দিলেই তো ধর্মঘট। এ গণতন্ত্রের আর এক নাম মাৎস্যন্যায়।

মেসোমশায় আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলেন।

—তুমি তো ওখানেও কাজ করেছ, এখানেও কাজ করছো, তফাৎ কী দেখছো ? এখানে কী ইউনিয়ান নেই ?

—আছে, তবে এদের মার মার কাট্ কাট্ ভাব নেই। এখানে লোক ছাঁটাইর দরকার হলে তা অনায়াসেই করা যায়। কাজ না করে বসে বসে কেউ পয়সা পায় না, যেমন পায় আমাদের দেশের সরকারি সংস্থায় বা সরকারি অর্থে পরিচালিত রুগ্ন সংস্থায়। সরকারি কর্মচারিরাও একটা নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে। ব্যাঙ্কগুলি সব কম্পিউটারাইজড, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার ব্যালেন্স জানিয়ে দেবে, আর আমাদের দেশে পাস বই রেখে আসতে হবে,তার পরদিন আবার যেতে হবে সেই পাস বই আনতে। দুদিন দেখুন, তারপর বুঝতে পারবেন তফাৎটা কোথায়।

—এখন অবশ্য মাঝে মাঝে ভাবি, কোনটা ঠিক পথ—সরকারি দখলানা, না ব্যক্তিগত দখলানা। সরকারি সংস্থা পৃথিবীর কোথাও ঠিকমত চলছে না। তাদের উদ্ভাবনা শক্তি নেই, উদ্যম নেই, গুণগত মান উন্নতির প্রচেষ্টা নেই, ক্রমাগত উৎপাদকতা বাড়াবার প্রচেষ্টা নেই।

—এর মধ্যেই মত পরিবর্তন করে ফেলবেন না। চলুন খেয়ে নেই।

খেতে খেতে বললেন, এ যে একেবারে বাড়ির রান্না। অপূর্ব। কে শেখালো ওকে রান্না?

—কিছুটা আমি আর কিছুটা মা শিখিয়ে গিয়েছিল। মেয়েদের ইচ্ছে থাকলে শিখতে সময় লাগে না, একবার দেখলেই শিখে নেয়। কাল প্রথমে কোথায় যাবেন?

—নটার সময় এপয়েন্টমেন্ট আছে ইকনমিক ও সোসাল ডেভালপমেন্ট বোর্ডের এক মেম্বারের সঙ্গে।

—ওরা কী গাড়ি পাঠাবে?

—গাড়ি তো পাঠাতে বলিনি।

—আমার গাড়িটা দিয়ে দিচ্ছি। গাড়িটা আপনি ছাড়বেন না। আমার ড্রাইভার ইংরেজি বোঝে আর কিছু বলতেও পারে।

—তোমার অসুবিধা হবে না?

—আমি আর একটা গাড়ি নিয়ে নেবো।

পরের দিন সন্ধ্যায় দুজনে বসেছি গল্প করতে।

মেসোমশায় খুব উৎসাহ নিয়ে বললেন, সত্যি এদের গত কুড়ি বছরের উন্নতি দেখার মত। সবচাইতে যেটা আমাকে ইমপ্রেস্‌ করেছে সেটা হলো এদের গ্রামীণ উন্নতি। সবাই শিক্ষিত, সবাই পরিচ্ছন্ন। দেখলেই মনে হয় ভাত কাপড়ের অভাব নেই কারও।

—এরা যে প্রথমেই গ্রামের উন্নতির দিকেই নজর দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা এদের বাধ্যতামূলক, তার ফলে আজ সব মেয়েরাই লিখতে পড়তে জানে। আমাদের পিয়ালীও যেমন জানে লিখতে তেমনি ঝাড়ুদার বৌটিও জানে। চাষের, মৎস্য চাষের, সামুদ্রিক মাছ ধরার ব্যাপারে, মুরগী, হাঁস পালনে দারুণ উন্নতি করেছে। এরা প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্য, মুরগীর মাংস, সামুদ্রিক মাছ প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করে।

—আমাদের গ্রামেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। চোখে পরে না সংখ্যার চাপে।

—ঠিক বলেছেন। এদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে জন্মের হার শতকরা তিন থেকে নেমে এক দশমিক পাঁচ।

—সেটা সম্ভব হলো কী করে, তুমি জানো?

—প্রথমত মেয়েরা শিক্ষিত, দ্বিতীয় ডাঃ মিচাইর অক্লান্ত প্রচেষ্টা আর তৃতীয়ত ধর্মের বাধা নেই, এরা মঠের সন্ন্যাসীদেরও ব্যবহার করেছে গ্রামোন্নয়নের কাজে। নিঃস্বার্থভাবে পরের সেবা করাই তো সন্ন্যাসীদের ধর্ম, তাই গ্রামবাসিরা সুবিচার পায়। এসব কাজের প্রধান অনুপ্রেরণা রাজার। রাজার স্বার্থ প্রজার শ্রদ্ধা, অর্থ নয়। ইলেকসনে তাঁকে দাঁড়াতে হয় না, তাই তাঁকে অর্থও সংগ্রহ করতে হয় না চোরাপথে।

—আমি অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে এদের আমদানি রপ্তানির চাইতে বেশী

কিন্তু বিদেশি মুদ্রাসঞ্চয় দিন দিন বেড়েই চলেছে।

—সেটা সার্ভিস ইণ্ডাস্ট্রিজের জন্যে, বিশেষ করে বহিরাগত যাত্রীদের থেকে বিদেশি মুদ্রাঅর্জনের ফলে। জানেন বছরে এখানে কত টুরিস্ট আসে—পঞ্চাশ লক্ষ আর আমরা কুড়ি লক্ষ বিদেশিকেও টেনে আনতে পারি না।

—কিসের টানে এত বিদেশি আসে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, না বহু পুরোনো স্থাপত্য, না অন্য কিছু?

—অন্য কিছুর আকর্ষণ হয়তো আছে কিন্তু অন্য আকর্ষণও আছে। এখানে টুরিস্টদের মনরঞ্জনের জন্য যেমন অনেক কিছু আছে, তেমনি অন্য দেশের চাইতে অনেক সস্তায় সুখস্বাচ্ছন্দ পাওয়া যায়—সস্তায় ভালো হোটেল, সমুদ্রের ধারে নানান রকম ওয়াটার স্পোর্টস, যাতায়াতের জন্য সুন্দর রাস্তা, গল্ফ, টেনিস, কোথায় আছে আমাদের দেশে এ রকম বন্দোবস্ত? তাছাড়া আর একটা সুবিধা উত্তরে চিয়াংমাই থেকে দক্ষিণে ফুকেট পর্যন্ত প্লেনে যেতে লাগে তিন ঘণ্টা আর আমাদের দেশে দ্রষ্টব্য স্থানগুলো অনেকটা দূরে দূরে ছড়ানো। সাতদিনে থাইল্যাণ্ড বেশ ভালোভাবে দেখা হয়ে যায়, আমাদের দেশে এক মাসেও তা দেখা শেষ হয় না।

—ঠিকই বলেছো' তবে আমরাও তো এক একটা সেকটার ডেভেলাপ করতে পারি এবং যে ভাবে প্যাকেজ টুরের ব্যবস্থা করতে পারি?

—সেই প্যাকেজ টুর হয়তো আছে, কিন্তু তার প্রচার কোথায়? এদের প্রচার ব্যবস্থা খুব ভালো, যেটা আমাদের একেবারেই নেই।

পরের দিন উনি যাবেন বিঃ ও আই (বোর্ড অব ইনভেস্টমেণ্ট) অফিসে, তারপর দেখবেন একটা ইণ্ড্রাস্ট্রিয়েল এস্টেট প্রভৃতি।

উনি সন্ধ্যায় ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন।

আমি চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, শরীরটা কী খারাপ লাগছে?

—বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। একটু শুয়ে থকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

—বুকে ব্যথা হচ্ছে না তো?

—তা হচ্ছে না, তবে একটু হাফ ধরছে। মাথাটাও ঝিম্ ঝিম্ করছে। মনে হয় গ্যাস্ হয়েছে।

আমার কাছে লিকুইড জেলুসিল ছিল, তাই দিয়ে বললাম, একটু শুয়ে থাকুন। আমি পর্দাগুলি টেনে দেই।

ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করে স্নান করে উনি বেশ চাঙ্গা হয়ে বাইরের ঘরে বসে পিয়ারীকে বললেন, এক কাপ চা দিতে।

আমি পিয়ালীকে বললাম—শুধু চা না দিতে।

পিয়ালী খাউ মাউ (চিড়া) আর বাদাম ভেজে দিল চায়ের সঙ্গে।

—এখানে চিড়া ভাজা পাবো কখনও ভাবিনি। তোমার তো তা হলে খাবারের কোনই অসুবিধা নেই?

—না, তা নেই। আজ কোথায় গিয়েছিলেন?

—বি ও আইতে গিয়ে জানলাম যে এই ছোট্ট দেশে গত বছর চারশো কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে বিদেশিরা। আমাদের দেশ থেকে তো ওরা টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, বিনিয়োগ তো দূরের কথা।

—তা তো হবেই। এত সরকারি বজ্র আটুনির মধ্যে কে ব্যবসা করবে। বিদেশি বিনিয়োগের জন্যে এরা দরজা খুলে রেখেছে, নানান সুবিধা দিচ্ছে, আর আমরা সে দরজা বন্ধ করে আত্মনির্ভর হতে চাইছি।

—জাপানে ও তো বিদেশি সংস্থার বিনিয়োগ নেই?

—তা নেই কিন্তু ওরা বিদেশের নতুন নতুন টেকনলজি এনে তাকে আরও উন্নত করে নিজেদের প্রচেষ্টায় তার কোয়ালিটি ভালো করে সস্তায় বিদেশে রপ্তানি করে। আমরা কি তা করি? আমরা নিম্নমানের জিনিস বানিয়ে দেশের বাজারে বিক্রি করি। জাপানিরা সবাই জানে যে রপ্তানি না করতে পারলে ওরা বাঁচতে পারবে না। সামুরাইদের রক্ত বইছে ওদের মধ্যে। ওদের সঙ্গে কারও তুলনা করা চলে না।

—আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম ওদের জাতীয় উৎপাদনের মূল্য প্রতিবছর দশ প্রতি শতক হিসাবে বাড়ছে, সে তুলনায় আমাদের পাঁচ।

—আমার তো মনে হয় মেসোমশায়, নেহেরু প্রথম থেকেই ভুল করেছেন—পরাধীন মানুষকে আইন শৃঙ্খলা মানতে শেখাননি, প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেননি, প্রস্তুতি ছাড়াই গণতন্ত্র স্থাপন করেছেন, জন্মনিয়ন্ত্রনের প্রচার চালাননি, ভারি শিল্প সরকারি আওতায় গড়ে আত্মনির্ভর হতে গিয়ে গ্রামোন্নয়ন হয়নি। আমরা রাশিয়াকে অনুসরণ করতে গিয়েই বোধহয় ভুল করেছি।

—যে সব দেশ আমেরিকার তাবেদারি করেছে, যেমন দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি—ব্রাজিল, মেক্সিকো, পাকিস্থান, তাদের অবস্থা তো আমাদের চাইতেও খারাপ। মেক্সিকোতে একটি দলের একনায়কত্ব চলছে। ওদের সাতহাজার কোটি ডলার বিদেশী ধার। প্রতি মাসেই দ্রব্যমূল্য বাড়ে কয়েক শো করে। মেক্সিকো সিটিতে সবচাইতে বড় বস্তি। আসলে আমরা মানুষ তৈরি করতে পারিনি।

উত্তেজিত হয়ে আরও বললেন, আমেরিকানদের উস্কানিতে পাকিস্থানের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধ হওয়ায় আমাদের ডিফেন্সের খরচা বড্ড বেশী, যেটা থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান আর তাইওয়ানকে করতে হয় না। জাপান তার বাজেটের এক শতাংশও খরচ করে না ডিফেন্সের জন্যে, যেখানে আমাদের করতে হয় প্রায় তেরো চোদ্দ অংশ।

একটু থেমে বললেন, চিনে গিয়ে দেখি ওরা কী করছে?

—ডেঙ্গ তো ক্রমশ খোলা বাজারি অর্থনীতির দিকে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, শুনেছি। কালেকটিভ ফার্মিং উঠিয়ে দিচ্ছে, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য দ্বিতীয় হংকং তৈরি করছে।

খুব হতাশার সঙ্গে বললেন, এতদিনের বিশ্বাস ভাঙতে বসেছে। জানি না এসব কমিউনিস্ট দেশগুলো টিকতে পারবে কিনা?

মেশোমশায়ের মনে এক সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে।

পরের দিন উনি চলে গেলেন, এক সংশয় নিয়ে।

॥ ৫৬ ॥

সেদিন বাড়ি ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেছে। শোবার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম, খাটে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে নেত্রা। আমি আর ঘুম ভাঙালাম না। শরীরের ঘড়ি এখনও অস্ট্রেলিয়ার সময়ে বাঁধা। ঘণ্টা তিনেক আগে নাকি এসেছে।

ঘুম ভাঙলে লজ্জা পেয়ে বললো, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে ডাকোনি কেন? খুব অবাক হয়েছো আমাকে দেখে, তাই না?

—তা তো হয়েইছি। চলে এলে যে বড়?

—মনটা যে এখানে পড়ে আছে। মন ছেড়ে কি শরীর বাঁচে?

—বাবা আপত্তি করেনি?

—তা আবার করেনি? আমি আগে থেকেই তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবাকে সেকথা জানাইনি।

—তুমি এখানে সোজা চলে এলে যে?

—কোথায় যাবো ভেবেছিলে?

—এ কয়দিন কী এখানেই থাকবে নাকি।

আমাকে জড়িয়ে ধরে, হ্যাঁগো মশাই। তোমার আপত্তি থাকলে, চলে যাবো।

—আপত্তি থাকবে কেন? আমার তো ভালই। তুমি ছিলে না, আমার তো সময়ই কাটছিল না।

—তোমার মা বাবার চিঠি এসেছে?

—পৌঁছন-সংবাদ তো জেনেই গিয়েছিলে। তোমাকে বাবা একটা চিঠি লিখেছে।

—আমার চিঠি দাও। তুমি পড়নি তো? পরের চিঠি পড়তে নেই।

—তুমি বুঝি পর।

—এখন পর্যন্ত।

চিঠিটা ও পড়লো দু তিনবার। পড়তে পড়তে ও হাসছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—কী লিখেছে?

—পড়ে দেখো, আমার কত প্রশংসা করেছে।

ওর সুখ্যাতি, এখানে কাটানো আনন্দময় দিনগুলির সুখস্মৃতি বর্ণনা করে

শেষ করেছেন—শীত পড়লেই তোমাদের দুইটি হাত মিলাইয়া দিবার ইচ্ছা আছে। সেই আনন্দের দিনগুলি কল্পনা করিয়াই আমাদের বুড়ো বুড়ির সময় কাটিতেছে।

—এই, দরজাটা বন্ধ করে এসো।

—দরজা বন্ধ করে কী হবে? বাড়িতে তো শুধু রয়েছি আমি আর তুমি। আরও দুজন আছে অবশ্য।

—আর দুজন আবার এলো কোথা থেকে?

—ঐ দেখো, জানলার ওপর কিচির-মিচির করছে দুটো চড়াই পাখি।

ও হেসে—দেখো ওরা কখনও কথা বলছে, আবার মাঝে মাঝে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খাচ্ছে।

ও একপাশে সরে গেল, আমাকে জায়গা ছেড়ে।

অব্যবহারে মনোবীণার তারগুলি বেসুরো হয়ে গিয়েছিল। ভালোবাসার অনুভূতি দিয়ে যখন তাতে দুজনে মিলে সুর বাঁধলাম, তখন সেই বীণায় নানান সুরের দ্বৈত সঙ্গীত বেজে, ভরিয়ে দিল মন প্রাণ। অতীতের অন্ধকার দিনগুলো ডুবে গেল বর্ত্তমানের হাসি খুশিতে আর ভবিষ্যতের সোনালী সকালের দিশারায়।

পিয়ালী যখন চা নিয়ে এলো, তখনও আমরা গল্প করছি—দেশে গেলে ওকে নিয়ে কোথায় কোথায় যাবো আর কি কি দেখাবো।

—আমি কিন্তু মাকে সঙ্গে নেবো।

—মাকে নিলে বাবাকেও নিতে হবে।

—তা তো হবেই।

—তা হলে আর হানিমুন্ হবে না।

—সেটা আগে সেরে নেবো। তারপর বেড়াবো।

—আমার মাকে বুঝি তোমার খুব ভালো লেগেছে?

—আমার মা থাকলেও বোধহয় এত স্নেহময়ী হতো না। আমার মা আধুনিক শহরের মানুষ, অনেক বছর কাটিয়েছিল পাশ্চাত্য পরিবেশে।

—ও রকম পরিবেশে থাকলে বুঝি স্নেহশীলা হয় না?

—হলেও, এত ভাস্বর হয় না, একটা কৃত্রিম আবরণে ঢাকা থাকে। তোমার মা প্রকৃতির কোলে মানুষ. সেখানে স্নেহ, ভালোবাসা আবরণহীন। তাই তোমার মাকে এত ভালো লাগে।

সন্ধ্যার পর ভাসনা এসেছে।

—নেত্রা, এটা তোর অন্যায়। সোজা চলে এলি, আঙ্কল-আণ্টি আসেনি বুঝি? ওরা আসেনি শুনে বললো, তা হলে তো তুই এখানেই থাকছিস?

ও উত্তর দিল না, শুধু আমার মুখের দিকে তাকালো একবার। আজ চলি, বলে স্যুটকেসটা নিয়ে উঠে পড়লো।

আমি বললাম, তুমি যে বললে, থাকবে।

—না। ভেবে দেখলাম, থাকাটা ঠিক হবে না। কাল আবার আসবো।

॥ ৫৭ ॥

নেত্রা রোজই সন্ধ্যায় আসে। খেয়ে দেয়ে গল্প করে চলে যায়। আর দুদিন পর ওর মা বাবা আসছে। এ দুটো দিন আমরা কাছে কাছে থাকবো ঠিক করেছি। কাল যাবো কাওয়াই নদীর ব্রিজ দেখতে। আমি সিনেমাটা দেখেছি, কিন্তু আসল জায়গাটা দেখা হয়নি। নেত্রা কোনওটাই দেখেনি।

ও এসে পিয়ালীকে বললো, ছোট স্যুটকেশটা বের করে দাও তো।

আমি বললাম, স্যুটকেস দিয়ে কি হবে?

—একপ্রস্থ জামা কাপড় নিয়ে নেই। আমিও এনেছি। শুনেছি, ওখানে নদীর ওপর হোটেল আছে। ভালো লাগলে থেকে যাবো।

—আমি বাপু, তোমাকে নিয়ে আর কোথাও থাকবো না। চিয়াংরোইর বিভীষিকা আমি ভুলতে পারি না।

—নিতে তো কোনও আপত্তি নেই। ভালো না লাগলে, থাকবো না।

নেত্রা রোড ম্যাপ দেখিয়ে বললো, ব্যাংকক থেকে উত্তর পশ্চিমে পঁচাত্তর মাইল গেলে আমরা পেঁছবো একটা ছোট্ট শহরে, কাওয়াই নদীর ধারে, কাঞ্চনবুড়ি। ঐখানেই সেই বিখ্যাত ব্রিজটা, বর্মা আর থাইল্যাণ্ডের ঠিক বর্ডারে।

চল, আর দেরী করো না, আমি বললাম।

আমরা নেমে এলে পিয়ালীও পেছন পেছন এলো। আমরা যখন গাড়িতে উঠছি, ও তখন বাস্তুমন্দিরে প্রণাম করছে। তারপর দৌড়ে এসে বললো, সাবধানে যেও। ওখানে থেকো না। থাকতে হয় বাড়িতে থাকবে।

নেত্রা বললো, তা হলে আর স্যুটকেসটা নিয়ে কী হবে। পিয়ালীর হাতে ওটা ফিরিয়ে দিল।

নেত্রাই গাড়ি চালাচ্ছিল। মনের সুখে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার একটা টেপ চালিয়ে দিয়েছি। গরম থাকা সত্ত্বেও ও, এ, সি চালাতে দেয়নি। জানলা নামিয়ে দিয়েছে সুইচ টিপে। বাইরের হাওয়া ওর চুলগুলো নিয়ে খেলা করছে।

—খুব ভালো লাগছে অতীশ। আমি যেন পাখির মত উড়ে চলেছি।

—একটু সাইড করে দাঁড়াও তো। চুলগুলো তোমার চোখের ওপর এসে পড়ছে। একসিড্যাণ্ট হয়ে যাবে।

ও গাড়িটা ধার করে দাঁড় করালে ওর মাথায় গল্ফের ক্যাপটা এড্জাস্ট করে পড়িয়ে গালটা একটু টিপে বললাম, এবার চল।

ঘণ্টাখানেক চলার পর আমরা ছোট ছোট পাহাড়ের দেখা পেলাম। অনেকটা পালামৌ ডাল্টনগঞ্জের মত পাহাড়, জঙ্গল। একটা বুনো শুয়োর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে তার একগাদা বাচ্চা নিয়ে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, একবার এগোচ্ছে,

আবার পেয়েছো। গাড়ির শব্দ পেয়ে বাচ্চাগুলো মায়ের পেটের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু দূর এগিয়ে গেলে একটা শিংওয়ালা হরিণ দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। এরপর পাহাড়টাকে দুভাগ করে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে।

এই পথ দিয়েই জাপানিরা ঢুকেছিল ব্রহ্মদেশে।

আর একটু গিয়েই আমরা কাঞ্চনবুড়ি শহরে ঢুকলাম। ছোট্ট শহর, কিন্তু দোকান পাটে ভর্তি, যেমন আছে কাপড় জামা, তেমনি আছে সিল্ক, আর ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র। ওষুধের দোকানের ছড়াছড়ি। বুঝলাম, এখান থেকেই ব্রহ্মদেশে এ সব জিনিস চোরাপথে ঢোকে, কারন ওদের মিলিটারি সোসালিস্ট সরকার আমদানির সদর দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

শহর থেকে বেরিয়ে আমরা কাওয়াই নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম।

নেত্রাকে বললাম, চল, আমরা এখানে খেয়ে নেই।'

—এখানে আবার কোথায় খাবার পাবো? তাহলে কাঞ্চনবুড়িতে ফিরে যেতে হবে।

আমি বললাম, ঐ যে দেখছো কয়েকটা ঘর জলে ভাসছে ওগুলো, হলো র‍্যাফট্ হাউজ।

—কে বললো তোমায়?

—ঐ বোর্ডটায় দেখ, কি লেখা আছে?

—ঠিকই তো বলেছো।

একটা রাস্তা নদীর উচু পাড় থেকে জল অবধি নেমে গেছে।

ও গাড়িটা সেই রাস্তা দিয়ে নামিয়ে জলের ধারের পার্কিং স্পেসে রাখলো। আরও কয়েকটা গাড়ি ওখানে দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে একটা র‍্যাফট্ হাউজে উঠলাম। এটা এদের খাবার ঘর। সব র‍্যাফট্গুলো পাটাতন দিয়ে যোগ করা রয়েছে। প্রত্যেকটা র‍্যাফটে দুটো তিনটে করে ঘর আর বসার জন্য ডেক চেয়ার পাতা, খোলা ডেকে।

একটি সারঙ্গ পরা মেয়ে আমাদের নিয়ে বসালো। খোলা ডেকে চেয়ার টেবিল পাতা। চার পাঁচজন বুড়ো সাহেব মেমের দল বসেছে খেতে। মেয়েটি আমাদের ড্রিঙ্কের কার্ড আর মেনুটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

—বিয়ার প্লিজ। সিংহা বিয়ার।

—দেখেছো অতীশ কি সুন্দর জায়গাটা। তিনদিকেই পাহাড়। সব চাইতে ভালো লাগছে যে পাহাড়ের উপর গাছগুলো এখনও মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নদীটা দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কি সুন্দর নেমে আসছে তারপর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যেন শান্ত হয়ে গেছে এখানটায়। দূরে যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই কি সেই বিখ্যাত ব্রিজ অন দি রিভার কাওয়াই, যেটা তৈরী করতে, তুমি বলছিলে, হাজার হাজার বৃটিশ আর অস্ট্রেলিয়ান যুদ্ধবন্দী মারা গিয়েছিল?

—ওটাই বোধহয় সেই ব্রিজটা। আমারও খুব ভালো লাগছে এই জায়গাটা।

—থাকবে নাকি একটা রাত র‍্যাফট্ হাউজে ?

—হেঁসে নেত্রা বললো, তা হলে হানিমুনের আর চার্ম থাকবে না।

—তা অবশ্য ঠিক। সবুরে মেওয়া ফলে। ঐ ব্রিজটার কথা জিজ্ঞেস করছিলে ? হ্যাঁ, ওটাই নিশ্চয় কাওয়াই নদীর ব্রিজ।

—এখানে এতো বুড়ো বুড়ি এসেছে কেন, বলতো ?

—বোধহয় তাদের প্রিয়জন, যারা এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, তাদের স্মরণ করতে নিশ্চয় এসেছে এরা।

'ওন্ মি পার ডি', সরি, একস্কিউজ মি, বলে মেয়েটি আমাদের খাবার দিয়ে গেল।

—ওটা কি ভাষায় বললো, বুঝতে পারলে, নেত্রা ?

—মনে হয় মেয়েটি বর্মি। ওর চেহারা আর পোশাক দেখলে তো তাই মনে হয়। ওর নামটাই বর্মি, আমি দেখে নিয়েছি, ওর বুকের কাছে লেখা আছে। তুমি আগে মাখন দিয়ে গরম ভাতটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেশ করে মাখো তো। সেদিন ওটা খুব ভাল খেয়েছিলাম। সেইজন্যে আজ কড়া করে ভাজা মাছও অর্ডার দিয়েছি।

আমি মেখে এক গরস করে দিচ্ছিলাম ওর মুখে, আর একবার করে নিজের মুখে। ও মাছের কাঁটা বেছে দিচ্ছিল একবার আমার মুখে, একবার নিজের মুখে। বাঁশের অঙ্কুরের তরকারি আর শুয়োরের মাংসটা খেতে ভালই ছিল।

খাওয়া শেষে আমরা ব্রিজটার কাছে গিয়ে দুজনে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। একটা ট্রেন ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে গেল। বর্মা সীমা এখান থেকে মাইল দশেক হবে। সারাদিনে একটাই ট্রেন যায় এখান দিয়ে মৌলমিন্ পেগু হয়ে রেঙ্গুন আর একটা আসে রেঙ্গুন থেকে।

জানো নেত্রা, এটা কিন্তু সেই প্রথম ব্রিজটা নয়, যেটা যুদ্ধবন্দীরা বানিয়েছিল।

—ওটা তবে কোথায় ?

—ঐ ব্রিজটার উপর দিয়ে যখন প্রথম জাপানি রেলগাড়ি যাচ্ছিল, জাপানিদের উল্লাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হুইসিল দিতে দিতে, সেই দিন সেই সময়ই বৃটিশ স্পাইদের লাগানো টাইম বোমার বিস্ফোরণে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

—তারপর ?

—তারপর জাপানি সেনাপতি হাইত্তু, যার দায়িত্ব ছিল ঐ ব্রিজটা বানাবার, তার মৃতদেহ গান ক্যারেজে তোলা হলো। সে হারিকিড়ি করেছিল।

—এই ব্রিজ বানাতে এতো যুদ্ধবন্দী কী করে মারা গেল ?

—অর্ধাহারে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে আর জাপানিদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে।

—কী অত্যাচার করতো ? কাজ না করলে গুলি করে মারতো ?

—একটা নমুনা দেই—

বৃটিশদের এক সেনাপতি কর্নেল নিকলসন্ ছিল ঐ যুদ্ধবন্দীদের একজন। তাকে সাধারণ কুলির কাজ করতে বলায় সে রাজি হলো না, কারণ আন্তর্জাতীক আইনানুসারে সেনাপতিদের শ্রমিকের কাজ দেওয়া বেআইনি। জাপানি সেনাপতি তার উত্তরে বলেছিল, 'আই ডোণ্ট কেয়ার ইণ্টারন্যাশনাল ল। আমার কথাই আইন। মাই দিউটি, মেকস্ দি ল। মাই দিউটি ইজ তু ফিনিস্ ব্রিজ ইন তু মান্থস্। যদি আমি তা না করতে পারি, তা হলে তোমরাও মরবে আর আমিও মরবো।' নিকলসন্‌কে টলানো গেল না।

—তাকে কি তখন গুলি করে মেরে ফেলা হলো ?

—না, মারা হলো না, তাকে তিলে তিলে মারার বন্দোবস্ত হলো। একটা গর্তের মধ্যে ওকে বন্ধ করে রাখা হলো, সেখানে বসবার মতও জায়গা নেই, আলো ঢুকবার পথ নেই।

—সেই দেখে অন্য যুদ্ধবন্দীরা কি করলো ?

—তারা কাজ বন্ধ করে দিল। তাদের সারাদিন না খাইয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। তাতেও কাজ হলো না। হাইড়ু অস্থির হয়ে উঠলো। প্রাণের মায়া, বড় মায়া। সে মাথা নীচু করে ক্ষীণ সুরে হুকুম দিল নিকলসনকে বের করে আনতে। অর্ধমৃত নিকলসন্‌কে বের করে আনা হলো।

হাইড়ু তার পিঠ চাপড়ে বললো, ঠিক আছে তুমি কাজের তদারকি করে ব্রিজটা তৈরি করে দাও। ইউ ডোণ্ট ওয়ার্ক তু ডে। উই স্টার্ট তুমরো।

তারপর কাজ আরম্ভ হলো, ব্রিজ তৈরি হলো।

—ব্রিজ ভেঙ্গে যাবার পর বন্দীদের কী হলো ?

—প্রায় সবাইকে গুলি করে মারলো জাপানি সৈন্যরা। চল, কবরখানাটা দেখে আসি।

হাজার হাজার কবর, শুধু মাটির ঢিপি, মাথার কাছে একটা ক্রস্, আর একটা পাথরের গায়ে মৃতের নাম, জন্ম মৃত্যুর দিন আর জন্মস্থান লেখা। কয়েকটা কবরেব কাছে তাজা ফুল।

নেত্রা নাম ঠিকানাগুলো পড়ছিল—সিডনি, মেলবোর্ণ, বার্মিংহাম এবার্ডিন।

কোন সুদূরে এদের জন্ম, আর কোথায় এসে প্রাণ দিল, কিন্তু কেন ? এই কেনর উত্তর কোনও দিনই কেউ দিতে পারেনি। পারেননি বুদ্ধদেব তাঁর অহিংসার মন্ত্র প্রচার করে, পারেননি সম্রাট অশোক তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, পারেননি যিশু তাঁর প্রাণ দিয়ে। কে বলে মানুষ বুদ্ধিজীবি—স্বার্থের জন্য হিংসা আর হিংসার জন্য মৃত্যু।

নেত্রা বললো, এখানে আর নয়—বড় বিষাদময়। একটু আনন্দময় পরিবেশে চল। কাছেই একটা ঝরণা আছে, নাম ইরাওয়ান। দাঁড়াও গাইড ম্যাপটা একটু দেখেনি। ঠিক আছে, এই রাস্তা দিয়ে পাহাড়ে উঠে গেলেই দেখা যাবে সেই ঝরনা।

কাওয়াই নদী অনেক ধারায় বিভক্ত হয়ে আছড়ে পড়ছে অনেকটা নীচে।

চারিদিকে গভীর জঙ্গল। জলকণাগুলো রামধেনু এঁকে দিয়েছে। আমরা একটা পাথরের উপর বসলাম ঘন হয়ে। অনেকক্ষণ মুগ্ধমুগ্ধ হয়ে বসে থাকবার পর কখন যে গুনগুনিয়ে গলায় সুর এসেছে, নিজেই জানি না—

'কলো কলো কলমন্দ্রে নির্ঝরিণী
ডাক দেয় প্রলয় আহ্বানে।

মন মোর ধায় তারি মত্ত প্রবাহে
তাল তমাল অরণ্যে
ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে।'

এক্সিল্যান্ট্। ভালো লাগার পুরস্কার বলে, আমার মাথাটাকে টেনে নিল। এবার মানেটা বলো। এটাও কি সেই একই কবির লেখা?

—হ্যাঁ, বলে মানেটা বললাম।

তোমারও কাব্যিক মন। এর জন্যেই তো তোমাকে এত ভালো লাগে।

বিকেল বিকেলই বাড়ি ফিরে এসেছি। পিয়ালী বাড়ি চলে গেছে। চা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

ওভেনটার কাছে যেতেই, আরে ওখানে কি করছো, বলে ছুটে এলো নেত্রা। চা খাবে, তা বলবে তো। যাও, তুমি বসো। আমি করে আনছি।

—ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করেছে সব জিনিস—চা, চিনি, বিস্কুট।

বেশ আরাম করে চা খেয়ে দুজনে একটু গড়িয়ে নিলাম।

॥ ৫৮ ॥

নেত্রার বাবা মা ফিরে এসেছে। আজই প্রথম অফিসে গিয়েছিল, নেত্রা।

নেত্রার শঙ্কিত গলার আওয়াজ—অতীশ একখুনি আমাদের বাড়ি চলে এসো। বাবা তোমার সঙ্গে কি একটা পরামর্শ করতে চায়।

—ঘণ্টা খানেক পরে আসছি।

—না, না দেরী করো না। বাবা ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছে।

—কী হয়েছে, তা তো বলবে?

—তা বাবা বলছে না। ভীষণ ডিপ্রেসড্। অফিস থেকে এসেই তোমাকে ডাকতে বলেছে। আমরা জিজ্ঞেস করলে কোনও কথা বলছে না। মনে হচ্ছে, অফিসে কিছু একটা হয়েছে।

—ঠিক আছে, আসছি।

আমার গাড়ি গেটের কাছে আসতেই, সিকিউরিটি অফিসার নামধাম জিজ্ঞেস

করে বাইরে দাঁড়াতে বললো। ফোন করে অনুমতি নেবার পর গেট খুলে দিল।

ওর বাবা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এসো অতীশ, বলে আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন।

নেত্রাও দাঁড়িয়েছিল ওর বাবার পেছনে, কিন্তু কোনও কথা বলার সুযোগ পেলো না।

—নেত্রা, এখন আমরা দুজনে একটু কথা বলবো, তুমি এখন যাও। চল অতীশ, বলে আমাকে নিয়ে গেলেন ওনার পড়বার ঘরে।

—কি খাবে বলো? আমি কিন্তু হুইস্কি খাবো।

বেল বাজালে একজন উর্দি পরা লোক এলো। বললেন, আমার হুইস্কি, আর অতীশ—ঠিক আছে কফি।

লোকটা হুকুমমাফিক পানীয় দিয়ে গেলে, উনি উঠে দরজার খিল বন্ধ করে বসলেন।

—জানো অতীশ, আমাকে অস্ট্রেলিয়া পাঠানোটা ছিল সরকারের একটা চালাকি।

—চালাকি বলছেন কেন?

—আমার অবর্তমানে ওরা খুন্ সানের আরও পপি ক্ষেত নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর ওর আস্তানায়ও হানা দিয়েছিল। দারুণ নাকি লড়াই হয়েছিল। ও খুব ভালো স্ট্র্যাটেজিস্ট। থাই সৈন্যই নাকি বেশী মারা গিয়েছে।

—ওকে কী ওরা ধরতে পেরেছে?

—পার্ব্বত্য মূষিককে আর কে ধরবে। সীমা পার হয়ে গেলেই তো ও নিরাপদ। এখন আমার চিন্তা হচ্ছে।

—আপনার আবার চিন্তা কেন?

—সান্ নিশ্চয় ভাবছে যে আমিই এ সব করিয়েছি।

—তা ভাববে কেন? আপনি তো আর এখানে ছিলেন না।

—নাই বা থাকলাম। ও ভাববে যে আমি সব বন্দোবস্থ করে বাইরে গিয়েছিলাম।

আমি খুব চিন্তিত হয়ে বললাম, তা অবশ্য ভাবতেই পারে।

—জানো, নেত্রাকে ছাড়িয়ে আসার সময় আমাকে অনেক বাট দিতে হয়েছে। সেটা জোগাড় করতে গিয়ে আমার পৈতৃক বাড়ি বন্ধক দিতে হয়েছে, জমানো টাকা সব শেষ, এমন কি কিছু ধারও করতে হয়েছে। তোমাদের বিয়ে কী করে দেবো, তাই ভাবছি।

—বিয়ের জন্য ভাববেন না। শুধু রেজিস্ট্রি করে নিলেই হবে।

—তাও কী হয়। ও যে আমার একটিই সন্তান।

—আপনি কী এ কথা বলতেই আমাকে ডাকিয়েছিলেম?

—ঠিক তা নয়। আসল কথা, আমি ভয় পাচ্ছি ওর প্রত্যাঘাতটা এবার কী ভাবে আসবে? আমি আমাদের প্রাণের আশংকা করছি। আমার ভয় নেত্রাকে

নিয়ে। আমি মরতে ভয় পাই না। নির্ভয়ে মরতে এবং নিষ্ঠুর ভাবে মারতেই আমি শিক্ষা নিয়েছি।

—আপনি নিরাপত্তার জন্য কী ভাবছেন?

—ভাবছি যদি নেত্রাকে নিয়ে তুমি কোথাও বাইরে চলে যাও।

—আমি কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, তাতে তো কিছু সময় লাগবে। আমি একটা একস্‌পানসানের পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যস্ত, তাই এখন ছুটি পাবো না। তাছাড়া বিয়ে না করে এক সঙ্গে থাকাটাও ঠিক মনোমত নয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, অনেকটা হুইস্কি খেয়ে, উনি বললেন, তা হলে ওকে ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে আর সিকিউরিটির কড়াকড়ি আরও বাড়াতে হবে। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো। ওকে হাসিখুশি রাখবার জন্য তুমি প্রায়ই এসো। তোমার বাবা আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন, তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে।

—বাবা কী লিখেছেন?

—তোমার বাবা লিখেছেন যে তিনি চান তোমাদের দেশে হিন্দু মতে বিয়ে দিতে। তার আগে এখানে আমাদের মতে বিয়ে হলেও তাঁর কোনও আপত্তি নেই। ওখানকার বিয়েতে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উনি চান জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিতে বিয়েটা দিতে।

—আপনার কী মত?

—আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। একটু আগে হলে অবশ্য আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। আমারও অবশ্য কিছু সময়ের প্রয়োজন, অর্থ সংগ্রহের জন্য।

—নেত্রার তো অনেক টাকা আছে। তাই থেকে খরচ করবেন। টাকার চিন্তা করবেন না।

—মেয়ের টাকা নিয়ে বিয়ে দিলে তো আমি পিতার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো। সেটা আমার মনঃপুত নয়।

—আপনি অত ভেঙ্গে পড়বেন না। আপনি একজন জেনারেল, আপনার কী ভয় পাওয়া শোভা পায়? 'ইউ হ্যাভ টু ফাইট্ ব্যাক এণ্ড ফাইট বোল্ডলি।'

—আমার বড় নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে মিথ্যাচারী হয়ে, তাই লড়াই করার সাহসটাই হারিয়ে ফেলছি।

—ছোট মনে হবার কী আছে?

—আমি নেত্রাকে ছাড়িয়ে আনবার সময় কথা দিয়েছিলাম যে এ বছর আর পপি ক্ষেত নষ্ট করা হবে না। আর সেটাই করা হলো, আমাকে সরিয়ে দিয়ে। আমি সামনের সপ্তাহে পদত্যাগ করবো ভাবছি।

—পদত্যাগ করলে, প্রথমত আপনার চলবে কি করে, আর দ্বিতীয়ত সিকিউরিটির বন্দোবস্ত হবে কী করে? আপনার মাথা গোজবার মত জায়গাও তো নেই এখন।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তা অবশ্য ঠিকই বলেছো, আমি আর চিন্তা করতে পারছি না। কী যে করবো?

—আসুন সবাই মিলে ভেবে একটা মনস্থির করা যাক। ওদের ডেকে আনি। আপনার চিন্তা তো আমাদের সবারই চিন্তা।

উনি চুপ করে রইলেন। আমি নেত্রাকে আর ওর মাকে ডেকে আনলাম।

ওদের সব ঘটনা বুঝিয়ে বললাম। সবাইর মতামত চাইলাম, যথাকর্ত্তব্য ঠিক করার জন্য।

নেত্রা শুনে বললো, বাড়িটা যাকে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছো, সেটা আমার টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনো।

ওর বাবা মাথা নেড়ে বললেন, তা কী করে হয় মা? তোর টাকা কেন নষ্ট করবো?

—আমার জন্যেই তো তোমার টাকাটা লেগেছে। অতএব ঐ টাকাটা আমারই দেওয়া উচিত। আমি আগেও সেই কথা বলেছিলাম। অতীশই আমাকে বলেছিল, তোমাকে বলতে। ভাগ্যি ভালো যে বাড়িটা বিক্রি করোনি।

আমি বললাম, নেত্রা ঠিকই বলেছে। আপনি বাড়িটা ছাড়িয়ে আনুন। পদত্যাগ না করে অন্য বিভাবে বদলি হবার চেষ্টা করুন, না হলে অন্য কোথাও চাকরি নিন, পদত্যাগের আগে।

সিকিউরিটির কড়াকড়ি সম্বন্ধে কোনও দ্বিমত নেই। নেত্রা স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী হতে রাজি হলো। বিয়েটা এগিয়ে দেবার জন্য ওর বাবা লিখবেন বলে ঠিক হলো। আমি হংকং বদলি হবার চেষ্টা করতে রাজি হলাম। ওর বাবার চিন্তার ভার অনেকটা লাঘব হলো।

তারপর কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টায় আবহাওয়া হাল্কা করে খেয়েদেয়ে ফিরে এলাম।

॥ ৫৯ ॥

বর্ষা নেমেছে। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সূর্যের দেখা নেই। শহরের অনেক জায়গায় জল জমে গেছে। চাউ পিয়াও নদী উপচে পড়ছে। শহরের জল টানতে পারছে না। উত্তরের উঁচু জায়গার জল শহরে এসে জমা হচ্ছে। বাঙ্গপ্রা আর প্রাতুনামের মাছ, শব্জির বাজারে হাঁটু জল। ফুড্‌ল্যান্ড থেকে বাজার করতে হচ্ছে। সেখানে মিষ্টি জলের মাছ বিশেষ পাওয়া যায় না। সাকন্ ওদের পাড়া থেকে বড় বড় কৈ মাছ এনে দিয়েছে। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস করছি। আমার গল্প খেলা বন্ধ।

সন্ধ্যার সময় জানলার ধারে বসে বৃষ্টি দেখছিলাম। বাঁশতলার ড্রইংরুমে

বন্ধ। সয়টন্সেন্ রাস্তার ধারের সরু খালটাতে, নালাই বলা চলে, একজন খ্যাপলা জাল ফেলে মাছ ধরছে, যেমন ধরে প্রায়ই। কিছু নিশ্চয় পায়—হয়তো কৈ বা মাগুর।

গেটের কাছে একটা টুকটুক্ এসে দাঁড়ালো। দারোয়ান ওকে ঢুকতে দিচ্ছে না। টুকটুকে বসা মেয়েটি অনেক কাকুতি মিনতি করছে, তবু ও ছাড়ছে না। মেয়েটি তারপর একটা কার্ড দেখালো দারোয়ানকে। ও ছেড়ে দিল। টুকটুকটা নামিয়ে দিল তার সোয়ারি।

এমনি মেঘমেদুর বর্ষায় মনটা বিরহে আতুর হয়ে ওঠে। নিঃসঙ্গতা মনের মাঝে ভারি হয়ে চেপে বসে। সঙ্গীহীনরা সঙ্গী খোঁজে। এমনি দিনেই কালিদাস মেঘদূত কাব্যে বিরহিণীর অশ্রুসিক্ত প্রেমবার্তা লিখেছিল। তার বার্তা বহন করার জন্য মেঘের কাছে তার আর্ত মিনতি। আমার তো দূরভাষিণী আছে, ব্যবহার করবো কী? ভাবতে ভাবতেই ফোনটা বেজে উঠলো।

—অতীশ? তোমার কাছে বড্ড যেতে ইচ্ছে করছে।

—আমারও। এসো না।

—আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় অনেক জল। বের হতে পারবো না।

—কী করছো?

—বসে ছবির এলবাম দেখছি—আমার অচীনদেশের রাজপুত্রকে। তুমি কি করছো?

—আমি জানলা দিয়ে বৃষ্টির রূপ দেখছি, আর তোমাকে কামনা করছি।

—ঠিক আছে, আমি তোমার রূপ দেখি আর তুমি জলে ভেজা এক ফালি প্রকৃতির রূপ দেখো। কামনাটা মনে মনেই থাক। আচ্ছা ছাড়লাম।

একটু পরে আবার ফোন—

—চিনতে পারছেন? বলুন তো কে? হাসির আওয়াজ।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, এ রকম ইংরেজি বলে একজনই, সে ফ্যান্স।

—দু বছর পর যদি কথা বলি তা হলে আর চিনতে পারবেন না। ভাববেন কোনও আমেরিকান মেয়ে।

—তা হলে কী আমেরিকা চললে নাকি?

—হ্যাঁ।

—তার মানে জন্ এসছে?

—হ্যাঁ। কাল আমরা ব্যাংকক যাবো—ভিসা করতে। আপনার সঙ্গে দেখা করবো। থাকবেন তো?

—তোমার আমার এখানেই তো থাকতে পারো।

—কোনও অসুবিধা হবে না তো? দাঁড়ান জন্‌কে একবার জিজ্ঞেস করেনি। জন্ বলছে হোটেলেই থাকবে।

—তুমি জন্‌কে দাও। আমি বলছি।

—হাই জন, তুমি, কেমন আছ? ইউ আর ওয়েল কাম টু মাই হাউজ। তোমাকে আমি চাক্ষুস দেখিনি, কিন্তু তোমাকে আমি চিনি।

—থ্যাংক ইউ। আমিও আপনাকে ও রকম চিনি। সি ইউ টুমরো।

ওরা দশটার মধ্যে চলে এলো।

জন ঘরে ঢুকে, হাত ঝাকুনি দিয়ে বললো, হাই অতীশ, হাউ ডু ইউ ডু?

—আমি ভালো, তুমি কেমন?

জন ছ ফিটের ওপর লম্বা, সুপুরুষ। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। খুব লক্ষ্য না করলে বোঝাই যায় না যে ওর একটা পা কৃত্রিম।

ফ্যাঙের ছেলেটা ভারি সুন্দর। বাবার হাত ছাড়ছে না।

ফ্যাঙ দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আপনার কথাই ঠিক হলো।

আমি বললাম, তোমার জন যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি সুন্দর ওর স্বভাব। কতশত আমেরিকানের ঔরসে তো থাই মেয়েদের সন্তান হয়েছে, তারা কী আর ফিরে এসেছে তাদের নিয়ে যেতে। তোমার আনন্দ যে আর ধরে না?

—কী যে বলেন, এ যে স্বপ্নেরও অতীত। শুধু দুঃখ মা একা রয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের প্রোগ্রাম কী জন?

ও বললো, আজ মার্কেটিং করতে বের হবো। কাল সকালে ভিসার ইন্টারভিউ। ভিসা পেয়ে গেলে কালই বিকেলের বাসে ফিরে যাবো।

—তা হলে আমার গাড়িটা নিয়ে যাও। আমার ড্রাইভার আছে।

—থ্যাংক ইউ। আপনার অসুবিধা হবে না তো?

—মোটেই না। তুমি আসতে এতো দেরী করায় ফ্যাঙ হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল।

—জানি, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ এস্টাব্লিসড না হয়ে ওদের নিতে চাইনি. শুনলাম আপনি ওকে আশ্বস্ত করেছিলেন। আপনার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি আসবো, ওদের নিয়ে যেতে। এ বিশ্বাস আপনার কি করে হলো?

—তোমার মুখের মধ্যেই একটা সততার ছাপ আছে, সেটা ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

জন হেসে বললো, ভারতীয়রা শুনেছি খুব ভালো গনৎকার, সেটাই প্রমানিত হলো।

—তোমার কৃত্রিম পায়ে দেখছি, কোনও অসুবিধাই হয় না।

—প্রথমে খুবই অসুবিধা হয়েছে। জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল, মনে হয়েছে। কারও সঙ্গে মিশতাম না, চুপচাপ বসে থাকতাম আর রাগে ফুলতাম, আমাদের সরকারের ওপর। কোথায় ভায়েটনাম, তাই জানতাম না। দিব্যি পড়ছিলাম কলেজে। একদিন কনসক্রিপসানের হুকুম এলো। সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হলো। কত নিরীহ লোকের বাড়িঘর, শস্যক্ষেত, বনসম্পদ জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছি নাপাম বোমা দিয়ে। গায়ে আগুন নিয়ে ছুটেছে সব নিষ্পাপ ছেলে-

মেরে, বুড়োবুড়ি চীৎকার করতে করতে, তারপর হাত পা ছুঁড়ে মরে গেছে। ওদের দেশে, তারা কি রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করবে তার জন্য আমাদের কেন মাথাব্যথা, বলতে পারেন? আমাদের সত্তর হাজার তাজা প্রাণ শেষ হয়েছে ঐ ভায়েটনামের যুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত কি হলো? আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের সম্পদ, আমাদের গর্ব, হেরে গেল, এক দরিদ্র নিঃস্ব জনগণের মানসিক দৃঢ়তার কাছে, হো. চি., মিনের আদর্শের কাছে। কী আর হবে? ও নিয়ে আর ভাবি না। ভুলে গেছি আমার একটা পা নেই। জীবনটাকে আবার নতুন করে শুরু করেছি। তাই দেরী হয়ে গেল ওদের নিয়ে যেতে। অনিশ্চয়তার মধ্যে ওদের নিতে চাইনি।

আমি বুঝতে পারিনি যে আমার একটা কথায় ওর মনের মণিকোঠায় এতটা আঘাত করবে। তুমি যে তোমার মনের জোর ফিরে পেয়েছ, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছ, সততাকে নষ্ট হতে দাওনি, তার জন্য তোমাকে অভিনন্দন করছি।

ফ্যাঙের ছেলেটা খুব মিশুকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবা তোমাকে ভালোভাসে?

—খু-উ-ব। মাই ড্যাডি ইজ ভেরি গুড্।

—তোমার জন্য কি এনেছে?

—অনেক খেলনা। রিমোর্ট কন্ট্রোলড্ গাড়ি, লোগো আরও অনেক।

—তোমার এ দেশ ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় না?

—এটা তো আমার দেশ নয়, যে কষ্ট হবে। এটা তো আমার মায়ের দেশ।

ফ্যাঙ খুব সেজেছে। সুন্দর একটা নীল রঙের স্কার্ট পরেছে আর তার সঙ্গে গোলাপি সিল্কের টপ্, তার সঙ্গে মিলিয়ে ঠোঁটের আর চোখের পাতায় রঙ, হাতে সোনার স্ট্র্যাপের ঘড়ি. কানে নীল পাথরের দুল, গলায় সরু একটা চেইন, চেইনে ঝুলছে একটা ক্রস্।

—তুমি আজ খুব সেজেছ।

নিজের বুকের দিকে একবার তাকিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললো, ভালো দেখাচ্ছে?

—খুব সুন্দর।

—আপনাকে আমি চিঠি লিখবো। আমেরিকায় গেলে কিন্তু আমার ওখানে যেতেই হবে। নেল্লাকে বিয়ে করছেন কবে?

—শিগ্গিরই।

—যাঃ, নেমন্তন্নটা খাওয়া হলো না। বিয়ে হলে জানাবেন।

জন্ বললো, অতীশ, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ি, তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবো। অনেক জিনিস কিনতে হবে।

—খেয়ে যাও।

—বাইরে কিছু খেয়ে নেবো। এখানে তো খাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই।

—ওরা তিনজনে বেরিয়ে গেল।

আমি খেয়ে দেয়ে একটা লম্বা ঘুম দিলাম। পিয়ালীর ডাকে যখন উঠলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। চা খেতে খেতেই ওরা এসে পড়লো, দুটো বড় বড় স্যুটকেস নিয়ে।

ওদের ছেলে হ্যারি ছুটে আমার কাছে এসে বললো, আঙ্কল, আমার অনেক সুন্দর সুন্দর জামা, প্যান্ট, জুতো কেনা হয়েছে। তোমার জন্য চকলেট এনেছি। এটা কিন্তু আমার পয়সা দিয়ে কিনেছি। খাও, খাও।

ওর গালে একটা চুমু দিয়ে—থ্যাঙ্ক ইউ। ইউ আর এ নাইস্ বয়।

গম্ভীর হয়ে বললো, আমি কিন্তু কোনও দিন যুদ্ধে যাবো না। তা হলে আমারও বাবার মতো পা টা যাবে। তাই না আঙ্কল? বাবা যখন রাত্রে পা টা খুলে শোয় তখন আমার খুব কষ্ট হয়। বাবা না, তখন কাটা হাঁটুতে হাত বোলায়।

—হ্যাঁ সোনা, তুমি যুদ্ধে যেয়ো না।

স্যুটকেস দুটো জনু ওদের শোবার ঘরে নিয়ে গেছে।

ফ্যাঙ্গ আমার হাত ধরে টানতে টানতে বললো, আসুন দেখবেন কি রকম জিনিস কেনা হলো। জনু অনেক খরচা করে ফেললো। অত খরচা করা কি ঠিক, বলুন?

হ্যারি টেনে বের করলো ওর জামা, প্যান্ট, জুতো।

—ভালো হয়েছে, না?

—খুব সুন্দর।

ফ্যাঙ্গ ওর জিনিসগুলো বের করে সব খাটের ওপর সাজাতে লাগলো। আমি আর জনু সিগারেট ধরালাম।

—এখানে জিনিসের দাম আমাদের দেশের অর্দ্ধেক। ফ্যাঙ্গ ভাবছিল, আমি বাজে খরচা করছি। তা কিন্তু মোটেও নয়। ওদের ভালো জামা কাপড় ছিলই না। সেগুলো তো কিনতেই হতো। এখানে কিনে আমার অনেক লাভ হয়ে গেল। সে কথাটা, আমি ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।

ফ্যাঙ্গ এবার আমায় ডেকে বললো, দেখুন আমার কত জিনিস কিনে দিয়েছে জনু।

একটা সুন্দর ফ্রক নিয়ে দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে পরে এসে বললো, দেখুন তো কি রকম ফিট করেছে?

—খুব সুন্দর। এখান থেকেই বলে দিতে পারি তোমার শরীরের মাপ।

হেসে বললো, বলুন তো?

—থার্টিফোর 'এ', টয়েন্টিএইট, থার্টিফাইভ।

—জনু বললো প্রায় ঠিক হয়েছে। মুচকি হেসে—এখন ওটা 'বি' হয়ে গেছে।

ফ্যাঙ্গ লজ্জা পেয়ে গেল।

জন পকেট থেকে একটা ঘড়ির বাক্স বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, এ স্মলু মেমেন্টো ফ্রম থ্রি অফ আসু। আইডিয়াটা অবশ্য ফ্যাঙ্গের।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

আমিও কিছু কিনে রেখেছিলাম ওদের জন্যে, সেগুলো ওদের এনে দিলাম, ফ্যাঙের ভ্যানিটি ব্যাগ, জনের বেল্ট, হ্যারির জীন্।

—ইউ আর রিয়েলি নাইস্। এদিককার লোকদের অল্পক্ষণের মধ্যেই অপরকে আপন করে নেওয়ার যে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, সেটা আমার খুব ভালো লাগে, আর সেই ভালো লাগাটাই আমাকে টেনে এনেছে ফ্যাঙের কাছে। আমাদের দেশে আর এটা নেই।

—তোমাদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে?

—তা পেয়েছে।

—তোমাদের ইণ্ডিয়ান স্ন্যাকস্ খাওয়াবো।

খেতে বসে জন্ অনেকগুলো লুচি খেয়ে ফেললো। বললো দারুণ খেতে—অনেকটা টরেটোর মত।

আমি বললাম, 'টরেটো' তো মেকিসকান ময়দার রুটি। এটা তেলে ভাজা।

সন্ধ্যের সময় আমরা আড্ডায় বসলাম। সবাইর হাতেই পানীয়, জনের হুইস্কি অন্ রক্, আমার হুইস্কি জল। ফ্যাঙও আজ খুশির চোটে জিন্ নিয়েছে। হ্যারির হাতে স্প্রাইটের গ্লাস।

জন্ বললো, আপনার নেত্রাকে আসতে বলুন না? তা হলে আরও আড্ডাটা জমবে।

ফ্যাঙ বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ডাকুন।

—ওর খুব আসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে আসতে পারবে না।

—বলুন না, আমি এসেছি।

—ও জানে, ফ্যাঙ তুমি এসেছো।

—যাবার আগে তা হলে আর দেখা হলো না ওর সঙ্গে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, জন্ তুমি যুদ্ধে এভাবে আহত হলে কি করে?

—আমি ছিলাম ক্যাপ্টেন। আমাদের কুড়িজনকে কপটার রাত্রের অন্ধকারে নামিয়ে দিয়েছিল ভায়েটনামিদের এক গ্রামে। গ্রামটা মেকঙ নদীর ধারে। চারিদিক গভীর জঙ্গল। ওখানে ওদের বেস ক্যাম্প ছিল। ওটা দখল করতে পারলে, ওদের আক্রমণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের নামিয়ে দেবার আগে দিনের বেলায় প্লেন থেকে অনেক বোমা ফেলা হয়েছিল। আমাদের ধারণা ছিল, যে বোমায় ধ্বংস হবার পর, আর ওদের লড়াই করার ক্ষমতা থাকবে না। আমরা অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ গাছের ওপর থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে ছুটে এলো চারিদিক থেকে। আমরা শুয়ে পড়ে গাছগুলোর দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলাম। সব থেমে গেল। আমরা আবার এগোচ্ছি। এবার ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছি। দেখতে পাচ্ছি ওদের কাঠ দিয়ে ঘেরা দুর্গ। বুঝতে পারছি ওদের তৎপরতা। আমরা আরও এগিয়ে

গেলাম। বোমায় যা ধ্বংস হয়েছে, ওরা আবার তা ঠিক করে ফেলছে। বেশ কিছু লোক নিশ্চয় মারা গেছে, তবুও ওদের মনোবল একটুও কমেনি।

একটা সার্চ লাইট আমাদের মুখের ওপর এসে পড়লো। তারপরই আর্টিলারি ফায়ার। আমাদের পাঁচ ছয় জন ছিন্নভিন্ন হয়ে মারা গেল। আমার বিশেষ বন্ধু, ও সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। ওর পেটে একটা সার্পনেল ঢুকে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। ওর নাড়িভুঁড়ি কিছুটা বেরিয়ে এসেছে। চীৎকার করতে করতে ও সেটা হাত দিয়ে ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। আমি ওকে কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছুক্ষণ পরই ও মারা গেল। শেষ কথা—মম্ ইয়োর বিলাভেড্ সান্ ডাইস্ ইন এন আননোন্ প্লেস। ওর পকেটে ওর প্রেয়সীর ছবি আর মায়ের শেষ চিঠি।

আমরা বেতারে খবর পাঠালাম কপ্টারের জন্য। হ্যালিপ্যাড্ পর্যন্ত আর পেঁছিতে পারলাম না। ওখানেও কয়েকজন ভায়েটনামি দাঁড়িয়ে আছে স্টেনগান আর রকেট নিয়ে। সবাই ছড়িয়ে পড়লাম।

আমি পথ হারিয়ে ছুটছি। হঠাৎ পায়ের কাছে একটা রকেট ফাটলো। আমি তখন নদীটা দেখতে পাচ্ছি। ঘাটে একটা নৌকো ছিল। সেটায় উঠে নদী পার হবার চেষ্টা করলাম। যখন এপাড়ে এসে পেঁছিলাম তখন আর আমার জ্ঞান নেই।

আই স্যালিউট দি ভায়েটনামিজ মোরেল। অদ্ভুত এদের মনোবল, এদিকে আমাদের মনোবলই ছিল না। যুদ্ধ করার কারোই ইচ্ছে নেই। প্রাণ নিয়ে পালাতেই ব্যস্ত।

আমি মন দিয়ে সব শুনে বললাম, নেতৃত্ব আর আদর্শ মানুষকে কতটা শক্তিশালী করে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই ভায়েট্নাম।

—যাক গিয়ে ওসব কথা। এই ফ্যাঙ্গ, আর জিন খেও না। তুমি আউট হয়ে যাবে। আউট হলে এখানে খুব মুসকিল। তোমাকে কিন্তু আমি শান্ত করতে পারবো না।

আমার দিকে তাকিয়ে জন্ বললো—আপনি থাকতে তো ও একদিন আউট হয়ে গিয়েছিল।

—তা হয়েছিল।

—তখন আপনি ওকে শান্ত করেছিলেন কি করে?

—মাথায় জল ঢেলে আর কালো কফি খাইয়ে।

—আপনার ভাগ্য ভালো। ও আউট হলে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

ফ্যাঙ্গ লজ্জা পেয়ে বললো, থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। জানেন, ও বড্ড বাজে কথা বলে।

—ফ্যাঙ্গ, ওখানে গিয়ে তুমি কী করবে?

—কী আর করবো, বাড়ির কাজ করতে করতেই তো সময় কেটে যাবে। ওখানে তো আর কাজের লোক পাওয়া যাবে না। কত কাজ—বাগানের ঘাস কাটা,

ঘর ঝাড় দেওয়া, মোছা, বাসন মাজা, রান্না করা, কাপড় কাচা, সবই তো এক হাতে করতে হবে।

জন্ বললো, ঘর ঝাড় দেওয়া, মোছা, কাপড় কাচা তোমাকে করতে হবে না, বাগানের ঘাস কাটাও নয়—ওগুলো আমি করবো। অতএব তোমার হাতে অনেক সময় থাকবে। তোমাকে আমি পড়াবো।

আমি অবাক হয়ে—এ বয়সে পারবে?

—নিশ্চয় পারবে। ও পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফ্যাঙ্গ তোমার বাবাকে তো দেখিনি?

—থাকলে তো দেখবেন। হ্যারি হবার দুই বছর পর মারা গেছে।

—কী করে মারা গেল?

—সে আর জিজ্ঞেস করবেন না, বলে কেঁদে ফেললো।

আমি বিহ্বল হয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম।

আরও আকুল হয়ে কেঁদে বললো, আমাকে বাবা খুব ভালোবাসতো। ছোট্টবেলা থেকে, সকালবেলা বাবা নিয়ে যেতো মেকঙ্গ নদীর পাড়ে। তখন ওপারের পাহাড়ের পেছন থেকে সূর্যের আলো এসে ঢেউএর ওপর আছড়ে পড়তো। বাবা আমাকে চুমু দিয়ে নৌকোয় উঠে বসতো। বাবা জাল ফেলে, হাল ধরে, আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো, যতক্ষণ দেখা যায়। আর যখন দেখা যেতো না, তখন আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে আসতাম। একদিন বাবা আর ফিরলো না। আমরা গ্রামের সবাইকে নিয়ে সারারাত খুঁজলাম। পরের দিন দুপুরে বাবার মৃতদেহ পাওয়া গেল, অনেক নীচে।

—সেদিন কি খুব ঝড় উঠেছিল?

—হ্যাঁ, সেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি ছিল। আমরা অনেক বারণ করেছিলাম। জন্ চলে যাবার পর, বাবা ছিল বলেই আমি বেঁচেছিলাম। বাবা চলে যাবার পর আর কিছুই ভালো লাগতো না। শুধু ছেলেটার মুখ চেয়েই বেঁচেছিলাম।

হ্যারি এসে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। 'মা তুমি কেঁদো না, আর কেঁদো না, প্লিজ। ড্যাডি, মাকে চুপ করতে বলো।'

পিয়ালীর টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। ওরা সবাই ওর রান্নার খুব সুখ্যাতি করলো। জন্ দৌড়ে ওর ডায়রিটা এনে মাছ আর মাংসের কারির রেসিপি লিখে নিল।

পরের দিন বিকেলে ওরা ভিসা পেয়ে গেল। জন্ সৈন্য বিভাগে ছিল আর হ্যারি ওর ছেলে প্রমাণিত হওয়ায় দূতাবাস ভিসা দিতে দেরী করেনি।

জন্‌কে জড়িয়ে, হ্যারিকে চুমু খেয়ে, ফ্যাঙ্গের গালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে অল দি গুড উইসেস্ বলে, ওদের বাসে তুলে দিলাম।

নেগ্রা কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমার এখানে আসতে পারে না। আমিই যাই ওদের বাড়ি। ও আমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

ওর মা বাবার কাছে ভদ্রতার খাতিরে একটু বসে কথা বলি। নেগ্রা উস্‌খুস্‌ করে, অস্থির হয়ে বলে, চল আমার ঘরে। মা বাবা গল্প করুক।

ওর মা হেসে বলে, অতীশ যাও, তোমরা গল্প করো। আমরা বুড়োবুড়ি গল্প করি।

আমি বলি, উনিই বুড়ো নন আর আপনার বুড়ি হতে এখনও কুড়ি বাকি।

নেগ্রা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ওর শোবার ঘরে।

ওর শোবার ঘরটা বেশ বড়। এক কোণায় একটা পিয়ানো, আর এক কোণায় একটা টেপ্‌ ডেক্‌। জানলার কাছে একটা লেখার টেবিল, চেয়ার। একদিকে দেওয়াল আলমারি, আর লাগোয়া স্নানের ঘর।

ওদের বাড়িটা একতলা বাঙলো বাড়ি, চারিদিকে বাগান, বাগান ঘিরে উঁচু প্রাচীর। গেটে রাতদিনের পাহারা। বাগানে ছাড়া থাকে দুটো এলসেসিয়ান কুকুর আর তার সঙ্গে ওদের হ্যান্ডলার।

নেগ্রা আজকাল ছবি আঁকা শিখছে। আমার কাছে বাংলার পাঠ নিচ্ছে। একটু একটু বাংলা লেখা শেখারও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাকে মাঝে মাঝে পিয়ানোতে মোসার্ট আর বিথোফেনের সুর বাজিয়ে শোনায়। কখনও আবার আমার গলায় বাঙলা গান শোনে।

আমাদের গল্প আরম্ভ হয়—আমার রোজনামচা দিয়ে তারপরই কল্পনার পাখা মেলে দুজনে কখনও ভারত দর্শন করি, কখনও কৃষ্ণনগরের বাড়ি, কখনও হিন্দু বিবাহের বিশদ বিবরণ। ওর মহা চিন্তা যে তিন চার ঘণ্টা বিয়ের পিড়িতে কি করে ও চুপ করে বসে থাকবে। বিয়ে তো মিটে গেল। তার পরদিন কালরাত। তার পরদিন প্রীতিভোজ, সাত আটশো লোক, ফুলের গহনা, ফুল দিয়ে সাজানো বিছানা, তার নাম ফুলশয্যা—প্রথম দৈহিক মিলনের শুভরাত্রি।

—বিয়ে তা হলে তিন দিন ধরে চলবে? খুব মজা হবে। কিন্তু অত ফুলের গয়না পরে তোমার গায়ে গা লাগিয়ে শোবো কি করে?

আমি বলি, তোমার প্রশ্নটা অনেকটা কুমারি মেয়ের প্রথম চুম্বন পর্বের প্রশ্ন, 'হোয়ার ডাজ দি নোজ গো?'

—বারে, তা কেন? পরের দিন যদি সকলে দেখে, ফুলগুলো সব মাটিতে লুটোচ্ছে, তা হলে কী ভাববে? দেখো বাপু, দু তিন বছরের মধ্যে আবার বাবা হতে চেও না।

কোনও কোনও দিন গল্প হয়, হানিমুন হবে কোথায়, বরফ ঢাকা পাহাড়ি জায়গায়, না সমুদ্রের ধারে—না বাপু, সমুদ্র তো এখানেই দেখছি। বরফ ঢাকা পাহাড়ই ভালো।

এমনি সব কল্পনার জাল বুনে সময় কেটে যায় অনেকটা। তারপর কয়েক মিনিটের জন্য স্তব্ধতা নেমে আসে, একে অন্যের হৃদস্পন্দন অনুভব করি, শুধু আছি আমি আর নেত্রা, আর কেউ কোথাও নেই, নেই কোনও চিন্তা ভাবনা, সময় যেন স্থির হয়ে গেছে।

ঘরে টোকা পড়ে,—এই নেত্রা খাবি না? আমরা বসে আছি তোদের জন্য।

একদিন ওর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বদলির কি হলো?

—চেষ্টা করছি। মনে হয় হয়ে যাবে। আমার ভাইস প্রেসিডেণ্ট এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। সামনের সপ্তাহে যেতে হবে।

—ও, তোমাকে তো বলাই হয়নি, নেত্রা আমাদের বাড়িটা ছাড়িয়ে এনেছে। আমার কোনও বাধাই ও মানলো না।

আমি বললাম, খুব ভালো হয়েছে। আপনার বদলির কী হলো?

—ওরা ভেবে দেখছে। হয়তো থাই টোবেকোতে চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডাইরেকটারের পদটা দেবে। তার জন্য অবশ্য আরও প্রায় এক মাস দেরী করতে হবে।

—তা হলে সবই আমাদের পরিকল্পনানুসারে এগোচ্ছে। এবার আমার বাবাকে একটা চিঠি দিন।

—শুভদিন দেখতে বলেছি, ডিসেম্বার নাগাদ।

হংকং যাবো শুনে, নেত্রার খুব মন খারাপ।

—চল না, আমাকে নিয়ে?

—দুদিনের জন্য তোমাকে নিয়ে কি হবে?

আমি একাই চলেছি।

সেবিকার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, প্রথমে চিনা ভাষায় তারপর ইংরেজিতে—আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই হংকং-এর 'কাইটাক' বিমানবন্দরে নামছি। আপনারা দয়া করে চেয়ার সোজা করে, সিট বেল্টটা লাগিয়ে নিন। এখন হংকং-এর সময় সকাল ছটা, তাপমাত্রা কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস্। আশা করি, আপনাদের যাত্রা সুখের হয়েছে। ক্যাথে প্যাসিফিকে ওড়ার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ।

প্লেন নামতে আরম্ভ করেছে—মেঘের তলায় নেমে এসেছে। চারিদিকে সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তার গায়ে সাদা মেঘ। আরও একটু নামলে দেখা গেল, কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ, সমুদ্রের নীল জলে ভাসছে। জাহাজগুলোকে মনে হচ্ছে যেন খেলনা। আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলো, গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কাইটাক কোথায়? প্লেনটা এবার সোজা ডান দিকে মুখ ঘোরালো—দুটো পাহাড়ের মাঝে হাওয়ায় ভাসছে আমাদের নিয়ে। একটু কম বেশী ঘুরলেই পাহাড়ের গায়ে

ধাক্কা—আর তিনশো যাত্রীর জীবনাবসান।

এবার দেখা যাচ্ছে কাইটাক, যেন সমুদ্রের জলে এক ফালি সমতল ভূমি, সামনেই সমুদ্রের নীল জল। প্লেনটা মাটি ছুঁলো। দৌড়ে গেল কিছুটা—প্রায় সমুদ্রের জল ছোঁয় ছোঁয় যখন, তখনই থেমে গেল। আর একটু গেলেই—সলিল সমাধি।

বেরিয়ে বারান্দায় আসতেই দেখা গেল, সব হোটেলের তখ্মা আটা ভ্যান। আমি ম্যান্ডারিন্ হোটেলে উঠবো।

হোটেলের পনেরো তলায় আমার ঘর। বেলবয় স্যুটকেসটা রেখে পাঞ্চকরা একটা কালো কার্ড টেবিলে রেখে বললো, আপনার ঘরের চাবি!

আমি বললাম, এ আবার কী রকম চাবি? কী ভাবে দরজা খুলতে আর বন্ধ করতে হয়, তা দেখিয়ে দাও।

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলে ও দরজাটা টেনে দিল—এই বন্ধ হলো। এবার খুলতে হলে কার্ডটা সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিন, কট করে একটা শব্দ হলে বুঝবেন, লক্ খুলে গেছে। আরে, শব্দ হলো না তো! নিশ্চয় গত সপ্তাহের কার্ডটা দিয়ে দিয়েছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি নীচ থেকে নিয়ে আসছি।

আমি বললাম, গত সপ্তাহের কার্ড মানে কী?

আমরা প্রতি সপ্তাহে কার্ডের পাঞ্চ বদলে নতুন কার্ড বানাই।

—কেন?

—কারণ, এখানে আনক সময় গেস্টদের জিনিস চুরি যায়, যখন গেস্টরা থাকে না। বার্গলারদের কাছে মাস্টার কী থাকে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই ডোনাল্ডের ফোন এলো—তুমি আটটার সময় তৈরি হয়ে নীচে থেকো। তোমাকে নিয়ে অফিসে চলে যাবো।

অফিস কাছেই। ছোট্ট পাহাড়ের ওপর ঘরবাড়ি, একে বেঁকে রাস্তা উঠে গেছে। রাস্তার ধারে ফুল ফুটে আছে। পরিচ্ছন্ন শহর, অন্ততপক্ষে এ দিকটা।

অফিসে ডোনাল্ডের ঘরে বসতেই ওর সেক্রেটারি পারকোলেটার থেকে কফি করে এনে দিল।

ডোনাল্ড জিজ্ঞেস করলো, তুমি বদলি হতে চাও কেন? তোমার জন্য আমার অন্য পরিকল্পনা। তোমার কারখানার একস্‌পানসানের কাজ কি রকম চলছে?

—ভালোই। আর এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

—তা হলে তো ভালোই এগোচ্ছে। প্রসার্ট মারা গেছে গত সপ্তাহে, তা তো তুমি জানো। আমি ভাবছি, ও দুটো কম্পানিকে এক করে তোমাকে প্রধান পরিচালক করবো। খুব চ্যালেঞ্জিং জব্ হবে।

তা হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে আমি আর থাকতে চাই না থাইল্যান্ডে।

—তা হলে আর একটা কাজ আছে। ডেঙ্গ চিনের বাজার একটু একটু করে খুলছে। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—দেখতে, ওখানকার সুবিধা অসুবিধা।

আমাদের কোম্পানিও চাইছে—ঐ বাজারটা স্টাডি করতে। একটা কমিটি তৈরি হচ্ছে কানাডায়। আমি তোমার নাম সুপারিশ করতে পারি।

আমি বললাম, তাই করুন।

—তাহলে তুমি মিঃ চ্যাঙের কাছে যাও। প্রাথমিক খবরাখবর ওর কাছেই পেয়ে যাবে।

চ্যাঙের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। ও চিন সম্বন্ধে চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। যে কোনও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলেই তার যথাযথ উত্তর ওর জীভের ডগায়। চিনে শিল্পোদ্যোগ করলে কি কি সুবিধা, এলুমিনিয়ামের বর্তমান উৎপাদন কত, কি হারে তার ব্যবহার বাড়ছে, সব পরিসংখ্যান ওর হাতের কাছে। এ ব্যাপারে ওর প্রাথমিক রিপোর্টটা আমাকে পড়তে দিল। সেই রিপোর্টে চিনের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারাও বর্ণিত হয়েছে। চিন যে একদিন আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে সব ব্যাপারে, তার ভবিষ্যতবাণী করতেও ভোলেনি।

রিপোর্ট পড়ে, চ্যাঙের থেকে সব জেনে সার্ভের একটা খসড়া পরিকল্পনা ডোনাল্ডের সঙ্গে আলোচনা করে যখন হোটেলে ফিরলাম, তখন পনেরো তলার ওপর থেকে দেখলাম সূর্য চিন সাগরে ডুব দিয়ে আমেরিকার আকাশে উঠি উঠি করছে। ফেরি বোটগুলো পাঁচ মিনিট পর পর অগণিত অফিস ফেরৎ যাত্রীদের নিয়ে স্টার ফেরি থেকে কাওলুনে পৌঁছে দিচ্ছে।

রাত্রের হংকং অপূর্ব দেখাচ্ছিল ওপর থেকে—পাহাড়ের ওপর উঠে যাওয়া রাস্তার সারি সারি বাতি, অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপগুলোতে জ্বলছে যেন তারা, আর বন্দরে জাহাজের আলো, ভাসমান রেস্তোরায় রঙবেরঙের আলোর মালা যেন এক স্বপনপুরি তৈরি করেছে।

চ্যাঙের রিপোর্টটা পড়ে মনে হলো, চিনের বর্ত্তমান নেতা ডেঙ্গ কত দূরদর্শি—অর্থনীতি শক্ত না হলে, অপামর জনসাধারণ শিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ না হলে, তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, তা সে জানে। চিনের ভাগ্য ভালো যে প্রয়োজনানুসারে ঠিক নেতৃত্ব পেয়েছে—মাও আর তারপর ডেঙ্গ। অনাবাসি চিনা, যারা থাকে থাইল্যান্ডে, ইন্ডোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর আর আমেরিকায় তারা অজস্র টাকা ঢালবে চিনে। ঐ অনাবাসি চিনারাই তো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির সারথি।

পরদিন সকাল বেলা রওনা হলাম থাইল্যান্ডের পথে। নেত্রার আলিঙ্গনের আনন্দে মন ভরপুর।

প্লেনে আমার ঘুম হয় না। একটা বই খুলে বসি, পড়তে পড়তে একটু ঝিমুনি আসে, আবার পড়ি আবার ঝিমাই, এমনি করতে করতে বিকেলে এসে ডনমুয়াঙ্গ বিমান বন্দরে নামলাম।

॥ ৬১ ॥

আমি ঘরে পা দিতেই পিয়ালী দৌড়ে এলো, মাস্টার, মাস্টার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

—আ-হা-হা, তোমার মা বুঝি মারা গেছে? তা, তুমি চলে যাওনি কেন?

—আমার মা নয়। মার তো যাবার বয়স হয়েছে। মা গেলে সর্ব্বনাশ হবে কেন?

—তবে কি হয়েছে?

—পী নেত্রা, পী নেত্রা।

—ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, নেত্রার কী হয়েছে? শিগগির বলো।

—গুলি, গুলি।

—ও কোথায়?

—পুলিশ হাসপাতালে। শিগগির যাও। তোমাকে খুঁজছে। ভোরবেলা লোক এসেছিল।

আমি যে ভাবে ছিলাম, সে ভাবেই বেরিয়ে গেলাম।

ওর ঘরের দরজার উপর লাল বাতি জ্বলছে। ঘরের সামনে ওর মা আর বাবা দাঁড়িয়ে আছে।

ওর বাবা দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে বললো, অতীশ, শিগগির ভেতরে যাও। নেত্রার যত বার জ্ঞান হচ্ছে, ততবারই কেবল তোমার নাম করছে।

আমি কিছু না বলে, ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

নেত্রার অচেতন দেহটা, সাদা চাদরে বুক অবধি ঢাকা। মুখে অক্সিজেনের মুখোস, বাঁ হাতে রক্তের নল লাগানো, সারা শরীরে লাগানো তার, সব যন্ত্রের মাধ্যমে কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত। নার্সের দৃষ্টি আটকে আছে কম্পিউটার স্ক্রীনের সবুজ রেখাগুলির দিকে।

নার্স আমার দিকে তাকালো—ওষুধ দিয়েছি, ঘুমোচ্ছে। আপনি?

—আমি অতীশ, ওর বন্ধু।

—যখনই চোখ খুলছে, তখনই আপনার কথা বলছে। কোথায় ছিলেন, এ কয়দিন?

—ছিলাম না এখানে। কেমন আছে এখন?

—ডাঃ উ থাইকে জিজ্ঞেস করুন। আমি নার্স—ভালো মন্দ আমি বুঝি না। নার্সিং-এ আমার ত্রুটি নেই, ডাক্তারদেরও চেষ্টার অন্ত নেই।

আমি ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলাম। আমার চোখের জল মাস্কের উপর পড়তেই, নার্স আমাকে চেয়ারটায় বসিয়ে দিল।

শুধু একটা প্রশ্নই বার বার মনকে ধাক্কা দিচ্ছে—ও বাঁচবে তো? ঠাকুর, ওকে নিয়ে যেও না, অতো নিষ্ঠুর হয়ো না। ঠাকুর, দয়া কর, ওকে বাঁচিয়ে তোলো। পাছে আমার কান্নার আওয়াজ শুনে ওর ঘুম ভেঙে যায়, তাই দুটো হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরলাম।

নার্স আমার মাথায় হাত দিয়ে বললো, অত ভেঙে পড়লে চলবে কেন? শক্ত হোন। আমার রুগি জেগে উঠে, যদি আপনাকে এইভাবে দেখে, তা হলে ওর মনোবল একদমই কমে যাবে। আপনার কাজ, ওকে আশা দিয়ে মনটাকে শক্ত করা। যান, একটু বাইরে ঘুরে আসুন। ওর ঘুম ভাঙলে, আপনাকে ডেকে আনবো।

বাইরে বের হতেই, ওর মা, বাবা উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ও কী চোখ খুলেছে? তোমার সঙ্গে কী কথা বলেছে?

আমি বললাম, না। ঘুমোচ্ছে। কী হয়েছিল, বলুন তো? ও তো বাড়ি থেকে বের হতো না, তা হলে ওকে গুলি করলো কোথায়? আর কেইই বা করলো? কেনই বা করলো?

এতগুলো প্রশ্ন শুনে ওর বাবা শিশুর মত চীৎকার করে কেঁদে উঠলো—আমারই দোষ, অতীশ। কপালের লিখন, কে খণ্ডাবে?

—আপনার দোষ, মানে?

—আমার দোষ মানে—আমাদের সঙ্গেই ও গিয়েছিল কাল। বিশ্বাস করো অতীশ, হলো, যা হবার তাই। নিরাপত্তার কোনও ত্রুটি রাখিনি। তাও যা ভয় পাচ্ছিলাম, তাই-ই হলো। আমার এমনই কপাল, যে আমাকে লক্ষ্য করা গুলিটা ওর গায়েই লাগলো, আর এমন জায়গায় লেগেছে যে ওর জীবন নিয়ে এখন টানাটানি।

—কোথায়, কী ভাবে, তা তো বললেন না?

ওর বাবার মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না, শুধুই কাঁদছেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে। কে বলবে, উনি একজন বিখ্যাত জেনারেল। আমার চোখের জলও বাঁধ মানছে না।

ওর মা তখন বললো, আমরা গিয়েছিলাম নেত্রার এক মাসতুতো বোনের বিয়ের রিসেপসানে, একটা মিলিয়নেয়ার ক্লাবে। সঙ্গে আমাদের দুজন সিকিউরিটি গার্ড ছিল। ক্লাবের মধ্যেও ছিল সাধারণ পোশাকে পাহারার লোক। আমরা সেখানে এক ঘণ্টা থেকে, মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে এলাম। আমাদের গাড়িটা একটু দূরে ছিল। ওখানে গাছের ছায়ায়, আলো একটু কম। গাড়ি ডাকার ঘোষণাকারি তখন ওখানে ছিল না, কারণ তখনও কারও বের হবার সময় হয়নি। আমাদের দেহরক্ষীরা আমাদের দেখতে পায়নি। আমরা যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছি তখন পাশ থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো। ওর বাবা, আমার হাত ধরে টেনে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। নেত্রা একটু এগিয়ে গিয়েছিল। ওকে ও চীৎকার করে বললেন, শুয়ে পড়তে। নেত্রা নিজেকে বাঁচাতে পারলো না, দুটো গুলি ওর গায়ে

লাগলো। ও পড়ে গেল। আমাদের রক্ষীরা ওমনি গুলি ছুঁড়লো—আক্রমণকারি একজনের গায়ে গুলি লেগে পড়ে গেল আর একজন দৌড়ে পালিয়ে গেল। গুলি-বিদ্ধ লোকটা মারা গেছে। মরবার আগে বলেছে—জেনারেলকে মারার জন্যেই ওরা গুলি ছুঁড়েছিল। পনেরো হাজার বাট দিয়েছিল একজন ওদের। সে লোকটার ঠিকানাও জানিয়ে গেছে।

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম। সব শেষ হলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আমি ওর ঘরে ঢুকলাম। তখনও ঘুমোচ্ছে।

দুজন ডাক্তার এলো ওকে দেখতে। কার্ডিয়গ্রামের চার্টটা খুলে দেখে, দুজনে মিলে কি আলোচনা করলো। টেম্পারেচার চার্ট দেখলো। নার্সকে একটা ইঞ্জেকসান দিতে বলে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন ওর বাবা ডাক্তারের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো, কী রকম বুঝছেন?

—আরও দুদিন না গেলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আমরা ফুসফুসের কাছের গুলিটা বের করে দিয়েছি, কিন্তু যেটা মেরুদণ্ডের মধ্যে লেগেছে, সেটা বের করতে সাহস পেলাম না, কারণ ওটা স্নায়ুগুচ্ছের খুব কাছে। স্নায়ু কেটে গেলে ও বেঁচে থাকলেও পুরো শরীর ওর অবশ হয়ে যাবে। ওরকম ভাবে বেঁচে থাকার চাইতে না বাঁচাই ভালো। তাই সাহস করিনি, ওটা বার করার চেষ্টা করতে।

—ডাক্তার, আমার মেয়েকে যেমন করেই হোক বাঁচাতেই হবে। ও আমার বড় আদরের একমাত্র সন্তান।

—ডাক্তার বললেন, আমাদের তো চেষ্টার ত্রুটি নেই। আজ আরও দুজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবো, দেখা যাক কি হয়। বুদ্ধদেবকে স্মরণ করুন। উনিই ভরসা—আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।

ডাক্তার চলে গেলে নার্স আমাকে ডেকে বললো, ডাক্তাররা একটু আশার আলো দেখছে। ফুসফুসের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। হার্টের অবস্থা এখন অনেক ভালো। ও তো এখনও ঘুমোচ্ছে। আপনারা বাড়ি থেকে খেয়ে আসুন।

ওর মা বললো, হ্যাঁ, তাই চলো। অতীশ, তুমি কি আজ রাতটা এখানে থাকবে?

—সে তো থাকবই।

—তুমি তো জামা কাপড়ও ছাড়োনি। একটু বাড়ি থেকে ঘুরে এসো। এতটা পথ এসেছো, নিশ্চয় খুব ক্লান্ত।

—আমি কোথাও যাবো না। গাড়িটা পাঠিয়ে দিন, আমার রাত্রিবাসটা নিয়ে আসবে। আপনারা যান, আমি থাকছি।

—তা হলে আমি ওনাকে নিয়ে যাচ্ছি, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই চলে আসবো, ওমনি তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসবো।

ওর বাবাও যেতে চাইছিল না। আমরা জোর করে পাঠিয়ে দিলাম।

নার্স বললো, আপনি এখানে বসুন। আপনার জন্যে একটা কফি নিয়ে

আনছি।

কফি খেয়ে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছি—ওর সঙ্গে কাটানো সুন্দর দিনগুলির টুকরো টুকরো কথা মনকে নাড়া দিচ্ছিল। কখন একটু চোখটা লেগেছিল। নার্সের ঠেলাতে জেগে গেলাম। নেত্রা চোখ মেলে তাকিয়েছে।

ক্ষীণ, করুণ স্বরে—উঃ বড় ব্যথা। অতীশ, তুমি কোথায়? তুমি কী আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো না? ও গড্, সেভ, মি প্লিজ্। ডোণ্ট্ টেক মি এওয়ে।

আমি তখন ওর মুখের কাছে মুখটা নিয়ে—এই তো আমি নেত্রা। আমি এসে গেছি। তুমি নিশ্চয় ভালো হয়ে যাবে।

আমার গালে আলতো করে হাতটা রেখে—তু-মি এ-সে-ছো, কো-থা-য়? আ-র-ও কা-ছে এ-সো। তো-মা-কে যে দে-খ-তে পা-চ্ছি না।

আমি মুখটা ওর চোখের সামনে রেখে—এই তো আমি।

অক্সিজেনের মুখোসটা থাকাতে ওর কথা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। নার্সকে বললাম, মাস্কটা কি একটু খুলে দেওয়া যায়?

—দাঁড়ান। ও মাস্ক খুলে একটা ক্যাথিডর নাকে ঢুকিয়ে দিল।

—তু-মি কা-ছে এ-সো।

আমি আবার মুখটা ওর মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। ও ডান হাতটা আমার ঠোঁটে, গালে বোলাতে বোলাতে—ও মাই সুইট্, অতীশ, আমার গালে একটু তোমার গালটা রাখো। তোমার স্পর্শে আমার ব্যথা দূর হবে। ও আবার চুপ, চোখটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি ওর চুলে বিলি কাটছি। চোখটা আবার খুললো—ও অ-তী-শ, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পিঠে আর বুকে বড্ড ব্যথা। আর পা-র-ছি না।

কম্পিউটার স্ক্রীনে ওর হার্টের গতি প্রকৃতি ও প্রেসারের ওঠানামা দেখে, নার্স আমাকে সরিয়ে দিয়ে মাস্কটা আবার মুখে লাগিয়ে একটা সেডেটিভ্ দিল। ও আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

নার্স বলে, আপনাকে দেখে বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। এখন কথা না বলাই ভালো। আপনাকে দেখেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

আমি আবার চেয়ারে এসে বসলাম। মাঝে মাঝে গিয়ে চাদরটা তুলি—ওর আকর্ষণীয় পা দুটোর দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, তারপর হাত বুলিয়ে দেখি, ঠান্ডা হয়ে গেছে কিনা।

ওর বাবা মা এসে গেছে। আমার জন্যে হ্যামবার্গার আর এক ফ্লাস্ক কফি নিয়ে এসেছে। ও আমার সঙ্গে কথা বলেছে শুনে, মনটা ওদের একটু হাল্কা হয়েছে।

জেনারেল সাহেবের জন্য হসপিটাল থেকে একটা কেবিন দেওয়া হয়েছে, তাতে তিনটে খাটে ধবধবে সাদা বিছানা। আমি ওর ঘর থেকে নড়িনি। ওর বাবা মাকে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওর বাবা মাঝে মাঝেই উঠে আসছে। ডাক্তারদের

আনাগোনা সারারাত ধরেই চলেছে।

আমি একবার করে ওর মাথার কাছে গিয়ে বসছি, আবার ফিরে আসছি ডেক চেয়ারটায়। ও যদি না বাঁচে, সেই কথাটা মনে হলেই ভয়ে গা শিউরে ওঠে। তখন দুর্বল মন, অবলম্বন খোঁজে শ্রীহরির পাদপদ্মে। ঠাকুর, দুর্গম পথ সুগম হয়েছে তোমার দয়াদাক্ষিণ্যে, এ বিপদ থেকে মুক্ত করো, ঠাকুর।

শেষ রাতের দিকে ও আবার চোখ খুলেছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

নার্স—কাকে খুঁজছেন?

—অ-তী-শ কোথায়?

—আপনার মাথার কাছেই বসেছিল এতক্ষণ। একটু শুয়ে পড়েছে চেয়ারটায়, ডাকবো?

—না থাক। ও একটু ঘুমোক। উঠলে, আমার কাছে বসতে বলো।

ওদের কথায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি দৌড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, ওর মুখের কাছে।

ও আমার গায়ে হাত দিয়ে বললো, তুমি সারারাত জেগে আছ। তোমার শরীর যে খারাপ হয়ে যাবে। তোমার শরীর খারাপ হলে, এখন কে দেখবে? তুমি আমাকে খু-উ-ব ভালোবাসো, তাই না? আমিও। যদি মরি, তবে যেন তোমাকে দেখতে দেখতে মরি।

—আমি তোমার কাছেই আছি। কোথাও যাবো না, যতদিন না তুমি ভালো হও।

—বাবা কোথায়?

—এখানেই আছে। আমি ঘুমোতে পাঠিয়েছি পাশের ঘরে। ডাকবো?

—হ্যাঁ, ডাকো।

ওর বাবা, মা দুজনেই এলো।

ওর বাবা গায়ে হাত বুলিয়ে বললো,—হ্যাঁ মা, এখন কেমন লাগছে?

—একটু ভালো। ভালো হলে, আমি আর দেশে থাকবো না বাবা।

—না মা, আর এখানে নয়।

—আমি অতীশের সঙ্গে চলে যাবো।

—তাই যাস্, মা।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ও হাঁপিয়ে উঠেছে। বড় ব্যথা বাবা, বলেই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

কম্পিউটার স্ক্রীনে সবুজ রেখাটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছিল। নার্স রক্ত যাওয়ার টিউবের ক্লিপটা এডজাস্ট করে দিল। তারপর ডাক্তারকে ফোন করে ডাকলো।

ডাক্তার দেখে মুখটা গম্ভীর করে বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। একটু পরেই

ফিরে এলো একটা ইঞ্জেকসান নিয়ে। সেটা ফুটিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

নেত্রার নিশ্বাস প্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। ডাক্তার চিন্তিত হয়ে চলে গেল।

তখন ভোরের মিঠে আলো জানলা দিয়ে নেত্রার মুখের ওপর পড়েছে। সে আলোতেও ওর চোখ খুললো না।

আমি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। গাছের ফাঁক দিয়ে ব্যাংকক স্পোর্টস্ ক্লাব দেখা যাচ্ছে। এইখানেই নেত্রার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। প্রথম দেখার দিনটির কথা মনে পড়ছিল, এখানেই কী এর শেষ হয়ে যাবে?

দেখা তো কত লোকের সঙ্গেই হয়, কিন্তু এ রকম ঘনিষ্ঠতা তো হয় না, যার ব্যথা নিজের বুকে এসে লাগে, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার বাসনা জাগে, মা-বাবা বংশরক্ষার কথা ভাবেন।

ওর বাবা মা এসে আমাকে বললো, অতীশ, তুমি তো সারারাত ঘুমোওনি। এবার বাড়ি গিয়ে স্নান করে একটু বিশ্রাম নিয়ে এসো। আমরা আছি। আমাকে জোর করেই পাঠিয়ে দিল।

আমি যখন ফিরে এলাম, তখন ওকে অনেকটা ভালো মনে হলো। ও ওর বাবার সঙ্গে কথা বলছিল।

ওর বাবার মুখে একটু হাসি। অতীশ, ও এখন একটু ভালো। ব্যথাটা একটু কম। তোমাকে খুঁজছিল। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো, আমরা বাইরে আছি।

আমি ওর মাথার কাছে বসে বললাম, একমাস পরে আমি হংকং বদলি হচ্ছি। আজ বাবার একঠা চিঠি পেলাম, আর দু'মাস পরে আমাদের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। সব বন্দোবস্ত করতে, আমাকে তাড়াতাড়ি একবার যেতে লিখেছেন।

--আমার কথা কী লিখেছেন?

—তোমাকে নিয়ে কোথায় কোথায় যাবেন, কী করবেন তার এক ফিরিস্তি পাঠিয়েছেন। তোমার কোনও চিঠি না পেয়ে ওদের খুব অভিমান হয়েছে। তুমি কেমন আছ, জানতে চেয়েছেন।

—সত্যি, আমার লেখা উচিত ছিল। আমি ভালো হয়েই লিখবো। ওঁদের ফোন করা যায় না?

—কলকাতায় এলে ফোন করতে পারবে। পনেরো দিন পর আসছে, তখন করো।

আমার হাতটা শক্ত করে ধরে—আমি বাঁচবো, অতীশ? বাঁচতে আমাকে হবেই। আমি বাঁচবই, আমি বাঁচবই, উঃ, আবার বড্ড ব্যথা, ভীষণ ব্যথা কোমরে। আমি পা নাড়তে পারছি না, অতীশ।

নার্সকে ডাকলাম। আমি ওর পায়ের কাছে গিয়ে দেখলাম, পা দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে।

—অতীশ, তুমি আমার সামনে এসো। নার্স, মুখোসটা একটু খুলে দাও না।

নার্স অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুলে দিল।

অতীশ, মুখটা একটু নামাও! আমি বাঁচবো কিনা জানি না। গিভ্ মি এ পার্টিং কিস্।

ও আবার চোখ বন্ধ করে ফেললো। ডাক্তাররা ছুটোছুটি আরম্ভ করলো। পোর্টেবল এক্সরে মেসিন নিয়ে ছবি তোলা হলো। আমরা অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর বড় ডাক্তার মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলো। ডামরুগপানের পিঠে হাত দিয়ে বললো, সরি, পারলাম না। কোমরের গুলিটা নার্ভ সেন্টারে ঢুকে গেছে। এই আশংকাই আমরা করেছিলাম। এখনও প্রাণ আছে, তবে বেশীক্ষণ নয়। আর কিছু করার নেই। আপনারা ভেতরে যান।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম, নেত্রার বুক হাপরের মত ওঠানামা করছে, অক্সিজেন লাগানো থাকা সত্ত্বেও। হার্টের গতি স্তিমিত হয়ে আসছে। প্রেসার নেমে গেছে। পায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি হাত দিয়ে ঘষে গরম করবার চেষ্টা করলাম। ওর বাবা মুখের কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে।

চোখ না খুলেই নেত্রা চীৎকার করে উঠলো—অ-তী···তারপরই ঘাড়টা কাত হয়ে গেল।

আমি নেত্রা বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেলাম।

ওর বাবা ওর মাথাটা নেড়ে—নেত্রা, একবার 'ফ' বল মা। ওর কান্নায় ঘরের বাতাস কাঁপছে।

ওর মুখখানা তখনও তাজা ফুলের মত। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে।

নার্স অক্সিজেনের মুখোসটা খুলে, ড্রিপের সুঁচটা বের করে, কাম্পউটারটা ডিসকানেকট করে, আমার পিঠে হাত দিয়ে বললো, সার।

আমার পা কাঁপছে। বুকে চাপ ধরছে। জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দৃষ্টি আটকে গেল নীল আকাশের কালো মেঘে। ভাবনাহীন শূন্যতায় ভাসছি। কতক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না। সম্বিত ফিরে এলো, যখন নেত্রার মা আমার হাতটা ধরে টানলো। দেখলাম নেত্রা বিছানায় নেই।

॥ ৬২ ॥

ঠিক করলাম, আর এখানে নয়।

এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলাম।

সম্মোহিতের মত নিজের সিটে বসে ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকিয়েছিলাম,

দেখছিলাম না কিছুই। চোখের সামনে ভাসছিল, নেত্রার বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা আর কানের মধ্যে আছাড় খাচ্ছিল—অ-তী-শ, অ-তী-।

কতবার এসেছি এ বিমানবন্দরে। হুল্লোড় করে সব যাত্রীদের সঙ্গে উঠেছি প্লেনে। যাওয়া আসার মাঝে একটা আনন্দের উচ্ছলতা ছিল। এ বিমানবন্দরটা দেখলেই মনটা খুশিতে ভরে উঠতো—একটা ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের ইঙ্গিত পেতাম—হয় মা বাবা বন্ধুবান্ধবের, না হলে নেত্রার। এখন শুধুই বিষাদ। এই শেষ।

প্লেনটা নড়ে উঠলো। আমার খেয়াল নেই কোনও ইতিকর্তব্যের কথা। বিমান সেবিকা আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, ফাসেন ইয়োর সেফটিবেল্ট প্লিজ।

আমি ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালাম। ও হেসে বেল্টের দুমাথা টেনে বেঁধে দিল। চেয়ারটা সিধে করে জিজ্ঞেস করলো, ইজ দেয়ার এনিথিঙ্গ রঙ্গ?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

প্লেনটা একটু উপরে উঠতেই সেই পরিচিত দৃশ্য। সেই রুপোলী জলরেখা, সর্পিল পথটা আর শ্যামদেশের শ্যামলীমা। এ দেশটা আমাকে আপন করে নিয়েছিল। কতই না আনন্দ দিয়েছে। আজ সে ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

চার বছর আগে যখন এসেছিলাম, তখন এ ছবিটা অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। তখন সাফল্যলাভের তাড়নায় নানান মতলব মাথায় ভিড় করছিল, নিজ ক্ষমতার উপর অফুরন্ত বিশ্বাস। আজ কোথায় গেল, সেই আত্মবিশ্বাস। আজ বুঝতে পারছি, সবই নিজ চেষ্টায় হয় না। ভাগ্যই শেষ বিধান দেয়। আমার ভাগ্যে ঘর বাঁধার লিখন নেই। যখনই যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার প্রস্তুতি করেছি, তখনই কার এক অদৃশ্য হাত তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

পায়ের কাছে রাখা হ্যান্ডব্যাগটা খুলে একটা ডায়রি বের করলাম—নেত্রার ডায়রি—ইংরেজিতে লেখা।

যখন ওকে শেষ বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে, দুটো বেলি ফুলের মালা আর একগুচ্ছ চাঁপা ফুল নিয়ে, তখন ওর শরীরটা সাদা চাদরে ঢাকা পড়েছিল, ওর নিজের খাটে। ওর মা ছিল আমার পাশটিতে। আমি ওর সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, অনেকক্ষণ স্থির হয়ে। তারপর মালা দুটো ওর বুকের উপর সন্তর্পণে রেখে ওর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া গাল দুটোতে আলতো করে হাত বুলিয়ে পায়ের উপর চাঁপা ফুলগুলো ছড়িয়ে ওর পায়ের উপরই আছড়ে পড়েছিলাম। আমার অশ্রুজলে সিক্ত হলো পদযুগল।

ওর মা হাতটা ধরে ওঠালো। ওর মাথার কাছে রাখা ডায়রিটা আমার হাতে দিয়ে বললো, ও নিজেকে উৎসর্গ করেছিল তোমার কাছে। তারই খুঁটিনাটি এতে ধরে রেখেছে। এটা তোমাকেই দিলাম।

ডায়রির প্রথম পাতায় লেখা 'হি এন্ড মি'।

পাতা উল্টে উল্টে দেখছিলাম। পুরোটা পড়ার মত এখন মনের অবস্থা নয়।

—আজই ওকে দেখলাম। যাকে খুঁজছিলাম, আজ মনে হচ্ছে তাকে পেয়েছি, কিন্তু ও যে বিদেশি ?…

—কিন্তু ও। ও কি আমাকে চায় ? কই ফোন করলো না তো ?…

—আর পারছি না থাকতে। আমিই যাবো।…

সন্ধ্যাটা খুব আনন্দে কাটলো। আজ আমি দারুণ খুশি, বুঝতে পেরেছি, ও, ও আমাকে চায়।…

—আজ ওকে খুব কাছে পেয়েছি। অনেকটা সময় কাটিয়েছি ওর সঙ্গে।…

—কি দারুণ নাচে ও। আরও কাছে পেতে ইচ্ছে করে।…

—ওর পুরোনো প্রেমিকাকে দেখলাম।…

—আমার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি হাত ছাড়া হয়ে যায়…

—ডিডি খুব ভালো মেয়ে। আমাকে বোন বলেছে।…

—ছোট বোনকে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়েছে।…

—কখন গিয়ে ওর পাশটিতে জায়গা করে নিয়েছি, নিজেই জানি না।….

—পারলাম না নিজেকে ধরে রাখতে…

—কী আনন্দ, কী আনন্দ…চিয়াংমাই আসা সার্থক হয়েছে।

—এবার কী হবে ? আর কী ওর সঙ্গে দেখা হবে ? আমাকে নিয়ে এরা কী করবে ? আমার শরীরটা নিয়ে টানাটানি করবে না তো ?…

—ভালোভাবেই রেখেছে। আশা করি ছেড়ে দেবে।…

—ও আমার খোঁজ নিয়েছে।…

—পালিয়েছিলাম।…ধরা পড়ে গেলাম।…

—খুন্ সান্ বেশ ভালো লোক। ..

—আমি ছাড়া পেয়েছি—বুদ্ধদেবের অসীম কৃপা।…

—আজ সন্ধ্যাটা ওর সঙ্গে ভালোই কাটলো, অনেকদিন পর ওর গায়ের পরশ… ঠোঁটে এখনও প্রথম চুম্বনের স্বাদ…

—ওর মা বাবা আসছে—আমার ভয় করছে—ওর কাছে বাংলা শিখছি…

—ওর মা বাবা এসে গেছে।—আমাকে দেখা করতে নিচ্ছে না কেন ?—হতাশ হয়ে পড়ছি।…

—দেখা হলো ওঁদের সঙ্গে।—হারটা ওর মাকে পরিয়ে দিতেই খুব খুশি। আরও খুশি আমার বাংলা কথা শুনে।…

—ওরা রাজি হয়েছে।—আমাকে মেয়ের মত দেখছে। খুব ভালো লোক।…

—বাবাকে বলেছি—ভীষণ রাগ—মা সহায়।…

—শেষ পর্যন্ত ওকে বাবার ভালো লেগেছে…

—আবার ওকে ছেড়ে যেতে হবে…মনটা খুব খারাপ।—পালিয়ে এসেছি।…

—রোজই দেখা হয়।

—বাবা ভীষণ ভয় পেয়েছে—খুন্ সানের প্রতিশোধের ভয়।…

—আমার বন্দী জীবন, তবু ওর সঙ্গে দেখা হয়। ও রোজই আসে।…

—ও আবার হংকং যাচ্ছে।…

—এরপর আর লেখার সময় পায়নি। ডায়রিটার মধ্যে দুটো ছবি ছিল। একটা ছবি মনীষা তুলেছিল পাত্তায়ায়, আমাদের দুজনার। ওর পরনে ছিল শাড়ি। ছবিটা ডায়রির পাতায় সাঁটা। তার পাশের পাতায় লেখা—

কী দারুন দেখাচ্ছে। ঐ দিনটার অপেক্ষায় আছি, যেদিন আমরা সবসময় একসঙ্গে এমনি পাশাপাশি থাকবো।…

আর একটা ছবি—মা, বাবা, আর নেত্রা। মা হাসছে, বাবার মুখে খুশির ভাব।

কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন যেন সমুদ্র পাড়ে বালি দিয়ে গড়া খেলার ঘর, ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বাবা মার কথা ভেবে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

বিমান সেবিকা—আপনার খাবার। টেবিলটা নামিয়ে ট্রেটা রেখে গেল।

আমার খাবার পড়ে রইল। আমি তখনও ছবি দুটো দেখছি, আর ভাবছি, ভবিতব্যের কথা। চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে—ছবি অস্পষ্ট, প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

সেবিকা এসে বললো, একি, আপনি খেলেন না? এটা কার ছবি, এতক্ষণ ধরে দেখছেন। আপনার স্ত্রীর বুঝি? ভারি সুন্দর তো?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর।

—অনেকদিন বুঝি দেখেন নি?

বললাম, না, আর দেখা হবে না।

সেবিকা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, আই এম সো সরি।

— সমাপ্ত —